দাম ঃ ৪০ টাকা

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা - ১৪১৫

৬ অক্টোবর - ২০০৮

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা - ১৪১৫, (যুগাব্দ ঃ ৫১১০)
৬১ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ৬ অক্টোবর, ২০০৮

সূচীপত্র

দেবী বন্দনা ❒ ডঃ সীতানাথ আচার্য, শাস্ত্রী ❒ ৪
শক্তি ছাড়া কি মা মহাশক্তির পূজা হয়? ❒ স্বামী যুক্তানন্দ ❒ ৫

উপন্যাস

তনয়া
সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত

❒ ৫৪

মুক্তিপণ
শেখর বসু

❒ ১১৮

এই সময়
কণা বসু মিশ্র

❒ ১৬৯

স্বপ্নভঙ্গের এক করুণ কাহিনী
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

❒ ২০৪

গল্প

ফরেনার ❒ এষা দে ❒ ২৪
সংসার সুখের হয় ❒ রমানাথ রায় ❒ ৩৫
নিষ্ক্রমণ ❒ মানবেন্দ্র পাল ❒ ১০২
রফা ❒ সজল দাশগুপ্ত ❒ ১৩৮
বেঁচে থাকার অন্যমুখ ❒ দীপঙ্কর দাস ❒ ১৫১
বিনোদ ঠাকুরের গল্প ❒ গোপালকৃষ্ণ রায় ❒ ১৫৬
মনের আয়নায় ❒ সুমিত্রা ঘোষ ❒ ১৯৮
তিমির বলয় ❒ গোপাল চক্রবর্তী ❒ ২২৮
কিডন্যাপ ❒ বাদল ঘোষ ❒ ২৩৪

প্রবন্ধ

ভারতবর্ষ এক সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র ❒ কে এস সুদর্শন ❒ ৯

আত্মার রহস্য উন্মোচন জড়-বিজ্ঞানীদের পক্ষে অসম্ভব ❒ ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী ❒ ১৫

আয়ুর্বেদের পুনরুত্থান ঃ ভারতের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা ❒ অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায় ❒ ২০

ভ্রান্ত পথের পথিক ডিরোজিও ❒ ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ❒ ২৮

মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ ফজলুল হক থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ❒ ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ ❒ ৩১

শতবর্ষের আলোকে ১৯০৮ সালের বোমার গল্প ❒ অধ্যাপক রবি রঞ্জন সেন ❒ ৪৯

স্বরাজের দাবিতে ইংলণ্ডে প্রথম সভা ❒ ডাঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্য ❒ ৯৯

বিপ্লবী বীর সাভারকর আজ উপেক্ষিত কেন? ❒ নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য ❒ ১১১

চতুর্থ পরিসর ও গণতন্ত্রে বিকৃতি ❒ তথাগত রায় ❒ ১১৬

সন্ত্রাসদীর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চল ❒ সুবীর ভৌমিক ❒ ১৪৪

অগ্নিপুরাণে ভারতীয় মনীষা ❒ ডঃ রবীন্দ্রনাথ বসাক ❒ ১৮৭

হিন্দুত্ব ❒ ডঃ প্রীতিমাধব রায় ❒ ১৯১

গোর্খাল্যাণ্ড নির্ধারণের মাপকাঠি কি হবে? ❒ ডঃ বলরাম চক্রবর্তী ❒ ২২৫

রম্য-রচনা

হুঁকো বার এক যৌন সুড়সুড়ির ব্যবসা ❒ চণ্ডী লাহিড়ী ❒ ১৪৯

ইতিহাস আশ্রিত কাহিনী

শিবাজী ও শাহজাদী ❒ ডঃ প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী ❒ ৪৩

পৌরাণিকী

মহাভারত কি ব্যাসদেবের আত্মজীবনী? ❒ মানিক চন্দ্র দাস ❒ ১৬৩

দিব্যজীবন

পুণ্য দর্শন মহেন্দ্রনাথ— জীবন চেনায় যারে ❒ অরিন্দম মুখার্জী ❒ ১৯৪

দেবী বন্দনা

● সীতানাথ আচার্য

যা দেবী জগতঃ পরাৎ পরতরা সর্বার্থসংসাধিকা
মাহাত্ম্যং গদিতুং ভবন্তি প্রভবো যস্যা ন দেবা অপি।
যাং ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতয়ো ধ্যায়ন্তি দেবাশ্চিরং
তাং দুর্গাং জননীং শুভাং দশমহাবিদ্যাস্বরূপাং ভজে।। ১।।

যে দেবী জগতের পরমতত্ত্বসমূহের থেকেও পরমতর, সর্বার্থ সিদ্ধিদাত্রী, যাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে দেবতারাও অসমর্থ, যাঁকে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ চিরকাল ধ্যান করেন, দশমহাবিদ্যাস্বরূপিণী সেই কল্যাণময়ী জননী দুর্গার ভজনা করি।

হস্তেনৈব রিপোর্বিগৃহ্য রসনামেকেন চান্যেন চ
ভ্রাম্যদ্‌মুদ্গরঘট্টনাং বিদধতীং পীতপ্রসূনপ্রিয়াম্।।
পীযূষোদধিমধ্যসংস্থিতিযুতে সিংহাসনে সংস্থিতাং
শ্রীবিদ্যাং বগলাত্মনা স্থিতিমতীং দুর্গাং ভজে ভক্তিতঃ।। ২।।

যিনি একহাতে শত্রুর জিহ্বা ধারণ করেন, অন্যহাতে মুদ্গর ঘূর্ণন করেন, যিনি অমৃতসিন্ধুর মধ্যস্থিত সিংহাসনে সমাসীন এবং পীতকুসুম যাঁর অত্যন্ত প্রিয়, বিদ্যাদায়িনী বগলাস্বরূপে বিদ্যমানা সেই দুর্গার ভক্তি সহকারে ভজনা করি।

সন্তপ্তহেমচিরাং কমলাসনস্থাং
পাশামাল্যকমলাঙ্কুশযুক্তবাহুম্।
ঐশ্বর্যদাননিরতাং সুরবৃন্দবন্দ্যাং
দুর্গাং নমামি কমলাস্বরূপাং সভক্তি।। ৩।।

যিনি তপ্তস্বর্ণবর্ণা, পদ্মাসনে বিরাজমানা, যিনি হাতে পাশ, অক্ষমালা, পদ্ম এবং অঙ্কুশ ধারণ করেন, ঐশ্বর্যদাননিরত সুরবৃন্দবন্দিত কমলাস্বরূপিণী দুর্গাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি।

শক্তি ছাড়া কি মা মহাশক্তির পূজা হয়?

স্বামী যুক্তানন্দ

মাঠে-ঘাটে-পথে-প্রান্তরে আজ রাশি রাশি কাশ ফুলের হাসি, কাননে কাননে শিউলীর মধুমাখা গন্ধ, নীলনবঘন আশ্বিন গগনে অগণিত শুভ্র মেঘের ভেলা ছুটে চলেছে দিক হতে দিগন্তে বিরাম বিশ্রামহীন ভাবে। যেন সকলের একই বক্তব্য— মা আসছেন বৎসরান্তে আবার আমাদের ঘরে। মা মেনকা সহ সবাই আমরা সারাটি বছর ধরে তাঁর আশাপথে চেয়ে আছি, কবে আবার উমা আমাদের ঘরে আসবেন। শরতের আজ প্রকৃতি দেবীই যেন সেই সংবাদই দিচ্ছেন ওই শুভ্র মেঘের ভেলা, কাশফুল ও শিউলি ফুলের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু উমার আসার জন্য আমাদের এত ব্যাকুলতা কেন, কেন তাঁর পথপানে এত আকুলভাবে চেয়ে থাকা? হ্যাঁ, তাও তো ঠিক। কিন্তু উমা যে শুধু আমাদের ঘরের মেয়েই নয়, সে যে শিবানী, যে শিব তাঁর ত্রিশূলের আঘাতে ত্রিপুরাসুরের হৃদয় ছিন্নভিন্ন করেছিলেন। যে শিব শিবনিন্দাকারী দক্ষের মুণ্ড ছেদন করেছিলেন আমাদের উমা তো তাঁর ঘরণী। শুধু কি তাই;তাঁরও যে অনন্ত শক্তি, তিনিও তো নিজে মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ, দুর্গ, চণ্ড-মুণ্ড, ধূম্রলোচন, রক্তবীজ প্রভৃতি কত অসুরকে নিধন করে আমাদের শান্তি দিয়েছেন, স্বস্তি দিয়েছেন, করেছেন শত্রুমুক্ত, সংকটমুক্ত। সেজন্যই মা আমাদের নিকট বিপদতারিণী, বিপদবারিণী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। আর তাই তো আমাদের আকুল হয়ে মা-র পথপানে চেয়ে থাকা। মায়ের পূজার চাঁদা আদায় করা, প্যাণ্ডেল বাঁধা। আলোর বন্যা বইয়ে দেওয়া চেষ্টা ইত্যাদি কতকিছুই শুরু হয়ে যায়। আর সে কাজে আমাদের উৎসাহ, আমাদের উদ্যোগকে বাড়িয়ে দিতেই যেন স্বয়ং প্রকৃতি বার্তা দিচ্ছেন ওই আসছেন, ওই আসছেন আমাদের মা।

বর্ষে বর্ষে হর্ষ ভরে এভাবেই হিন্দু, বিশেষত বাঙালি করে চলেছে মাতৃপূজা। মা মহাশক্তির পূজা। কিন্তু তবুও আমাদের অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস, দুর্গতিহারিণী, দুঃখহারিণী মায়ের পূজা করেও আমাদের হিন্দুদের দুঃখের, দুর্গতির আর অবসান হচ্ছে না। সেই কবে থেকে শুরু হয়েছে বিধর্মী অত্যাচারীর অত্যাচারে ভিটেমাটি ছাড়া আজও তা চলেছে, কখনও দেশ থেকে দেশান্তরে, কখনও গ্রাম থেকে শহরে। কখনও হতে হয়েছে স্বজনহারা, সম্পদহারা, মানহারা। হয়েছে সতী নারীর সতীত্ব হরণ, মন্দির ও বিগ্রহ চূর্ণ। যার সবই ছিল সে হল সর্বহারা,

আর যার কিছুই ছিল না, বা সামান্যই ছিল তারই হল সব।

আজও সেই ট্রাডিশনের বিচ্যুতি ঘটেনি। যদিও তা একটু অন্য ছন্দে। অন্য লয়ে। আজও ঘন ঘন ভাঙছে সংসার নদীর পাড়। তাতে তলিয়ে যাচ্ছে কত সংসার, কত গ্রাম, কত সমাজ। সেই সঙ্গে আরও কতকিছু। হিন্দু তার স্বভাববশত পিছিয়ে পিছিয়ে বাঁচতে চাইছে। কিন্তু সেভাবেই বা আর কতদিন! কারণ তার পিছিয়ে যাওয়ার জমি যে আজ প্রায় শেষের মুখে। হিন্দু যে আজ অতল খাদের কিনারায় এসে পৌঁছেছে। তদুপরি আছে কাটো-লুটো বাটো-ওয়ালাদের বোমার আস্ফালন। আছে হিন্দুর সংসারের নিত্য অভাব-অনটন-অসুখ-অশান্তি।

তাই প্রশ্ন অনেকেরই, দুঃখহারিণী, দুর্গতিহারিণীর এত পূজা করেও হিন্দু তোমার দুঃখ যায় কৈ! হিন্দু তুমি এত কষ্ট করে, এত আয়োজন করে, এত আশা নিয়ে মা-র পূজা করলে, আর মা তোমায় করলেন উপেক্ষা, তোমার কোনও কথাই শুনলেন না, প্রার্থনা পূরণ করলেন না। কেন করলেন না? তবে মা কি পাষাণী! তিনি কি হৃদয়হীনা বলেই আমরা মনে করব? হিন্দু, মাকে তুমি যা খুশী মনে করোই না কেন, তার আগে চিন্তা করো তুমি মাকে কি দিয়েছ? তুমি মাকে কিভাবে পূজা করেছ। মা তোমার কাছে কী চেয়েছেন, তিনি কী পেয়েছেন সেসব কথা। মা আজও পাষাণী নন, হৃদয়হীনা নন। হিন্দুরই মা-কে বুঝতে ভুল হচ্ছে। হিন্দুর ভুল কোথায় সেকথা অনুভবশীল সাধক কবি স্বামী বেদানন্দজী বহু আগেই বলে গেছেন। তিনি বলেছেন—

"তুমি হিন্দু—
তুমি নাকি শক্তি(র সাধক!
বর্ষে বর্ষে হর্ষ ভরে কর শক্তি(পূজা-আয়োজন।
দুর্গতিহারিণী মাতা দুর্গারে পূজিয়া,
দুর্গতি তোমার কেন না যায় ঘুচিয়া?
সাধনায় সিদ্ধিলাভ শাস্ত্রের বচন,
বুঝিয়ো নিশ্চয় ত্রুটি আছে, হয়নি সাধন!"

সেই ত্রুটিটি কি? সেকথাও পূজ্য স্বামীজী তাঁর আর এক কবিতায় বলেছেন—

"যত পূজা তুমি করেছ হিন্দু
পড়ে নাই মোর পায়ে
হীন বীর্যের ক্লীবতার পূজা
স্বীকার করি না তাহে।
অত্যাচারের প্রতিরোধে যবে
ভীম প্রতিজ্ঞা লও যদি সবে—
সেই দিনে তব প্রার্থনা ধ্বনি
পশিবে আমার প্রাণে
শুধু ফুলে পূজা লব না এবার
কাতর কাকুতি গানে।"

তাহলে মা-র পূজায় আমাদের ত্রুটি কি? পূজ্য স্বামীজীর মতে, ত্রুটি হল, যিনি মা মহাশক্তিময়ী, সর্বশক্তি স্বরূপিণী, সর্বশক্তি প্রদায়িণী তাঁকে আমরা দিচ্ছি ফুল, বেলপাতা, তুলসী চন্দনের উপাচার। আর তার সাথে কিছু কাতর কাকুতি। তাতেও না আছে শক্তি, না আছে সর্বস্বপ্রদান। দেহ-মন-বুদ্ধির সর্বশক্তি দেবীবরণে দেওয়া হলে তবেই যে দেবী তুষ্টা হন, তাঁকে দিচ্ছি সামান্য ফুল-বেলপাতা আর কাতর কাকুতি। এ যেন সেই তুমি নাও মা আমার সব দুঃখের ভার, আর আমাকে দাও পুষ্পের ভার।

ধনের জন্য আমরা ধনদেবী লক্ষ্মীর পূজা করি। বিদ্যার জন্য পূজা করি বিদ্যাদায়িনী মা সরস্বতীর। কিন্তু শুধুমাত্র মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে পূজা করলেই কি মা আমাদের ধন, বিদ্যা দান করেন? সেজন্য যেমন আমাদের কৃষিকাজ, ব্যবসা করতে হয়, তেমনই রীতিমতো লেখাপড়া করতে হয়। তবেই ধন বা বিদ্যা পাওয়া যায়। বরং আরও বলা ভাল, যদি কেউ মায়ের পূজা না করে প্রাণ মন দিয়ে কৃষিকাজ বা লেখাপড়া করে তবে তাতেই মা লক্ষ্মী বা মা সরস্বতী তার প্রাপ্য প্রসন্ন মনে বুঝিয়ে দেবেন। সেটিই মায়ের প্রকৃত পূজা। বাস্তবিক পূজা। এক্ষেত্রেও সেই একই কথা। মা মহাশক্তির প্রসন্নতার জন্য আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাঁর পূজা, তাঁর কাজ করতে হবে। তবেই তিনি প্রসন্না হবেন। আমাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবেন। আর আমরা কিছুই করব না, কিছুই দেব না অথচ সব বুঝে নেব, এমন কখনও হয় নাকি?

আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষে অতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা মাতৃকরুণা পেয়েছেন বলে শুনেছি, তাঁরা সকলেই সত্য সত্যই যথাবিধানে, যথাযোগ্য উপাচারে মা মহাশক্তির পূজা করেছেন। করেছেন বলেই মা-ও তাঁদের কোনও আশাই অপূর্ণ রাখেননি। ওগো হিন্দু, মায়ের করুণা পেতে হলে তোমাকে তাঁদের পথ ধরেই চলতে হবে। তাঁদের আদর্শকেই মেনে নিতে হবে। একবার ভেবে দেখেছ কি সেই অতীতের কথা। সেই আর্য-বীর্য কাহিনী? ভেবে দেখেছ কী মধুকৈটভ, মহিষাসুর, ধূম্রলোচন, চণ্ড-মুণ্ড-রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের কাহিনী। সেসব কথা তো শ্রীশ্রী চণ্ডীতেই আছে। আছে দেবী ভাগবতেও।

পৃথিবী তখন এক বিরাট কারণ সমুদ্রে পরিণত। ভগবান শ্রীবিষ্ণু অনন্তনাগকে শয্যারূপে বিস্তৃত করে যোগনিদ্রায় মগ্ন হয়ে আছেন। সে সময় শ্রীভগবানের কর্ণমল থেকে সৃষ্ট হয়েছে দুই মহাসুর— মধু ও কৈটভ। জন্মসূত্রেই তারা অসুর বা অশুভ শক্তিসম্পন্ন। দেবতা বা দেবস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি বা শক্তির তারা বিরোধী। সেজন্য দেখা যায়, তারা তাদের সামনে ব্রহ্মাকে দেখেই তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত।

নিরস্ত্র ব্রহ্মা। তিনি নির্বল। তাঁকে মারতে উদ্যত দুই অসুরকে দেখেই তিনি ভয়ে ভীত, শঙ্কিত। সেই আক্রমণকারী দুই অসুরের হাত

থেকে রক্ষা পেতে শুরু শ্রীবিষ্ণুর স্তব। ভয়ে আকুলতা সহকারে স্তুতি করলেও যোগনিদ্রাভিভূত শ্রীভগবানের কানে সে প্রার্থনা পৌঁছায় না। ভগবানের করুণা পেতে ব্যর্থ হয়ে সৃষ্টিকর্তা শ্রীবিষ্ণুর নয়নাশ্রিতা অতুলা তামসী শক্তি বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রীর নিকট অনেক কাতর প্রার্থনা করলেন, উদ্দেশ্য যদি তিনি যোগনিদ্রায় অভিভূত ভগবানের থেকে সরে আসেন। আন্তরিকতা ছিল প্রার্থনায়। তাই তা বিফলে গেল না। যদিও দেবী মহামায়া ব্রহ্মার দুই শত্রুকে বধ করলেন না, কিন্তু তাদের বধকর্তা শ্রীবিষ্ণুর থেকে সরে এলেন। ফলে যোগনিদ্রা থেকে উত্থিত হলেন শ্রীভগবান। নিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মার কাতর কাকুতির কারণ শুনেই সেই দুই দৈত্যনিধনে শুরু করলেন যুদ্ধ। যুদ্ধ চলল অনেকক্ষণ ধরেই। শুনতে অবাক লাগলেও বিশ্বপতি শ্রীবিষ্ণুই কিন্তু যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এরপর তিনি দৈত্যদের শক্তির প্রকৃত রহস্য অবগত হয়ে দেবীর স্তব করলেন। স্তবে তুষ্টা দেবী ভগবান বিষ্ণুর সহায় হলে দৈত্যদ্বয় বিনষ্ট হল।

মহিষাসুরের ঘটনায় জানা যায়, সেই পরাক্রমী অসুরের সঙ্গে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের একশ বছর ধরে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হন। তখন তাঁরা নিজ রাজ্য স্বর্গ উদ্ধারের জন্য শক্তি সংগ্রহের উপায় খুঁজতে খুঁজতে যথাক্রমে ব্রহ্মা, শিব এবং শেষপর্যন্ত ভগবান বিষ্ণুর নিকট গিয়ে উপস্থিত হন। সম্মিলিত দেবতা আদ্যাশক্তি মা মহামায়ার নিকট শক্তি প্রার্থনা করেন। তাদের প্রার্থনায় দেবী ভগবতী আবির্ভূতা হন। সেই দেবী মহাশক্তিকে সকল দেবতা নিজ নিজ শক্তি ও অস্ত্র দিয়ে রণসাজে সজ্জিতা করলেন। সেই প্রবল মহাশক্তির নিকট যুদ্ধে আসুরিক শক্তি পরাভূত হল। দেবতারা ফিরে পেলেন নিজেদের হৃত রাজ্য।

শুম্ভ বধের ঘটনায় শক্তিমানের জন্যই শক্তি পূজা কথাটি বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়। দেবতারা মহাবল ও পরাক্রমী শুম্ভ নিশুম্ভের শক্তির সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করেও নিজেদের রাজ্য ও মান কিছুই রাখতে পারছেন না। তখন তাঁরা কি করেন চিন্তা করতে করতে পথ অবশ্যই খুঁজে পান। তাঁদের স্মরণে আসে মহিষমর্দিনী মা মহাশক্তি তো তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন— বিপদকালে আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাদের সকল বিপদ তখুনি নাশ করব। আশ্বাসে ভরসা রেখে তাঁরা গেলেন দেবী শ্রীশ্রীচণ্ডীকার নিকট। সেখানে তাঁরা দেবীর নিকট প্রার্থনা করে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা ও স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বলেন। দেবী তাঁদের সব কথা শুনে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। দেবী হাতে নিলেন অস্ত্র। শুরু হল শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পালা। সেই পালা দেবতারা কিন্তু দূর থেকে দাঁড়িয়ে না দেখে নিজেরাও নিজেদের অস্ত্র নিয়ে দেবীর সঙ্গে শত্রুবধে সামিল হলেন। এভাবে যে যে দেবতারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন তন্মধ্যে যেমন ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণী, মহেশ্বর-মাহেশ্বরী, কার্তিক-কৌমারী, বিষ্ণু-বৈষ্ণবী, বরাহমূর্তিধারী বিষ্ণু-বরাহী, নরসিংহের মূর্তি - নারসিংহী, ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী প্রমুখ।

যে সুরথ রাজাকে সেই মহামায়া শোনানোর জন্য ঋষিবর মার্কণ্ডেয় শ্রীশ্রীচণ্ডীর গল্প শুনিয়েছেন, তাঁরও ঘটনা তো সেরকমই। তিনি শত্রুদের নিকট পরাজিত ও নিজ অমাত্যবর্গের দ্বারা রাজ্যহারা। একক শক্তিতে বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করাও সম্ভব নয়। লজ্জায় ও দুঃখে চলে গেলেন গভীর জঙ্গলে। সেখানে মুনিবরের মুখে শুনলেন মহামায়া মহাশক্তির কথা। শুনলেন তাঁর কৃপা হলে সবই সম্ভব। বুঝলেন কিভাবে তাঁর পূজা করতে হবে। ব্রতী হলেন মা-র পূজায়। ভক্তিপূর্ণ চিত্তে মাকে সব দিয়ে, এমনকি নিজেকেও (নিজের শরীরের মাংস) দেবীর চরণে উৎসর্গ করে দেবীর প্রসন্নতা পেলেন। মাতৃকৃপায় হলেন পূর্ণশক্তির অধিকারী। ফিরে পান রাজ্য, সম্পদ সবই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে আমরা মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের যে দুর্গাপূজার ঘটনা পড়ে থাকি, তাতেও দেখা যায়, অশুভ শক্তি রাক্ষসকুল ধ্বংস করতে তিনি বীরবিক্রমে মহাসংগ্রাম করছেন। কিন্তু রাবণ যেন মৃত্যুঞ্জয়ী, তাকে মারা খুবই কঠিন। সে সময় প্রভু রামচন্দ্র জগজ্জননী মহাশক্তির নিকট রাক্ষস বধে শক্তি চাইলে দেবী তাঁকে পূর্ণ শক্তি দিয়ে সহায়তা করেন। রাম হলেন রাবণ বিজয়ী।

ছত্রপতি শিবাজীর জীবনেও শোনা যায়, যখন তিনি আপন বাহু ও বুদ্ধিবলে এবং নিজ অনুগত সৈন্যদের সহায়তায় বিধর্মী অশুভ শক্তিকে পরাভূত করতে তৎপর হয়েছিলেন, সেসময় মা ভবানী তাঁকে দিয়েছিলেন নিজ শক্তি স্বরূপ অজেয় খড়্গ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে হিন্দু জাতির রক্ষায় আবির্ভাব ঘটেছিল জাতি সংগঠক যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের। যাঁর সাধনাই ছিল বীর্যের সাধনা, যিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, দুর্বলের কান্না, সে আমার জন্য নয়, আমি বুঝি অস্খলিত ব্রহ্মচর্য। সমগ্র জীবনই তিনি যেমন ব্রহ্মচর্যের সাধনা করেছেন, বীর্যের সাধনা করেছেন, শক্তির সাধনা করেছেন, তেমনই দেশ-জাতি-সমাজও যাতে শক্তিশালী ও সবল হয়ে ওঠে সেজন্য চেষ্টা করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবনেও দেখা যায়— অন্যায়কারী, অত্যাচারী দুর্বৃত্ত যত প্রবলই হোক না কেন, তাঁর শাসনের নিকট তাকে পরাজয় স্বীকার করতেই হয়েছে।

পরন্তু তিনি হিন্দু জাতিকে শিখিয়েছেন, হিন্দু তোমাকে বাঁচতে হলে শক্তিশালী হতে হবে, সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, প্রয়োজনে অস্ত্রও নিতে হবে। তাছাড়া বীরভোগ্যা এ বসুন্ধরায় তোমার নেই অধিকার বাঁচিবার। তিনিই হিন্দুকে শিখিয়েছেন, শুধু ফুল বেলপাতা বা তুলসী চন্দন দিলেই দেবীর মহাশীর্বাদ পাওয়া যাবে না। তার জন্য চাই শক্তির উপচারে পূজা। সেই স্বামী প্রণবানন্দজীকে দেবীর মহাশক্তি লাভে রাশি রাশি ফুল, বেলপাতা ছড়াতে হয়নি, চোখের জলে বুক ভাসাতে হয়নি। পশুবলি দিতে হয়নি বা অন্য আর কিছুই করতে হয়নি। যখনই তাঁর মাতৃদর্শন, মাতৃশক্তি লাভের ইচ্ছা জেগেছে তখনই দেবী তাঁর নিকট স্বয়ং প্রকাশিতা হয়েছেন, ধরা দিয়েছেন। নিজ শক্তি প্রদান করেছেন সর্বোত্তম শক্তি সাধকের নিকট।

হিন্দুর শক্তিপূজার গূঢ় রহস্য ও শক্তি অর্জনের কৌশলটি কি? সে সম্বন্ধে জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য—

"হিন্দু! তুমি শক্তির উপাসক, মহাশক্তির পূজারী, তোমার আরাধ্য দেবদেবী মহাশক্তির ঘনীভূত বিগ্রহ— ইহা কি তুমি একেবারেই ভুলিয়া গেলে? অন্যায়ের প্রতিকার দৃষ্টদুর্বৃত্তের দমন ও শাসনই যে তাঁহাদের লীলা, তাহা কি তুমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলে? শিবের হাতে শাণিত ত্রিশূল, শ্রীকৃষ্ণের হাতে ভীম সুদর্শন, কালীর হস্তে রক্তাক্ত খড়্গ, দুর্গা দশ হস্তে দশ প্রহরণ দেখিয়াও কি তোমার ভিতরে শক্তির স্ফুরণ— সাহসের সঞ্চার হয় না? যে যাঁর পূজা-উপাসনা ও ধ্যান করে সে তো সেইরূপ ভাবই প্রাপ্ত হয়। তবে তুমি কেন মহাশক্তির পুজোপাসনা করিয়াও দিনের পর দিন দুর্বল, ভীরু, কাপুরুষ, নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছ? তোমার ভিতর কেন সেই সাহস ও বীরত্ব, দুষ্টদুর্বৃত্ত দমনের সেই আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ জাগ্রত হইতেছে না? ইহাতে বুঝিতে হইবে— তোমার পূজা উপাসনা ঠিক ঠিক হইতেছে না। যে দেবতা যে ফুলে সন্তুষ্ট

তুমি তাঁহাকে সেই ফুল দাও, যে দেবতা যে উপাচার পছন্দ করেন তুমি তাঁহাকে সেই উপাচার দিয়া পূজা কর। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের বেলায় তো তুমি তাহা কর না। যে দেবতা যে অস্ত্র ধারণ করিতে ভালবাসেন, যে অস্ত্র দ্বারা যে দেবতা দুষ্টদুর্বৃত্তের দমন ও ত্রিভুবন শাসন করেন, তুমি কি সেই সমস্ত বিশেষ বিশেষ অস্ত্র দ্বারা বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজারতি কখনও করিয়া থাক? তাহা না করিলে কী করিয়া তুমি তোমার আরাধ্য দেবতার কৃপালাভ করিবে, কেমন করিয়া তিনি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বরাশীষ দান করিবেন?"

"হিন্দু! আজ তোমার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে তোমাকে তোমার দেবতার প্রিয় জিনিস— অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ঠিক ঠিক ভাবে শক্তিপূজা করিতে হইবে। ঘরে ঘরে শক্তি-চর্চা, শক্তি অনুশীলনের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেককে শক্তিমান করিয়া তুলিতে হইবে এবং প্রয়োজন মতো উপযুক্ত ক্ষেত্রে সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। আবালবৃদ্ধ নরনারী প্রত্যেককে শুনাইতে হইবে, দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতাই মহাপাপ। আর বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্বই মহাপুণ্য।

হিন্দু! আজ তোমাকে আত্মবিস্মৃতির মোহজাল ছিন্ন করিতে হইবে। মহানিদ্রা, মহাবিভ্রম-বিভ্রান্তির ঘোর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। সমস্ত ভয়ভাবনা ত্যাগ করিয়া, দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতাকে জন্মের মতো বিসর্জন দিয়া এখন তোমাকে সর্বদা স্মরণ করিতে হইবে, মনে প্রাণে গাঁথিয়া রাখিতে হইবে— তোমার শক্তি-সামর্থ্য, বল-বীর্য-সাহস কাহারও অপেক্ষা কম নয়, বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থেও তুমি কাহারও তুলনায় হীন নও। তুমি কাহারও খাদ্যসামগ্রীও নও যে, যে কেহ যখন তখন, যেখানে সেখানে তোমাকে খাইয়া ফেলিবে। তাহা হইলেই তোমার সমস্ত দুঃখদুর্দশা দূর হইবে, তুমি মহাশান্তি, সুখে মান-মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার সহিত অবস্থান করিতে পারিবে।"

হিন্দুর শাস্ত্রই প্রমাণ করে যে, হিন্দু প্রাচীনকাল থেকেই শস্ত্রধারী। হিন্দুর দেবতারাও শস্ত্রধারী। এবং তার দেবতাদের হাতে শস্ত্র তা শুধুমাত্র শোভাবর্ধনের জন্যই নয়, পরন্তু সময়মতো প্রয়োজন মতো তার প্রয়োগও তাঁরা করেছেন। স্বয়ং শ্রীভগবান বিষ্ণু, যাঁর হাতে শোভিত শঙ্খ, চক্র ও গদা তিনি যেমন মধুকৈটভকে বিনাশ করেছেন, তেমনই হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু থেকে বহু আসুরিক শক্তিকে নিজ অস্ত্রে বিনাশ করেছেন। এমনকী যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমরা জানি তিনি নামের মধ্য দিয়েই কলির তাপিত প্রাণে শান্তির সুধা বর্ষণ করতে চেয়েছেন, তিনিও প্রয়োজনে সুদর্শন ধরতে চেয়েছেন। পরন্তু হিন্দু যে কোনও দেবতারই পূজা করুক, আরাধনা করুক না কেন, সেই দেবতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শস্ত্রধারী ও শক্তিমান। তাই বহু প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দু উত্তরাধিকার সূত্রে শক্তির পূজক মহাশক্তির উপাসক।

দুঃখের বিষয় সেই হিন্দু অহিংসাবাদের প্রবল প্রভাবে পড়ে বহুদিন শস্ত্র ত্যাগ করেছে। শক্তি সাধনার কথা ভুলে গেছে। তাই বলে হিন্দুর মন থেকে যে হিংসা দূর হয়ে গেছে তা কিন্তু নয়। সে আজও ভাইয়ে ভাইয়ে, আত্মীয় আত্মীয়ে মারামারি, লাঠালাঠি করে। এমনকি কাটাকাটি করতেও ছাড়ে না। অথচ তার দেশ-জাতি-সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতির যারা ক্ষতি করছে, সর্বনাশ করছে, তাদের প্রতিরোধে তার অনীহা। তখনই সে অহিংস বা প্রেমাবতার কত কিছু। অহিংসা ও উদারতার নামে শক্তি সাধনায় বিমুখীনতার ফলে হিন্দু আজ কতখানি দুর্বল তা কারুরই জানতে বাকি নেই। সেজন্য যারা দেশে সংখ্যায় অল্প, সংখ্যালঘু বলে পরিচিত, তারা হিন্দুদের দেখে নেওয়ার শাসানি দিচ্ছে, এমনকী দেখেও নিচ্ছে।

শক্তির সাধনা না করলে শরীর হয় দুর্বল, দুর্বল শরীরে ঘটে নানা রোগের উপদ্রব। সংসার দুর্বল হলে যত আপদ বিপদ ঘটে। সমাজ দুর্বল হলে নানা সমস্যা দেখা দেয়। নানা উৎপাতের সৃষ্টি হয়। আর রাষ্ট্র দুর্বল হলে ঘটে নানা আঘাত আক্রমণ। হিন্দুর অন্তত এটুকু চেতনা হলেও অনেকখানি কল্যাণ হতে পারত। কিন্তু তাই কি হবে?

সেজন্যই মনে হয়, যতদিন পর্যন্ত হিন্দুর এই বিপথগামিতা দূর না হবে, যতদিন পর্যন্ত হিন্দু শক্তি অর্জনে, শক্তি সাধনায় ব্রতী না হবে, ততদিন পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা, শান্তি বা সুস্থিতি কিছুই আসতে পারে না। আক্রমণকারী কাউকে আক্রমণের আগে তখনই ভাবে, যখন প্রতি আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। তা যেখানে নেই, সেখানে আবার ভয় কিসের?

মা হলেন মহাশক্তিময়ী। যে শক্তির সাধনা করে, শক্তি চায় তিনি তারই নিকট ধরা দেন। তাকেই শক্তি প্রদান করেন। তা যে করে না সে মায়ের পূজা যতই করুক, বড় প্যাণ্ডেল তৈরি করুক, আলোর বন্যা বইয়ে দিক— সবই ব্যর্থ, ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র।

সেজন্য হিন্দুকে আজ বেঁচে থাকতে হলে সমাজে টিকে থাকতে হলে, তার দুঃখ দুর্দৈব দূর করতে হলে শক্তিসাধনা করতে হবে। শক্তির উপচারে মায়ের পূজা করতে হবে। তাই তো হিন্দুকে মাতৃপূজায় সতর্ক করে দিয়ে সাধক কবি বীর্যোদীপ্ত ছন্দে বলেছেন—

"মহাপূজা চাই— কররে হিন্দু
মহাপূজা আয়োজন।
অমর জীবন— বিরাট কামনা,
মরণ কঠিন পণ!
ফুল-চন্দনে পূজা-আরাধনা—
শুধু তায় খুশী দেবতা হবে না!
বীর্য্যের খেলা শক্তি(র লীলা,
মুক্তি(-আকিঞ্চন!
মাভৈঃ মাভৈঃ যুগ-আচার্য্য
করিছেন আবাহন।।".....

(সঙ্ঘ-বিষাণ, স্বামী বেদানন্দ)

ভারতবর্ষ এক সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র

কে এস সুদর্শন

হিন্দীতে যাকে রাষ্ট্র বলে তাকে বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া ভাষাতে 'জাতি' (Nation) বলে। জাতীয় ভাব-এর মানে রাষ্ট্রভাব (National Spirit), জাতীয় শক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তি। সেজন্য রাষ্ট্র ও জাতি সমার্থক। কিন্তু বাংলাতে রাষ্ট্র মানে State বা পলিটিক্যাল পাওয়ার। সেজন্য আমরা যখন বলি রাজনীতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই, তখন লোকে বলে — তোমাদের নামেই তো 'রাষ্ট্রীয়' শব্দ রয়েছে, আর তোমরা কী না বলছ রাজনীতি করি না? কিন্তু লোকেরা বোঝে, সাধারণভাবে সঙ্ঘ রাজনীতিতে নেই।

আমাদের জাতি (রাষ্ট্র) বিশ্বের প্রাচীনতম জাতি। বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থই যে বেদ তা রাষ্ট্রসঙ্ঘও স্বীকার করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের আর্কাইভ বা অভিলেখাগারে বেদও রাখা আছে। এই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থে হিন্দু জাতিকে প্রাচীনতম, পরিণত ও সর্বাঙ্গপরিপূর্ণ, শক্তিশালী, সমৃদ্ধ জাতি — এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। এই বেদ কত প্রাচীন? কেউ বলেন দশ হাজার বছর, কেউ কেউ বলেন পঞ্চাশ হাজার বছরের প্রাচীন। এখনও কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনি বেদ কত বছরের প্রাচীন। বেদের মধ্যেও আমাদের রাষ্ট্রের কথা আছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি কীভাবে হল, তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বেদে বলা হয়েছে—

ভদ্রম্ ইচ্ছন্ত ঋষয়ঃ স্বর্বিদঃ
তপোদী(াম্ উপাসেদুরগ্রে।
ততোরাষ্ট্রম্ বলমোজশ্চ জাতম্
তদস্মৈ দেবাঃ উপসংনমন্তু।।

প্রাচীন কালে লোককল্যাণে ইচ্ছুক সকল ঋষিরা তপস্যা করেন। সেই তপস্যা থেকে শক্তি ও তেজ থেকে রাষ্ট্রদেবতার উৎপত্তি হল। আমরা সবাই সেই রাষ্ট্রদেবতাকে হবি সমর্পণ করব। রাষ্ট্রদেবতার উপাসনা করব।

তেমনই আমাদের রাষ্ট্র বা জাতির সীমার বর্ণনাও ঋগ্বেদে আছে।

যস্য ইমে হিমবন্তো মহীয়া
যস্য সমুদ্রম্ রসয়া সহ..... ।।
যস্য ..... সস্য বাহু।
তস্মৈ দেবাঃ হবিষা বিধেম।।

মহান হিমবান পর্বত যার গুণগান করছে, নদীসমূহ যার যশোগানে ব্যস্ত, যে সকল ..... বিষয় আয়ত্ত করে বিশ্বের মধ্যে দাঁড়িয়েছে, সেই অষ্টদেবতাকে আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য সমর্পণ করব। অর্থাৎ বেদের মতো প্রাচীন গ্রন্থে এদেশের নদী, সমুদ্র আর হিমালয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য ভারত প্রাচীনতম রাষ্ট্র। এই বিষয়ে একটি উদাহরণ আছে।

১৯৬০-৬২ সালের কথা। শৃঙ্গেরীর শঙ্করাচার্যের কাছে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক এলেন। তিনি শঙ্করাচার্যের কাছে কিছুদিন ছিলেন। একদিন তিনি শঙ্করাচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের হিন্দু ধর্ম এত শ্রেষ্ঠ, তাহলে আপনারা অন্যদের হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরকরণ করছেন না কেন? তখন শঙ্করাচার্য বললেন, যখন কেউ হিন্দু থাকবে না তখন মতান্তর করার দরকার হবে। বিশ্বের মধ্যে সকল মানুষ হিন্দু হিসেবেই জন্মগ্রহণ করেন। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে জন্মগ্রহণকারীরা সকলেই হিন্দু। ব্যাপটাইজড্ হওয়ার পর খৃস্টান হয়, সুন্নত করে মুসলমান

হয়। নাহলে সে তো হিন্দুই থাকে। আমেরিকান ভদ্রলোক বললেন, আপনি তো অনেক বিশাল দাবি করছেন। শঙ্করাচার্যজী বললেন, কি করব? আমি তো দাবিকে ছোট করতে পারব না। আমেরিকান ভদ্রলোকটি বললেন — আপনি তো জানেন, যদি কেউ যীশুর আশ্রয় না নেয় তাহলে সে মুক্তি পাবে না।

কিন্তু যীশু তো ২০০০ বছর আগে জন্মেছিলেন। তাঁর জন্মের আগে অনেক লোকেরা জন্মেছেন। তারা তো যীশুর নামই শোনেননি। আর এখনও এমন অনেক লোকেরা আছেন যারা যীশুর নামই শোনেননি। তাদের অপরাধ কোথায়? তারা সবাই কি নরকবাসী হবে? কিন্তু কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই যুক্তিগতভাবে একথা মেনে নেবেন না।

মানুষের আবির্ভাব কত বছর আগে হয়েছে এটা বলা কঠিন। কিন্তু তখনও মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তা লাভের উপায়ও ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা ও তা লাভের কথা বেদের মধ্যে আছে একথা আমরা মানি। সৃষ্টির আরম্ভ থেকেই মানুষকে দিকনির্দেশ করার জন্য 'বেদ' (চেতনা বা জ্ঞান) সৃষ্টি হয়েছে। বেদ আর মানুষের একই সময়ে উদ্ভব হয়েছে। বেদ এতটাই প্রাচীন। আমাদের রাষ্ট্রের বর্ণনা বেদের মধ্যে রয়েছে। ইংরেজরা যখন এদেশে এল, তারা তখন এই দেশের বৈচিত্র্য দেখে অবাক হয়ে গেল। এদেশকে এক রাষ্ট্র (Nation) কী করে বলা যায়? তাদের ধারণা ছিল এক রাষ্ট্র যাকে তারা Nation বলে, তার মধ্যে সকলের ভাষা সমান, সমান বংশ, সমান পরম্পরা, পূর্ব-পুরুষদের প্রতি সমান শ্রদ্ধা থাকবে। একই পূর্বপুরুষ না থাকলে এক রাষ্ট্র বা নেশন (জাতি) হতে পারে না। কিন্তু ভারতের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিবিধতা আছে। ভাষা অনেক, একটি মাত্র ভাষা নেই। খান-পান-শিষ্টাচার-মান্যতা আলাদা-আলাদা। অনেক ধর্মগ্রন্থ, অনেক পন্থ সম্প্রদায়। কেউ সাকার, কেউ নিরাকারকে মানে। কেউ কেউ আবার নাস্তিক। এত বিবিধতা থাকলে এক রাষ্ট্র কী করে বলা যাবে? এটা সম্ভব নয়, সেজন্য ইংরেজরা বলেছিল, ভারত এক রাষ্ট্র বা জাতি নয়। একটি উপ মহাদেশ বা সাবকন্টিনেন্ট হল ভারত। আর এই ভারতে নানা রাষ্ট্র আছে — প্রত্যেক ভাষার আলাদা রাষ্ট্র। বাংলা ভাষা-ভাষীরা এক জাতি (Nation), মারাঠী ভাষী, তামিল ভাষী, পাঞ্জাবী ভাষী, কন্নড় ভাষী প্রভৃতি — প্রত্যেকের একটি আলাদা রাষ্ট্র রয়েছে। পাশ্চাত্যের আমেরিকান দার্শনিক উইল ডুরাণ্ড বলেছেন, ভারত আমাদের সকল রাষ্ট্রের জন্মভূমি, সংস্কৃত ইউরোপীয় ভাষা সমূহের জননী। সংস্কৃত আমাদের দর্শনশাস্ত্রের মাতৃস্বরূপা, আরব দেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত গণিতের মূল উৎসস্থল ভারতই। কেননা, গণিত ভারত থেকে আরবে আর আরব থেকে ইউরোপে গিয়েছে। ভারতের গণিতজ্ঞরাই ১২৩৪ প্রভৃতি সংখ্যার আবিষ্কর্তা। তারপরই তা আরব ও ইউরোপে গেছে। আরবের লোকেরা তা একটু পরিবর্তন করে নিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মমত ও খৃষ্টমতে যে আদর্শের কথা বলা হয়ে থাকে তার উৎস ভারত। ভারতের প্রাচীন গ্রামসভাই স্বশাসন অর্থাৎ গণতন্ত্রের জননী।

মার্ক টোয়েন নামে একজন আমেরিকান পণ্ডিতও বলেছেন, ভারত মানবজাতির পরিপালক, দোলনা সদৃশ। বহু ভাষার জন্মভূমি, ইতিহাসের জন্মদাত্রী। অর্থাৎ অনেক কিছুরই মূল উৎস। আবার সাধু-মহাত্মা - পরম্পরারও স্রষ্টা। এরকম এক মহান ভূমি হল ভারতভূমি। দেশবিদেশের অনেকের মনে এই ভারতভূমি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। একবার এই মাটির দর্শন হলে জগতের আর কোনও কিছুরই দর্শন অবশিষ্ট থাকে না — এই ভাবনা তাদের ইচ্ছার পিছনে কাজ করছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ যিনি ভারতের ইতিহাস লিখেছেন, তিনি সেই ইতিহাস গ্রন্থের প্রস্তাবনায় বলেছেন, ভারতের মধ্যে অনেক বিবিধতা আছে। কিন্তু তারও অন্তরে এক একাত্মতা মূলীভূত ভাবে বিরাজ করছে। এখানে লোকেরা এমন এক সংস্কৃতির বিকাশ করেছেন যা জগতের মধ্যে অন্য কোথাও দেখা যায় না। একাত্মতার যে পদ্ধতি এখানে বিকাশ করা হয়েছে তা জগতের অন্য যে কোনও পদ্ধতির থেকে সুদৃঢ়। ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক কারণে অন্য যে সকল রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে তার চেয়ে এখানের একতার ভাব অনেক গভীর, শক্তিশালী ও প্রভাবশালী। অন্যান্য দেশের লোকেরাও একথা স্বীকার করেছেন। হাজিমে তাকামুরা নামে এক জাপানী পণ্ডিত বলেছেন, ভারত সাংস্কৃতিক দিক থেকে জাপানের জননী। ভারতের সংস্কৃতি জাপানের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে।

পশ্চিমে অর্থাৎ পাশ্চাত্যে 'জাতি' বা 'নেশন'-এর ধারণা খুব বেশি পুরাতন নয়। মাত্র ৩০০-৪০০ বছর আগেকার। তার আগে বড় বড় সাম্রাজ্য ছিল। আমরা জানি যীশুখৃস্ট (ইসা-মসীহ) ২০০৮ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপরে তাঁকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হল তখন থেকে খৃস্টাব্দের গণনা হচ্ছে। তার আগে যীশু খুব প্রচার করেছেন। ১২ বছর বয়স থেকে ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত উনি কোথায় ছিলেন সেই বিষয়ের কোনও উল্লেখই বাইবেলের মধ্যে নেই। এই বিষয়ে পরবর্তীকালে অনেক গবেষকরা গবেষণা করেছেন। তাদের কথায় সেই সময়ে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভারতের নানা স্থানে তিনি ঘোরাফেরা করেছেন, এখানের অনেকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। সে সময় ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রচলন ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের করুণা, অহিংসা, দয়া প্রভৃতির যে আবেদন তাতে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর মাথায় এসেছিল তাঁর নিজের এলাকায় সকলে পরস্পর ঝগড়া করে, হিংসা, হানাহানি করে। ওখানে এই করুণা, অহিংসা, দয়ার কথা প্রচার করতে হবে। সেজন্য তিনি ফিরে গিয়ে ওই করুণা, অহিংসা, দয়ার এই উপদেশ-এর কথা প্রচার করেছেন। কিন্তু তাঁর দেশের ইহুদিদের তাঁর কথা ভালো লাগল না। তারা বলল, আমাদেরই এক ইহুদি এরকম ভাষায় দয়া, করুণা, অহিংসার কথা বলছে। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হল। কিন্তু যীশু মারা যাননি। তাঁর একজন অনুগত শিষ্য তাঁকে নামিয়ে নিকটবর্তী এক চার্চে নিয়ে যান। সেবা শুশ্রূষা করেন। দুদিন রেখে ক্ষতস্থানে মলম-পট্টি লাগিয়ে দেন। তারপর যীশু কাশ্মীরে যান। কাশ্মীরে ইসানগর বলে এক স্থান আছে। সেখানে যীশুর সমাধি আছে। যেহেতু বৌদ্ধ মতাদর্শ যীশুকে প্রভাবিত করেছিল, সেজন্য বৌদ্ধ জাতকের মতো অনেক গল্পই বাইবেলের মধ্যে স্থান পেয়েছে।

যীশুর একজন শিষ্য সেন্ট পিটার, তিনি রোমে এসে ক্যাথলিক চার্চের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারও আগে সেন্ট পল রোমে এসেছিলেন। এই দুজনে মিলে রোমান চার্চের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন রোমের সম্রাট ছিলেন নীরো। নীরো ওই দু'জনকে হত্যা করেন। তারপর ৩১ জন পাদ্রী খৃস্টমত প্রচারের চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে দুজন বাদে বাকীদেরকেও হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীতে শক্তিশালী রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খৃস্টমতকে গ্রহণ করে স্বীকৃতি দেন। তাঁর মাধ্যমে খৃস্টমতের প্রচার সারা ইউরোপের মধ্যে হয়। পাদ্রীরা যেখানে কনস্টানটাইনের রাজত্ব ছিল না সেখানেও খৃস্টমতের প্রচার করেন। কিন্তু কনস্টানটাইন কখনও পাদ্রীদেরকে নিজের থেকে বড় বলে স্বীকার করেননি। তাঁর

কথা ছিল সম্রাট ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ঈশ্বর তাঁকে পৃথিবীতে রাজত্বের জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি সকলকে জাগতিক ও ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক সবকিছু নির্দেশ দেবেন। সেজন্য সম্রাটের পোপকে নিযুক্ত করার অধিকার আছে। পোপ কোনও বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তি নন। একজন পুরোহিত মাত্র। রাজ্যের সামান্য এক কর্মচারী। কনস্টানটাইন-এর এরকম মনোভাব ছিল। একবার এক বিশপকে তিনি অনেক আদর-আপ্যায়ন করেন। বিশপের ইচ্ছা ছিল তাঁকে পোপ ঘোষিত করা হোক। কিন্তু কনস্টানটাইন তা করেননি। পরবর্তীকালে অনেক শতাব্দী এরকম চলল। দশম শতাব্দীতে রোমের কয়েকজন রাজা পোপের সাহায্য নেন। একজন রাজা ফ্রান্স আক্রমণ করার জন্য পোপের অনুমতি চান। পোপ অনুমতি দেন। ফ্রান্সের রাজত্ব রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সম্রাট রোমে ফিরে এলেন। আর পোপকে দেখামাত্র রাজা তাকে নত হয়ে প্রণাম করেন। তারপর পোপের ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে পাঁচ পা হেঁটে যান। পরে অনেক রাজারা এরকমই করেন। সম্রাটের দুর্বলতার ফলে বা সম্রাট দুর্বল থাকার জন্য পোপের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। পোপ বললেন, তিনি যীশুর অনুগামী সেন্ট পিটারের উত্তরাধিকারী। ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এজন্য সম্রাটকে নিযুক্ত করার অধিকার পোপেরই রয়েছে। অর্থাৎ কনস্টানটাইনের আমলের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। এর ফলে পোপ বনাম সম্রাট ঝগড়া শুরু হল এবং অনেক বছর পর্যন্ত চলল। তারপর ধীরে ধীরে পোপেদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। আর রাজারা? ইউরোপে তখন অনেক ছোট ছোট রাজত্ব ছিল। তারা পোপের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। সবাই পোপের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। পরে একজন পোপ হন যার নাম গ্রেগরি। গ্রেগরির এক উত্তরাধিকারী পরে পোপ হন। তাঁকে বৃটেনের রাজসিংহাসনে পঞ্চ ম হেনরির রাজ্যাভিষেক করতে বলা হয়েছিল। পঞ্চ ম হেনরি তখন নাবালক। তখন পোপ শর্ত আরোপ করে বললেন, রাজাকে পোপ নিযুক্ত করার অধিকার ত্যাগ করতে হবে। তা না হলে রাজ্যাভিষেক করব না। আবার ঝামেলা। এইভাবে পোপ বনাম রাজার ঝগড়া দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপে চলেছে। যখন যে বেশি শক্তিশালী তারই প্রভুত্ব চলেছে। শেষে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরির সঙ্গে তৎকালীন পোপের প্রচণ্ড বিবাদ শুরু হল। পোপ বললেন, 'তুমি আমার অনুমতি নাওনি। আমি তোমাকে রাজা বলে স্বীকার করি না।' রাজার কথা, 'আমি তোমাকে পোপ বলেই মানি না।' একে অপরকে বরখাস্ত করল। ফলে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরি রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকেই আলাদা হয়ে গেলেন, প্রতিষ্ঠিত হল 'প্রোটেস্ট্যান্ট' চার্চ। রাজা নিজেকে 'ডিফেন্ডার অফ্ দি ফেথ' বলে ঘোষণা করলেন। তখন ইংল্যান্ডের লোকেরা খুশী হল। রাজা বাইবেল ইংরেজীতে অনুবাদ করার আদেশ দিলেন। রাজা আরও বললেন, যে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের অনুগত থাকবে সেই মুক্তি পাবে। জার্মানীতে লুথার নামে একজন সমাজ সংস্কারকের উত্থান হয়েছিল। তিনি লুথেরান চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মাধ্যমে জাতীয় চেতনার উদ্ভব হল। ফ্রান্সে ক্যাথলিক চার্চ থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহ হল। ফ্রান্সের রাজা লুই ভ্রষ্টাচারী ও আমোদ-প্রমোদে জীবনযাপন করতেন। এতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লোকেরা ক্ষুব্ধ হল, বিদ্রোহ করল। পরিণামে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। তাদের নীতি — লিবার্টি, ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটারনিটি অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা, সমতা ও বন্ধুত্ব বা মৈত্রীর ভিত্তিতে নতুন ফ্রান্স রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। জার্মানীতে অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল। সেই সকল রাজ্যকে এক করে নতুন একতাবদ্ধ জার্মানীর প্রতিষ্ঠা হল। অন্যদিকে গ্যারিবল্ডি ও যোসেফ ম্যাজিনী হলেন নতুন ইতালির প্রতিষ্ঠাতা। রাশিয়ানরা অর্থোডক্স চার্চকে মানতেন। তারাও রাশিয়ান নেশন তৈরি করলেন। এভাবেই সারা ইউরোপ জুড়ে স্পেন, পর্তুগাল, হল্যান্ড প্রভৃতি জাতি ছব্ধব্ধন্ঙ্গ বা রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। আসল কথা হল, আধুনিক ইউরোপের যে জাতীয়তাবাদ তা মাত্র ৩০০-৪০০ বছরেরই পুরাতন। সেজন্য তাদের বক্তব্য হল একটি রাষ্ট্র হতে গেলে সকলের এক সমান ভাষা, একই পরম্পরা, একই শত্রু-মিত্র বোধ, একই সংস্কৃতি, একই সমান পূর্বপুরুষ যদি থাকে তবেই সেই জনসমাজ একটি রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হবে। সেই সূত্র অনুসারে ভারতে ওই সব পাওয়া যায় না। সেজন্য ভারতে এক রাষ্ট্র নয়। এটা ইউরোপীয় চিন্তা-ভাবনার আদলে ভারতকে দেখার কারণে বলা হচ্ছে। ভারতে নানা জাতপাত আছে। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান। এদেশে ইংরেজরা রাজত্ব করেছে। তাদের মাথায় এটাও ছিল যদি ভারতের সবাই সংগঠিত হয়ে যায় তাহলে তারা ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবে। সেজন্য ভারতকে বিভাজন করতে হবে। ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের ওই আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। সারা দেশ একসঙ্গে ইংরেজ শাসকদের বিরোধিতা করেছিল। কিছু ভুল হওয়ার কারণে ১৮৫৭-র স্বাধীনতা সংগ্রাম অসফল হয়েছিল। তারপর ৯০ বছর ধরে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলল। ৯০ বছর পরে ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। ৯০ বছরের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে সারা দেশ একত্রে লড়েছিল। সারা দেশ একত্রিত ছিল। এতরকম বৈচিত্র্য বিবিধতা সত্ত্বেও সারা দেশ এক ছিল।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, ভারতে যে জাতি বা রাষ্ট্র তাকে একতাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা কি? কেননা একটি মাত্র ভাষা নেই। একটি সম্প্রদায়ও নেই, নানা পন্থ সম্প্রদায়। কেউ শৈব, কেউ শাক্ত-মা কালীর উপাসক। কেউ সাকার তো কেউ নিরাকারের উপাসক। তাহলে এই দেশকে এক রাষ্ট্র কী করে বলা যাবে? আসলে আমাদের রাষ্ট্রের ভিত্তি হল এক শ্রেষ্ঠ উন্নত সংস্কৃতি। আমাদের রাষ্ট্রবাদ বা জাতীয়তাবাদ হল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ। এই সংস্কৃতির উৎস কি? আমাদের ঋষি-মহর্ষিরা ভাবনা চিন্তা করে দেখেছেন, প্রত্যেক মানুষের শরীর আছে, মন আছে, বুদ্ধি আছে। প্রত্যেকের শরীরের আকৃতি নানা রকম। লম্বা, বেঁটে, ফরসা, কালো — কারোর টিকালো নাক তো কারোর চ্যাপ্টা নাক, আবার সকলের আলাদা আলাদা নাম। সেই নামে সবাই পরিচয় দেয়। প্রত্যেকের মন আলাদা, শরীর আলাদা, বুদ্ধি ও আলাদা আলাদা। তাহলে প্রত্যেককে একে অপরের সঙ্গে জুড়ে রাখার তত্ত্ব কি? তখন তাঁরা দেখলেন, মানুষের তিনটি অবস্থা থাকে — জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্ন অবস্থা আর সুসুপ্তি অবস্থা। সুসুপ্তি অবস্থা প্রগাঢ় নিদ্রার সময়। জাগ্রত অবস্থায় খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা সবই করা হয়। কিন্তু স্বপ্নাবস্থার নিয়ম জাগ্রতাবস্থার নিয়ম থেকে ভিন্ন। একেবারে আলাদা। আকাশে উড়ি, স্বপ্নে পাগলা কুকুর তাড়া করছে দেখি, অথচ পালাতে পারছি না। লোকে পালাতে বলছে। ঘুম ভেঙে গেল, বুক ধড়পড় করে শরীরে ঘাম দেয়। আর একটি অবস্থাও আছে তা প্রগাঢ় নিদ্রা। তখন শরীর ও মন নিশ্চেষ্ট থাকে। বুদ্ধি ও কাজ করে না। ঘুম থেকে ওঠার পর শরীরের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। শরীরে আরামবোধ হয়। প্রগাঢ় নিদ্রার আনন্দ বা সুখানুভব কার হল? তখন তো শরীর, মন, বুদ্ধি সুপ্তাবস্থায় ছিল। কোনও কাজই করছিল না। অথচ আমিই এই আনন্দ বা সুখ অনুভব করেছি। এই 'আমি' শরীর মন ও বুদ্ধির বাইরে। সে হল আমার আত্মা। সেজন্যই গীতাতে বলা হয়েছে —

ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহু, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্তু পরা বুদ্ধি, যো বুদ্ধে পরসস্তু সঃ।।

ইন্দ্রিয়ের পরে মন, মনের পরে বুদ্ধি আর বুদ্ধির পর আত্মা। সেই আত্মা কী রকম? আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষি-মুনিরা এবিষয়ে বহু চিন্তা ভাবনা করেছেন। তারপরে সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন আত্মা নির্বিকার, নিরাকার, নিরহঙ্কার, অনাদি, অনন্ত ও আনন্দস্বরূপ। যে অনাদি, অনন্ত সে দুরকম হতে পারে না। যেমন, আকাশ একটাই — দুটো নয়। কিছু দূরে আকাশ মাটির সঙ্গে মিশেছে বলে মনে হয়। কিন্তু যতই সামনে যাওয়া হোক দেখা যাবে আকাশ আরও দূরে সরে গিয়েছে। আত্মা এক এবং এরকম অনাদি ও অনন্ত। সকলের মধ্যে সেই একই আত্মা বিরাজমান। এই আত্মা সকলকে একসঙ্গে জুড়ে রাখছে। তাহলে প্রশ্ন উঠে, আমরা একে অপরের মনের চিন্তা-ভাবনা বুঝতে পারি না কেন? উত্তর হল, বুঝতে পারা যায়। এবং তা তখনই সম্ভব যদি আমরা নিজের আত্মাকে বিস্তার করি। এটা করাই যায়। একটা ছোট শিশুকে বাড়ির সবাই ভালোবাসে। সে যখন বড় হয়, দেখে বাড়ির সবাই তাকে সুখী করার জন্য সদা ব্যস্ত, সেও বড় হয়ে বাড়ির সকলকে সুখী করার জন্য চেষ্টা করে। অর্থাৎ তার আত্মা বিস্তৃত হয়ে বাড়ির সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। গ্রামে দেখা যায় এমন অনেকে থাকেন যিনি কোনও বাড়িতে দুঃখজনক কিছু ঘটলে সবার আগে ছুটে যান। আবার কিছু আনন্দের খবর পেলে তিনি আনন্দিত হন। অর্থাৎ তিনি পুরো গ্রামকেই নিজের পরিবার বলে মনে করেন। গ্রামের পর জেলা। জেলার পরে প্রদেশ। একই জেলার লোকেরা একে অন্যকে আপন বলে মনে করেন। একই প্রদেশের লোক একে অপরকে নিজের বলেই ভাবেন। কোনও পূর্ব পরিচয় না থাকলেও আপন। এরকম একই পন্থ-সম্প্রদায় ভুক্ত হলে একে অন্যকে নিজের আপনজন ভাবেন। গোরখপুর, বাংলা, অসম, ত্রিপুরায় নাথপন্থীরা আছে। গোরখপুরের লোকে বাংলা বলেন না। কিন্তু তাঁরাও পরস্পরকে একে অন্যের নিকটাত্মীয় বলে মনে করেন। বাঙালি, অসমীয়া ভাষার মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও নাথপন্থের অনুগামী বাঙালী, অসমীয়া একাত্ম। নানাভাবে সারা ভারত একাত্মতার আধারে যুক্ত। এভাবে সারা ভারত আমাদের আপন — এই বোধ হয়। স্বামী রামতীর্থের কথা —

ম্যায় ভারত হুঁ।

হিমালয় মেরা .....

গঙ্গা যুমনা মেরে বক্ষস্থল কে হার হ্যায়

বিন্ধ্যাচল মেরি কটি মেখলা হ্যায়

পুরে পশ্চিমঘাট মেরে প্যার

কন্যাকুমারী মেরে চরণতল হ্যায়

হিন্দমহাসাগর নিরন্তর মেরে চরণতল পখার রহা হ্যায়।

ম্যায় জব চলতা হুঁ, পুরা ভারত চলতা হ্যায়।

ম্যায় জব বোলতা হুঁ তো সদিয়ো কী শাশ্বত বাণী মেরে মুখ সে নিঃসৃত হোতী হ্যায়

ম্যায় জব হাঁসতা হুঁ সদিয়ো কা আনন্দ ঘনীভূত হো করকে মেরে মুখ সে প্রকট হোতা হ্যায়। ম্যায় জব রোতা হুঁ তব সদিয়ো কী পীড়া ঘনীভূত হো করকে অশ্রুধারা বন করকে মেরে মুখ সে প্রবাহিত হোনে লগাতে হ্যায়।

ম্যায় ভারত হুঁ। ভারত হুঁ।। ভারত হুঁ।।

রামতীর্থ ভারতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার সময় একবার তিনি ইংল্যান্ডে এসেছিলেন। ইংল্যান্ডের লোকেরা শুনেছিল যে আমেরিকায় বিভিন্ন স্থানে স্বামী রামতীর্থের সুন্দর বক্তৃতা হয়েছে। ইংরেজরাও ইংল্যান্ডে চার-পাঁচ জায়গায় রামতীর্থের বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করল। তখন ভারতে ইংরেজ শাসন। স্বামীজী ওখানে বেদান্তের বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন। ওখানে ইংরেজরা তো বেদান্ত সম্পর্কে কিছুই জানত না। সবাই প্রভাবিত। শেষে কিছু লোক বলল, 'স্বামীজী, আমরা আপনার সঙ্গে ছবি তুলব। তবে আপনাকে আমাদের বেশ পরিধান করতে হবে। স্বামীজী রাজী হলেন, তবে টুপীটা পরলেন না। জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, ইংল্যান্ড আমার পায়ের তলায়। আর মাথায় তো 'ভারত' ছাড়া অন্য কিছুই থাকবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ আমেরিকায় চিকাগো বক্তৃতার শুরুতেই যখন বললেন, আমার আমেরিকাবাসী ভাই ও বোনেরা, তখন তিন মিনিট লাগাতার হাততালি। নিউইয়র্ক টাইমস্ লিখেছিল, পাদ্রী পাঠানোর প্রয়োজন নেই ভারতে। এরকম সন্ন্যাসীরাই ওদেশের জন্য যথেষ্ট।

একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সকলের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছিলেন, হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, — আমার বুকের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ তিনি ভক্তদের মধ্যেই বসে আছেন। কিছুক্ষণ পরে আবার স্বাভাবিক। কেউ তো কিছু করেনি। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'বাইরে ঘাস দেখা যাচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম ঘাস ও আমি এক। সেই ঘাসের উপর দিয়ে একটা গরু পার হয়ে গেল। তখনই আমার খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল।' অনেকে বিশ্বাস করল না। তার বুকের উপর গাইয়ের ক্ষুরের ছাপ স্পষ্ট ছিল। ঘাসের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে এক একটি স্তর পার হয়ে একাত্ম হতে হয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা ভেবেছেন এজন্য প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রস্তুত করা প্রয়োজন। কেননা, শুধুমাত্র আমরা বললেই লোকে মেনে নেবে না। এই মনোভাবনার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ভারতবর্ষে হয়েছে।

এদেশে কত বৈচিত্র্য, কোথাও সারা বছর তুষারপাত, আবার কোথাও সারা বছর ঠাণ্ডাই পড়ে না যেমন — তামিলনাড়ু ও কেরল। এদেশে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় চেরাপুঞ্জিতে আবার সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাতের স্থান রাজস্থানের বাড়মের, জয়শলমীর। আমাদের দেশে মরুভূমি আছে আবার সর্বাধিক উর্বর সমভূমি রয়েছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায়। আছে দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল। সারা পৃথিবীতে কোথাও ছয়টি ঋতু হয় না। ভারতের মধ্যে ছয়টি ঋতু-বৈচিত্র্য রয়েছে, এজন্য যত বিবিধ প্রকারের গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ, মানুষ রয়েছে তার অর্ধেক বৈচিত্র্যই রয়েছে ভারতে।

এত বিবিধতা থাকার পরও যদি তাদাত্ম স্থাপন করা যায় তাহলে আমরা পৃথিবীকে বলতে পারবো — দেখ এতকিছুর পরও আমরা

একদেশ। একথা আমাদের পূর্বপুরুষরা চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। এই পদ্ধতিতে অন্যান্য দেশও নিজের দেশকে একাত্ম ও সমৃদ্ধ করতে পারবে।

এজন্য সর্বপ্রথম ভারতভূমি সম্পর্কে এক আত্মীয়তার বোধ নির্মাণ করা দরকার। সেই কথা আমাদের পূর্বপুরুষরা বলেছেন। মাতৃভূমি, পিতৃভূমির কথা সবাই বলে। কিন্তু ভারত কর্মভূমি একথা শুধু আমরাই বলি। অন্যরা কর্মভূমি বলে না। পশ্চিমের লোকেরা তো শুধুমাত্র ফাদারল্যাণ্ড বলে। ইউরোপে ইতালি ছাড়া বাকী সব দেশ তাদের ফাদারল্যাণ্ড। প্রাচ্যের লোকেরা মাদারল্যাণ্ড বলে। কেউ কেউ পুণ্যভূমিও বলেন।

অত্রাপি ভারতং দেশম্ জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্মভূরেষা ততো হন্যা ভোগভূময়ঃ॥

জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতই একমাত্র কর্মভূমি। বাকী সকল ভূমিই ভোগভূমি। বিষ্ণুপুরাণে একথা লিপিবদ্ধ। আমাদের দেশের ঋষি, মুনি, সাধু-সন্তরা হাজার হাজার বছর ধরে একথা প্রচার করে আসছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন — পৃথিবীতে যদি এরকম কোনও দেশ থাকে, যাকে মঙ্গলময়ী, কর্মভূমি, পুণ্যভূমি বলা হয়, তা এই ভারত। এখানে পৃথিবীর সকল জীবকে কর্মফল ভোগ করার জন্য আসতেই হয়, যেখানে ঈশ্বরমুখী সব আত্মাকে শেষ বারের জন্য আসতে হয়, এখানে না এসে মোক্ষপ্রাপ্তি হবে না। মোক্ষ প্রাপ্তির পথে এটাই শেষ ধাপ — শেষ স্টেশন হল এই ভারতবর্ষ। যেখানে মানবতা, উদারতা, শুচিতা এবং শান্তির চরম শিখরে উঠেছে সেই দেশ হল ভারতবর্ষ। অন্তর্দৃষ্টি এবং আধ্যাত্মিকতার আকর হল ভারতবর্ষ। আমাদের দেশের সাধু-সন্তরা এদেশের মাহাত্ম্যের গুণকীর্তন করেছেন। অসমের সন্ত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বলেছেন —

কোটি কোটি জন্ম অন্তরে যাহার
আসে মহাপুণ্যরাশি
তেহি কদাচিৎ মনুষ্য হোয়
ভারতবর্ষে আসি।

শঙ্করদেবের শিষ্য দামোদরদেব বলেছেন —

ধন্য ধন্য কলিকাল, ধন্য নরতনু ভাল
ধন্য জন্ম ভারতবর্ষ।
ভারতবর্ষে জন্ম নেওয়া মানে ধন্য।
ভারতখণ্ডি নরদেহপ্রাপ্তি ..... অধ্যাচি সম্পত্তি।

গুজরাটের নরসি মেহতা যেরকম কথা বলেছেন, সেরকম দক্ষিণের তামিলনাড়ুর সুব্রাহ্মণ্যম ভারতী বলেছেন — যিনি জন্মদাত্রী জননী, যে স্বর্ণভূমিতে আমরা জন্ম নিয়েছি — তা স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ। *অর্থাৎ জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী — ভাবনারই পুনরাবৃত্তি।*

নানান সাধু সন্ত ও অন্যান্যরা এদেশের গুণগান করেছেন। এদেশের লোকেদের মধ্যে এক ভক্তিভাব ভারতমাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই ভক্তির ভাব নিয়ে শুধু বাড়িতে বসে থাকলেই হবে না। সেজন্য ব্যবস্থাও করা হয়েছে। স্থানে স্থানে তীর্থক্ষেত্র স্থাপন। জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য রামেশ্বরম্, দ্বারকা, বদ্রীনাথ, কেদারনাথে মঠ স্থাপন করে বললেন — এই চারধামে গেলে পুণ্যলাভ হবে। সারা দেশ জুড়ে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছে —

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথং চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্ .....
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ
সপ্ত জন্মকৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি।

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন, (অন্ধ্রপ্রদেশে), উজ্জয়িনীতে মহাকাল, অমলেশ্বরে ওঙ্কারনাথ, পরল্যাং বৈদ্যনাথং চ (মারাঠাওয়াড়া), ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্ (পশ্চিম মহারাষ্ট্র), সেতুবন্ধে তু রামেশং (সেতুবন্ধে রামেশ্বর), নাগেশং দারুকা বনে (দ্বারকা), বারাণস্যাং তু বিশ্বেশ্বং (বারাণসীতে বিশ্বনাথ), ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে (গোদাবরী তীরে ত্র্যম্বকেশ্বর) হিমালয়ে তু কেদারং (হিমালয়ে কেদারনাথ), ঘৃষ্ণেশং চ শিবালয়ে (মারাঠাওয়াড়াতে ঘৃষ্ণেশ)।

আবার দেশজুড়ে দ্বাদশ দেবী বিগ্রহ রয়েছে —

কাঞ্চিপুরে তু কামাক্ষী, মলয়ে ভ্রামরী তথা
কেরলে তু কুমারী সাগ, অম্বা .....।
করণীরে মহালক্ষ্মী, কালিকাম্ .....
প্রয়াগে ললিতা দেবী, বিন্ধ্যে চ বিন্ধ্যবাসিনী।।
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী গয়ায়াং মঙ্গলাবতী
বঙ্গে চ সুন্দরী দেবী (ত্রিপুরাসুন্দরী ত্রিপুরাতে)।
নেপালে চ .....
ইতি দ্বাদশরূপেণ স্বস্তিকা ভারতে স্বাহা।
এতেষাং দর্শনদেব সর্বপাপৈঃ বিমুচ্যতে।

এই সকল দেবী বিগ্রহ দর্শনে সকল পাপ মুক্ত হওয়া যায়। যদি দর্শন না করতে পারি তাহলে সকাল সন্ধ্যা স্মরণ কর। স্মরণ মাত্রই পাপ

দূর হয়।

এভাবে সারা দেশে তীর্থযাত্রা প্রচলিত ছিল, প্রত্যেক চার বছর অন্তর প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিক-এ কুম্ভমেলা হয়। সারা ভারতের লোকেরা সেখানে যান। একবার কুম্ভমেলার সময় মদনমোহন মালব্যজীর সঙ্গে একজন আমেরিকান যান। কোটিখানেক লোকের সঙ্গম দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। তিনি মালব্যজীকে প্রশ্ন করলেন, — এত লোকেদের খবর দেওয়ার জন্য আপনাদের কীরকম ব্যবস্থা আছে। তখন মালব্যরজী পাঁজি খুলে তিথিটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে আমাদের দেশে সারা ভারতের প্রতি ভক্তিভাব উৎপন্ন করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রচেষ্টা করেছেন। এদেশে এক সংস্কৃতি আছে। আর সেই সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে সকলের উপর। আর এই সংস্কৃতির কারণেই এত বিবিধ বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশ এক, এক রাষ্ট্র, এক জাতি। তার ভিত্তি হল আমাদের সংস্কৃতি। অন্যান্য স্থানে রাষ্ট্রের ভিত্তির ধারণা হল, রাজনৈতিক (Political Concept) কিন্তু ভারত হল সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র। এখানে রাষ্ট্র ধারণা হল সাংস্কৃতিক (Cultural Concept)। বিশ্বে এরকম দেশ আর নেই। আর সেই ভারতকে সারা বিশ্বের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জগৎগুরুর আসনে আবার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভারতবর্ষ শক্তিশালী হলে বিশ্বের লোকেরা আমাদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবেন। দুর্বল হলে কেউ স্বীকার করবে না।

এজন্য শক্তি চাই। সারা ভারত এক, আমরা সবাই ভারত মাতার সন্তান, কোনও ভেদ নেই, আমরা সবাই ভাই-বোন — এই জাতীয়ভাব জাগ্রত হলে ভারত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবে। সেই লক্ষ্যেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কাজ করে চলেছে।

আত্মার রহস্য উন্মোচন জড়-বিজ্ঞানীদের পক্ষে অসম্ভব

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

জিন-বিজ্ঞানী ও নিউরো-বিজ্ঞানী

বর্তমানে যেসব বিজ্ঞানীরা মানব মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁদের প্রধানত দুই দলে ভাগ করা চলে। প্রথম দলকে বলা হয় জিন-বিজ্ঞানী (genetic-scientist) এবং দ্বিতীয় দলকে বলা হয় নিউরো-বিজ্ঞানী (neuro-scientist)। প্রথম দলের বিজ্ঞানীরা মানুষের জিন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন এক ধরনের মানুষ তৈরি করার চেষ্টা করছেন, যে মানুষ হাঁপানী, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র, গেঁটেবাত ইত্যাদি কোনও বংশগত রোগে ভুগবে না। এই সব বিজ্ঞানীদের অন্তিম লক্ষ্য হল, জিনের তারতম্য ঘটিয়ে ইচ্ছানুরূপ এমন মানুষ তৈরি করা, যারা হবে বেশ লম্বা, ফর্সা, দেখতে সুন্দর, বুদ্ধিমান, ব্যবহারে নম্র ও মেধাবী। অন্যদিকে তারা কখনও অতিরিক্ত মোটা বা মাথায় টাক পড়ার মতো কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে না।

পক্ষান্তরে নিউরো-বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য অবশ্য অতটা বৈপ্লবিক নয়। তাদের লক্ষ্য হল, ওষুধ-পত্রর সাহায্যে মানুষের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া-বিক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে বিশেষ কিছু গুণাবলীর উন্নতি সাধন করা। বর্তমানে তাঁদের লক্ষ্য হল, অ্যালঝাইমার ও পার্কিনসন রোগ, বয়স বৃদ্ধির কারণে স্মৃতি শক্তির হ্রাস, অবসাদ ইত্যাদি রোগের উপশম করা। তাছাড়া চিকিৎসার দ্বারা জড়বুদ্ধি শিশুদের বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ ঘটানোও তাঁদের উদ্দেশ্য। এইসব বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, একদিন তাঁরা ওষুধ-পত্রের সাহায্যে নোবেল পুরস্কার পাবার মতো বিজ্ঞানী, বা নন্দলাল বসুর মতো চিত্রশিল্পী বা তানসেনের মতো সঙ্গীতজ্ঞ তৈরি করতে সক্ষম হবেন।

কাজের বিভিন্নতা অনুসারে আজকের নিউরো বিজ্ঞানীদের প্রধানত তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথম দলে আছেন সেই সব ইঞ্জিনিয়ার বা প্রযুক্তিবিদ, যাঁরা উদ্ভাবন করে চলেছেন সেই সমস্ত উন্নত যন্ত্রপাতি, যার সাহায্যে মস্তিষ্কের কোন অংশ কোন অনুভূতিতে সাড়া দেয় তা অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে নির্ণয় করা সম্ভব। দ্বিতীয় দলে আছেন সেইসব বিজ্ঞানীরা যাঁরা সেইসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে নির্ণয় করে চলেছেন যে, মস্তিষ্কের কোন অংশের বিকৃতির ফলে মানুষের মধ্যে কোন কোন বিকৃতিগুলো জন্ম নেয়। তৃতীয় দলে আছেন সেই সব বিজ্ঞানীরা, যাঁরা কি ধরনের অত্যাশ্চর্য ওষুধ ব্যবহার করলে সেইসব বিকৃতির নিরাময় হতে পারে সেই ব্যাপারে ওষুধ তৈরি করার কোম্পানীগুলোকে পরামর্শ দেন। বিশেষ করে, মস্তিষ্কের কোন কোন অংশের কি ধরনের ক্রিয়া-বিক্রিয়া মানুষের মনের গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এইসব বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে এই ব্যাপারে কাজ করে চলেছেন। এঁদের বিশ্বাস, এই সব গবেষণার ফলে তাঁরা একদিন মানব মনের অতল গভীরে প্রবেশ করতে সমর্থ হবেন তো বটেই, এমনকি তাঁরা একদিন মস্তিষ্কের কোনও বিশেষ নিভৃত কোণে মানুষের আত্মা বসবাস করে তাও আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন।

বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, এইসব কাজের জন্য সবার আগে দরকার মানব মস্তিষ্কের কোন অংশ কি কাজ করে, অথবা মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ মানব শরীরের কোন কোন কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার একটা অতিশয় সূক্ষ্ম ও নির্ভুল মানচিত্র তৈরি করা। অত্যাধুনিক স্ক্যানিং-এর যন্ত্রপাতির আবিষ্কার এইসব বিজ্ঞানীদের কাজের অনেক সুবিধা করে দিয়েছে। মাত্র এক কি দেড় দশক আগেও ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রাফি বা EEG ছিল এইসব গবেষণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের এক মাত্র হাতিয়ার। কিন্তু আজ প্রায় আধ ডজন বিশেষ কারিগরি তার স্থান দখল করে নিয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান হল (১) পসিট্রন এমিশন টোমোগ্রাফি (বা PET), (২) সিঙ্গল ফোটোন এমিশন টোমোগ্রাফি (বা SPET), (৩) ম্যাগনেটো এনসেফালোগ্রাফি (বা MEG), (৪) ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিং (বা MRI) ইত্যাদি। তবে যে সর্বাধুনিক কারিগরি, যা আজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা হল, ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিং (বা FMRI)। মস্তিষ্কের কোনও অংশ যখন কোনও বাহ্যিক উদ্দীপনায় সাড়া দেয়, তখন সেখানকার রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিং ও ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিং রক্ত প্রবাহের সামান্যতম পরিবর্তনকেও অনুভব করতে সক্ষম। কাজেই মানুষ যখন কোনও বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকে

বা বিশেষ চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, তখন মস্তিষ্কের কোন অংশ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়, এইসব কারিগরির সাহায্যে তা নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে।

আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবাসী ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ বিনোদ মেনন ও তাঁর সহকর্মীরা ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিং কারিগরির সাহায্যে মানব মস্তিষ্কের এরকম একটি মানচিত্র তৈরি করার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। ডঃ মেনন ও তাঁর সহকর্মীরা লক্ষ্য করেছেন যে, শিশু, কিশোর, তরুণ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের মানচিত্র এক রকম হয় না। ডঃ গ্রেগ সীগ্যল (Dr. Greg Siegle) ও তাঁর সহকর্মীরা ওই একই FMRI প্রযুক্তির সাহায্যে অবসাদ রোগের ওপর কাজ করে চলেছেন। অবসাদের ফলে মস্তিষ্কের কোন অংশ প্রভাবিত হয় সেটাই তাঁদের গবেষণার বিষয়। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, অবসাদ রোগের সঙ্গে মস্তিষ্কের অ্যামিগডালা (amygdala) নামক অংশটার বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। ডঃ সীগ্যল বিশ্বাস করেন যে, একদিন তাঁদের কাজ অপরাধ জগতের লোকদের সনাক্ত করতে সাহায্য করবে। লাই ডিটেক্টর বা কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাঁদের গবেষণার ফলে তা নিঃসন্দেহভাবে ধরে ফেলা সম্ভব হবে।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, আমেরিকার বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলো এইসব নিউরো-বিজ্ঞানের গবেষণার পিছনে প্রচুর টাকা খরচ করে চলেছে। কারণ তারা জানে যে, যদি এইসব গবেষণার দ্বারা কোনও অত্যাশ্চর্য ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হয় তবে একটা ওষুধ বিক্রি করেই তারা হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করতে পারবে। মানসিক চাপ, অবসাদ, নিদ্রাহীনতা, বিস্মরণশীলতা, অধিক লজ্জা ও ভীরুতা ইত্যাদি মানসিক ব্যাধির জন্য অত্যাশ্চর্য ওষুধ তৈরি করার লক্ষ্যে এই কোম্পানীগুলি কাজ করে চলেছে। ইতিমধ্যে তারা সুপার প্রোজাক্স (super-prozacs) নামে একটা ওষুধের ব্যাপারে প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, ওই ওষুধটা বার্ধক্যজনিত বিস্মৃতি কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে। এব্যাপারে তারা এ এম পি এ রিসিপ্টর্স (AMPA receptors) নামে আরও একটা ওষুধ উদ্ভাবন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা হচ্ছে যে, এক স্নায়ু কোষ থেকে অন্য স্নায়ু কোষের মধ্যেকার সঙ্কেতের শক্তিকে বৃদ্ধি করে এই ওষুধটি বার্ধক্যজনিত বিস্মৃতিকে কমিয়ে আনতে পারবে। বর্তমানে এই নিউরো-বিজ্ঞানীরা নতুন এক চিকিৎসা পদ্ধতির কথা ভাবছেন, যার নাম হল ট্রান্স-ক্রেনিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশন (trans-cranial magnetic stimulation or TMS)। এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হল, বাইরে থেকে অতিশয় শক্তিশালী একটি চুম্বকক্ষেত্রের সাহায্যে মস্তিষ্কের কোনও অংশের কাজকে সাময়িকভাবে স্তব্ধ করে রাখা। এবং এর দ্বারা রুগীর ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটানো।

দেহের মধ্যে আত্মার নিবাস কোথায়?

আগেই বলা হয়েছে যে, কিছু কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন এইসব গবেষণার মধ্যে দিয়ে তাঁরা মানব মনের গভীরতম রহস্য উন্মোচন করতে সক্ষম হবেন। মানব মস্তিষ্কের কোন রহস্যময় গুপ্ত প্রকোষ্ঠে চিন্তার জন্ম হয় বা মস্তিষ্কের কোথায় চিন্তার উৎসমুখ লুকিয়ে রয়েছে তা খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন। সর্বোপরি, মস্তিষ্কের কোথায় সেই রহস্যময় সত্তা, যাকে দার্শনিকরা আত্মা বলেন, তা লুকিয়ে রয়েছে, তাও খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন।

ফরাসী গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক রেনে দেকার্তে (Rene Descartes) বিশ্বাস করতেন যে, মানব মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড (pineal gland) নামক শঙ্কু আকৃতির ছোট যে গ্রন্থি রয়েছে, সেখানেই আত্মার অবস্থান। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, পিনিয়াল গ্ল্যান্ডটি একটি এণ্ডোক্রাইন (endocrine) গ্ল্যান্ড মাত্র (মানব শরীরে বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থি আছে যেগুলো থেকে বিশেষ ধরনের রস নিঃসৃত হয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এই সব গ্রন্থিগুলোকে এন্ডোক্রাই গ্রন্থি বলে)। আরও কতগুলি কারণে দেখা গেছে যে, দেকার্তের উপরিউক্ত ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন। যেমন, কারও পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডে টিউমার হলে বা অন্য কোনও কারণে তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে, আত্মার ওপর তা কোনও প্রভাব ফেলে বলে মনে হয় না। তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এব্যাপারে কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হলে আরও অনেক গবেষণার প্রয়োজন। কিন্তু এইসব জড়বাদী বিজ্ঞানীদের অনেকেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, একদিন না একদিন তাঁরা আত্মার রহস্য অবশ্যই উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন। তাই নিউইয়র্কের হেস্টিংস সেন্টার (Hastings Centre) -এর এক নিউরো বিজ্ঞানী বলেন, "Ultimately science will triumph"- অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানই জয়যুক্ত হবে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, পাশ্চাত্যের এইসব জড়বাদী বিজ্ঞানীদের মতে, যে সমস্ত প্রাণীর মস্তিষ্ক নেই তাদের আত্মা থাকতে পারে না।

এটা সকলেরই জানা আছে যে, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু দর্শনে আত্মার অস্তিত্ব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এবং হিন্দু ধর্ম অনুসারে একমাত্র আত্মার বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান এবং উপলব্ধিই মানুষকে পার্থিব দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে পারে। জন্ম-জন্মান্তর চক্র থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং চরম আধ্যাত্মিক সুখ ও নির্মল আনন্দ দিতে পারে। এবং আত্মার বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করাই হল প্রতিটি হিন্দুর ইহজীবনের চরম লক্ষ্য। আর এই মোক্ষই হল প্রতিটি হিন্দুর চরম আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি। হিন্দু দর্শন অনুসারে আত্মাই হল সমস্ত জ্ঞানের জ্ঞাতা এবং সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক ইত্যাদি সমস্ত অনুভূতির অনুভবকারী। একাদশ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আত্মা সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক ইত্যাদি ভোগ করেন। তাই হিন্দু দর্শন অনুসারে মানুষের শরীর, মন, মস্তিষ্ক, মস্তিষ্কের বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া এর কোনওটাই আত্মা নয়। এগুলি হল আত্মার অবয়ব মাত্র, যার দ্বারা আত্মা পার্থিব সুখ, দুঃখ, শোক, আনন্দ ইত্যাদি অনুভব করেন।

আত্মার ক্লোন সম্ভব নয়

গত ১৯৯৭ সালে আইরিশ জিন-বিজ্ঞানী আয়ান উইলমুট (Ian Wilmut) যখন ডলি নামক একটি ভেড়ার ক্লোন তৈরি করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন মানুষের ক্লোন প্রস্তুত করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। এরই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে মার্কিন কংগ্রেস ক্লোন-বিরোধী একটি বিল আনয়ন করে। কিন্তু প্রবল বিরোধিতার ফলে তা আইনে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। মার্কিন বিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রপতির নিষেধাজ্ঞাটিকে একটি হঠকারী ও অবৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন। বিশেষ করে সেনেটর টম হারকিন রাষ্ট্রপতির উপরিউক্ত

নিষেধাজ্ঞাটিকে পোপ পঞ্চ ম পল-এর ১৬১৬ সালে গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে জারি করা নিষেধাজ্ঞার সমান বলে উপহাস করেন। কিন্তু আমেরিকার অনেক জনকল্যাণমুখী সংস্থা বিল ক্লিনটনকে সমর্থন করে। তারা বলে, মেয়েদের বন্ধ্যাত্বের প্রকার হিসাবেও মানুষের ক্লোন প্রস্তুত করা উচিত নয়, কারণ মানুষের ক্লোন তৈরি করাটা সম্পূর্ণ অনৈতিক।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, রোমান ক্যাথলিক চার্চ মানুষের জন্মের ওপর ক্লোনিং সহ যে কোনও রকমের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার বিরোধী। এই প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার, যেসব বিজ্ঞানীরা জীবজন্তুর ক্লোন তৈরির ওপর কাজ করছেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী এই বছরের মার্চ মাসে এক বিবৃতিতে মানুষের ক্লোন তৈরির ব্যাপারে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ও ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা জানান। তাঁরা বলেন, এর ফলে শত শত বিকলাঙ্গ ও অস্বাভাবিক ভ্রূণের জন্ম হতে পারে এবং এই কারণে শত শত ভ্রূণ হত্যার প্রয়োজন হতে পারে। ওই বছরেরই এপ্রিল মাসে বিখ্যাত টেলিভিশন সংস্থা 'সি এন এন' এবং 'টাইম' পত্রিকার তরফ থেকে যুগ্মভাবে একটি জনমত সমীক্ষা চালানো হয় এবং তাতে প্রায় ৯০ শতাংশ আমেরিকান ক্লোনিং-এর বিপক্ষে মত দেন। প্রায় ৭৬ শতাংশ আমেরিকান এই মত দেন যে, বন্ধ্যা মেয়েরা সন্তান লাভের জন্য ক্লোনিং-এর সাহায্য নিতে চাইলেও নৈতিক দিক থেকে তাকে সমর্থন করা চলে না। এইসব কথাবার্তা চলতে থাকার মধ্যেই আমেরিকার ছয়টা রাজ্য, যেমন ক্যালিফোর্নিয়া, লুইসিয়ানা, মিসৌরি, মিচিগান, রোড-দ্বীপ ও টেক্সাসে আইন করে মানুষের ক্লোন তৈরি করাকে নিষিদ্ধ করা হয়।

তবে প্রকৃত সত্য হল এই যে, এইসব বিরোধিতা ও নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে অনেক বিজ্ঞানী অতি সঙ্গোপনে মানুষের ক্লোন তৈরি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন হতে পারে যে, অল্প কিছুদিনের মধ্যে এঁদের কেউ প্রথম মানুষের ক্লোন তৈরি করার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। আর এক দিক থেকে দেখতে গেলে, মানুষের ক্লোনের চাহিদা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। তাই জোর কদমে বেড়ে চলেছে মানুষের ক্লোন তৈরি করার প্রচেষ্টা। আমেরিকার প্রায় ৩.৭ শতাংশ গৃহবধূ বন্ধ্যা এবং তাঁরা সকলেই চান ক্লোনের মাধ্যমে সন্তানের মা হতে। আমেরিকার অনেক ধনকুবেরের ইচ্ছা হল, ক্লোনিং-এর মধ্য দিয়ে নিজের প্রতিমূর্তি তৈরি করা, যাতে তিনি মারা গেলেও তাঁর ওই ক্লোন প্রতিমূর্তি জীবিত থাকতে পারে। নিউ ইয়র্কের ইচ্ছা হল, মরার আগে তিনি তাঁর শরীরের ত্বকের কিছু কোষ সংরক্ষণ করে যাবেন, এবং মৃত্যুর পর সেই কোষ থেকে যে ক্লোন তৈরি হবে সে তাঁর সম্পত্তির মালিক হবে।

তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখতে গেলে মানুষের ক্লোন তৈরি করাটা আজ আর তেমন কোনও কঠিন কাজ নয়। কোনও নারীর জরায়ু থেকে তাঁর একটি ডিম্বকোষ তুলে আনতে হবে। অতঃপর সেই ডিম্বকোষের কেন্দ্রীয় অংশ বা Nucleusটি বের করে সেখানে যার ক্লোন করতে হবে তার কোনও একটি কোষের Nucleus প্রতিস্থাপিত করতে হবে। এবং সব শেষে সেই পরিবর্তিত কোষটি পুনরায় যে কোনও মহিলার জরায়ুতে প্রবিষ্ট করাতে হবে। প্রত্যেক বিজ্ঞানী তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে এই কাজটি করে থাকেন এবং সেই পদ্ধতিটি গোপন রাখেন। যেই মহিলার জরায়ুতে ওই পরিবর্তিত কোষটি প্রতিস্থাপন করা হয় তাকে সারোগেট মা বলা হয়ে থাকে। এই সারোগেট মায়ের গর্ভেই ভ্রূণটি বড় হয়।

কিন্তু বলতে যত সোজা, কাজটি করা অত সোজা নয়। জন্তু জানোয়ারের ক্লোন করার বেলায় শতকরা ৯৮টি ক্ষেত্রে পরিবর্তিত ভ্রূণটি তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। যে কয়টি বেঁচে থাকে, তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় নানা রকম দৈহিক বিকৃতি। এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বিজ্ঞানী আয়ান হেলমুট বলেন যে, যদি ২০টি সারোগেট মায়ের জরায়ুতে পরিবর্তিত ভ্রূণ প্রতিস্থাপিত করা হয়, তবে আশা করা যায় যে, তার মধ্যে মাত্র একটি ভ্রূণ সুস্থ শিশুতে পরিণত হতে পারে। বাকি বিকলাঙ্গ বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। ক্লোন তৈরির ক্ষেত্রে এটাই হল সর্বাপেক্ষা অমানবিক পর্যায়। এবং এই কারণেই ক্যাথলিক চার্চ ও অন্যান্য নীতিবাদী সংস্থা মানুষের ক্লোন করার এত বিরোধী। এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী আর্থার কাপলান (Arthus Caplan) বলেন, "এই ধরনের সাফল্য ইঁদুর বা নেংটি ইঁদুরের বেলায় চলে, কিন্তু মানুষের বেলায় চলে না।"

যদি কোনও দিন ক্লোনিং সব দিক দিয়ে দোষমুক্ত হয়, তাহলেও এব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রশ্ন থেকেই যাবে। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব-নীতিবিদ ছন্ত্বক্সন্দ্বব্ধড়ন্তুব্দগ্ন ডঃ লিও কাস ছন্দ্বক্সংত্রব্দব্দগ্ন বলেন, "মানুষের ব্যাপারে ক্লোনিং বা যে কোনও রকমের জিনগত পরিবর্তনের ফলাফল হতে পারে অতি ভয়ঙ্কর। আজ সব মানুষেরই একজন বাবা ও একজন মা আছে। কিন্তু মানুষের ক্লোন তৈরি করলে কে হবে তার বাবা আর কে হবে তার মা? ধরা যাক, কোনও মহিলা তাঁর নিজের ক্লোন তৈরি করলেন। তা হলে সেই ক্লোন কি তাঁর মেয়ে হবে না তাঁর বোন হবে?" ডঃ কাস আরও বলেন, "ধরা যাক বিল তার মৃতপ্রায় মায়ের একটা ক্লোন তৈরি করল। তাহলে সেই ক্লোন করা শিশুটিকে কি তার মা বলা যাবে?"

একটি স্বাভাবিক শিশুর সঙ্গে একটি ক্লোন করা শিশুর মূল পার্থক্য হল, তার জন্মের জন্য পিতার শুক্রকোষের প্রয়োজন হয় না। কাজেই ক্লোন করা কোনও শিশুরই কোনও জৈবিক পিতা থাকবে না। উপরন্তু, সেই শিশুটি যদি কোনও সারোগেট মায়ের গর্ভে বড় হয়ে থাকে তা হলে তার কোনও জৈবিক মাও থাকবে না। কাজেই সেই শিশুটির সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কি সম্পর্ক হবে তাও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। কাজেই সমাজে তার পরিচয় নিয়ে মহা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে। তাই এই আত্মপরিচয়ের সমস্যা শিশুটির জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলবে তা বলাই বাহুল্য। সমাজবিদরা এব্যাপারে আরও একটি সমস্যার কথা বলছেন। যদি কোনও দিন ব্যাপকভাবে মানুষের ক্লোন তৈরি করা শুরু হয়, তাহলে প্রত্যেক বাবা-মা-ই চাইবে যে তাদের শিশুটি যেন অত্যন্ত মেধাবী বা কোনও অতিশয় বিখ্যাত লোকের নকল হয়। এটা চলে থাকলে মানব সমাজ বুদ্ধি বৃত্তির দিক দিয়ে একটি অচলায়তনে পরিণত হবে। ফলে আজ নতুন প্রজন্ম বলতে যা বোঝায় তা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু মানব ক্লোনের সমর্থনকারীরাও তাঁদের নিজস্ব যুক্তি খাড়া করে চলেছেন। কেন্টুকি বিশ্ববিদ্যালয়-এর বন্ধ্যাত্ব বিষয়ের বিজ্ঞানী ডঃ পানাওটিস জাভোস (Panayiotis Zavos) হলেন মানব ক্লোনের একজন বড় সমর্থক। তিনি বলেন, আমরা যদি কোনও মায়ের কোলে তার

মৃত শিশুকে ফিরিয়ে দিতে পারি বা কোনও বন্ধ্যা মায়ের কোলে সন্তান তুলে দিতে পারি, তাহলে তাতে দোষ কোথায়? যদি ভ্রূণ হত্যা আইনসিদ্ধ হতে পারে, তবে ক্লোনের মাধ্যমে ভ্রূণের জন্ম দেওয়া বেআইনী হবে কেন?

এব্যাপারে আরও চিন্তা করার আছে। সত্যিই কি ক্লোনের মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের পক্ষে নিজেদের ইচ্ছামতো বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষ বা এককথায় tailor-made মানুষ তৈরি করা সম্ভব? উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তবে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু দর্শনের খুবই দুর্দিন উপস্থিত হবে। হিন্দুর পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব এক চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। হিন্দু ধর্মের মূল প্রাসাদটি দাঁড়িয়ে আছে পুনর্জন্ম ও মোক্ষের অবধারণার ওপর। মানুষ জন্ম জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে মোক্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই জন্ম জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে করতে যখন তার ব্রহ্মজ্ঞান হবে, তখনই সে এই জন্ম ও পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পেয়ে মোক্ষ লাভ করবে। তাই এই জন্মে সে যেসব জৈবিক, মানসিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর অধিকারী হয়েছে তা তার পূর্বেকার জন্মগুলোর সুকর্মের ফল। এ ব্যাপারে গীতা বলছে—

"যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে।।" (১৪ ঃ ১৪)
"রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।।" (১৪ ঃ ১৫)

— অর্থাৎ সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে যদি জীবের মৃত্যু হয়, তবে তিনি উত্তম তত্ত্ববিদগণের প্রাপ্য প্রকাশময় দিব্য লোকসকল প্রাপ্ত হন (১৪ ঃ ১৪)। রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে কর্মাসক্ত মনুষ্য যোনিতে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে পশ্বাদি মূঢ়-যোনিতে জন্ম হয় (১৪ ঃ ১৫)।

কাজেই বিজ্ঞানীরা যদি ক্লোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁদের ইচ্ছামত কাঙ্ক্ষিত গুণ সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন তবে হিন্দু ধর্ম তথা গীতার বাণী খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে। তাই ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

বিজ্ঞানীদের মতে যে কোনও দুটি যমজ শিশু একে অপরের ক্লোন। অথবা একে অন্যের প্রতিরূপ। তাঁরা আরও মনে করেন যে, দুটি যমজ শিশুর মধ্যে যে নিকট সাদৃশ্য থাকে, ক্লোনের মাধ্যমেও অতটা সাদৃশ্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কারণ দুটি অবিকল একই রকম জিন সমন্বয় থেকে দুটি যমজ শিশুর শরীরের উদ্ভব হয়। তদুপরি তারা একই মায়ের গর্ভে একই বাতাবরণে বড় হয়। কিন্তু জন্মের ব্যাপারে এত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, শিশু দুটি কখনোই অবিকল এক রকমের হয় না। দুটি পৃথক ব্যক্তিত্ব হিসাবেই তারা সমাজে প্রতীয়মান হয়। স্বাভাবিক ভাবে এটাই দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে একটি হয়তো খেলাধূলায় আগ্রহী, কিন্তু অন্যটির আগ্রহ রাজনীতিতে। একটি হয়তো দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু অন্যটি কারিগরিতে অত্যন্ত পটু। একটি হয়তো জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী, কিন্তু অন্যটি জ্যোতিষ বা ভাগ্য গণনার ব্যাপারে ভীষণ অবিশ্বাসী।

তাই এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে জিন বিজ্ঞানী আর্থার কাপলান (Arthus Caplan) বলেন, ক্লোনিং করে কোনও মৃত বাচ্চাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় বা কারও পক্ষে নিজেকে অমর করে রাখাও সম্ভব নয়। কারণ ক্লোন করে যাকে সৃষ্টি করা হবে তার চরিত্র হবে সম্পূর্ণ পৃথক। দুটি যমজ বাচ্চার মধ্যে একটি মারা গেলে অন্য জীবিত বাচ্চাটিকে দেখে যেমন মৃত বাচ্চাটির ব্যাপারে সান্ত্বনা পাওয়া সম্ভব নয়, এটাও ঠিক সেইরকম। এখানে বলে রাখা দরকার যে, মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী শুধু জিনের ওপর নির্ভরশীল নয়। জিন ও সেই সঙ্গে অ্যামিনো অ্যাসিডের তারতম্যের ওপর মানুষের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলী নির্ভরশীল। ক্লোনের দ্বারা জিন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিন্তু অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর তারতম্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তাই ক্লোনের দ্বারা কোনও মানুষের অবিকল প্রতিরূপ তৈরি করা সম্ভব নয়। এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বিজ্ঞানী শ্রীমতী সুসান রীড (Susan Reed) বলেন, কোনও দুটি মানুষের হাতের ছাপ যেমন কখনও একরকম হয় না, সেই রকম দুটি যমজ শিশুও কখনও অবিকল এক রকম হয় না। কারণ জৈবিক শরীরের দিক দিয়ে তারা প্রায় এক রকম হলেও তাদের আত্মা দুটি আলাদা। বিজ্ঞানীরা মানুষের শরীরটারই ক্লোন করতে পারে, তারা আত্মার ক্লোন করতে পারে না।

আত্মার প্রকৃত রূপ

সাঙ্খ্য দর্শনের প্রণেতা ঋষি কপিলের মতে, আত্মা অবর্ণনীয় কিন্তু তাই বলে তাকে অস্বীকার করা চলে না। উপরন্তু আত্মা আছে, কারণ কারও পক্ষে আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এরপর আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সূত্র দিচ্ছেন— 'ষষ্ঠী ব্যপদেশাদপি'। অর্থাৎ আমরা আমাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে বোঝাতে বলে থাকি, এটা আমার হাত, এটা আমার পা, এটা আমার মাথা, এটা আমার চোখ, এটা আমার কান ইত্যাদি। অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই আমরা ষষ্ঠী বিভক্তি ব্যবহার করি। শুধু জৈবিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই নয়, অজৈব গুণাগুণের ক্ষেত্রেও আমরা বলি, আমার বুদ্ধি, আমার জ্ঞান, আমার ক্রোধ, আমার ভয় ইত্যাদি। কাজেই সবই যদি আমার হবে তবে আমিটা কে? ঋষি কপিলের মতে, ওই আমিটাই হল আত্মা। তার থেকেও বড় কথা হল, কেউ মারা গেলে আমরা বলি না, ওটা রামবাবু শুয়ে আছেন। আমরা বলি রামবাবুর মৃতদেহটা শুয়ে আছে। এর থেকে ঋষি কপিল বোঝাতে চাইছেন যে, আত্মা আমাদের শরীরের কোনও জৈবিক সত্তা নয় এবং আত্মা একটি অজৈবিক অতিপ্রাকৃত সত্তা। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্টও প্রকারান্তরে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, 'আমি জানি'-র 'আমি' কে? ঋষি কপিলের মতে এই 'আমি'ই হল আত্মা।

তাই হিন্দু দর্শন অনুসারে আত্মার অস্তিত্ব আছে এবং তা একটি অজৈবিক অপ্রাকৃত সত্তা। তাই এই অজৈবিক ও অপ্রাকৃত সত্তাকে জড়বিজ্ঞানীরা তাদের প্রাকৃত ও জৈবিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কেমন করে জানবে? উপরন্তু আত্মা রহস্যময়। মানুষের জন্ম মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মার জন্ম মৃত্যু নেই। সাধারণ ভাবে মনে হয় যে, শরীরের ভিতরেই আত্মার অবস্থান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মা আমাদের জৈবিক শরীরের মধ্যে অবস্থান করে না। তাই আত্মার রহস্যময়তা বোঝাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন,—

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।

আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।। (২ঃ২৯)

— অর্থাৎ কেহ আত্মাকে আশ্চর্যবৎ কিছু বলিয়া বোধ করেন, কেহ কেহ ইহাকে আশ্চর্যবৎ কিছু বলিয়া বর্ণনা করেন, কেহ বা ইনি আশ্চর্যবৎ কিছু, এই প্রকার কথাই শুনেন, কিন্তু শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারেন না।

গীতায় আরও অনেক শ্লোকের মধ্য দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মার স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। যেমন, মানুষের জন্ম ও মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নেই (২ ঃ ২০)। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেইরকম জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহকে আশ্রয় দেয় (২ ঃ ২২)। অস্ত্র এই আত্মাকে ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নি এই আত্মাকে দহন করতে পারে না, বায়ু এই আত্মাকে শুষ্ক করতে পারে না বা জল এই আত্মাকে সিক্ত করতে পারে না (২ ঃ ২৩)। বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে ফুলের সুগন্ধ স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন করে, আত্মাও সেইরকম দেহ থেকে দেহান্তরে গমন করে (১৫ ঃ ৮) এবং জ্ঞানীরা তাদের জ্ঞান চক্ষুর সাহায্যে তা দেখতে পান, মূঢ় বা অজ্ঞানীরা তা দেখতে পায় না (১৫ ঃ ১০) ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার থেকেও বড় কথা হল, বৈদান্তিকের কাছে যিনি পরমব্রহ্ম, যোগীর কাছে তিনিই পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে তিনিই পরমেশ্বর। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সঙ্গে কি সম্পর্ক তাই নিয়ে নানা মতভেদ থাকলেও এক কথায় বলা যায় যে, জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। পরমাত্মা যদি আগুন হয় তবে জীবাত্মা তার স্ফুলিঙ্গ। তবে জীবাত্মাও পূর্ণ, পরমাত্মাও পূর্ণ। ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং। তাই যে আত্মাকে জড়বিজ্ঞানীরা স্থূল জড় যন্ত্রপাতির দ্বারা দেখা বা জানার চেষ্টা করছে, হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে সেই আত্মা হলেন পরমেশ্বর ভগবান। এবং হিন্দু শাস্ত্রমতে সেই আত্মাকে জানার পথ হল আধ্যাত্মিক। সাধনা, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ভক্তির দ্বারাই তাকে জানা বা বোঝা যেতে পারে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সাধক তাঁর অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবেই তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। কারণ উপনিষদ বলছে—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।। (কঠ ১/২/২৩)

অর্থাৎ, এই আত্মাকে বহু বেদ অধ্যয়নের দ্বারা, অথবা মেধার সাহায্যে, কিংবা বহুশাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না। যাঁহার প্রতি ইনি অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইহাকে লাভ করেন। তাঁহারই সকাশে আত্মা তাঁর স্বীয় রূপ প্রকটিত করেন।

কিন্তু পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী নামক বালখিল্যের দল ভাবছে যে তারা এমন এক যন্ত্র তৈরি করবে যার সাহায্যে তারা আত্মাকে দেখতে পাবে। অর্থাৎ তারা ভগবানকে দেখার যন্ত্র তৈরি করে ফেলবে। এর থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা শিশু মাত্র।

আয়ুর্বেদের পুনরুত্থান ভারতের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা

অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়

রোগ নিরাময়ের জন্য প্রাকৃতিক ভেষজ নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি আজ উত্তরোত্তর আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে সারা বিশ্ব জুড়ে এবং ভেষজ উৎস থেকে আবিষ্কৃত ওষুধের বাজারও আজ বিশ্বব্যাপী, কিঞ্চি দধিক ৬০ মিলিয়ন ডলারের। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেবে ২০৫০ সাল নাগাদ এটা হয়ে যাবে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের মতো। এই বাজারে তাই ঢুকে পড়ার চেষ্টা সমস্ত দেশেরই, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার সামর্থ্য যাদের আছে। ভেষজ উৎস থেকে আবিষ্কৃত ওষুধের বাজারের এই ব্যাপ্তির কারণ প্রধানত দুটি—

(১) পাশ্চাত্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী রোগ নির্ধারণ এবং নিরাময় প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং যা ক্রমবর্ধমানভাবে এক শ্রেণীর চিকিৎসক-ব্যবসায়ীদের যৌথ উদ্যোগে বিপুল অর্থ উপার্জনের উপায় মাত্র হয়ে গেছে।

(২) তথাকথিত উন্নততর চিকিৎসা পদ্ধতিতে একটি রোগকে প্রতিহত করতে গিয়ে অন্য ধরনের জটিলতা আমন্ত্রিত হচ্ছে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে যা ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে সাধারণ মানুষকে।

এই দ্বিবিধ যাঁতাকলে পিষ্ট সাধারণ মানুষ অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীনতার প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন চিকিৎসার প্রতি আগ্রহী হয়েই প্রাচীনতম চিকিৎসা পদ্ধতি বা ভারতীয় আয়ুর্বেদের প্রতি অথবা স্থানীয় ভেষজ নির্ভর রোগনিরাময় ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু বিকল্প হিসেবে আকর্ষণীয় এই পদ্ধতি বা আমাদের দেশের আয়ুর্বেদীয় নিরাময় পদ্ধতিকেও সুকৌশলে এই বাজারে টেনে আনছে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলি। ফলে একান্তভাবে জনকল্যাণমূলক এবং সুলভ হওয়ার পরিবর্তে তা অধরা হয়ে যাচ্ছে বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্মুখীন হচ্ছে এবং যে দর্শনে ভারতীয় আয়ুর্বেদ সমৃদ্ধ তাও বিনষ্টের সম্মুখীন। ঠিক এই পরিস্থিতিতে ভারতের ভূমিকা কী হবে, কতটা হবে, কীভাবে হবে তা আবশ্যিকভাবেই ব্যাপক আলোচনার দাবি রাখে, যাতে করে এক সুস্পষ্ট পথনির্দেশ পাওয়া যায়।

আয়ুর্বেদ বেদেরই একটি অংশ। ভারতীয় বিশ্বাস মতো ব্রহ্মই এর উৎস। আয়ুর্বেদ বিধৃত ছিল হাজারটি অধ্যায়ে বিভক্ত এক লক্ষ শ্লোকে। প্রাচীনতম শিক্ষক ছিলেন (১) প্রজাপতি, (২) ইন্দ্র। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বিভিন্ন শিক্ষক চিকিৎসকদের প্রয়াসে বিপুল মাত্রার অনুসন্ধান, অনুশীলন, গবেষণা, ভেষজ আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ, শল্য চিকিৎসা, আলোচনা, সিদ্ধান্ত— এসব কিছু নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিল দুটি বিশাল সংকলন গ্রন্থ— (১) চরক সংহিতা, (২) সুশ্রুত সংহিতা।

ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের সামাজিকীকরণ, যার ফলে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের কেন্দ্র হয়ে উঠত না জ্ঞানবিজ্ঞান গবেষণাজাত উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি। যেমনটা হয়ে থাকে পাশ্চাত্য ব্যবস্থার পেটেন্ট বা মালিকানা ব্যবস্থার প্রবর্তনে। ভারতীয় চিন্তা-ভাবনায় এটা ছিল না। এরই কারণে জগদীশচন্দ্র বসু 'রেডিও'র আবিষ্কর্তা হয়েও তার পেটেন্ট নেওয়ার কথা ভাবতেই পারেননি, এবং এই সুযোগটা ব্যবহার করেই মার্কনি রেডিও আবিষ্কারের কৃতিত্ব হাতিয়ে নেন 'পেটেন্ট' করার মাধ্যমে। জনকল্যাণের জন্যই গবেষণার প্রাপ্তিগুলিকে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের উপকরণ মনে করতেন না ভারতীয় বিজ্ঞানীরা।

এই ভারতীয় দর্শন মোতাবেকই আয়ুর্বেদের লক্ষ্যই ছিল দৈহিক মানসিক রোগ যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের বা জীবের নিরাময়করণ। তাই দেখতে পাই জাতক কাহিনীতে, বুদ্ধ অনুরাগী জীবক গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণের কোনও এক সময় তাঁর কাছে আসা কোনও এক গ্রামবাসীর মস্তিষ্ক যন্ত্রণার কারণ বিশ্লেষণ করে যখন বুঝলেন এ যন্ত্রণার কারণ মস্তিষ্কের মধ্যে বাসা বাঁধা কৃমিকীট তখনই স্থানীয় কর্মকার দ্বারা প্রয়োজনীয় শস্ত্র তৈরি করে শস্ত্র চিকিৎসা প্রয়োগ করে সেই কৃমিকীটকে বহিষ্কার করে তাকে নিরাময় করেন। এবারে আমাদের কালে, এখন এই ব্যাপারটির তাৎপর্য ভেবে দেখুন। আর্থিক বিচারে, কুশলতার বিচারে, উপকরণ লভ্যতার বিচারে, সতর্কতার বিচারে জানা যায় চুলের আনুভূমিক দ্বিখণ্ডীকরণের মতো শস্ত্রও ছিল। এই শস্ত্রের জন্য কোনও সংগঠিত সংস্থার ওপর নির্ভর করতে হত না। সমাজের মধ্যেই লভ্য ছিল। আপাতভাবে অত্যাশ্চর্য হলেও এটা তা ছিল না— ভারতের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনাতেই সেটা বোঝা যায়। একটি উদাহরণ— লেসার তৈরির জন্য প্রান্তিক দর্পণ চাই অত্যন্ত উচ্চমানের, বিশেষ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারকারী সংস্থা ছাড়া এই উচ্চমানের দর্পণ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জানেন কী,

মহারাষ্ট্রে একটি পরিবারের গৃহশিল্প প্রয়াস থেকে এই ধরনের উচ্চমানের দর্পণ ফ্রান্সের একটি সংস্থা কিনে নিয়ে যায়। ওই পরিবারটি দেশীয় প্রাচীন পদ্ধতিতে ওই উচ্চমানের ধাতবদর্শন তৈরি করে আসছে দীর্ঘদিন।

আয়ুর্বেদের প্রশ্নে ফিরে আসি। লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ কেমন ভাবে সামাজিকীকরণের পদ্ধতিতে ঢুকে গিয়েছিল, তার আর একটি প্রমাণ 'ত্রোটক' বা টোটকা চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন, যা আজ অবধি কোনও না কোনও রূপে কোথাও না কোথাও প্রচলিত আছে। জনজীবনে পুরোহিতের একটা ভূমিকা ছিল। তাই মন্ত্র তন্ত্র যন্ত্র— এই তিনের সমন্বয়ে ত্রোটক বলে একটি লোকপ্রিয় সুলভ চিকিৎসার প্রচলন ছিল, আজও আছে গ্রামীণ জীবনে টোটকা নামে। দৃশ্যত অবৈজ্ঞানিক অযৌক্তিক, বুজরুকি, কুসংস্কার মনে হলেও বেশ কিছু টোটকা আশ্চর্যজনক ভাবে ইতিবাচক হত। অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা একটু তুলে ধরা যাক। আমার ছোটবেলা কেটেছে গ্রামে। তখন হুপিং কাশি বলে এক দুর্দান্ত কষ্টদায়ক কাশি হত বাচ্চাদের। এই সময়ে টনসিল বা আলজিভ লাল হয়ে বেড়ে যেত। মা রান্নাঘরের খড়ের চালার কোণে জমা হওয়া 'ঝুল' একটু নিয়ে তাকে নুনের সঙ্গে মেড়ে আঙুলের ডগা দিয়ে আলজিভে ঠেকিয়ে দিলেই আশ্চর্যজনক ভাবে কাশি কমে যেত এবং টনসিলও স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যে চলে আসত। বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে এখন ওই কথা মনে করলে শিউরে উঠি ভয়ে।

চোখের পাতায় ফোঁড়া (অঞ্জনি) হলে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বাসি মুখে দরজার লোহার শিকল ওই চোখের পাতায় ঠেকাতে হবে— পর পর তিন দিন। অঞ্জনি ভাল হয়ে যেত। এরকম অজস্র ছোটখাটো ঘরোয়া পদ্ধতি ছিল, যার কথা এখন কারও সামনে বলা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লজ্জাজনকই। কিন্তু এগুলি সুফলপ্রদ হিসেবেই চালু ছিল। মনে হয় মূল চিকিৎসার এক সংক্ষিপ্ত রূপ এই ভাবে সামাজিকীকরণ মাধ্যমে চালু হত। এগুলির কার্যকারণানুসন্ধান অনুধাবনযোগ্য এবং ভারত সরকার সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত এই সব পদ্ধতির সমীক্ষায় অগ্রণী হয়েছেন।

পরম্পরাক্রমে আয়ুর্বেদের অনুশীলন অভিজ্ঞতা সবই গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংরক্ষিত থাকত ধর্মমত নির্বিশেষে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায়। ভেষজ নির্ভর চিকিৎসা (চরক) এবং অস্ত্রোপচার নির্ভর চিকিৎসা (সুশ্রুত) হাত ধরাধরি করে চলত। উভয় পদ্ধতি নিয়ে আলোচনাসভা বসত সিদ্ধান্ত নেওয়া হত এবং তা লিপিবদ্ধ হত। বাণিজ্যিক কারণে ভিনদেশী মানুষের আসা যাওয়ার মাধ্যমে এই সব চিকিৎসা পদ্ধতির কিছু কিছু বহির্দেশেও চলে গেছিল। বৌদ্ধ ও জৈন শাসনকালে অহিংস নীতির ব্যাপক যান্ত্রিক প্রয়োগে শস্ত্র চিকিৎসার পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যাহত হয়। বল্লাল সেনের আমলেও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অপরাধীদের ওপর চিকিৎসার নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হত। এদের বলা হত 'রোমথা'। সেন বংশের পতনের পর এই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর মুসলিম আক্রমণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একের পর এক ধ্বংস হওয়ায়, আয়ুর্বেদচর্চা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় ১২০০ বছর ধরে গবেষণাহীন হয়ে যায় আয়ুর্বেদ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় অবধি কোনওক্রমে টিকে থাকা আয়ুর্বেদ ও ইউনানী পদ্ধতিতে জনজীবনে চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু ছিল। পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির বহুল প্রসার, প্রয়োজন এবং সাফল্যের আড়ালে কবিরাজী নামে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার রুগ্ন এবং ক্ষয়িষ্ণু কাঠামো ধ্বংসই হয়ে গিয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন অংশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু কেন্দ্রে আয়ুর্বেদ কোনওক্রমে টিকে ছিল। কিন্তু অধুনা পাশ্চাত্য গবেষণাতেই আয়ুর্বেদ চর্চিত কিছু ভারতীয় ভেষজ যেমন নিম, হলুদ ইত্যাদির অসাধারণ গুণ আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতীয় আয়ুর্বেদ সম্পর্কে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হয় প্রবলভাবে, ব্যাপকভাবে। নিম, হলুদকে স্বস্থান থেকে একরকম ছিনতাই করে পেটেন্টে করে নেওয়ার প্রচেষ্টায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে সমগ্র বিশ্ব সুশ্রুত বর্ণিত শল্য চিকিৎসার চমৎকারিত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। এখন জানা যাচ্ছে, অস্ত্র চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, উপকরণ, আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সহ সমগ্রটাই সুশ্রুত-এর আবিষ্কার। শস্ত্র চিকিৎসার পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের নামের আড়ালে ঢেকে রেখে দেওয়া হয়েছে সুশ্রুতকে। যেমন প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর অবধি গণিতের যে পাঠক্রম তার পুরোটাই ভারতীয় গণিতজ্ঞদের অবদান, অথচ আমরা সাধারণভাবে তা অবহিত নই। অস্থি, সন্ধি, পেশী এবং স্নায়ু— শরীর সম্পর্কিত এই সব জ্ঞানই এসেছে সুশ্রুতের বর্ণনা থেকে। সুশ্রুত প্রদত্ত তথ্য— শরীরের মধ্যে ৩০০ প্রকার অস্থি, ২০০ প্রকার সন্ধি, ৫০০ প্রকার পেশী এবং ৯০০ প্রকার স্নায়ু আছে। আধুনিক বিজ্ঞানেও তা মোটামুটি স্বীকৃত। আকার আকৃতি এবং কার্যকারিতার বিচারে এগুলির শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছিল। সমগ্র মানব দেহকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে যে মর্মস্থলে ভাগ করা হয়েছিল, ওই স্থলগুলিকে শস্ত্র প্রয়োগের জন্য আট রকম উপায়ের কথা বলা আছে সুশ্রুত সংহিতায়। ভোঁতা ও ধারালো বিভিন্ন ধরনের শস্ত্র প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করা হত। ১৪ প্রকার 'পট্টি' (ব্যাণ্ডেজ) ব্যবহৃত হত নিরাময় প্রক্রিয়াতে। অস্ত্রোপচার যন্ত্রণাহীন ভাবে করতে অজ্ঞান করার ব্যবস্থা ছিল। যুদ্ধ বিগ্রহজনিত কারণে বা শাস্তির কারণে অঙ্গহানি হলে সেই অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা ছিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে, তার জন্য চিকিৎসা পরিকাঠামো তৈরি থাকত। এই ধরনের চিকিৎসার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সন্তান প্রসবের সময় জটিলতার উদ্ভব ঘটলে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে শিশুর জন্ম ঘটানো হত। করোটি উন্মোচন ও সংস্থাপনের মতো জটিল অস্ত্রোপচারও হত। প্রসাধনিক প্রয়োজনে চর্মসংস্কারক অস্ত্রোপচারও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বসন্ত রোগ প্রতিষেধক টিকাও আবিষ্কৃত হয়েছিল। সুশ্রুতই সর্বপ্রথম শল্য চিকিৎসার জন্য শবব্যবচ্ছেদ অপরিহার্য বলে মনে করেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতোই আয়ুর্বেদ চিকিৎসার বিভিন্ন বিভাগ ছিল। চরক কর্তৃক বিভাজিত আয়ুর্বেদ চিকিৎসার আটটি বিভাগ বা অধ্যায় ছিল। এগুলি হল সূত্রস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান, শরীরস্থান, ইন্দ্রিয়স্থান, চিকিৎসাস্থান, কারস্থান এবং সিদ্ধস্থান।

এগুলির মধ্যেই আছে এখনকার সার্জারি, এনাটমি, ফিজিওলজি, ই এন টি ইত্যাদি বিভাগ। আশ্চর্য এই, আয়ুর্বেদও নাক-কান-গলা এক বন্ধনীতেই ছিল। প্রতিটি বিজ্ঞানে চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা আছে চরক সংহিতাতে — 'রোগমাদৌ পরীক্ষেৎ ততোজন্তুরমৌষধম্ / ততঃ কর্ম ভিষক পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্বং সমাচরেৎ'।

আগে রোগ পরীক্ষা, তারপর ওষুধ ব্যবস্থা ও তদনন্তর স্বেদভেদাদি কর্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। নিজের ইচ্ছেমতো ওষুধ নয়। আর এক জায়গায় বলা আছে— 'যথাবিষং যথাশস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা / তমৌষধম্ বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাততমমৃতং যথা।'— যে ওষুধের গুণ পরিজ্ঞাত নয় তাহা বিষ শস্ত্র ও বজ্রসদৃশ ভয়ানক, কিন্তু পরিজ্ঞাত ওষুধ অমৃতসদৃশ সুফলপ্রদ। অর্থাৎ আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আয়ুর্বেদ ছিল সম্পূর্ণ

বিজ্ঞান। তবুও এতাবৎকাল আয়ুর্বেদকে অবৈজ্ঞানিক, বুজরুকি, উদ্দেশ্যমূলক ভাবে পুরোহিত তন্ত্রসম্ভূত বলে অবদমিত করে রাখা হয়েছিল প্রধানত পাশ্চাত্য এবং পাশ্চাত্যাভিমুখী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা। ১২০০ বছর ধরে অবহেলিত, অচর্চিত, গবেষণার আবহাওয়া বর্জিত থাকার পর আয়ুর্বেদ নিয়ে পুনর্ভাবনা হচ্ছে। এই পুনরুত্থানকে সার্থকতার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে হলে ভারতকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা— তার প্রয়োগনিপুণতা এবং অন্তর্নিহিত দর্শনকে বুঝতে হবে। হৃদয়ংগম করতে হবে এবং করাতে হবে। যে কল্যাণমুখী দর্শন দ্বারা সম্পৃক্ত আয়ুর্বেদ তাকে অর্থসর্বস্ব ফ্রাঙ্কেস্টাইনের হাতে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। যোগ, প্রাণায়াম, ভেষজ, জীবনচর্যার ধরন— এই সমগ্র নিয়েই সর্বপ্রকার রোগ ব্যাধি মুক্ত মানবসমাজ গঠনই আয়ুর্বেদের লক্ষ্য। ভাগ ভাগ করে ভাবলে এই লক্ষ্যর ধারণা হবে না।

সর্বজনের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য গাদা গাদা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ওষুধের ধারণা আয়ুর্বেদে প্রায় নেই। ব্যক্তি বিশেষ নির্ভর বিশ্লেষণ, অনুধাবন, ব্যক্তি বিশেষের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দেওয়া বা রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করাই আয়ুর্বেদের বৈশিষ্ট্য। আধুনিক বিজ্ঞানও অনেক অভিজ্ঞতার শেষে ব্যক্তিবিশেষের 'জিন ম্যাপিং'-এর নির্ভর বিশ্লেষণের দিকে ঝুঁকছে। সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপত্র মুনাফাসর্বস্ব বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির দাপটকে অস্বীকার করতে থাকবে।

আয়ুর্বেদ অনুযায়ী প্রাণঞ্চ স্পার্ম+ওভাম + চেতনা।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এতদিন যা ভেবে এসেছে তাতে প্রাণ ঞ্চ স্পার্ম ও ওভাম। অথচ বিজ্ঞানের সর্বশেষ প্রাপ্তি অনুযায়ী বস্তুজগতের চরমতম উপাদান হল চৈতন্য বা consciousness। যদি তাই-ই হয়, এই চেতনাকে বাদ দেওয়া যাবে কি করে! আয়ুর্বেদ শুধুই আয়ুবৃদ্ধি র জন্য আহরিত জ্ঞান নয়। যার আয়ুবৃদ্ধি ঘটবে তাকে সমগ্র সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ভূমিকা নিতে হবে আয়ুবৃদ্ধি কে সার্থক করতে। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে চৈতন্যের ধারণায়।

প্রতিটি জীবকোষই চিৎ-জড় গ্রন্থী, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের অধুনালব্ধ অভিজ্ঞতা এই চিৎকে বাদ দিতে পারছে না। এই চৈতন্য সম্পর্কিত অজ্ঞতাসহ যে আয়ুবৃদ্ধি তা সমাজকে অশান্ত ও কলুষিত করার প্রবণতাসম্পন্ন। আগেই বলা হয়েছে আয়ুর্বেদ চর্চার, সমাজসম্বন্ধে সচেতনতার কথা। আজকের পাশ্চাত্য জড়বাদী দর্শন প্রভাবিত সমাজ ও জৈবপরিমণ্ডল তাই ক্রমবর্ধমানভাবে এত বিষাক্ত, অকল্যাণকর, আত্মঘাতী হয়ে উঠছে। ভারতের সব জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চাই চৈতন্য ধারণা আশ্রয়ী ধর্মকে জড়িয়ে রেখেছে। পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যনির্ভর প্রগতিশীলদের মতে, সেটাই নাকি অযুক্তিবাদের, কুসংস্কারবদ্ধ তার, সংকীর্ণতার ধারক ও বাহক। কিন্তু এ ধারণা ভুল। যুক্তিবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার অভাব ছিল না। ভারতীয় চিন্তাবিদরা বলেছেন, —

'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।

সত্যান্বেষণে সংকীর্ণতা কোনও ভাবে প্রশ্রয়িত হয়নি, এই প্রসঙ্গে চরকের বক্তব্য স্মরণীয়—

'নচৈব হি সুতরাং আয়ুর্বেদস্য পারং। তস্মাৎ
অপ্রমত্ত শশ্বৎ অভিযোগমস্মিন গচ্ছেৎ....
কৃৎস্নোহি লোকে বুদ্ধি মতাং আচার্যঃ শত্রুশ্চ
অবুদ্ধি তাম্, এতচ্চ অভিসমীক্ষা বুদ্ধি মতা
অমিত্রস্যাপি ধন্বং যশস্যং আয়ুষ্যং লোকহিতকরং
ইতি উপদিশতো বচঃ শ্রোতব্যং অনুবিধাতব্যঞ্চ ।

অর্থাৎ — আয়ুর্বেদের শেষ নাই অতএব অপ্রমত্তা হইয়া সর্বদা ইহাতে অভিনিবেশ করিবে। .... বুদ্ধি মান ব্যক্তিগণ সকলকেই গুরু মনে করেন। কিন্তু অবুদ্ধি মান সকলকেই শত্রু ভাবেন। ইহা বুঝিয়া বুদ্ধি মান ধনকর যশস্কর আয়ুষ্কর ও লোকহিতকর উপদেশবাক্য অমিত্রের নিকটেও শুনিবেন ও অনুসরণ করিবেন।

সুতরাং আয়ুর্বেদের এই পুনর্মূল্যায়ন ভারতীয় হিসেবে আমাদের উৎসাহিত করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আয়ুর্বেদ তার প্রার্থিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিনা তা দেখার এক গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে এবং সে চ্যালেঞ্জ নিতেই হবে। আমাদের অনুসৃত এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক পন্থা পদ্ধ তির কষ্টিপাথরে পুরনো আয়ুর্বেদকে নতুনভাবে প্রত্যয়িত করতে হবে।

২০০৫ সালের জুলাই মাসে 'হেলথ্ কানাডা' এবং ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসের 'জার্নাল অফ আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (জে ও এম এ)' তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাজারজাত ৭০টি নমুনা ওষুধের মধ্যে ১৪টিতে নির্ধারিত মাপের অনেক বেশি সিসা, দস্তা, পারদ এবং আর্সেনিক পাওয়া গেছে। পি টি আই (৩০.১২.২০০৫) জানিয়েছে, নিউইয়র্কের 'ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ্ অ্যাণ্ড মেন্টাল হাইজিন' তিনটি ভারতীয় হার্বাল ওষুধ বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছে, নিষিদ্ধ করেছে ঊনঝা আয়ুর্বেদিক ফার্মেসী, বৈদ্যনাথ এবং আর্য ফার্মাসিউটিক্যাল-এর মতো ভারতীয় কোম্পানি। ঝণ্ডু, ডাবর সহ ভারতীয় কোম্পানিগুলি এই নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ জানালেও ভারতীয় কোম্পানিগুলি ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন। ভারতীয় আয়ুর্বেদিক ওষুধগুলির মান নিয়ে বিশ্বজোড়া সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় আয়ুর্বেদিক ওষুধ ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন। ২০০৪-০৫ বছরে ভারতের ভেষজ বাজরে মোট বিপণন ছিল ২২০০০ কোটি টাকা। আয়ুর্বেদিক ওষুধের বিপণন হয়েছে ১৫০০ কোটি টাকা।

গোটা ব্যাপারটা প্রতিকূল হয়েছে ২০০৩ সালে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস্ কমিশনকে দেওয়া আমেদাবাদের 'কনজিউমার এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ'-এর রিপোর্টে। ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছিল, দেশে প্রচুর পরিমাণে নিম্নমানের আয়ুর্বেদিক ওষুধে বাজার ছেয়ে গেছে। ড্রাগ কন্ট্রোলের মাধ্যমে আয়ুর্বেদ ওষুধের গুণমান যাচাইয়ের কোনও ব্যবস্থা দেশে চালু নেই। বাস্তব অবস্থার বিচারে বিশ্ববাজারে ভারতকে তার জায়গা পেতে হবে এবং তার সঙ্গে আবশ্যিক এবং বাধ্যবাধকতা হল আন্তর্জাতিক গুণমানে আনতে হবে ওষুধগুলিকে। এলোপ্যাথিক কোনও ওষুধকে ভারতের বাজারে ঢোকার আগে ড্রাগ কন্ট্রোল অফ ইণ্ডিয়ার অনুমোদন পেতে হয়। আবেদনপত্রেই থাকে ওষুধের বিশদ সব কিছু—

পরে তা যাচাইয়ের জন্য ড্রাগ ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয় কলকাতায়, সেখানের ছাড়পত্র পেলে তা যায় দিল্লীতে এবং তারপরই বাজারে ঢোকার অনুমতি। কিন্তু আয়ুর্বেদিক ওষুধের বেলায় এরকম কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং তার ফলে অর্জিত বিশ্বাসযোগ্যতা আছে কি? সত্য সব পরীক্ষাতেই সত্য। এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আয়ুর্বেদ ওষুধকে বিজ্ঞানমনস্কদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য এর মানকে স্বীকৃত হতে হবে। সেক্ষেত্রে কেবল বিদেশের বাজারে ভারতীয় ভেষজ বা ভেষজ নির্ভর ওষুধগুলিকে নিয়ে লড়াইয়ে নামা যায় (যেমন হয়েছে নিম, হলুদকে নিয়ে)। এই প্রসঙ্গে নিম যুদ্ধের একটু বিবরণ পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে।

নিম গাছের ল্যাটিন নাম Azadirachta India পার্শী, ভাষায় বর্ণিত আজাদ (স্বাধীন) দিরারখট (বৃক্ষ) ই-হিন্দ (ভারতবর্ষীয়)। রোগব্যাধি দূরীকরণে অতুলনীয় এই বৃক্ষ নিম। বনবাসের পর অযোধ্যায় ফেরা রামসীতাকে আপ্যায়ন করা হয় ঘরের দরজায় রুপোর পাত্রে ফুল ও নিমডাল দিয়ে সাজিয়ে। জাতক কাহিনীতে 'নিম'-এর উপস্থিতি দ্রষ্টব্য। চরক উল্লেখ করেছেন, সুস্থতা রক্ষায় নিমের ব্যবহার— পাতা, ফুল, বীজ, ছাল, ডাল সবই। একটি নিম গাছের উপস্থিতি একটি গ্রামীণ 'প্রাকৃতিক হাসপাতাল'-এর মতো। এই নিমের থেকে তৈরি একটি জৈব কীটনাশক উইসকিনসিনের গবেষণাগারে দশ বছর যাবৎ গবেষণার ফল, যা ১৯৮৫ সালে আমেরিকার পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র আদায় করে। ভূপালে কৃত্রিম কীটনাশক কারখানার বিপর্যয়কর দুর্ঘটনার পর এই জৈব কীটনাশকের প্রতি বিশ্বের উন্নত দেশগুলির দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং শুরু হয় 'নিম' নিয়ে সাবধানী আইনের মোড়কে এক 'জৈব দস্যুতা'। অন্য কিছু কোম্পানির সঙ্গে বহুজাতিক কর্পোরেশন W. R. Grace-ও 'নিমজাত' কীটনাশক ও ওষুধ তৈরির জন্য পেটেন্টের জন্য মেতে ওঠে। প্রতিদিন ২০ টন নিম বীজ পাবার জন্য এক বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। ওই দস্যুতার খবর মিলতেই ভারত এর বিরুদ্ধে সচেতন হয়। না ভারত সরকার নয়, ভারতীয় বিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী ডঃ বন্দনা শিবা প্রমুখ। লজ্জাজনকভাবে ভারত সরকার শুরুতে কিন্তু কোনও উল্লেখযোগ্য লড়াইয়ের অংশীদার হয়নি। ১১ বছর ধরে লড়াইয়ের পর ২০০৫ সালের ৫ মার্চ ইউরোপের পেটেন্ট অফিস বাতিল করে দিল W. R. Grace এবং আমেরিকা সরকারের কৃষি দপ্তরের এক 'নিম পেটেন্টের' অধিকার এবং এদের অভিযুক্ত করল জৈবদস্যুতায় (Biopiracy)। এই নিমযুদ্ধে হাত মিলিয়েছিল ব্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিশেষজ্ঞ, বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম বিশেষজ্ঞ অনেকেই। হলুদ সহ আরও অনেক ভারতীয় ভেষজ আক্রমণের সম্মুখীন। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ভারত সরকার কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ দেখাতে পারছে না। নিমযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারত সরকার নতুন যে পেটেন্ট আইন চালু করলেন ডব্লিউ টি ও-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) মানতে বাধ্য হয়ে এবং একদা এর বিরুদ্ধ মতের ডাঃ রঘুনাথ মাশেলকার ডিরেক্টর সি এস আই আর-এর অনুমোদন সহ, তা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। কারণ ভারতীয় গবেষণাকে ভারতীয় প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে উপযোগী করে গড়ে তোলার কথা তিনি ভাবলেন না, উন্নত দেশের আধিপত্যই মেনে নিলেন। পরিবর্তিত পেটেন্ট ব্যবস্থায় উন্নত গবেষণার পথে এগিয়ে যেতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বাজেটে দরকার তার বাস্তবায়ন কি সম্ভব হবে!

ভারতীয় মেধা তো প্রায় পুরোপুরিই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছে। শুধু বিশ্বপরিস্থিতি বুঝে প্রতিকূলতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে কিছুদিন ধরেই ভারত সরকারও সচেতন হয়েছে, তাই ভারতীয় আয়ুর্বেদিক ওষুধগুলিকে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মানে চিহ্নিত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে। এজন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Indian Council of Medical Research (ICMR), National Institute of Science Communication and Research (NISCAR), Traditional Knowledge Data Library (TKDL) এবং CSIR সহ তেরটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ সমীক্ষণ সংস্থা এবং ৩টি প্রধান আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুত সংস্থা। কাজও হচ্ছে। কাজ হয়েছে ডায়াবেটিসের জন্য মেথিকে নিয়ে, হার্টের অসুখের জন্য রসুনকে নিয়ে, সর্পগন্ধা নিয়ে, নয়নতারাকে নিয়ে ক্যান্সারের জন্য, চট্টগ্রাম-তে কাজ হয়েছে ত্রিফলাকে নিয়ে। এরকম আরও অনেক ভেষজকে নিয়ে যাদের কিছু কিছু পরিচয় শিবকালী ভট্টাচার্যের বই চিরঞ্জীবী বনৌষধিতে আমরা অনেকেই পড়েছি। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে আয়ুর্বেদিক ওষুধগুলির প্রামাণীকরণ, নথিভুক্তকরণ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামোতে আয়ুর্বেদকে সংস্থাপন— এসব প্রয়াস চলছে। তবুও সমগ্র ব্যবস্থার ব্যাপক এবং ফলপ্রসূ রূপায়ণে আন্তরিকতা, বলিষ্ঠতা এবং নিয়মানুবর্তিতার অভাব দেখা যাচ্ছে সরকারি উদ্যোগে। যেমন গুণগত মান রক্ষার জন্য আয়ুর্বেদিক ওষুধের জন্য 'দি ড্রাগ অ্যাণ্ড কসমেটিক অ্যাক্ট ১৯৪০' এবং 'দি ড্রাগ অ্যাণ্ড কসমেটিক রুলস্ ১৯৪৫ - ৩৩ই, ৩৩ ই ই, ৩৩ ই ই এ' প্রভৃতি ধারা কার্যকরীভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না, বিভিন্ন ফাঁক-ফোকর এবং তার প্রতি আমলাদের উদাসীনতার জন্য। ফলত প্রার্থিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনতা প্রকট। এর কারণ দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে থাকা এক দ্বিধাগ্রস্ততা, এক প্রত্যয়হীনতা। তাই বাজারে আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরির জন্য উপকরণের অভাব, যোগানের অভাব, সরকারি অর্থ বরাদ্দ থাকলেও বৈজ্ঞানিক ভাবে ভেষজের চাষে শৈথিল্য, সংরক্ষণে ব্যর্থতা ও অনিশ্চয়তায় গোটা পরিকাঠামোটাই পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, হচ্ছে। অথচ আয়ুর্বেদ সম্মেলন, আলোচনাচক্রে কী করলে ভাল হবে সেই নিয়ে বক্তৃতার ফুলঝুরি চলছে। তা নিয়ে সাম্মানিক ভাতা বরাদ্দের অভাব নেই।

সরকারি প্রশাসনিক শৈথিল্য, এর উপর মহলের ঔদাসীন্য আয়ুর্বেদের প্রচলনকে দূরীভূত করে চলেছে। একবার কল্যাণীতে রাষ্ট্রীয় আয়ুর্বেদ গবেষণাগার এবং State Pharmacopoccal Laboratory ঘুরে দেখলেই গোটা ব্যাপারটা অনুভূত হবে। এই জন্যই আয়ুর্বেদের ছাত্রকে ডিগ্রী (বি এ এম এস) নিয়ে এলোপ্যাথিতে চিকিৎসা করতে হয়, কোনও এক কানাগলিতে চেম্বার খুলে মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভদের সহায়তা নিয়ে, হাঁসজারু ডাক্তার হয়ে।

আয়ুর্বেদ কলেজগুলির ছাত্র অধ্যাপক গবেষক কর্তৃপক্ষ কি একটু ভাববেন? মাও সে তুঙ যখন বলেন, "Weed through the past to bringforth the New, be Ancient Serve the Present" —আমরা আপ্লুত হই। কিন্তু নিজেদের অতীত জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে ভাবব না, উদ্যোগ নিয়ে অগ্রসর হতে বা তা নিয়ে সরকারকে চাপ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবো!

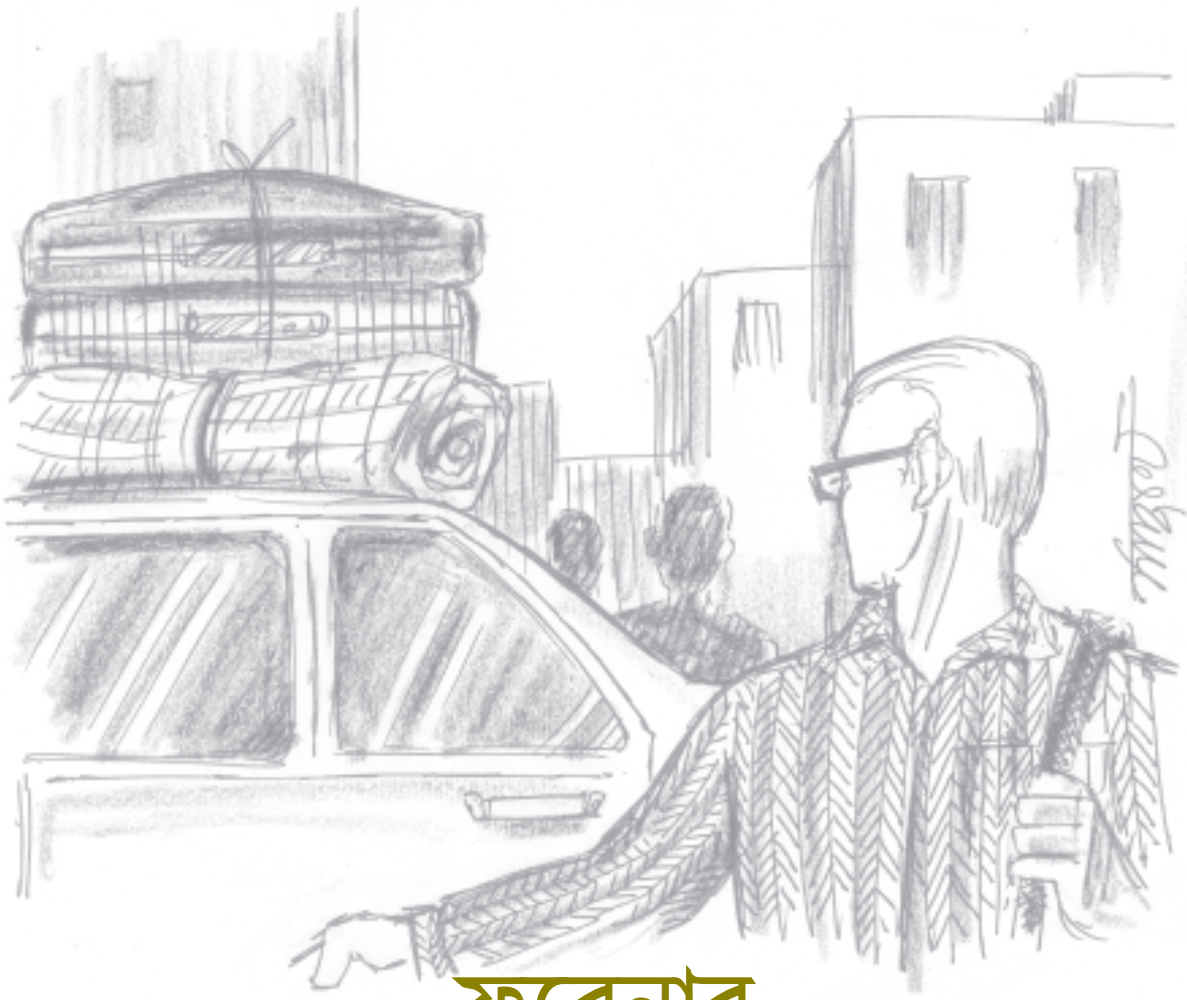

ফরেনার

এষা দে

গ্যাসের সামনে দাঁড়িয়ে রুমি। হাতে ক'টা তেজপাতা। কড়াইয়ে তেল দিয়েছে, এখনও হয়নি। পাশে রাখা পেঁয়াজ কুচি, বাটা মশলা, টমাটোর রস এবং ৪ কিলো মাংস। ছোট ভাই টুকুন রান্নাঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মারে, 'কিরে ভাইদের জন্য রান্না কতদূর? কাজের মাসি মাছ মাংস ধোওয়াধুয়ি করেছে, বাটনা বেঁটেছে, মিক্সিতে টোমাটো পিষে দিয়েছে মা। তোদের কাজ তো শুধু খুন্তি নাড়া।'

— 'তোরা ভাইরা তো তাও পারিস না। বাইরে খাওয়াতে নিয়ে যেতে হয়।'

যাদবপুরে বসু পরিবারে প্রতি বছর ভাইফোঁটায় এমন খুনসুটি চলে। সেই কবে রুমি টুকুনের বাবা জ্যেঠা-কাকা দুই পিসি সমেত ওপার বাংলা থেকে এসে এখানে বাসা করেছিলেন। কালক্রমে একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিতি। তবু অনুষ্ঠানাদিতে যৌথ পরিবারের ধাঁচা সযত্নে রক্ষিত। বাড়িতে এখন শুধু রুমির বাবা ও কাকার বাস। দুটি তলায়, আলাদা হেঁসেল। জ্যেঠা সন্তোষপুরে, পিসিরা একজন বাঘাযতীনে অন্যজন বেহালায়। কিন্তু ভাইফোঁটায় সকলের ছেলেমেয়ে একত্র। ভাইবোনেদের ডিউটি ভাগ করা। খরচ সব চাঁদা তুলে। বোনেরা ভাইদের জন্য উপহার কিনবে— প্রত্যেকের জন্য এক জিনিস, নিজের ভাইকে বেশি দেওয়া নট অ্যালাউড। এবং দুপুরে চোব্যচোষ্য রেঁধে বেড়ে খাওয়াবে। ভাইরা সবাইকে ইভনিং শোয়ে লেটেস্ট হিট ফিল্ম দেখাবে এবং রাতে ক্লাস রেস্তোরাঁয় হেঁজি পেঁজি নেহি চলেগা— ভূরিভোজ। লাঞ্চে র মেনু এবং রাঁধুনিও ফিক্সড— খাসির মাংস (রুমি), ভেটকি ফ্রাই (দিদিভাই অর্থাৎ জ্যেঠুর মেয়ে), রুই কালিয়া (বড়দি, বড় পিসির মেয়ে), চাটনি ও ফ্রায়েড রাইস (খুড়তুতো বোন টুম্পা), এবং পায়েস সকলে মিলে। আজ কেউ কাজে যায়নি। ফোঁটার পর্ব শেষ। চলছে টিভি আড্ডা এবং বোনেদের পেছনে লাগা।

ওপার বাংলার প্রথা 'প্রতিপদে দিয়া ফোঁটা দ্বিতীয়ায় নিয়া নীতা'। অতএব গতকাল বাবাদের জেনারেশনের ফোঁটা হয়ে গেছে বড় পিসির বাড়িতে। আজ বোনেদের এখানে আগমন। বৈঠকখানায় চায়ের সঙ্গে তাদের 'দ্যাশের' ভালোমন্দ স্মৃতি রোমন্থন চলছে। শ্বশুরবাড়ির প্রাক্তন ভিটেমাটির সঙ্গে পরিচয়হীন রুমির মা রান্নার তদারকিতে ব্যস্ত। হাজার হোক গিন্নি বলে কথা। ক্রি-ই-ই-ং, ক্রি-ই-ই-ং। জিতেন উঠে গিয়ে কোণে রাখা টেবিল থেকে ফোনের রিসিভারটা তোলেন। 'হ্যালো, কে সতু? ও, ঢাকা থেকে বলছিস? না? রাস্তায়! কী? কলকতায় আসছিস! কই আগে কোনও খবর দিস্‌নি তো। কেন, বিপদ আপদ কিছু— কী? না! তবে? ও। আচ্ছা।'

রুমির মাংস ছাড়া হয়ে গেছে। নেড়েচেড়ে ঢাকা দিয়ে আঁচ কমিয়ে দিয়েছে। বাইরে এসে দেখে বৈঠকখানার দরজায় মা দাঁড়িয়ে। বাবা ধীরে ধীরে বলেন, 'সতু আজ কলকাতায় আসছে। সঙ্গে মেজো মেয়ে জামাই নাতি-নাতনী। '

— 'কোথায় উঠবে? মায়ের মুখ শক্ত।

বাবা মুখ ফিরিয়ে নেন, 'কোথায় আবার, এখানেই।'

— 'কথা নেই, বার্তা নেই, ৫ জন বাড়তি লোকের খাওয়া শোওয়া থাকার বন্দোবস্ত। আমি কি ম্যাজিক জানি?'

— 'আহা, দুজন তো বাচ্চা।'

— 'তাদের তো আরও হ্যাঁপা। আগেরবার ছোট ঠাকুরপো বড় মেয়ে জামাই দুই নাতি নিয়ে এসে হাজির হয়েছিল। কী নাস্তানাবুদ হয়েছি মনে নেই? বড়রা ড্যাং ড্যাং করে 'কইলকাতা দ্যাখতে' বেরিয়ে যাবে। বাচ্চাদের আমার ঘাড়ে রেখে, আর তারা কেঁদে কেঁদে পাগল করে দেবে। কাজের লোকজন তো অতিথি দেখলেই কামাই। কোন দিক সামলাবো?

জ্যেঠামশাই রাগত মুখে বলেন, —'নন্দিতা তো ঠিকই বলেছে। কেন তুই ওদের গুষ্টিশুদ্ধু বারবার বাড়িতে তুলিস? সব দায় ওর ঘাড়ে। আগের বারই আমি বলেছিলাম, তুলিস না। এটা তোর অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে।' চায়ের কাপটা ঠেলে সরিয়ে রাখেন।

বড় পিসির একমুখ হাসি— 'আরে বাবা ক'দিনই বা থাকবে। মায়ের পেটের ভাই বলে কথা। আগের বার যখন এসেছিল আমরা কেদারবদরি গিয়েছিলাম। ভালোই হল, কতকাল পর দেখা হবে। তাঁর চা খাওয়া শেষ।

কাকা ফস করে বলেন, —'বেশ তো অতই যখন দরদ, তোমার বাড়িতেই নিয়ে তোল না।'

বড় পিসি পানের ডিবে খুলে একখিলি পান বের করছিলেন। হাত থেমে গেল। 'কী যে বলিস! নিজের বাড়ি থাকতে বোন-ভগিনীপতির বাড়ি কেউ ওঠে?' পানটা মুখে দিয়ে কচমচ করে বাঁধানো দাঁতে চিবোতে থাকেন।

—'নিজের বাড়ি মানে? এটা তার নিজের বাড়ি হয় কী করে?' আরও চটে যান জ্যেঠামশাই। —'৫৫ সালে যখন আসলাম আমার বয়স ২০ বছর। পরপর তোরা, সকলের ছোট সতু ৮। একলা সেই বয়সে কোনওক্রমে একতলায় ক'টা ঘর, মাথার ওপর ছাদ তোলা। জিতু আর দীপু টিউশনি করে পড়াশুনা চালিয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে তবেই না বাড়িয়েছে। দোতলা করেছে, বাড়ির ভোল পাল্টে ছে। আমরা ৩ ভাই মিলে তোদের বিয়ে দিয়েছি। আর শ্রীমান সত্যেন্দ্র? আমরা তার স্কুল কলেজের মাইনে গুণেছি। আর নবাবজাদা ফেল করে করে কোনওক্রমে পাসকোর্সে বি এ। কী, না মায়ের আদরের ছোট ছেলে, কম্ম শুধু খাওয়া আর শোওয়া। ধরে বেঁধে আমার বিজনেসে বসালাম। তারপর কী হল সবই তো জানিস।'

কাকা যোগ দেন—"মনে নেই, দাদার হেভি লস্ করিয়ে বাংলাদেশ লিবারেশনের পরপর 'দেশ ঘুরে আসি' বলে সেই যে গেল তো গেল।" ঠক করে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখেন।

ছোট পিসি তারিয়ে তারিয়ে চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বলেন, 'তাহলেও আর আর ডিপার্টমেন্ট এই বাড়ি ৪ ভাইয়ের নামেই করে দিয়েছিল সেটা ভুললে কি চলে।'

টুকুন এঘরে টিভিটা মিউট করে দিয়েছে। ছেলেমেয়েরা সবাই চুপ। রুমি মাংস কষতে কষতে শোনে জ্যেঠামশাইয়ের উত্তেজিত কণ্ঠ— 'তোদের মাথায় কি গোবর? তখন আমরা জানতাম ও বাংলাদেশে পার্মানেন্টলি থাকবে? এখন তো ও ওখানকার সিটিজেন, ভোট দেয়। কী করে কলকাতায় এ বাড়ির মালিকানায় ওর অংশ থাকে শুনি? তাছাড়া লিবারেশন তো স্রেফ অছিলা। গেলই তো সম্পত্তির লোভে। আমরা ৬ ভাইবোন বিধবা মাকে নিয়ে চলে এলাম। জ্যেঠামশাই জেঠিমা রয়ে গেলেন। আমাগো পোলা মাইয়া কিস্যু নাই। চৌদ্দ পুরুষের ভিটাতেই মরুম। তরা যা গিয়া। ইণ্ডিয়ায় অন্তত বংশ রক্ষা হইব। ঠাকুর্দার সব জমিজমা হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের নিয়মে —জ্যেঠামশাই তো কর্তা। আমরা তো চলে এসে বাবার ভাগ কিছুই পাইনি। আর সতু জ্যেঠাজেঠিকে ম্যানেজ করে পুষ্যিপুত্তুর হয়ে সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে সারা জীবন কাটিয়ে দিল। তার ওপরেও তোরা বলিস ওর এ বাড়িতে হক আছে? আলবৎ নেই।' এক চাপড় মারেন সেন্টার টেবিলে। কাপপ্লেট ঝনঝন করে ওঠে।

অতঃপর সত্যেন্দ্র ওরফে সতুর পক্ষে বিপক্ষে প্রবল বাদানুবাদ। দিদিদের মতে, প্রথমে তাঁরা কলকাতায় কষ্ট করলেও পরে দিব্যি এস্টাব্লিশড্ হয়েছেন আর বেচারা সতু একা পড়ে রইল ঢাকা জেলার কোন সেই গ্রামে। চাষবাস কি চাট্টিখানি কথা! তার ওপর তিন তিনটে মেয়ে। প্রত্যেককে পার করতে জমি বেচতে হয়েছে। ভাইদের লম্বা ফিরিস্তি, সে কতবার সপরিবারে এখানে কাটিয়ে গেছে। প্রত্যেক মেয়ের বিয়েতে এখান থেকে কী কী গেছে এব প্রতিদানে সে কারও বিয়েতে একগাছা সুতোও ঠেকায়নি। কাউকে কখনও বাংলাদেশে যেতে ডেকেছে? ওয়ানওয়ে ট্রাফিক চিরকাল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বড়দের রাগারাগি মানে ছোটদের অস্বস্তি। —'এই একটু ঘুরে আসি' বলে ছেলেরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মেয়েরা সচেতনভাবে রান্নায় লাগে। উচ্চগ্রামে একসঙ্গে কথা বলে।

—আমি মাংসটা প্রেসারে দিচ্ছি। দেখতো বড়দি জলটা। আরও দেব?' রুমি।

—'ফ্রাইগুলো আধভাজা করে রাখি, কী বলিস। খাওয়ার সময় আর একবার তেলে দিয়ে গরম গরম দেব।'

—'ওরে টুমা রে। তোর চাটনি হল? আমার যে কালিয়ার মাছ সাঁতলাতে দিন কাবার হয়ে যাবে।' বড়দি।

যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে— 'জ্যেঠা-কাকা-পিসিদের কাজিয়ার মধ্যে পড়ে রুমি বলে, 'আমরা কিন্তু ভেজ কিচ্ছু রাখছি না। তোমাদের অসুবিধা হবে না তো?'

অপরাধী বাবা এতক্ষণ চুপ ছিলেন। এখন তাড়াতাড়ি বলেন, —'না, না, লাগবে না। স্যালাড একটা রাখছিস তো? বেশ, ওতেই হয়ে যাবে।'

বড় পিসি জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যাঁরে জিতু, সতুরা পৌঁছাবে কখন? দুপুরে খাবে?'

— 'তা তো জিজ্ঞাসা করিনি।' বাবা যথারীতি অপ্রস্তুত।

— 'চমৎকার। তা করবে কেন। আমি তো হোটেল খুলেছি। যখন তখন ৫ জন বাড়তি লোকের খাবার রেডি। দুপুরে না হোক রাতে তো নিশ্চয়ই খাবে। ওবেলা তো কাজের লোক কেউ আসবে না। কে যোগাড় দেবে, কাটবে কুটবে রাঁধবে?'

আর এক প্রস্থ পারিবারিক কলহ। মোটমাট শেষমেষ ভাইফোঁটায় সকলে মিলে খাওয়ার আনন্দটুকু মাটি। বড়দার ফ্রন্টে, খুড়তুতো ভাই ছোটকুর সন্দেশ খাওয়ার কম্পিটিশন অন্যান্য বারের মতো জমল না। বরং রাতে বাড়তি থেকে যাবে এই হিসেব করেই যেন সবাই কম কম খেল। খাওয়ার পাট চুকলে বাড়তি মাছ তরকারি ফ্রিজে তুলতে তুলতে বিকেল। সবাই একটু বসেছে। রুমি ভাবছে চায়ের জলটা চড়িয়ে দেবে।

এমন সময় দরজার কাছে ট্যাক্সি। মেয়ে জামাই নাতি নাতনী সহ ছোট কাকার অবতরণ।

— 'আরে, হক্কলেই দ্যাখি আস। দ্যাও পাওয়ের ধূলা দ্যাও। উমারে চিনতে পারস? অসিত, জামাই। মণি আয় প্রণাম কর। দ্যাখ, হেইটা হইল আমাগো কইলকাতার বাড়ি।'

—'অ্যাতটুকু মাইয়া, কথা কয় দ্যাখ। প্রণাম কর, কতগুলান ঠাকুর্দা ঠাকুরমা। আরে কোলের পোলাটা কান্দে ক্যান? উমা, খোকারে দ্যাখ।'

— 'টায়ার্ড হইয়া গ্যাসে। ভোর থিক্যা বাসে বইস্যা।' উমার ব্যাখ্যা।

রুমি ভিতর থেকে আসতে আসতে শোনে বাবার মৃদু গলায় অভ্যর্থনা। জ্যেঠাকাকার নীরবতা, পিসিদের উচ্ছ্বাস— 'কতদিন পরে দ্যাশের ভাষা শুনলাম। আমাদের তো আর অভ্যাস নাই। ছেলেপিলেরা জানেই না। আয় আয় ভিতরে আয়।'

ট্যাক্সি ড্রাইভার দুমদাম রাস্তার মাঝখানে মাল নামিয়ে রেখে গাড়ি স্টার্ট করে দিয়েছে। টুকুন ছোটকু, ছোট পিসির ছেলেরা ছোড়দা আর বোম্মা সকলে হাত লাগায়। ডাইনিং স্পেস বৈঠকখানা জুড়ে সারি সারি ছোট বড় মাঝারি স্যুটকেস, ছোট বড় মাঝারি কিটব্যাগ, খুচরো ক্যারিব্যাগ।

— 'বোজলা অসিত, আমরা যখন রিফিউজি হইয়া আইলাম, এই বাসায় ছয়জন ভাইবোন, মা কত কষ্ট কইরা যে ছিলাম। অ্যাখন ত বেডরুম ড্রইং, ডাইনিং সব হইসে। তখন সিল খালি ক'খান দেওয়াল, মাথার উপরে ছাদ। দুইটা তক্তপোষ। মাটিতে পাত পাইতা খাওন, ঢালা বিছানায় শোওন। বাইরের উঠানে টিনের চালের কলঘর।

পঞ্চাশের দশকের নিম্নবিত্ত জীবনচর্যা রুমি টুকুনের আভাসে ইঙ্গিতে শোনা। সেটা তাদের পরিবারের অপ্রীতিকর অধ্যায়। কোনও বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া উল্লেখনীয় নয়। এদিকে ইভনিং শো-এর টিকিট কাটা। সবাইকে চা করে দেয় রুমি। অতিথিদের সামনে মিষ্টির প্লেট রাখে টুম্পা। রুমি বলে, 'ছোট কাকা উমাদি তোমরা চা খেয়ে টেয়ে বিশ্রাম কর। আমরা রেডি হতে যাচ্ছি।'

বড়দি যোগ করে, 'আমাদের একটু বেরুনোর কথা।'

— 'কই যাস?' দিদিভাই উত্তর দেয়, 'সিনেমায়।'

—'সিনেমা! কী সিনেমা রে! শাহরুখ আসে নাকি? আসে! আমরা যামু। ও ম্যাজ জ্যাঠাইমা বাবা ত থাকব। মণি আর খোকারে রাইখ্যা যাই?'

বড়দা তাড়াতাড়ি বলে, 'কিন্তু টিকিট তো পাওয়া যাবে না। হিট ফিল্ম। তার ওপর আজ ভাই ফোঁটা। সেই কবে লাইন লাগিয়ে কেটে রাখা। লাস্ট মোমেন্টে পাবে নাকি!'

বড় পিসি বলেন, 'এক কাজ কর না, এতগুলো টিকিট, দু'জন থেকে যা, পরে দেখিস। ওরা বাংলাদেশ থেকে এসেছে, এত শখ শাহরুখের ফিল্ম দেখার। ওরা দেখুক।'

বড়দি গম্ভীর। 'তা কী করে হবে? এটা আমাদের ভাইফোঁটার পাওনা।'

ছোট পিসি কুটুস করে চিমটি কাটেন। 'ভাইফোঁটা তো উমারও। ওর কি ভাই নয় এরা?'

সকলের ছোট বোম্মা মায়ের মুখের ওপর বলে বসে, 'বারে! উমাদি তো আমাদের ফোঁটা দেয়নি। প্রেজেন্ট দেয়নি, দুপুরে—'

দুই পিসির দ্বৈতকণ্ঠে ধমক, 'ছি বোম্মা ছি।' টুম্পার মন্তব্য, 'কেন, বোম্মা তো ঠিকই বলেছে।'

শেষে সকলে গেল সিনেমায়। মা বাবা বেরিয়ে যেতেই মণির বায়না, 'আমি সিনেমা দ্যাখুম। আমারে ক্যান লইয়া গ্যাল না... ক্যান?'

দিদির ক্রন্দনসিক্ত কণ্ঠে ভ্রাতার উচ্চগ্রামে যোগদান, 'মায় কই গ্যাল, মা-মা।'

—' আরে চিল্লাস ক্যান? নে আর অ্যাকটা সন্দেশ খা। কইলকাতার সন্দেশ। ঢাকায় পাবি না। ব্যাশি কইরা খা, ন্যা, হাঁ কর। আরে, তবু কান্দে। বউদি অ বউদি, অদের তোমাগো ঘরে খাটে লইয়া যাও। ঘুম আসতাসে বোধহয়। লম্বা জার্নি করসে ত।'

অতঃপর মণি ও খোকাকে সঙ্গে নিয়ে ভোলাবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে নন্দিতার শয়নকক্ষের দিকে প্রস্থান।

— 'পোলাপান, ভাবতাসে নূতন জায়গা, অচেনা মানুষ। জানে না হক্কলেই নিজের।'

অতঃপর দিদি ও দাদাদের কাছে সত্যেন্দ্র ওরফে সতুর পুরনো পাঁচালি শুরু। ওখানে তিনি কত সমস্যায় জর্জরিত, কত খারাপ আছেন। এখানে সকলে কত নিশ্চিন্ত, কত ভালো আছে। হিন্দু-মুসলমানের ঝামেলা নেই, মেয়েরা পর্যন্ত পড়াশুনা করে দিব্যি চাকরি করে, ভালো বিয়ে থা হয়েছে। আর তাঁর? তিন মেয়ের একজনও রোজগারের ধারেকাছে নেই। কোনওক্রমে গ্র্যাজুয়েট। বিয়ে দিতে তিনি ফতুর। আবার সেখানেও অশান্তি। বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে ছেলেপুলে নিয়ে অর্ধেক দিন বাপের বাড়িতে। 'আমাদের এক আধটা মেয়ে তাই ভালো মানুষ হয়েছে' মন্তব্য করে ভাইরা নীরব। দিদিরা সহানুভূতিতে গদগদ হচ্ছিলেন। এখন ছোটজনের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, 'শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার তো বড় মেয়ের ডাইভোর্স করসে না কেন? আমরা তো ও সব সহ্য করার কথা ভাবতেও পারি না।'

—'বাংলাদ্যাশে হিন্দুগ তালাক নাই, ইণ্ডিয়ায় আসে।'

বিরক্ত বড়দা প্রসঙ্গ পাল্টান, 'তোদের হঠাৎ কলকাতা আসার কারণ?'

— 'অসিত সোনারপুরে জমি কিনতাসে। বায়না দিসিল। অ্যাখন কাগজপত্রে সই করব। ১০-১৫ দিনের কমে হইব না। অ্যাকটা বাউণ্ডারি দিতে লাগব। তাই হক্কলরে লইয়া আইলাম।'

— 'ইণ্ডিয়াতে জমি কিনছে কী করে অসিত? ওর তো জন্মকর্ম সব বাংলাদেশে, ওখানকার সিটিজেন।' কাকা রীতিমতো ক্ষুব্ধ।

—'কত বাংলাদেশী কইলকাতায় নর্থ ব্যাংগলে জমি কিন্যা ঘরবাড়ি বানাইত্যাসে। তোমরা দ্যাখি কিসুই জানো না। হিন্দুগ ও দ্যাশে সিকিউরিটি নাই। অসিত বড় চতুর পোলা, কবে থিক্যা রেশন কার্ড করসিল। অ্যাখন কামে লাইগ্যা গ্যাল।'

ভাইঝি জামাইয়ের বিচক্ষণতায় দিদিরা মোহিত। দাদারা বলে যান, কলকাতায় প্রত্যেক বাড়িতেই স্থান সংকুলান। ওপরের তলায় গৃহিনী চাকুরে, দুই ছেলেমেয়ে জায়গা বা সময় কোনওটাই নেই। বড় ভাইয়ের বাড়িতে হাটের রুগি স্ত্রী, চাকুরে বৌমা, সংসার চলে অতি মেপে মেপে। আর এ বাড়িতে টুকুন তার ঘরে রাতে কম্পিউটারে কাজ করে, সেখানে কারও থাকা অসম্ভব। এদিকে রুমির শরীর ভালো নেই। ক'দিন আছে বাপের বাড়িতে, জামাইও। তার শ্বশুর শাশুড়ি অন্য ছেলের কাছে দিল্লিতে গেছেন। আজকাল সব বাড়ি আসবার পত্রে থৈ থৈ। মাটিতে ঢালা বিছানার না আছে জায়গা, না আছে লেপতোষক।

সতু সহাস্য মুখে শুনে যায়, 'অ্যাক প্রকার চালাইয়া দিমু। আমাগো অসিত বড় ভালো পোলা, জামাই আদর না হইলে কিসস্যু মাইণ্ড করব না। তাসাড়া নূতন জামাই ত নয়, দুইটা পোলার বাপ।'

টুকুন ও রুমির প্রত্যাবর্তন। 'এক্সট্রা টিকিট পাওয়া গেল না।' দুজনেই গুম। বড় পিসির ভ্রুক্ষেপ নেই। 'সিনেমার পর তোরা খেতে যাবি তো?'

টুকুন মুখ গোঁজ করে বলে, 'না, আমরা বাড়িতেই খাব। দিদির শরীর ভালো নয়, তার ওপর সারাদিন খাটাখাটনি গেছে। দু'ঘন্টায় দুবার যাদবপুর থেকে দেশপ্রিয় পার্ক যাতায়াত পোষায়?'

রুমি চুপচাপ নিজের ঘরে গিয়ে এফ এম চালিয়ে শুয়ে পড়ে। টুকুন তার ঘরে কম্পিউটারের সামনে।

ভাগ্যিস সকলের মাছ-মাংস বেঁচেছিল। নন্দিতা মণি ও খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে ভাত ডাল রেঁধে ফেলেন। বাকি ছেলেমেয়েরা সিনেমা দেখে ভেজে খেয়ে ফিরতে ফিরতে এ বাড়িতে সকলের খাওয়া শেষ। কাকা অবশ্য আগেই স্ত্রী ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠে গেছেন। জ্যেঠামশাই আর পিসিমারা শুধু পুত্রকন্যার অপেক্ষায় বসে। মণি আর খোকা একটু ঘুমিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে আবার মৃদু ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছে। মা কই গ্যাল। ছোটকাকা বলেন, 'এইত হক্কলে আইস্যা গ্যাসে। ক্যামুন শাহরুখ খানরে দ্যাখলি, উমা? কইলকাতার হল দ্যাখলা অসিত? ঢাকায় অ্যাত ক্যারমতির হল্ নাই। অরে অ মণি বাপ আইসে মা আইসে। শান্তি হইসে ত? আয়, ঠাকুর্দা ঠাকুরমাদের শুনা কত শিখসস। যাওয়ার আগে বড়দা শুইন্যা যাও।'

বড় পিসি সোৎসাহে ধরতাই দেন— 'হ্যাঁ, এইতো সোনামণি অ আ জানো তো? বলো দেখি অ এ অজগর আসছে তেড়ে....'

মাথা ঝাঁকিয়ে 'না' জানিয়ে এক নিঃশ্বাসে গড়গড় করে বলে যায় মণি, 'অজু করে নামাজ পড়/ আজান শুনে জামাও ধর/ ইলমে দ্বীন শিক্ষা কর/ ঈদের খুশি অম্লান/ উঠ উঠ মুসলমান।'

ঘর নিস্তব্ধ, ছুঁচ পড়লেও শব্দ হবে। প্রশংসার প্রত্যাশায় এর ওর মুখের দিতে চায় মণি।

উমা বলে, 'আমাগো বাংলাদ্যাশের অ আ অ্যামুনি।'

গৃহকর্ত্রী নন্দিতা এতক্ষণে অতিথির সঙ্গে কথা বলেন, 'ছোট ঠাকুরপো কিছু মনে কর না, আমাদের বাড়িতে ৫টি প্রাণীর এতদিন থাকার বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়। আজ রাতটা যেমন তেমন চালিয়ে নিচ্ছি। কাল সকালে তোমাদের অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে।'

— 'অ্যাত বড় কথাটা তুমি কইতে পারলা? বড়দা ম্যাজদা তোমরা চুপ কইরা আস! বড়দি, ছোড়দি, তোমরাও কিসু কও না। কই যামু আমরা? রাস্তায়?'

টুকুন কখন এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। আস্তে করে বলে, 'রাস্তায় কেন যাবেন ছোটকাকা! রোজ শত শত বাংলাদেশী আসে, কেউ রাস্তায় থাকে না। ধর্মতলা ওয়েলেসলি ভর্তি তাদের জন্য কত গেস্টহাউস হোটেল। সেগুলো পছন্দ না হয় তো সাউথের দিকে দেখতে পারেন। নাম ঠিকানা দিয়ে দেব।'

পরদিন সকাল। জলখাবারের পালা শেষ। বাড়ির দরজায় ট্যাক্সি। মালপত্র তুলছে টুকুন আর অসিত। উমা বাচ্চাদের নিয়ে গাড়িতে ওঠে। ছোটকাকা বাবা মা-র দিকে তাকান। 'নিজের বাড়িতে আমার জায়গা হইল না। তোমরা আমারে ফরেনার কইরা দিলা!'

রুমির মুখে এসে যায়, 'ছোটকাকা তুমি নিজেই ফরেনার হয়ে গেছ। আমরা করিনি। বাংলাদেশ যে বিদেশ সেটা বোঝনি।' বাকরুদ্ধ বাবার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে থাকে, কোনও কথা বলে না।

ভ্রান্ত পথের পথিক ডিরোজিও

ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকের বাংলার নব জাগরণ ছিল এক বৌদ্ধিক সংগ্রাম। শোষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল এই সংগ্রামের সামাজিক ভিত্তি। রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত এই চেতনার সংগ্রাম পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা, সমাজ সংস্কার আন্দোলন, রাজনৈতিক সমিতি গঠনের প্রচেষ্টা এসবের মাধ্যমে সংগ্রামের গতিধারা প্রবাহিত হয়েছিল। নব জাগরণের প্রবাহে দুটি সুস্পষ্ট চরিত্র চিহ্নিত করা যেতে পারে — একটি হল সংস্কারবাদী ও সহাবস্থানমূলক প্রবণতা, আর অন্যটি হল আত্মপরিচয় ও আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বাঙালী সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের পরিশিষ্টে সঠিকভাবেই বাংলার নবজাগরণের অন্তর্নিহিত সুরটি চয়ন করেছেন। তাঁর কথায় —

"কিন্তু প্রথমে যাহা আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল তাহাই আমাদিগকে জাগ্রত করিতেছে। প্রথম সুপ্তিভঙ্গে যে প্রখর আলোক চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয় তাহাই ক্রমশ আমাদের দৃষ্টি শক্তির সহায়তা করে। এখন আমরা সজাগ ভাবে সজ্ঞানভাবে নিজেদের দেশের আদর্শকে উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজের দেশের গৌরবকে বৃহৎ ভাবে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি।"

উনিশ শতকের বাংলার বৌদ্ধিক সংগ্রাম যা নবজাগরণ নামে পরিচিত তার মূল সূত্র ছিল ঐতিহ্য ও আধুনিকতা। ভারতীয়ত্বকে নস্যাৎ করে নয়, ভারতীয়ত্বের আধারে আধুনিকতার আবাহন ছিল এই সংগ্রামের মর্মকথা। ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায় থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক প্রবাহ দেখা যায়। কিন্তু হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এই ধারার প্রতিনিধি ছিলেন না;ঝড়ের পাখি নামে কথিত, ডিরোজিও ছিলেন এক ভ্রান্ত পথের পথিক। পাশ্চাত্যকরণের উগ্র অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে তিনি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির মূল স্রোত থেকে নিজেকে বিচ্যুত করেছিলেন। তাই তিনি ছিলেন ত্রিশঙ্কু, হঠাৎ আলোর ঝলকানি ব্যর্থতার গহ্বরে পতিত হয়েছিল।

ডিরোজিওর দ্বিশতবর্ষ জন্মপূর্তি উপলক্ষে বাংলার নবজাগরণে ডিরোজিও-র ভূমিকার বাস্তবসম্মত মূল্যায়ণ হওয়া জরুরী।

কিন্তু কেন তাঁকে ভ্রান্ত পথের পথিক বলছি? এর উত্তর খুঁজতে হবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে-র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। ঐ সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সর্বভারতীয় চরিত্র ধারণ করে। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির চাপে ভারতীয় অর্থনীতি এক পরগাছা ঔপনিবেশিক চরিত্র ধারণ করে। এর সঙ্গে শুরু হল সাংস্কৃতিক আধিপত্য।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে সুপুষ্ট করার জন্য দেশজ ঐতিহ্যকে দেশীয় অর্থনীতির মতো অপহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। খ্রিষ্টান ধর্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর সুকৌশলে আঘাত হানল। উদারনৈতিক সংস্কারবাদের মুখোশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আধিপত্যবাদ আরোপিত হল। হিন্দু কলেজ নামে হিন্দু হলেও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ (hegemony)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তিরূপে গড়ে উঠল। উল্লেখ্য, হিন্দু কলেজ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কলেজ নামেও পরিচিত ছিল। ইংরেজি শিক্ষা পাশ্চাত্যকরণ ও উগ্রসংস্কারবাদী রণকৌশলের হাতিয়ারে পরিণত হল। মেকলে সম্প্রদায় নামে পরিচিত জাতি ও জন্মসূত্রে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্য বিরোধী ভাবধারা সঞ্চারিত করল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই পাশ্চাত্যপন্থী উগ্র সংস্কারবাদী আধুনিকীকরণের প্রতিবিম্ব ছিলেন হিন্দু কলেজের

তরুণ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১)। মাত্র সতের বছর বয়সে চতুর্থ শিক্ষক হিসেবে হিন্দু কলেজ যোগদান করেন। শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা এই দুই পেশার মাধ্যমে ডিরোজিও তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের মধ্যে তিনি অসাধারণ প্রভাব ফেলেছিলেন। এই প্রভাবের দুটি দিক ডিরোজিওর জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ হয়ে উঠেছিল। একদিকে ছিল ইতিবাচক প্রভাব — তরুণ ছাত্রদের সবুজ মনে তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও যুক্তিবাদী মুক্ত চিন্তার আলোক সঞ্চারিত করলেন। লক, হিউম, রুশো, টম পেইন এর ভাবধারা ছাত্রদের সামনে এক নতুন জগতের দ্বার উন্মোচন করল। কিন্তু নেতিবাচক প্রভাব ছিল খুবই বেদনাদায়ক। দেশজ ঐতিহ্য সংস্কৃতির প্রতি অবমাননাই নয়, প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান নস্যাৎ করে ফেলার উগ্র উন্মাদনা ডিরোজিওর শিষ্যদের গ্রাস করে ফেলেছিল। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, কারণ ডিরোজিও সম্পর্কে কেউ কেউ তাঁকে যুগাবতার বানিয়েছেন, আবার কেউ কেউ তাঁকে ভারত বিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের খলনায়ক।

এক পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি পরিবারের সন্তান ডিরোজিও ১৮ বছর বয়সে (১৮২৭ খ্রীঃ) হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। হিন্দু কলেজে তাঁর শিক্ষক হিসাবে যোগদানকে সমকালীন মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র একটি যুগান্তকারী ঘটনা (''a new era in the annals of the college'') বলে অভিহিত করেছেন। শিক্ষক হিসাবে ডিরোজিওর সাফল্যকে লঘু করে দেখা উচিত নয়। কারণ তিনি শিক্ষাদানের মাধ্যমে ছাত্রদের মনে জ্ঞানস্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন "He felt it his duty as such to teach not only words but things to touch, not only the head but the heart." ডিরোজিও'র ছাত্রগোষ্ঠীকে নব্যবঙ্গ (Young Bengal) বলা হয়ে থাকে। এরা আবার ডিরোজিয়ানস্ নামেও পরিচিত। শিক্ষক ডিরোজিও-র বয়স ছিল ২১ বছর (১৮৩০ খ্রীঃ) আর তাঁর অনুগামী ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাম গোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক-এর বয়েস ছিল ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে।

ডিরোজিও কলেজের গন্ডীর মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। কলেজের বাইরে একটি বিতর্ক সভা গঠন করেন যা অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে পরিচিত। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর চারজন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই সভার সাপ্তাহিক বৈঠকে সক্রিয় অংশ নিতেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এমনকী রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে আলোচনা তর্ক-বিতর্ক চলত। তারুণ্যের উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা হিন্দুদের ধর্মসভা ও রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ কারোরই পছন্দ হয়নি। প্রসন্ন কুমারের রিফর্মার, মিশনারীদের সমাচার দর্পণ, ইন্ডিয়া গেজেট প্রভৃতি পত্রিকায় নব্যবঙ্গ দলের উগ্রতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল।

কিন্তু তারুণ্যের আতিশয্যে ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রগোষ্ঠী ভারসাম্য রাখতে পারলেন না। ডিরোজিওর মতামত ও প্রভাব হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। অভিযোগ— ধর্মনীতিহীন বিজাতীয় শিক্ষার ফলেই তরুণ সমাজের নৈতিক অবনমন ঘটেছে। অভিভাবকদের সমালোচনায় কিছু কলেজ কর্তৃপক্ষ ডিরোজিও-র বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন। ২৫ এপ্রিল ১৮৩১ ডিরোজিও পদত্যাগ করলেন। এর আটমাস পরে ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১-এ মাত্র সাড়ে বাইশ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। ডিরোজিওর ভাবশিষ্য নব্যবঙ্গ সম্প্রদায় বিভিন্ন মুখপত্রের মাধ্যমে তাঁদের ধ্যান ধারণা ব্যক্ত করতে লাগলেন। এইসব পত্র পত্রিকার মধ্যে The Enquirer, The East Indian, Parth nan উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বাংলা সাপ্তাহিক পত্র জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশ করেন। জ্ঞানের আলোক সঞ্চার করে অসত্য ও কুসংস্কারের তিমির বিনাশ করা ছিল নব্যবঙ্গের ঘোষিত উদ্দেশ্য।

বিনয় ঘোষ প্রমুখ লেখকেরা নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে ইয়ং বেঙ্গল-এর আবির্ভাব বাংলার সমাজ জীবনে এক ''যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা''। আলেকজান্ডার ডাফ নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী ডিরোজিওর ভাবধারা থেকে সরে আসেন। তারুণ্যের উদ্দীপনা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে পড়ে। নব্যবঙ্গের প্রজন্ম ক্রমশ স্থির আত্মমগ্ন স্তরে উত্তীর্ণ হন।

একটি বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। ডিরোজিও কি হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তুলে খ্রীস্টধর্মের প্রসারে সহায়তা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ডিরোজিও বেকন, হিউম, টম পেইন প্রমুখের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। টম পেইন ঈশ্বরমুখী চিন্তাধারাকে বর্জন করে মানবমুখী যুক্তিবাদী ধারণার পক্ষপাতী ছিলেন। টম পেইন রচিত Rights of Man ও The Age of Reason গ্রন্থ দুটিকে খোলাখুলিভাবে খৃষ্টধর্ম বিরোধী বলে মন্তব্য করেছিলেন," প্রসঙ্গত বলা যায়, ডিরোজিও যে কোনও ধর্মীয় অনুশাসনের বিরোধী ছিলেন। তবে নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর হিন্দু আচার-আচরণ বিরোধিতাকে কাজে লাগিয়ে ডিরোজিও-র প্রয়াণের পর আলেকজান্ডার ডাফের নেতৃত্বে খৃষ্টান পাদরিরা তরুণ প্রজন্মকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে সচেষ্ট হন। মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন।

১৮৩০-এর দশক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর নাস্তিক্যবাচক মনোভাব ফিকে হতে শুরু করে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চালনে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে। এরপর ১৮৬০ সালের পর জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ আরও প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। প্রবীণ ব্রাহ্ম নেতা রাজনারায়ণ বসু 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' স্থাপন করেন (১৮৬৬ খৃঃ)। মাতৃভাষায় শিক্ষার, দেশজ আচার-আচরণ ও উৎসব আয়োজনে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়। ১৮৬৭ সালে হিন্দু মেলার সূচনা হয়। এই মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "এই মেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। একদিনে কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎ কর্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে।" জাতীয় আত্মপরিচয়ের সন্ধানে হিন্দু মেলার আদর্শ অনুসরণ করেই ইন্ডিয়ান লীগ ও ভারত সভার আত্মপ্রকাশ ঘটে। আত্মপরিচয়ের আধারে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকা

স্বাদেশিকতার প্রতিবিম্ব ছিল। তাই ১৮৭২ খেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত দশককে বাংলার চেতনার ইতিহাসে বঙ্গদর্শনের যুগ বলা চলে। বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীকে "জননী জন্মভূমি এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকা রূপিনী"র সঙ্গে পরিচয় ঘটালেন। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত কবিবর মাইকেল মধুসূদন স্বদেশ চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে 'শ্রী মধুসূদনে রূপান্তরিত হলেন এবং বিদেশী ভাবনার দংশনে জর্জরিত হয়ে "কপোতাক্ষ কূলে" ফিরে আসার আর্তি জানালেন। ১৮৭০র দশকে বাঙালী মানসের আত্মানুসন্ধানের বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর স্মৃতি কথায় লিখলেন —

"The years 1875-1878 saw the fifth of our new Nationalism. This new Nationalism had its origin in a renaisance in Bengali literature by our contact with modern European thought .... Bankim Chandra was, in a special sense, the prophet at this renaisance'' (Memories of my life and Times, পৃঃ ২২৬-২৭)

নেতিবাচক পাশ্চাত্যকরণ ও নাস্তিকতার উপর ডিরোজিও যে চেতনার জগৎ গড়ে তুলেছিলেন তা কালের বিচারে ব্যর্থ ও অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হয়। এক কৃত্রিম নকল নবিশ পরগাছা চেতনার ঘেরাটোপে জাতীয় জীবনের সাবলীল বিকাশ সম্ভব নয়। এখানেই ডিরোজিও-র ঐতিহাসিক ব্যর্থতা উনিশ শতকের শেষে ফলিত বেদান্তর উদগাতা স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় জীবনে ধর্মকে প্রাণবায়ু বলে অভিহিত করেছেন। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ না করে ধর্মের আধারে নব-ভারত গঠনের প্রয়োজনীয়তা তিনি তুলে ধরেছেন। "ভারতের ভবিষ্যৎ" বক্তৃতায় বিবেকানন্দ দ্বিধাহীন ভাবে বলেছিলেন "আমাদের ধর্মই আমাদের তেজ, বীর্য, এমনকি জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি। তোমরা এই ধর্মবন্ধনে চির আবদ্ধ। যদি ধর্ম পরিত্যাগ কর, তবে তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।" আসলে ধর্মবোধ বলতে এখানে কোনও সংকীর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে বোঝানো হয়নি। ধর্মবোধ নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সমার্থক। স্বাধীনতার পর ঐতিহ্য ও স্বদেশ চেতনাকে উপেক্ষার ফলে আজ জাতীয় জীবনকে ভারাক্রান্ত ও অস্থির করে তুলেছে। আজও ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় একান্ত জরুরী।

মাদ্রাসা শিক্ষা
ফজলুল হক থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

মসলমান সমাজে মুক্তচিন্তা মুক্তবুদ্ধির লোক খোঁজা খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার সামিল। সে বিচারে কিছুকাল পূর্ব একটি খবরের কাগজে প্রকাশিত ডাঃ এম এ সফিউল্লার 'মাদ্রাসা শিক্ষা ও মুসলমান' শীর্ষক পত্রখানা এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। চিঠিখানায় স্বসমাজের অবক্ষয় ও অধঃপতনের একজন খাঁটি সমাজদরদীর ব্যথিত অন্তরের বেদনাই প্রকাশ পেয়েছে এবং সুচিকিৎসকের মতো তিনি তার কারণও নির্ণয় করেছেন। কিন্তু এসবই মনে হয় অরণ্যে রোদন। কারণ অদ্যাবধি ডাঃ সফিউল্লার বক্তব্যের সমর্থনে মুসলমান পাঠকদের পক্ষ থেকে একটি চিঠিও প্রকাশিত হয়নি।

না হওয়াই স্বাভাবিক। যে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির আড়ালে মুসলমান সমাজকে ধর্মাশ্রিত রাজনীতির বেড়াজালে বেঁধে ফেলা হয়েছে, তার থেকে তাদের বেরিয়ে আসা কষ্টসাধ্য। নিজেদের সমাজে এবং হিন্দুত্ববিরোধী মেকি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির মধ্যে মুসলিম হিতৈষীদের সংখ্যা এত বেশি বেড়েছে যে তাদের দোয়ায় মুসলমান সমাজে অশিক্ষা-কুশিক্ষার বান ডেকেছে। মুখে মুসলমানদের উন্নতির কথা বললেও এরা মনেপ্রাণে চায় মুসলমানরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে থাকুক। মেয়েরা বোরখার আড়ালে মুখ ঢাকুক, ছেলেরা বেকার, মস্তান ও সমাজবিরোধীতে পরিণত হোক, সমাজে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ুক, ফুটপাথ রাস্তার ধার ও রেলপথের পাশে নরকজীবন যাপন করুক— তবে ভোটটা আমাদের বাক্সে পড়ুক। তাহলেই তাদের তৃপ্তি। মুসলিম ধর্মীয় ও সমাজনেতারা এই মেকি ধর্মনিরপেক্ষীদের ফাঁদে পড়েছেন এবং ব্যক্তিগত লাভের বিনিময়ে সমাজকে পেছন দিকে ঠেলে রাখার কাজে এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।

মাদ্রাসা শিক্ষার অসারতা সম্পর্কে ডাঃ সফিউল্লা অনেক যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন। কিন্তু শোনে কে? যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী ও যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ মনীষী রেজাউল করীম সাহেব অধুনালুপ্ত 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৪২ সালের মাঘ মাসে 'মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রণালী' শীর্ষক প্রবন্ধে যে সমস্ত যুক্তি তর্কের অবতারণা করেছিলেন, আজও তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক-বিতর্কের প্রেক্ষিতে রেজাউল করীম সাহেবের প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল—

"মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রণালী"

— রেজাউল করীম, এম-এ, বি এল

বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য যে অত্যন্ত বিড়ম্বিত, তাহাদের ভবিষ্যৎ যে ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, তাহা চারিদিকের অবস্থা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে। এক দল নেতা তাহাদিগকে প্রগতিশীল সকলবিধ কর্মপদ্ধতি হইতে নিয়ত প্রতিনিবৃত্ত করিতেছেন। এইসব নেতার প্রচারের ফলে মুসলমান আজ জাতীয় আন্দোলনে পশ্চাৎপদ, রাজনীতিতে অনগ্রসর এবং নারী প্রগতির সকল কর্মধারায় পরাঙ্মুখ। হিন্দুরা যেখানে স্বরাজ ও স্বাধীনতার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত, আমাদের সমাজ সেখানে চাকরির উমেদারি করিবার জন্য লালায়িত। তারপর আর একটা অভিনব উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে তাহাদিগের শিক্ষাসমস্যা লইয়া। এই বিষয়ে আমাদের তথাকথিত নেতারা যে পন্থা অবলম্বন করিতে সমাজকে উপদেশ দিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল। ইহাতে সাধারণভাবে সমাজের জন্য উচ্চশিক্ষার পথ যে একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহা বুঝিবার মতো দূরদৃষ্টি নেতাদের নাই। আর বুঝিবেনই বা কী করিয়া? নিজ নিজ সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়বর্গের জন্য তো এ ব্যবস্থা নয় যে সহজেই ভ্রম দূর হইয়া যাইবে— এ ব্যবস্থা হইতেছে আপামর সাধারণ মুসলমানদের জন্য। সাধারণের জন্য এক শ্রেণীর শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া আর নিজ নিজ সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়বর্গের জন্য উচ্চশিক্ষার সহজ পথটি সংরক্ষিত রাখিয়া আমাদের নেতারা এই যে সমাজের মধ্যে শিক্ষার বিভিন্নতা সৃষ্টি করিতেছেন, ইহাতে কিছুদিন নেতাদের সন্তানাদির চাকরি-বাকরির পথ সুগম হইতে পারে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সমগ্র সমাজকে জ্ঞানগরিমা ও শিক্ষা বিষয়ে দেউলিয়া না করিয়া ছাড়িবে না। আমি জোর গলায় বলিতে পারি, মক্তব-মাদ্রাসায় কি শিক্ষা দেওয়া হয়, সে বিষয়ে আমাদের নেতারা কোনও সংবাদই রাখেন না। যদি তাঁহারা তাহা স্বচক্ষে দেখিতেন, তবে বুঝিতেন, সেখানে যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সমাজের পক্ষে পর্যাপ্ত তো নহেই বরং ধ্বংসকর। তাঁহারা দেখিতেছেন, যখন হিন্দুরা উহার বিরোধিতা করিতেছে, তখন নিশ্চয় উহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। এইরূপ রেষারেষি ও জেদাজেদির বশীভূত হইয়া নেতারা সারা সমাজটার ক্ষতি করিতে বসিয়াছেন।

মুসলমানদের জন্য বিশেষ শিক্ষানিকেতন ও বিশেষ পাঠ্যব্যবস্থার ওকালতি করিয়া এবং অবশেষে তাহাই সমাজকে গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়া আমাদের নেতারা মুসলমান সমাজের যে সর্বনাশ সাধান করিতেছেন, তাহার জ্বালা সমাজ অচিরেই অনুভব করিবে। দেশে মক্তব-মাদ্রাসা ব্যাপকভাবে প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ হইতে উচ্চশিক্ষা একেবারেই উঠিয়া যাইবে— জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন সাহিত্য প্রভৃতির প্রতি তাহারা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবে এবং সমগ্র সমাজে গোঁড়ামি, ভণ্ডামি ও অন্ধসংস্কারের প্রাবল্য বাড়িয়া যাইবে। হিন্দুরা বাধা দিতেছে, এই অজুহাতে যদি একটা অপদার্থ বিষয়কে সমর্থন করিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা মূর্খতা ও আত্মঘাতী কার্য আর কিছুই হইতে পারে না। অনেকে এই কারণে ইহাকে সমর্থন করেন তাই এই প্রথার অন্তর্নিহিত দোষগুণের বিচার করিবার মতো ধৈর্য তাঁহাদের নাই। যখন বলা হয়, মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষাপদ্ধতিতে 'দীন-দুনিয়া', ধর্ম ও সংসার সবই একাধারে পাওয়া যাইবে, তখন তাঁহারা বিনা বাক্য ব্যয়ে ইহাকে সমর্থন করিতে অগ্রসর হন। তাঁহাদিগকে সানুনয়ে অনুরোধ করি ইহার ভিতরে কি আছে, না-আছে তাহা দেখিবার জন্য একটু চেষ্টা করুন— সংস্কারমুক্ত হইয়া দেখিলে বুঝিবেন, ইহা একেবারেই অন্তঃসারশূন্য।

মক্তব-মাদ্রাসাগুলিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য সম্প্রতি মৌলবী এ কে ফজলুল হক সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহা যেমন ছেলেমানুষী তেমনই ভয়ঙ্কর। মক্তব-মাদ্রাসায় পড়াইতে না পারিলে লোকেরা ছেলেদের মূর্খ রাখিবে, তবুও সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িতে দিবে না, অতএব তাহাই প্রচলিত রাখিতে হইবে!— কি চমৎকার যুক্তি, উপযুক্ত নেতার মতো যুক্তি বটে। লোকের ধর্মান্ধতার অনলে এই ভাবে ইন্ধন যোগাইতে না পারিলে দীর্ঘকাল ধরিয়া সমাজের নেতা হওয়া যায়! কিন্তু সমাজের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার করা যেসব নেতার কর্তব্য, তাঁহাদের মুখে এমন উক্তি শোভা পায় না। মক্তব-মাদ্রাসায় যেরূপ কুশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষাবিদ নেতার ঠিক উল্টা কথাই বলা উচিত। বরং সমাজ আরও কিছুকাল অশিক্ষিত থাকুক সেও ভাল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যেন কিছুতেই মক্তব-মাদ্রাসার প্রচলন না হয়। বহু বৎসর পূর্বে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের সময় মৌলবী-মোল্লারা তো জোর গলায় বলিয়াছিলেন যে, সমাজ মূর্খ থাকিবে, তবুও ইংরেজী শিখিবে না। কিন্তু সে অহঙ্কার বেশিদিন থাকে নাই। সমাজকে ইংরেজী শিখিতে হইয়াছে, এবং মৌলবী-মোল্লার সন্তান-সন্ততিরাও ইংরেজী শিখিয়াছে, অথচ তাহারা কেহই কাফের বা খৃষ্টান হইয়া যায় নাই। তারপর কিছুদিন প্রবলভাবেই ইংরেজী শিক্ষা চলিতে থাকে। ইংরেজীর প্রভাবে মুসলমানরা ধীরে ধীরে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিল। সমাজের চারিদিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইল। হিন্দুরা পূর্ব হইতেই সাধারণ বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথম প্রথম তাহার প্রভাবে সামান্য এক-আধটু কুফল দেখা দিলেও কিন্তু শেষপর্যন্ত তাহাতে হিন্দুদের উপকারই হইয়াছিল। বিশেষত বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে তাহারা বেশ অগ্রসর হইয়া উঠিল। মুসলমানদের বেলায়ও কিছুদিন সাধারণ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পর বুঝা গেল যে তাহারাও যদি এই শিক্ষা পাইতে থাকে, তবে তাহাদের মধ্যেও অচিরে চেতনার সঞ্চার হইবে।

কিন্তু হঠাৎ কাহার প্ররোচনায় জানি না, মুসলমানদের মনের গতি অন্য দিকে ঘুরিতে লাগিল। প্রথম প্রথম যে সরকার বাহাদুর এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহারাও কি জানি কেন মুসলমানদের জন্য মক্তব-মাদ্রাসার প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। এই জন্য তাঁহাদের বাছাই বাছাই কতকগুলি লোক নিযুক্ত হইল। সরকারের নিযুক্ত লোকের দ্বারা কোন বিষয়ে তদন্ত করিলে তাহার যে পরিণাম হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। এইসব মনোনীত লোক সরকার যাহা করিতে চাহেন তাহাতেই সমাজের নামে এবং নিজেদের স্বাধীন চিন্তার নামে অনুমতি দিয়া থাকেন। এই প্রকারে মক্তব-মাদ্রাসার উৎপত্তি হইল— সে অনেক দিনের কথা। বলা হইল, মুসলমানরাই ইহার উদ্ভাবনকর্তা এবং মুসলমানদেরই ইচ্ছানুযায়ী সরকার ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু ভিতরের ব্যাপার তাহা নহে। কোন শ্রেণীর ধুরন্ধর এইসব মক্তব-মাদ্রাসাতে সায় দিলেন তাহা কেহই ভাবিয়া দেখিল না। বস্তুত ইহা তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় ও নির্দেশমতোই হইয়াছে। এই শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এই প্রলোভন দেওয়া হইল যে, ইহার দ্বারা সমাজ কোরান হাদীস ও শারাশরিয়ৎ শিখিতে পাইবে। তারপর নানা ভাবে ইহার স্বপক্ষে প্রচারকার্য চলিতে লাগিল। পশ্চিমবঙ্গে মক্তব-মাদ্রাসা ততটা ব্যাপক না হইলেও অনতিবিলম্বে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র ইহা সংক্রামিত হইয়া পড়িল। ইহা ব্যাপক হইবার আর একটা কারণ, সরকার মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষাকে প্রবেশিকার মতো মর্যাদা দিলেন। অথচ প্রবেশিকার মতো উচ্চশিক্ষা ইহাতে মোটেই হয় না। এই ভাবে কিছুদিন বেশ চলিল, তারপর মোমিন কমিটি মাদ্রাসা পদ্ধতিকে চিরস্থায়ী রূপ প্রদান করিলেন। মোমিন কমিটির শেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে মাদ্রাসাগুলি নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও মধ্যযুগীয় আদর্শ প্রাপ্ত হইল।

একটা প্রশ্ন উঠিত পারে, এই নিকৃষ্ট পদ্ধতির প্রতি সরকারের আসক্তির কারণ কি? উত্তর অতি সহজ। সরকার এদেশের শিক্ষা পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার পূর্ণ অধিকার নিজহস্তে রাখিতে চান। নানা কারণে, বিশেষত হিন্দুদের সতর্কতার কারণে, সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব চালাইতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কি মুসলমানদের শিক্ষা পদ্ধতিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে রাখিতে ছাড়িবেন? তাঁহারা যে মুসলমানদের সর্ববিষয়ে মা-বাপ, বিশেষত ধর্মশিক্ষার নামে মুসলমানরা যখন সেই কর্তৃত্ব সরকারের হাতে একেবারেই ছাড়িয়া দিতে চায়। ব্যাপক ভাবে সাধারণ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিয়া হিন্দু যুবকগণ যেরূপ বেপরোয়া হইয়া উঠিতেছে, তাহা দেখিয়াও কি সরকার শিক্ষালাভ করিবেন না? সুতরাং অর্থ দিয়া, মোটা মোটা পদ সৃষ্টি করিয়া, এইসব নিকৃষ্ট শ্রেণীর মক্তব-মাদ্রাসার প্রসারে সাহায্য করা হইতে লাগিল। সাধারণ বিদ্যালয় অপেক্ষা মক্তব-মাদ্রাসাকে সরকার যে অধিক সাহায্য করেন তাহার মূলে অনেক রহস্য আছে— তাহা মাননীয় নেতাদের ভেদ করিবার যোগ্যতা নাই।

মৌলবী ফজলুল হক সাহেবের যুক্তি দেখিয়া বাস্তবিকই হাসি পায়। হক সাহেব ভুল কথা বলিয়াছেন। মক্তব না থাকিলে মুসলমান মূর্খ থাকিবে না, কিন্তু থাকিলে সমাজ কুশিক্ষা ও নিকৃষ্ট ধরনের শিক্ষা পাইবে, ফলে তাহাদের অন্ধ গোঁড়ামি বাড়িয়া যাইবে। ধোঁকায় পড়িয়া এইসব নেতা নিজেরা মক্তব চান, অথচ তাহাই সমাজের নামে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যেখানে মক্তব নাই, সেখানে কি সাধারণ বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র পড়ে না? গরিবের ছেলেরাও সেসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতেছে। আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, হক

সাহেব, খানবাহাদুর মোমিন সাহেব প্রমুখ মহাভাগ নেতাদের ছেলেরা ও আত্মীয়েরা কোথায় লেখাপড়া শেখে? সমাজের দরিদ্র ছেলেরাও যদি সেইখানে লেখাপড়া শেখে তবে কি এমন ক্ষতি হইবে? আমাদের নেতাদের বাড়ির ছেলেপুলেরা কেহই মক্তব-মাদ্রাসায় পড়ে না, তবে সমাজের জন্য মক্তবের প্রতি এত টান কেন দেখানো হইতেছে? তাই তাঁহাদের বলি সরকারি চাল ভেদ করিয়া একটু ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করুন, দেখিবেন, মক্তব-মাদ্রাসায় শিক্ষার ফল সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

আমি নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি— মক্তব-মাদ্রাসায় শিক্ষা কিছুই হয় না। দেখা গিয়াছে, এক কোরান শরীফ পড়িতে অনেকের তিন-চার বৎসর লাগিয়াছে, অথচ সে ছেলে না জানে লিখিতে, না জানে অঙ্ক কষিতে। এইভাবে কত ছাত্রের মাথা খাওয়া হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। তিন-চার বৎসর পড়ার পর যদি কোনও ছেলে সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িতে আসে তবে তাহাকে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি করা ব্যতীত উপায় থাকে না। কারণ সে কোরান পড়া অথবা উর্দুর দু-এক পাতা ব্যতীত অন্য কিছুই শেখে নাই। ধর্মশিক্ষার নামে সমাজের ছেলেদের প্রথম জীবনের এই মূল্যবান বৎসরগুলি নষ্ট হইতে দেওয়া ঘোরতর অন্যায়। হক সাহেব ও মোমিন সাহেব সেদিকে লক্ষ্য রাখেন না। শুনা যায়, নিউ স্কীম সিনিয়ার মাদ্রাসাগুলি প্রবেশিকা পরীক্ষার মর্যাদাপ্রাপ্ত। সরকারি নথিপত্রে সমপর্যায়ভুক্ত হইতে পারে, কিন্তু যোগ্যতার দিক হইতে উভয় পদ্ধতির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একটি সিনিয়র মাদ্রাসা উত্তীর্ণ ছেলের সহিত প্রবেশিকা উত্তীর্ণ ছেলের তুলনা করিলে এই পার্থক্য বুঝা যাইবে। একটি দুইটি নয়, আমি কয়েক ডজন ছেলেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ ছেলে মাদ্রাসা-পাস ছেলে অপেক্ষা অধিক জ্ঞানশালী। আর একটা কথা ভাবিয়া দেখুন— একটি ছোট শিশুর উপর যদি কয়েকটি ভাষার চাপ দেওয়া যায় তবে সে তাহা কিরূপে সহ্য করিবে? বাংলা, উর্দু, আরবী, ইংরেজী, আবার কোথাও কোথাও তৎসহ ফারসী— এইসব ভাষার সমুদ্র বাঙালী মুসলমানকে ডিঙাইতে হইবে! আমরা বাংলা দেশে কোন দুর্ভাগ্য লইয়া জন্মিয়াছি তাহা জানি না, কিন্তু আমাদের গুণধর নেতাদের কল্যাণে আমাদের এইসব প্রকৃতিবিরুদ্ধ বিষয় আয়ত্ত করিতেই হইবে। বস্তুত মাদ্রাসার শিক্ষার ফলে আমাদের ছেলেরা না-শেখে বাংলা, না-শেখে আরবী, না-শেখে বিজ্ঞান ও শিল্প— সব কিছুরই মিশ্রণে তাহারা হইয়া পড়ে একটা জগা-খিচুড়ি।

তাই আমরা করজোড়ে ফজলুল হক সাহেবদের অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন এবিষয়ে আর অগ্রসর না হন। বরং প্রচলিত সাধারণ বিদ্যালয়ের যাহাতে উন্নতি হয় তাহারই চেষ্টা করুন। সেই শিক্ষাকে একটু উন্নত প্রণালীর করিয়া লইলেই আপাতত যথেষ্ট। আমূল শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাহা না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষাপ্রণালীতে ছেলেরা শিক্ষা পাইতে থাকুক— মক্তব-মাদ্রাসার কোনও দরকার নাই।"

সুতরাং অতীতে মুসলমান সমাজ যেমন রেজাউল করিমের কথায় কান দেয়নি, বর্তমানেও তারা ডাঃ সফিউল্লার বক্তব্যে কর্ণপাত করবে না সেকথা নিশ্চিত।

সর্বশেষ খবর— সংখ্যালঘু উন্নয়নে আরও মাদ্রাসা রাজ্যে।

"রাজ্যে আরও ৩০০টি নতুন মাদ্রাসা গড়ছে রাজ্য সরকার। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্র ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এপ্রসঙ্গে রাজ্যের মাদ্রাসা ও সংখ্যালঘু দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার জানান, রাজ্য জুড়ে ৩০০টি নতুন সরকারি মাদ্রাসা গড়া হবে। এই সমস্ত মাদ্রাসায় সবমিলিয়ে ২১০০ শিক্ষক ও ৬০০ অশিক্ষক কর্মচারী প্রয়োজন।

পাশাপাশি ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ৪০০টি সংগঠিত মাদ্রাসাকে মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা হচ্ছে। তাতে ২৮০০ সহায়ক ও ৮০০ শিক্ষাকর্মী চাই। সংখ্যালঘু এলাকায় নতুন করে ৩০০টি মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্র ও ২০০টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।"

সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, হিন্দু এলাকায় একের পর এক প্রাইমারী স্কুল ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনেক মাধ্যমিক স্কুলে নিয়মিত হারে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কমে যাচ্ছে। অপরপক্ষে মুসলিম এলাকায় মাদ্রাসায় এবং প্রাইমারী স্কুলের দিকে তাকালে সেগুলিকে স্কুল না বলে পোলট্রি মুরগীর খাঁচা বলে মনে হয়। বাপ্‌রে বাপ্, মানুষ এতো বাচ্চা পয়দা করতে পারে!

আর করবেই না কেন? বিখ্যাত মুসলিম নেতা আলি মিয়াঁ তো মুসলিম মহিলাদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন— "The Muslim women should use their womb as a weapon to give birth too many children and make India a Muslim majority country as early as possible"। অর্থাৎ মুসলমান সমাজে মহিলাদের উচিত তাদের গর্ভাধারকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে বেশি বেশি সন্তানের জন্ম দিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব হিন্দুস্থানকে মুসলিম মেজোরিটি দেশে পরিণত করা। অবশ্য তার বেশি বাকি নেই। সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রীর বক্তব্যে সে উচ্ছ্বাস চাপা থাকেনি— "রাজ্যজুড়ে সংখ্যালঘু মুসলিমদের উন্নয়নের লক্ষ্যে একগুচ্ছ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার। নতুন মাদ্রাসা গঠনের কাজ আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যেই হয়ে যাবে। পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের সার্বিক উন্নয়নের কাজ খুব শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে। রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত এলাকার উন্নয়নে কেন্দ্র থেকে ৬৮৬ কোটি টাকা এসেছে। ওই টাকায় রাজ্যের ১১টি জেলায় কাজ শুরু হবে। যে জেলাগুলিতে কাজ শুরু হবে সেগুলি হল, বর্ধমান, হাওড়া, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর চবিবশ পরগণা, দক্ষিণ চবিবশ পরগণা, কোচবিহার, মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর। কেন্দ্রের টাকায় রাজ্য জুড়ে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় রাস্তাঘাট, পানীয় জল, নিকাশি, শৌচাগার থেকে শুরু করে শিক্ষাক্ষেত্রে খরচ করা হবে। যে সমস্ত এলাকায় ২০ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন, সেইসব এলাকাকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হিসাবে ঘোষণা করছে রাজ্য সরকার। সাত্তার সাহেবের কথায়, ২০ শতাংশ মুসলিম আর বাকি ৮০ শতাংশ অমুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত এলাকাকে আমরা উন্নয়নের কাজে বেছে নিয়েছি" (দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান - ১১ জুলাই, ২০০৮)।

স্বাধীনতার পর মুসলিম অধ্যুষিত জেলা ছিল দুটি— মুর্শিদাবাদ ও মালদহ। এখন তা দাঁড়িয়েছে ১১টি জেলায়। তার ফলও হাতে হাতে— কড়কড়ে ৬৮৬ কোটি টাকা। এই যে দৈহিক সুখ, মনের তৃপ্তি, নগদ প্রাপ্তি এবং অন্তিমে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিধানসভা, লোকসভা এবং সমগ্র রাজ্য দখল— তার মূলে কিন্তু ওই মাদ্রাসা শিক্ষা! মুসলমানরা এই চতুর্বর্গদায়িনী মাদ্রাসা শিক্ষা ছেড়ে দেবে একথা

পাগলেও বিশ্বাস করে না। কারণ, তাহলে কোরাণ, হাদিস, নবী, পয়গম্বর সব মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

এখন পশ্চিমবঙ্গের বাকি কয়টি জেলা মুসলিম অধ্যুষিত হলেই বুদ্ধ-বিমানদের শান্তি। তাঁরা সি পি এম শাসনে মুসলমানদের বাড়বাড়ন্তের কথা বুক ফুলিয়ে বলতে পারবেন!

সংসার সুখের হয়

রমানাথ রায়

লালিকে ভালবাসি। লালিকে বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বাবার কথায় বিয়ে করলাম জুলিকে। বাবার জুলিকে খুব পছন্দ। জুলি অবশ্য পছন্দ করার মতো মেয়ে। জুলি রান্না করতে জানে, ঘরদোর গুছিয়ে রাখতে জানে। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এলে জুলি তাদের আদর-আপ্যায়ন করতে জানে। সবচেয়ে বড় কথা, জুলি বাবার ভীষণ বাধ্য। সব সময় বাবার কথা শুনে চলে। বাবার মত না নিয়ে কোনও কাজ করে না। এমনকি বাড়ির বাইরে গেলেও বাবার মত নিয়ে যায়। ফলে জুলি বাবার কাছে মেয়ের চেয়েও বেশি। জুলি দুদিন বাপের বাড়ি গেলে বাবা চোখে অন্ধকার দেখে। কারণ, মা পাঁচ বছর হল মারা গেছে। তাই বাবার দেখাশুনা করার জন্য বাড়িতে জুলি ছাড়া আর কেউ নেই। বাড়িতে রান্নার লোক আছে, কাজের লোক আছে। কোনও অসুবিধা হয় না। তবু জুলিকে চাই। জুলি না থাকলে গোটা সংসার যেন ভেঙে পড়ে। বাবার মুখে যেন অন্ধকার নেমে আসে। মেজাজটা খিটখিটে হয়ে যায়। বাবার হার্টের অসুখ। জুলি না থাকলে বাবা ওষুধ খায় না। বাবা রোজ সকালবেলা পার্কে গিয়ে হাঁটে। জুলি না থাকলে বাবা বাড়ি থেকে বেরোয় না। শুধু তাই নয়, বাবা তখন ভাল করে খায় না, ভাল করে কারও সঙ্গে কথা বলে না। তখন বাবার মুখের ভাষা বদলে যায়। আমি হয়ে যাই শয়তান, পাজি, হতচ্ছাড়া। আর জুলি হয়ে ওঠে মা লক্ষ্মী। এসব শুনতে আমার ভাল লাগে না। মনে হয় এ সব বাড়াবাড়ি। বাবার ওপর রাগ হয়। জুলির ওপর রাগ হয়। আমার বাড়িতে আমার চেয়ে জুলির কদর বেশি। ভুল বললাম, বাড়িটা আমার নয়, আমার বাবার। তবে একদিন তো বাড়িটা আমার হবে। অবশ্য জোর দিয়ে কথাটা বলা যায় না। বাবার মতিগতি ভাল নয়। বাবা বাড়িটা জুলিকে দান করে দিয়ে যেতে পারে। কিছু বলা যায় না। জুলিকে নিয়ে আমার তাই একটা ভয় হয়। জুলিকে বাড়ি থেকে সরানো দরকার। কিন্তু কিভাবে? একমাত্র পথ মিউচুয়াল ডিভোর্স। এছাড়া মামলা করে ডিভোর্স পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আমি কী কারণ দেখিয়ে ডিভোর্সের মামলা করব? লালি কি চিরকাল আমার কাছে স্বপ্ন থেকে যাবে! জুলিকে সরিয়ে দিয়ে লালিকে

নিয়ে কোনও দিন ঘর করতে পারব না? উপায় একটা বের করতেই হবে।

ঠিক এই সময় হঠাৎ একটা খুশির খবর পেলাম। আমার এক বন্ধু আছে। তার নাম ভানু। একদিন ভানু আমার অফিসে এল। এসে একটা বিয়ের কার্ড আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, আবার বিয়ে করছি।

আমি চমকে উঠলাম, আবার!

ভানু হেসে বলল, হ্যাঁ, আবার। রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। এবার কোনও জাঁকজমক নয়। বাড়িতে কুড়ি-পঁচিশজন বন্ধুকে ডেকে খাইয়ে দেব।

আমি অবাক হয়ে এবার জানতে চাইলাম, তুই এত সহজে ডিভোর্স পাস কি করে?

— টাকা দিলেই ডিভোর্স পাওয়া যায়। প্রথমবার একটা ফ্ল্যাট দিয়ে ডিভোর্স পেয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে ডিভোর্স পেয়েছি। এবার কী হবে জানি না।

আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। জিজ্ঞেস করলাম, তোর ব্যাপারটা কী? বিয়ে করেই ডিভোর্সের কথা ভাবতে শুরু করেছিস?

ভানু নির্দ্বিধায় বলল, এটা তো সবার আগে ভাবা দরকার। কারণ, আজকাল স্বামী-স্ত্রীতে বেশিদিন ভাব-ভালবাসা থাকে না। দুদিন পরেই চরম অশান্তি, ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে যায়। কেউ কাউকে আর মেনে চলে না। ফলে তখন শান্তির জন্য ডিভোর্স ছাড়া পথ থাকে না। কিন্তু তুই দেখালি বটে!

— কেন? আমি কী দেখালাম?

— এক বউকে নিয়ে তিন বছর কাটিয়ে দিলি!

— কী করব! কপাল খারাপ।

— তোদের মধ্যে কোনও অশান্তি হয় না?

— না।

— তা হলে ভাববার কথা। তুই যেভাবে পারিস ঝামেলা কর। নইলে ওই এক বউকে নিয়ে সারা জীবন কাটাতে হবে।

— কী ভাবে ঝামেলা করব?

— রোজ মদ খেয়ে বাড়ি ফিরবি। বউয়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবি। আর যদি মদ না খাস তাহলে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করবি। ও তখন বধূ নির্যাতনের মামলা করবে। তুই দুদিন ঝামেলায় পড়বি। তারপর হাসতে হাসতে ডিভোর্স পেয়ে যাবি।

— কিন্তু আমার একটা সমস্যা আছে।

— কীসের সমস্যা?

— আমার বউকে বাবা ভীষণ ভালবাসে। একেবারে নিজের মেয়ের মতো দেখে। বউয়ের সঙ্গে ঝামেলা পাকালে বাবা আমাকে আস্ত রাখবে না। দরকার হলে আমাকেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে।

— তা হলে কিছু করার নেই। তুই এক বউকে নিয়ে পচে মর। — বলে ভানু উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বলল, সামনের রবিবার সন্ধেবেলা। মনে থাকে যেন। তুই একা আসবি না। সঙ্গে বউকে নিয়ে আসবি। আসবি তো?

বললাম, আসব।

।। দুই ।।

আমি থাকি মানিকতলায়। ভানু থাকে সল্ট লেকে। রবিবার সন্ধেবেলা জুলিকে নিয়ে ভানুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। অনেকেই তখন এসে গেছে। যারা আসেনি তারাও একে একে এসে হাজির হল। কেউ একা আসেনি। সকলেই সস্ত্রীক এসেছে। সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে। তবে কারও সঙ্গে একটু বেশি, কারও সঙ্গে একটু কম। জুলির সঙ্গে কারও তেমন পরিচয় নেই। আমি সকলের সঙ্গে জুলির পরিচয় করিয়ে দিলাম।

আমাদের এক বন্ধুর নাম অভি। কিছুদিন আগে সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। সে আমাকে জুলির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য এক ঘরে গেল। সেখানে আরও দু-চারজন বন্ধু ছিল। অভি আমাকে বলল, তুই এখনও জুলিকে নিয়ে আছিস! এবার ত্যাগ কর।

আর এক বন্ধুর নাম রানা। সে ভানুর মতো তৃতীয়বার বিয়ে করেছে। সে বলল, জামা বদলানোর মতো বউ বদলাবি। নইলে কীসের জীবন!

আর একজন বন্ধুর নাম বিভু। বিভুও রানা ও ভানুর মতো তৃতীয়বার বিয়ে করেছে। সে বলল, তুই এখনও সেকেলে থেকে গেলি! তোকে আর কিছুতেই আধুনিক করা গেল না। তুই কী করে যে এক বউকে নিয়ে জীবন কাটাস তা আমাদের মাথায় আসে না।

আমার আর এক বন্ধুর নাম পাপু। সে চতুর্থবার বিয়ে করেছে। সে সব শুনে শুধু বলল, ছিঃ!

এবার আমার নিজেকে অপরাধী মনে হল। বুঝতে পারলাম আমি খুব অনাধুনিক। বুঝতে পারলাম, এই সমাজে আমি অচল। এদের মধ্যে আমাকে মানায় না। আমি ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেলাম। এবার আমাকে একটা কিছু করতেই হবে। আমি কোনও রকমে এইসব বন্ধুদের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এলাম। জুলিকে একা ছেড়ে এসেছি। এবার জুলির কাছে যাওয়া দরকার। আমি জুলির কাছে ফিরে এলাম। আসতেই দেখি, বন্ধুদের বউরা জুলিকে ঘিরে ধরেছে। তারা কী যেন জুলিকে বলছে।

আমাকে দেখেই জুলি জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়েছিলে?

বললাম, অনেকদিন পরে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল। তাই একটু গল্প করছিলাম।

— এবার খেয়ে নাও। আর দেরি করো না। বাবার শরীরটা আজ আবার ভাল নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।

একটি বউ তা শুনে জিজ্ঞেস করল, কোন বাবার শরীর খারাপ? নিজের বাবার?

জুলি বলল, না। আমার শ্বশুর মশাইয়ের শরীরটা ভাল নেই।

বউটি এবার অবাক হয়ে বলল, আপনি শ্বশুর বাড়িতে থাকেন?

— হ্যাঁ।

— তা হলে তো খুব কষ্ট আপনার। আপনি স্বামীকে নিয়ে আলাদা হয়ে যান।

— না ভাই। শ্বশুরমশাই আমাকে মেয়ের মতো ভালবাসেন। তিনি আমার কাছে বাবার মতো। আপনি আমাকে এরকম পরামর্শ দেবেন না।

আর একটা বউ তা শুনে বলল, আদিখ্যেতা!

আমি সঙ্গে সঙ্গে জুলিকে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর খেয়েদেয়ে ভানু ও তার নতুন বউয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্যাক্সি ধরলাম। ট্যাক্সিতে উঠে জুলি বলল, আমাকে আর কোনওদিন এ সব জায়গায় এনো না।

— কেন?

— আমার ভাল লাগে না।

— কিন্তু....

— কোনও কিন্তু নয়। — বলে জুলি জিজ্ঞেস করল, তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বন্ধুরা কি

বলছিল?

— এক বউ নিয়ে জীবন কাটাচ্ছি দেখে তারা আমায় গালমন্দ করল।

— কেন?

— তাদের মধ্যে কেউ দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে, কেউ তৃতীয়বার বিয়ে করেছে। একজন তো চতুর্থবার বিয়ে করেছে। ফলে আমি যে এক বউ নিয়ে আছি তা তাদের পছন্দ নয়।

— তারা তোমাকে কী পরামর্শ দিল?

— ডিভোর্সের পরামর্শ দিল।

— তুমি উত্তরে কী বললে?

— কিছু বলিনি।

— তার মানে তুমি মনে মনে ডিভোর্স চাও। — বলে একটু থেমে জুলি বলল, ঠিক আছে। তাই হবে। তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে ডিভোর্স করতে পারো। আমার কোনও আপত্তি নেই।

আমি একথায় খুশি হলাম। আমি তো এটাই চাইছিলাম। এবার আমি আমার লালিকে ফিরে পাব।

।। তিন ।।

কথাটা এখন বাবাকে জানানো দরকার। বাবাকে না জানিয়ে কিছু করা যাবে না। করতে গেলে বাবা আমাকে আস্ত রাখবে না। কিন্তু কথাটা বাবাকে বলা মুশকিল। বলতে গেলে বাবা আমাকেই বাড়ি থেকে বের করে দেবে। তা হলে কথাটা বলবে কে? জুলি? জুলি কেন বলবে? জুলির কী দায় পড়েছে! তবে জুলিকে একটা অনুরোধ করা যেতে পারে।

একদিন কথায় কথায় জুলিকে বললাম, অনেকদিন হয়ে গেল। এখনও বাবাকে কথাটা বলা হল না।

প্রথমে জুলি কথাটা বুঝতে পারেনি। তাই জিজ্ঞেস করল, কোন কথাটা?

— ডিভোর্সের কথাটা।

— ওহ্! — বলে একটু থেমে জুলি বলল, জানিয়ে দাও।

— আমি বলতে পারব না।

— তা হলে কে বলবে? আমি?

— হ্যাঁ। তুমি বলো।

— আমার স্বার্থ?

— দ্যাখো, এখনও আমাদের ডিভোর্স হয়নি। আইন অনুযায়ী এখনও আমি তোমার স্বামী। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, পতি পরম দেবতা। সুতরাং দেবতার মুখের দিকে তাকিয়ে অর্থাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা তোমারই বলা উচিত।

— ঠিক আছে। কথাটা আমিই বলছি। — বলে জুলি চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি না বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। একটা অদ্ভুত ভয় আমাকে পেয়ে বসল। মনে হল, কাজটা ঠিক করলাম না। বাবা এখনই আমাকে ডেকে পাঠাবে। তারপর কপালে কী দুঃখ যে আছে তা জানি না। আমি প্রায় সিঁটিয়ে রইলাম।

আমার অনুমান মিথ্যে নয়। কিছুক্ষণ পরে জুলি এসে বলল— বাবা তোমাকে ডাকছেন।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

— ডিভোর্সের ব্যাপারে আলোচনা করবেন।

— এতে আলোচনার কী আছে? বাবা তো ডিভোর্স করবে না। ডিভোর্স করব আমরা।

জুলি গম্ভীর হয়ে বলল— কথাগুলো আমাকে না বলে বাবাকে গিয়ে বলো।

বাবাকে আমি ভয় পাই। বাবার ডাক উপেক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। ফলে আমি বাবার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। দেখি, বাবা গুম হয়ে সোফায় বসে আছে। আমাকে দেখেই বলল, বস।

আমি বাবার মুখোমুখি বসলাম। বসতেই বাবা বলল, বউমার মুখে সব শুনলাম।

আমি কোনও কথা বললাম না। চুপ করে রইলাম।

বাবা এবার জিজ্ঞেস করল, তুই ডিভোর্স চাইছিস?

উত্তরে বললাম, হ্যাঁ।

বাবা তা শুনে জানতে চাইল, ডিভোর্সের কারণ? বউমা কি তোকে মারধর করে?

— না।

— বউমা কি পাগল?

— না।

— বউমার কি খারাপ রোগ আছে?

— না।

— বউমা কি এক বছরের বেশি বাপের বাড়িতে তোকে ছেড়ে আছে?

— না।

— তাহলে তো ডিভোর্সের কোনও কারণ দেখছি না।

— আমি আর ওকে চাই না। আমি অন্য একজনকে ভালবাসি। আমি তাকে বিয়ে করব।

— সে কে?

— লালি।

— লালি! সেই মেয়েটা? মেয়েটা ভাল নয়। ওকে বিয়ে করলে তুই বিপদে পড়বি।

— লালি আমাকে ভালবাসে। আমার কোনও বিপদ হবে না।

— না হলেই ভাল। — বলে একটু থেমে জিজ্ঞেস করল,— বিয়ের ব্যাপারে লালির সঙ্গে কোনও কথাবার্তা হয়েছে?

— এখনও হয়নি।

— কথাবার্তা বল। বউমা তোকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে। কোনও অসুবিধা হবে না। তবে একটা কথা।

— কী?

— ডিভোর্সের পর তোর আর এ বাড়িতে থাকা চলবে না। বউমা আমার কাছে থাকবে।

একথা শুনে রেগে গেলাম। বললাম— এ আবার কী কথা?

বাবা বেশ জোর দিয়ে বলল, — হ্যাঁ। এটাই কথা। আমার বাড়ি। এবাড়িতে থাকতে গেলে আমার কথা শুনে চলতে হবে। যে চলবে না তার এ বাড়িতে স্থান হবে না।

— ঠিক আছে। তাই হবে।— বলে রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

জুলি আমাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা কী বললেন?

— তোমাকে ডিভোর্স করলে আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

— এতে আপত্তির কি আছে? ভালবাসার জন্য মানুষ জীবনের মোহ ত্যাগ করে। তুমি সামান্য এই বাড়ির মোহ ত্যাগ করতে পারবে না?

এই ঠাট্টার উত্তরে কিছু বললাম না। নীরবে ঠাট্টাটা হজম করলাম। কারণ, এখনও ডিভোর্স হয়নি। এখন কিছু বললে ডিভোর্সের সময় ঝামেলা পাকাতে পারে।

।।চার।।

একদিন অফিস ছুটির পর লালিদের বাড়ি গেলাম। লালি বাড়িতেই ছিল। লালিকে বললাম, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।

— কী কথা?

— এখানে বলা যাবে না। একটা পার্কে বা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসা দরকার।

— চলো। — বলে লালি উঠে দাঁড়াল।

আমি লালিকে নিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে মুখোমুখি বসলাম। বসতেই লালি বলল, এবার কথাটা বলো।

আমি লালিকে জিজ্ঞেস করলাম, — তুমি আমাকে সত্যি ভালোবাস?

লালি হেসে বলল, — হ্যাঁ।

— এখনও?

— হ্যাঁ। এখনও।

— আমাকে বিয়ে করবে?

— করব। কিন্তু তার আগে জুলির সঙ্গে তোমার ডিভোর্স হওয়া দরকার।

— হয়ে যাবে। এই সপ্তাহে হয়ে যাবে।

একথা শুনে লালি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, আমার কিন্তু পাঁচটা শর্ত আছে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম— কী কী?

— বিয়ের পর আমি যেমন আমার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসব, তোমাকেও তেমনি তোমার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকব না। এতে রাজি আছ?

— আছি।

— আমি রান্নার কাজ, বাসন মাজার কাজ বা ঘরমোছার কাজ একদিনের জন্যও করব না। এসব কাজের জন্য লোক রাখতে হবে। এতে রাজি আছ?

— আছি।

— আমাকে মাসে মাসে হাতখরচ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। এতে রাজি আছ?

— আছি।

আর একটা শর্ত হল, তুমি এখন যে মাইনে পাও তার পে-স্লিপ আমার হাতে তুলে দিতে হবে।

এবার চমকে উঠলাম। বললাম,— পে-স্লিপ দিয়ে কী হবে?

— তোমার সঙ্গে যদি ডিভোর্স হয় তাহলে খোরপোশ আদায় করতে সুবিধা হবে। তুমি কি এতে রাজি আছ?

— আছি।

— এবার আমার পঞ্চ ম এবং শেষ শর্ত হল, আমার চলাফেরায় কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা চলবে না।

— একথার অর্থ?

— আমার যখন যেখানে ইচ্ছে হবে, যাব। যার সঙ্গে ইচ্ছে হবে, তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। বাড়িতেও তারা আসবে। তুমি কিছু বলতে পারবে না। তুমি এতে রাজি আছ?

ঢোঁক গিলে খুব কষ্ট করে বললাম,— আছি।

লালি এবার হেসে বলল— এখন আমাকে পাবার জন্য বলছ রাজি আছি। পরে যেন অন্য রকম কথা না শুনি।

— শুনলে কী হবে?

— সঙ্গে সঙ্গে বধূ নির্যাতনের মামলা, ডিভোর্স, খোরপোশ... ভেবে দ্যাখো, ভাল করে ভেবে দ্যাখো।

আমার আর ভাবার কিছু নেই। লালিকে আমি ভালবাসি। আমি এখন অসহায়। আমি এখন অন্ধ। তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, — ভেবে দেখার কিছু নেই। তোমার যদি আরও শর্ত থাকে বলে যাও। আমি সব মেনে নেব।

।। পাঁচ ।।

জুলির সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়ে গেল। আমি লালিকে বিয়ে করে আলাদা থাকতে লাগলাম। এক বছর আমাদের ভালভাবেই কাটল। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে একবার পুরী গেলাম। একবার সিমলা গেলাম, একবার গোয়া গেলাম। ব্যাঙ্কে যে টাকা ছিল, তার অনেকটাই লালিকে খুশি করতে গিয়ে খরচ হয়ে গেল। কিন্তু এত ঘুরেও লালি খুশি হল না। সে একদিন বায়না ধরল, এবার আমেরিকা চলো। নিউইয়র্কে সোমা আছে। সোমা অনেকদিন ধরে আসতে বলছে।

জিজ্ঞেস করলাম,— সোমা কে?

— আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। ওর কাছে গেলে থাকা খাওয়া বা ঘুরে বেড়ানোর কোনও অসুবিধা হবে না। আমার আমেরিকা যাবার খুব ইচ্ছে। আমি এবার গম্ভীর হয়ে বললাম— তোমার এই ইচ্ছে পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

লালি এ কথায় রেগে গিয়ে বলল— কেন সম্ভব নয়?

— টাকা নেই।

— ধার করো।

আমি এবার ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললাম, কে ধার দেবে? তোমার বাবা?

লালি উত্তেজিত হয়ে বলল, — বাবা ধার দেবে কেন?

— দেবে নাই বা কেন? মেয়েকে জন্ম দিয়েছে, মানুষ করেছে। এখন মেয়ের বিয়ে দিয়ে সব দায়-দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে আমার ঘাড়ে চাপালে চলবে? তুমি তোমার বাবার কাছে তিরিশ বছর ছিলে। আমার কাছে আছ এক বছর কয়েক মাস। আর এতেই আমার ঘাড়ে তোমার দায়-দায়িত্ব চেপে গেল? তোমার বাবার কোনও দায় দায়িত্ব রইল না? চমৎকার! তোমার বাবা তো বিয়েতে এক পয়সাও খরচ করেননি। রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়েছে। ঘরে ফার্নিচারও আমার কেনা। একটা বসার চেয়ারও কিনে দেননি। এবার মেয়ের একটা আবদার অন্তত পূরণ করুন ।

— দ্যাখো, আমার বাবার নামে আজেবাজে কথা বলো না।

— কেন বলবো না? তোমার বাবা তো অনেক সম্পত্তির মালিক। তোমার দাদা আর তুমি সেই সম্পত্তির সমান অংশের মালিক। অথচ সেই সম্পত্তির আয় থেকে তুমি ক'পয়সা পেয়েছ?

— ভবিষ্যতে পাব।

— ভবিষ্যতেও পাবে না।

— পাব না কেন?

— তুমি কয়েকদিন আগে একটা কাগজে সরল বিশ্বাসে সই করেছিলে। মনে আছে?

— আছে।

— আমি কাগজটা লুকিয়ে দেখেছি। ওটা কীসের কাগজ জানো?

— না।

— অথচ সই করে দিলে!

— সই করতে বলল, তাই করে দিলাম।

— আর তাতে কী হল জানো? বাপের সম্পত্তির ওপর তোমার আর কোনও অধিকার রইল না।

— সই করার সময় আমাকে বারণ করলে না কেন?

— তখন বারণ করলে বিরাট ঝামেলা হত। সবাই ভাবত, তোমার বাবার সম্পত্তির ওপর আমার লোভ আছে। সেটা আমার সম্মানে লাগত।

—এখন কী হবে?

— এখন কিছু করার নেই। এখন কিছু করতে গেলে অনেক ঝামেলা।

লালি তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। থাকার পর আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল। আমার তাহলে আমেরিকা যাওয়া হবে না!

আমি উত্তরে শান্ত গলায় বললাম— আমার টাকায় হবে না। তুমি তোমার বাবার টাকায় চলে যাও। কেউ আপত্তি করবে না।

— কিন্তু আমি আমেরিকা যাবই। তোমার টাকাতেই যাব।

— কীভাবে?

— দেখে নাও।

।। ছয় ।।

ফ্ল্যাটের তালার দুটো চাবি। একটা চাবি আমার কাছে থাকে। আর একটা চাবি থাকে লালির কাছে। একদিন ফ্ল্যাটে ফিরে দেখি দরজায় তালা ঝুলছে। কী ব্যাপার? লালি কোথায় গেল? বাপের বাড়ি? কিন্তু আমাকে না বলে বাপের বাড়ি কি যাবে? কোনওদিন তো এরকম হয়নি। তাহলে হয়তো কোনও বান্ধবীর বাড়ি গেছে। ফোন করলেই সব জানা যাবে।

ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। জামা-প্যান্ট ছাড়লাম। হাত-মুখ ধুলাম। ধুয়ে জলখাবার খেলাম। কফি খেলাম। তারপর ফোন করতে বসলাম। প্রথমে কোথায় করব! প্রথমে আমি লালির বাপের বাড়িতে ফোন করলাম। লালির বাবা ফোন ধরলেন।

জিজ্ঞেল করলাম— লালি কি আপনার কাছে গেছে?

উত্তর এল— হ্যাঁ।

— ওকে একবার ডাকুন তো।

— না।

— কেন?

— তোমার কাছে ও আর যাবে না। তুমি ওকে আমেরিকা নিয়ে যাওনি। তুমি ওকে বলেছ, তোমার টাকা নেই। শুধু তাই নয়, তুমি আমার নামে অনেক আজেবাজে কথা বলেছ। ফলে তোমার সঙ্গে ও আর কোনও সম্পর্ক রাখবে না। তবে যদি এখনই ওকে দু-লাখ টাকা দিতে পারো, তাহলে তোমার কাছে আবার ফিরে যাবে। এখন বলো, টাকা কি দিতে পারবে?

— আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার তো অনেক টাকা, আপনি ওকে টাকাটা দিয়ে দিন।

— আমি কেন দেব? তুমি লালিকে বিয়ে করেছ। বিয়ের পর বাপের আর কোনও দায়দায়িত্ব নেই। বাপ এখন মুক্তপুরুষ। এখন লালির সব দায়দায়িত্ব তোমার। আমেরিকা যাওয়ার টাকা তোমাকেই দিতে হবে।

— কী ভাবে?

— বধূ নির্যাতনের মামলা করে হাজতের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে নেব।

— আর মামলা মিথ্যে প্রমাণ হলে আমি তখন মজা দেখাব।

— আমাকে মজা দেখাবে! এত বড় সাহস তোমার! দাঁড়াও, তোমাকে আমি হাজতে ঢুকিয়ে ছাড়ব।

— ক্ষমতা থাকলে ঢোকাবেন।— বলে ফোন নামিয়ে রাখলাম।

তবে মুখে সাহস দেখালেও ভিতরে ভিতরে ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। আজকাল বিয়ের পর ঘরে ঘরে এই সব ঝামেলা হচ্ছে, সংসার ভাঙছে। লালি অবশ্য এ সব ঝামেলা করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আমি না করলেও লালির বাবা ছাড়বে না। লালির আমেরিকা যাওয়ার

টাকা আমার কাছ থেকেই আদায় করে ছাড়বে। লোকটা একদম সুবিধার নয়। ছিঃ ছিঃ। এসব বাপের মেয়েকে কেউ বিয়ে করে! খুব ভুল হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার নেই। আমার বাবা লালির বদলে জুলিকে ঘরে এনে ঠিক কাজই করেছিল। বাবার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। এখন আর জুলির কাছে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। কোন মুখে ফিরব? সমস্যায় পড়ে গেলাম।

দুদিন পরে লালবাজার উইমেনস্ গ্রিভান্স সেল থেকে ফোন এল। অফিসার ফোন করেছেন। তিনি বললেন— আপনি কাল একটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করুন। বললাম, আমার যে অফিস আছে।

— অফিস কামাই করুন। নইলে বিপদে পড়ে যাবেন। আসবেন তো?

— আসব। বলে ফোন নামিয়ে রাখলাম।

লালবাজারের ডাক। উপেক্ষা করার উপায় নেই। তাই পরদিন লালবাজারে গিয়ে হাজির হলাম। গিয়ে দেখি অফিসারের সামনে লালির বাবা বসে আছেন। পাশে লালি।

অফিসার আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী শ্রী....

— হ্যাঁ।

— বসুন।

আমি একটা চেয়ারে বসলাম। অফিসার বললেন, — আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম— কি অভিযোগ?

— আপনি বিয়েতে দু'লাখ টাকা পণ চেয়েছিলেন। লালির বাবা সেই পণের টাকা দিতে পারেননি বলে আপনি লালির ওপর অকথ্য মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাতেন।

— এসব মিথ্যা কথা।

— জানি। বধূ নির্যাতনের মামলা সাজাতে গেলে এরকম মিথ্যে কথা বলতে হয়। সবাই এ সব বলে থাকে। কিন্তু আপনি কি হাজতবাস চান! মামলা চান?

— না।

— তা হলে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিন।

— কীভাবে?

— লালিকে দু'লাখ টাকা দিয়ে দিন। আর ডিভোর্সও নিয়ে নিন। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আপনি কি এতে রাজি?

— রাজি।— বলে আমি কট্‌মট্ করে লালির বাবার দিকে তাকালাম। লালির বাবার মুখে তৃপ্তির হাসি।

।। সাত।।

লালির সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেল। তবে আমার দু'লাখ টাকা গচ্চা গেল। অনেক কষ্টের টাকা। মন খারাপ হয়ে গেল। লালি ও লালির বাবা আমাকে এইভাবে ঠকাল! লালি এইভাবে আমেরিকা গেল! এইভাবে! ক'দিন ভাল করে খেতে পারলাম না, ঘুমোতে পারলাম না। মন থেকে সব শান্তি চলে গেল। বুঝতে পারলাম না এখন আমি কী করব? কার কাছে যাব? কে আমার পাশে দাঁড়াবে? কে আমায় এই সময় একটু শান্তি দেবে? আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। আবার বাড়ি ফিরে যাব? এছাড়া উপায় কি? আমার পক্ষে একা ফ্ল্যাটে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু কোন মুখে বাড়ি যাব? গিয়ে কি বলব?

শেষে একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে বাড়ি গেলাম। গিয়ে বাবা ও জুলিকে সব কথা খুলে বললাম। সব শুনে জুলি চুপ করে রইল। কিছু বলল না। বাবা শুধু বলল, তোর উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। এরকম শাস্তি হওয়া তোর দরকার ছিল। এখন তুই আবার এখানে এসেছিস কেন? কী চাস?

— ফ্ল্যাটে একা থাকতে খুব অসুবিধা হচ্ছে।

— তার জন্য আমি কি করব?

— তুমি যদি বলো, তা হলে আবার এখানে ফিরে আসতে পারি।

— এখানে?

— হ্যাঁ।

— কিন্তু বউমার অনুমতি না নিয়ে কিছু করতে পারি না। বউমা যদি রাজি থাকে তা হলে আমার কোনও আপত্তি নেই। — বলে বাবা জুলির দিকে তাকাল। তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল— তোমার হতভাগ্য প্রাক্তন স্বামী আবার এখানে ফিরে আসতে চায়। তুমি কি থাকতে দেবে?

— দিতে পারি। তবে একটা শর্ত।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, — কী শর্ত?

— আমার ঘরে থাকা চলবে না। অন্য ঘরে থাকতে হবে। রাজি?

আমি এখন বাড়িতে ফিরতে চাই। এখন আমার বাবাকে চাই, জুলিকে চাই। এখন আমি শান্তি চাই। স্নেহ চাই, ভালবাসা চাই। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম— রাজি।

।।৮।।

একদিন অফিসে লালির ফোন এল। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ? লালি বলল— ভাল নেই।

— কেন?

— খুব কষ্টে আছি। ছেলেবেলায় মা মারা গেছে। আমেরিকা থেকে ফেরার পর বাবাও মারা গেল। দাদা-বউদি অমাকে বাড়ি থেকে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি এখন মাসির কাছে আছি। এখানেও বেশিদিন থাকতে পারব বলে মনে হয় না। বলতে পারো, এখন আমি কী করব?

— জানি না। — বলে ফোন নামিয়ে রাখলাম। রাখতেই মনে পড়ল, আজ জুলির জন্মদিন। জুলি বিরিয়ানি খেতে ভালবাসে। আজ ওর জন্য এক প্যাকেট বিরিয়ানি নিয়ে যাব।

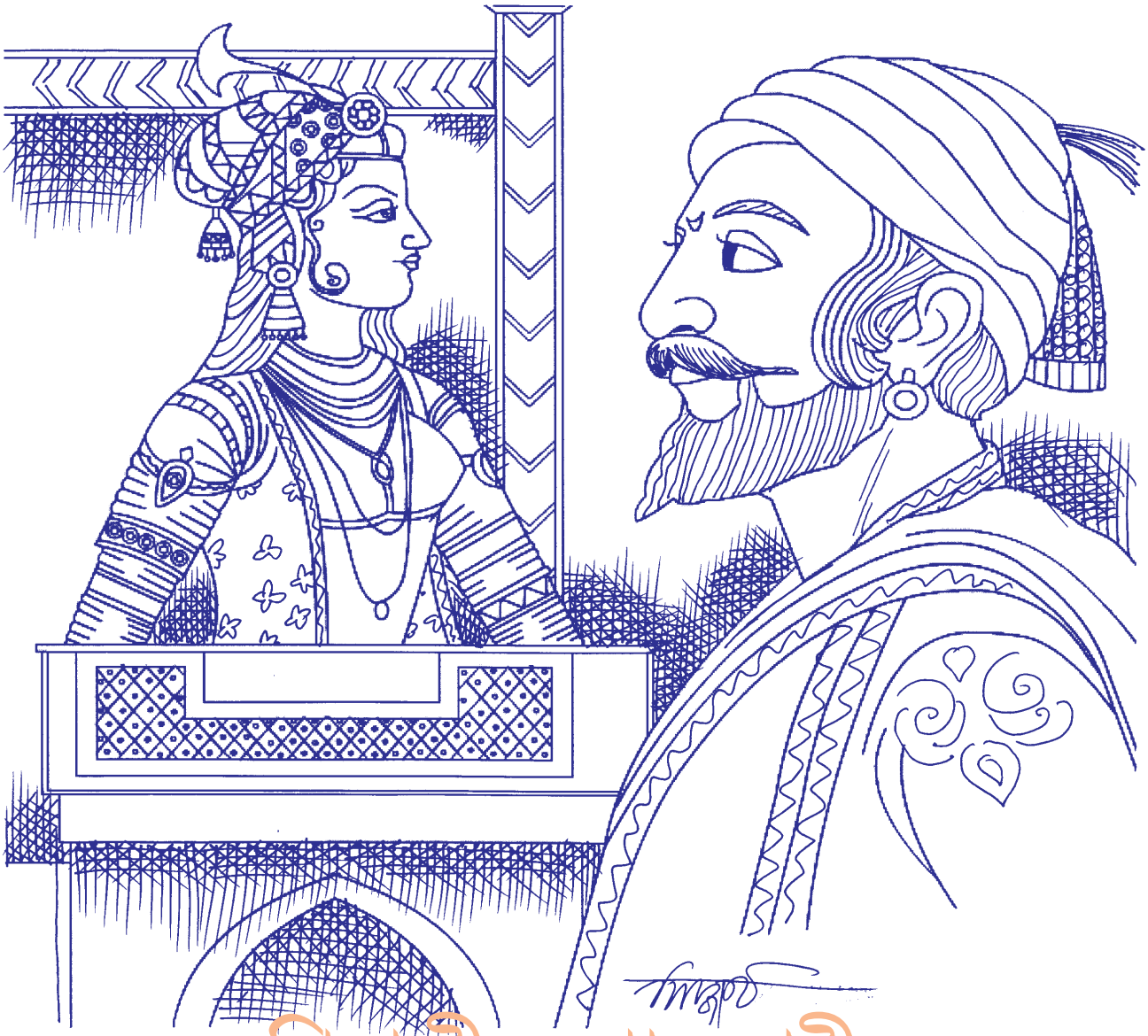

শিবাজী ও শাহজাদী

ডঃ প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী

বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে ভারতভূমি ত্রিকোণাকার পুরোডাশের মতো ভারত মহাসাগর স্পর্শ করেছে। পশ্চিমে সহ্যাদ্রির ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণী। সে পর্বত অরণ্যময়। দীর্ঘদেহ বনস্পতি আর কন্টকলতা গুল্মে সমাচ্ছন্ন, দিবাভাগেও পথ চলা দায়। অথচ সেই গিরিসঙ্কটেই চলেছে একদল অস্ত্রধারী সৈনিক। দেখে মনে হয় তারা ভয় পেয়েছে। সে ভয় জঙ্গলের নেকড়ে বাঘ আর অরণ্য দস্যুর। তারা ঘিরে নিয়ে চলেছে একটি শিবিকা। দামী সোনার তার বসানো মণি-মুক্তা গাঁথা পর্দায় ঢাকা শিবিকায় রয়েছেন, বাদশা আওরঙ্গজেবের পরমাসুন্দরী সপ্তদশ বর্ষীয়া কন্যা শাহজাদী রোশেনারা। তখন দিল্লীর মসনদ নিয়ে চলেছে চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র।

বাদশা শাজাহান বৃদ্ধ ও অসুস্থ। তিনি চান বড় ছেলে দারাই মসনদে বসুন। অন্য ছেলেরা তা মানতে রাজি নন। বঙ্গদেশ থেকে সুজা, গোয়ালিয়র থেকে মুরাদ আর দক্ষিণ ভারত থেকে আওরঙ্গজেব ছুটে এলেন। সঙ্গে বিশাল বাহিনী। মোগলদের যুদ্ধ রীতি ছিল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে হাতির পিঠে রাজকোষও চাপিয়ে নবাব বাদশারা পথ চলতেন। নারীদেরও বাদ দিতেন না। আওরঙ্গজেব চতুর ও কূটকৌশলী। জানতেন, পিতার স্নেহভাজন বড় ছেলে দারাকে বিনাশ করতে না পারলে দিল্লীর মসনদ তাঁর অপ্রাপ্যই থেকে যাবে। "আমি ফকিরি নিয়ে মক্কায় চলে যাব"— তুমি হবে বাদশা— এই স্তোকবাক্যে ভোঁতা বুদ্ধির মুরাদকে ভুলিয়ে সঙ্গে নিয়ে দিল্লীর পথে ছুটে যান। হারেমের নারীদের কথা তাঁর তখন ভাববার সময় নেই। শুধু প্রিয়তমা কন্যা রোশেনারাকে বিশ্বস্ত বিশজন মোগল সেনার হাতে দিয়ে কোরান ছুঁয়ে শপথ করিয়েছেন তারা কোনও অবস্থাতেই শাহজাদীকে ত্যাগ করবে না। দীর্ঘ পথ— মারাঠী দস্যু শিবাজীর এলাকার মধ্যেই পড়ে। মোগল সেনারা তাই খোলা তরবারি হাতে শাহাজাদীর শিবিকা ঘিরে সতর্কভাবে হাঁটছিল। সহসা শোনা গেল— এক তীব্র বংশীধ্বনি। জ্বলে উঠল ক'টি উল্কা— শন্ শন্

করে ছুটল এক ঝাঁক তীর। জনা পাঁচেক মোগল সেনা ধরাশায়ী হল। বড় বড় গাছের ডাল বেয়ে কালো জাগুয়ারের মতো নেমে এল— ক'জন মানুষ, হাতে ধনুক। মোগল সেনাদের দলপতি তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। আর তখন গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা এক বিশালদেহী মানুষের হাতের শূল মোগলের বক্ষ ভেদ করল। দেখা গেল, রক্ষী মোগল সেনারা পালিয়েছে, আর শিবিকার ষোলজন বেহারা ভয়ে কাঁপছে।

জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ক'টি মানুষ। কালো তাদের গায়ের রঙ, মাথায় বাবরি চুল, পরণে মালকোঁচা মারা কাপড়। শূলধারী পুরুষ এদের বললেন, শাহজাদীকে পৌঁছে দাও সিংহগড় দুর্গে। এক বিচিত্র নাটক অভিনীত হল। সে নাটক দেখলেন শাহজাদী রোশেনারা। তিনি ভয় পাননি। মোগল শাহজাদীরা হতেন প্রচণ্ড অংহকারী, নিষ্ঠুর প্রকৃতির। রূপ, সম্পদের দর্পে মানুষকে কীট পতঙ্গের মতো তাচ্ছিল্য করতেন। অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন— 'কে তুমি? কোন সাহসে আওরঙ্গজেবের কন্যাকে অপহরণের হিম্মত কর!

উচ্চহাস্য শোনা গেল— উত্তর এল বজ্রকণ্ঠে— তোমার বাপজান, যাকে বলেন, 'ডাকাত, কুত্তার বাচ্চা, ধূর্ত শৃগাল, সেই আমি।

পাহাড়ের উপরে বিশাল দুর্গ। সিংহগড়। তেতলায় এক মস্ত ঘরে রোশেনারার বাসের ব্যবস্থা হয়েছে।

দিল্লীর রঙমহলের বাদশাজাদীর মূল্যবান জৌলুসযুক্ত আসবাবপত্র পাহাড়ী বর্বর দস্যু পাবে কোথায়? প্রসাধনের আতর, মৃগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধী দ্রব্য নেই, কিন্তু অগুরু, চন্দন আছে, সুগন্ধ ফুল রয়েছে রৌপ্য পাত্রে। শয্যায় বাদশাহজাদীদের পাতা থাকতো কাশ্মীরী শাল। যখন দেখলেন, তাঁর শয্যায় পাতা রয়েছে পশুলোমে তৈরি চাদর, শাহজাদী ক্রুদ্ধ হলেন। মালকোঁচা মারা এক স্থূলাঙ্গিনী নারী— কাঠের বারকোষে করে রুপোর থালায় তাঁর 'খানা' নিয়ে এলেন। ঘৃতপক্ক পুরোডাস, পরমান্ন, নারিকেল তৈল ভর্জিত শাক, ক্ষীর, দধি ও লাড্ডু। জিভে সামান্য ঠেকিয়ে শাহজাদী ওই অরুচিকর গরিবী খানা সরিয়ে রাখলেন। ঘৃত ও মশলামাখা বৃহৎ মাংসে অভ্যস্ত জিহ্বা, অনাক্ত নারিকেল কোরা মেশানো ব্যঞ্জন তাঁর বিবমিষার উদ্রেক করল।

'নেহি খায়েঙ্গে' বলে থালা সরিয়ে রাখলেন। দু'দণ্ডও কাটেনি, দাড়িওয়ালা একটি লোক ঘুন্টিবাঁধা মেরজাই পরা খাটো ধুতি, মালকোঁচা মারা— ঘরে ঢুকলো। হাতে মস্ত এক কাঠের পরাত, তাতে চীনামাটির পাত্র থেকে ধূমায়িত ব্যঞ্জনের পরিচিত সুঘ্রাণে শাহজাদী আবার আসনে বসলেন। দাড়িওয়ালাকে বললেন, 'তুমি বুঝি মুসলমান? তাই এমন মোগলাই পরোটা, মাংসের কোর্মা, কোপ্তা?

লোকটি বলল— 'আমি হিন্দু, তোমারা যাকে বলো কাফের। তবে ঘি মসলায় মাখা মাংস, ষণ্ডের নয়, শূকরের নয়, মেষ, মৃগ আর ময়ূরের। আমাদের রাজা আমিষাশী নন। তিনি খান বাজরার রোটিকা। শাক সিদ্ধ, তেঁতুলের আচার।'

এবার তৃপ্তি ভরে আহার করলেন রোশেনারা। চাইলেন আরক মদ্য। নারীদের মদ্যপান অনুচিত বলে মনে করেন আমাদের রাজা। শাহজাদী, হিন্দু কুমারীদের মতো মদ পান না করলেই ভাল হয়।

রাত্রিটা কাটলো ভয়ের মধ্যেই। খোলা জানালায় কোনও গরাদ নেই। দরজায় নেই কোনও অর্গল। একলা ঘরে শাহজাদী। মৃদু আলোর একটা প্রদীপ দিয়ে গেল লোকটি। মাথা নীচু করে বললে, যখনই দরকার হবে হাততালি দেবেন।

যাকে তিনি দাসী ভেবে তুই বলেছেন, তিনি তানাজী মল্লের বিধবা পত্নী। এই তানাজী মোগলদের কাছ থেকে এই দুর্গ দখল করার সময় প্রাণ দিয়েছেন। তাই আমাদের 'রাজা' শিবাজী এই দুর্গের নাম দিয়েছেন 'সিংহগড়'।

শাহজাদী ভৃত্যের কথায় হিংস্র সর্পিনীর ন্যায় ফোঁস করে উঠলেন। এত বড় স্পর্ধা এই পাহাড়ী দস্যুর। সে আওরঙ্গজেবের কন্যাকে হরণ করে। শীঘ্রই তাঁর বাপজান এসে এই দুর্গ গুঁড়িয়ে দেবেন। কাফের কুত্তার খপ্পর থেকে শাহজাদীকে উদ্ধার করবেন। হিম্মত থাকে আসুক সেই বর্বর আমার সামনে পয়জার মেরে তার গর্দান চূর্ণ করে দেব।

ভৃত্যটি বোধহয় ভয় পেয়ে ঘর ছেড়ে পালাল।

রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারলেন না রোশেনারা। বুরুজের পাশে একটা কালো ছায়া যেন ঘুরে বেড়ায়। হয়তো তাঁর উপর অত্যাচার হবে। মোগল হারেমের কেড়ে আনা হিন্দু নারীদের কাছে শুনেছেন, কেমন ভাবে তুর্কি সেনারা তাদের বেইজ্জত করেছে। কিন্তু তিনি মোগল কন্যা, তৈমুর চেঙ্গিজদের খুন আছে তাঁর দেহে। শালোয়ারের বন্ধনীর খাঁজে লুকানো আছে দামাস্কাসের তীক্ষ্ণ ছুরি। বুনো ডাকাতের কলিজা ফাঁক করে দিতে এক লহমা মাত্র। আর আছে গোলকুণ্ডার হীরে বসানো আংটির ভিতর বিষের পুরিয়া। কামার্ত পুরুষ তাঁর দেহ স্পর্শ করার পূর্বে তাঁর প্রাণ শূন্য হবে।

সকালে তানাজীর পত্নী লক্ষ্মীবাঈ এলেন, হাতে চন্দন কাঠের সুদৃশ্য একটা বাক্স। বললেন, 'শিবাজী আপনাকে পাঠিয়েছেন এই পোশাক।'

বাক্সের ডালা তুলে দেখলেন, বাংলার মসলিনের মহামূল্য কাপড়। সোনার সুতোয় বোনা তার পাড়। জমিতে চুনী পান্নার বাহার। রোশেনারা অবাক হয়ে গেলেন। — 'মা, শিবাজী জানতে চেয়েছেন, কেমন আছ। মন ভার করে থেকো না। শীঘ্র যুদ্ধ শেষ হবে। সন্ধি হলেই মুক্তি পাবে।'

মোগল হারেমে আরাম আছে, আছে বিলাস ঐশ্বর্য, নেই ভালবাসার 'মা' ডাক। উদ্ধত দর্পিতা মেয়েটি যেন গলে গেল। আর এক বিস্ময় তার জন্য যেন অপেক্ষায় ছিল। তানাজী পত্নী শাহজাদীকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। দেখালেন, একটি আয়তাকার রৌপ্যাধারে সাজানো রয়েছে গ্রন্থ। গ্রন্থগুলি পারস্য ভাষায় লেখা কাব্য। কবিরা হলেন— ফেরদৌসি, হাফিজ, শেখ সাদি। মোগল হারেমের অনেক কন্যাই ছিলেন বিদূষী। রোশেনারা ফারসী ভাষা লিখতে পড়তে পারতেন। তাঁর বড় পিসিমা জাহানারার মতো তিনিও ছিলেন কবি। জাহানারা দারাকে স্নেহ করতেন। তাই বিরক্ত হয়ে আওরঙ্গজেব স্নেহময়ী মেজদিদি রোশেনারার নামে কন্যার নামকরণ করেন। রোশেনারা দুর্গের অবরোধের মধ্যেও মুক্তির আস্বাদ পেলেন। কোথাও যেতে তার নিষেধ নেই। নেই খোলা তরবারি হাতে তাতার প্রহরীণী, সারা দিনভর চলা মোগল রঙমহলে মদ্যপান আর নৃত্যগীতের উচ্ছৃঙ্খলতা, কামার্ত পুরুষের গোপন অভিসার। এখানে সকাল সন্ধ্যায় বাজে শাঁখ, দেবমন্দিরে বাজে ঘন্টা,

চলে পূজা আরাধনা। ফুলের বাগান থেকে পুষ্পচয়ন করা রোশেনারার ভারি আনন্দের খেলা। গোঁড়া সুন্নি কন্যা রূপে মূর্তি পূজায় নেই বিশ্বাস, তবু সে ফুল নীরবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতেন।

কন্যার অপহরণের খবর আওরঙ্গজেব পেলেন দিল্লীর পথে। মসনদ দখলের জন্য তুমুল যুদ্ধ হল। সুজা পালালেন, আরাকানের পথে তিনি নিখোঁজ হলেন। মুরাদকে মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করলেন। যুদ্ধে পরাজিত পলাতক দারাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দিল্লীতে আনা হল। দিল্লীর মসনদে বসলেন আওরঙ্গজেব। আগ্রায় বন্দী হলেন শাজাহান। বড় মেয়ে বিদূষী কবি জাহানারা রইলেন তাঁর সঙ্গে।

রোশেনারার শিবিকা রক্ষাকারী পলাতক সেনাদের কাছ থেকে আওরঙ্গজেব জানলেন, শিবিকা বহন করছিল হিন্দু বেহারারা। শিবাজীর সঙ্গে তাদের যোগ ছিল, তারাই রোশেনারাকে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে।

আওরঙ্গজেব রেগে টঙ্ হয়ে ষোলজন হিন্দু বেহারাকে শূলে দিলেন। অবশ্য রক্ষীরাও রেহাই পেল না। ওদিকে শিবাজী একের পর এক মোগল দুর্গ অধিকার করে চলেছেন। আওরঙ্গজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর জন্মদুর্গ পুণার রায়গড় দখল করে আরামে বিলাসে কাটাচ্ছিলেন। একদিন রাতে বিবাহের বরযাত্রী সেজে শিবাজী শায়েস্তা খাঁর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে তাঁর শিরশ্ছেদ করতে উদ্যত— ভীত শায়েস্তা খাঁ প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় জানালা টপকে লাফিয়ে পালালেন। তবে শিবাজী খড়্গের এক কোপে তাঁর বাম হাতের আঙুল কটা কেটে ফেললেন। খবর পেয়ে আওরঙ্গজেব মামাকে অপদার্থ, বেওকুব গালাগালি করে "দোজখ" বাংলাদেশে সুবাদার করে পাঠালেন। আর মাড়বার অধিপতি মহাবীর যশোবন্ত সিংকে — শিবাজীকে পুণার রায়গড় দুর্গে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া ও পলায়নের ব্যাপারে সাহায্যকারী রূপে — দায়ী করলেন। তবে কুচক্রী, আওরঙ্গজেব কপটতার আশ্রয় নিয়ে যশোবন্তকে দিল্লীতে আহ্বান করলেন। জানালেন,— তাঁকে মহারাষ্ট্রে পাঠাবেন, শিবাজীকে দমন করতে। আর কন্যা রোশেনারাকে 'কুত্তার বাচ্চা' পাহাড়ী ডাকাতটার কবল থেকে উদ্ধার করে আনতে। যশোবন্ত সিং বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে পুণায় উপস্থিত হলেন। শিবাজী কিছুদিন পূর্বে হিংস্র দানবের মতো বিজাপুরের পাঠান সেনাপতি আফজলকে বাঘনখের সাহায্যে উদর বিদীর্ণ করে হত্যা করে তুর্কি জগতে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন। আফজল নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে শিবাজীকে আমন্ত্রণ করে তার ভল্লুকের মতো বিশাল দেহে পিষ্ট করে গলা টিপে মারতে চেয়েছিলেন। সাবধানী সুচতুর শিবাজী বাঘনখ দিয়ে পেট চিরে আর বিছুয়া ছুরি দিয়ে আফজলের পাঁজরে বিঁধিয়ে বিশ্বাসঘাতককে বধ করেন।

একদিন যশোবন্তের শিবিরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উপস্থিত। বলেন, 'আমি শিবাজী। শিবাজী হিন্দু মহাবীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন না। যশোবন্তের মতো হিন্দু মহাবীর হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী, হিন্দু ধর্ম বিনাশকারী মহা অত্যাচারী, হিন্দুর উপর জিজিয়া কর আরোপকারী আলমগীরের দাসত্ব করছেন। এর চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে!

যশোবন্ত বললেন— শিবাজী, এস তোমায় আলিঙ্গন করি। আমরা যা পারিনি, তুমি তা সম্ভব করেছ। বিদেশী তুর্কিরা তোমার ভয়ে কম্পমান। আমি হিন্দু, নুন খেয়েছি আওরঙ্গজেবের। লড়াই একটা হবে, তবে আমি হারবো। শিবাজী জলভরা চোখে মহারাজকে প্রণাম করলেন।

যুদ্ধ একটা হল। পরাজিত যশোবন্ত দিল্লী ফিরলেন। কূটবুদ্ধি আওরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংকে ভর্ৎসনা দূরের কথা, একটা রূঢ় কথাও বললেন না। বরং জানালেন, মহারাজের সারা জীবনের মোগল সেবার পুরস্কার দিতে চান আগামী রমজান মাসের পয়লা তারিখে। বিস্মিত হলেন যশোবন্ত সিংহ। আওরঙ্গজেবের এ কোনও কুটিল কৌশল নয় তো তাঁকে বিপাকে ফেলার? সরলচিত্ত মহাবীর এলেন দেওয়ানি খাসে। আওরঙ্গজেব মহাসমাদরে তাঁকে পরিয়ে দিলেন রেশমী সুতোয় বোনা 'খেলাত' বস্ত্র। আর মণিমুক্তা বসানো জোববা। হাতে দিলেন তাম্বুল। সেই পান মুখে দিয়ে বাদশাকে কুর্নিশ করে আট বেহারার তাঞ্জুমে চড়লেন যশোবন্ত সিংহ। তাঞ্জুম যখন যশোবন্তের প্রাসাদ তোরণে পৌঁছল দেখা গেল, তাঞ্জুমে ভেলভেটের গদীর ওপর মহাবীর মৃত, তাঁর দেহ নীল। কেউটে সাপের বিষজলে ভেজানো রেশমী সুতোর বস্ত্রের বিষ লোমকূপ দিয়ে দেহে প্রবেশ করছে। পানে ছিল হীরকচূর্ণ। যশোবন্তের শিশুপুত্রকেও হত্যা করার নির্দেশ ছিল। কিন্তু দুর্জয় বীর রাঠোর দুর্গাদাস তেজী ঘোড়ায় চড়ে প্রভুপুত্রকে কোলে নিয়ে আওরঙ্গজেবের ঘাতক বাহিনীকে শূলাঘাতে বিনষ্ট করে মাড়বারের পথে যাত্রা করেন। সেদিন এক বাদশাহ দুহিতা প্রেমমুগ্ধা জাহানারা, তাঁকে গোপনে পলায়নে সাহায্য করেছিলেন। মহান আকবরের ফরমানে তিনি ছিলেন চিরকুমারী। দুর্গাদাস তাঁকে গ্রহণ করেননি। অবশ্য দুর্গাদাস যবনী স্পর্শ করতেন কি না সে সংশয় ছিল।

আওরঙ্গজেবের লোভ ছিল দামী জহরতের উপর। শুনেছিলেন মীনাক্ষী মন্দিরে বহু শতাব্দী ধরে সঞ্চিত হয়ে আছে হীরা, মুক্তা, স্বর্ণের স্তূপ। উত্তর ভারতের মথুরার কেশব মন্দির, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ মন্দির, কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির চূর্ণ করে মণি-মুক্তা-স্বর্ণ কম পাননি। এবার শাজাহানকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করে আলমগীর চললেন বিশ হাজার অশ্বারোহী সেনা নিয়ে মাদুরা। কাছেই মীনাক্ষী দেবীর স্থাপত্য ভাস্কর্যে মণ্ডিত হিন্দু শিল্পের অনুপম সৃষ্টি সুবিশাল মন্দির।

কিন্তু পথ থেকে ফিরতে হল। খবর পেলেন জয়সিংহের পত্রে। শিবাজী সন্ধি করতে রাজি। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর মোঘল সম্রাটের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি রাজপুত মহাবীর জয়সিংহ ও আর এক সেনাপতি দিলীর খাঁকে— শিবাজীকে ধ্বংস করে কন্যা রোশেনারা উদ্ধারে পাঠিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে 'সিংহগড়ে' ঘটে গেছে এক ভয়ানক কাণ্ড। সেদিন শুক্লাষ্টমী, ঘন নীল আকাশ আলোয় ভরা। বাতাসে ভাসছে গোলাপবাগের সুগন্ধ। শয্যায় আধশোয়া হয়ে রোশেনারা পড়ছেন— হাফেজের প্রেমের কবিতা। সাতটি ঘৃত প্রদীপের আলোয় ঘরটি মায়াময়। সহসা গরাদহীন গবাক্ষে দেখা গেল এক বিরাট মুণ্ডু। মুখে তার চিত্রবিচিত্র মুখোশ। ভয়ঙ্কর এক ভালুক যেন জানালা টপকে লাফিয়ে এসে রজনীগন্ধার মতো সুরূপা রোশেনারার দেহটাকে জাপটে ধরে পিষ্ট করতে লাগল। ককিয়ে কেঁদে উঠলেন রোশেনারা। আর তখনি সহ্যাদ্রি অরণ্যের ভয়ঙ্কর নেকড়ের মতো একটা প্রাণী ঝাঁপিয়ে পড়ল ভালুকটার পিঠে। চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করালো, ছিঁড়ে ফেলল মুখোশ। 'একী! চন্দ্ররাও তুমি? তোমাকে না আমি শাহজাদীর রক্ষী করেছি?' তুলোর বস্তার মতো লোকটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল জানালা দিয়ে। উঁকি মেরে

দেখল, দেওয়ালে ঠেস দেওয়া আছে সুদীর্ঘ রণ-পা। রোশেনারা তখন চেতনা হারিয়েছেন। চোখ যখন খুললেন দেখলেন, গালিচায় রক্ত। হাততালি দিতে এবার আর দাড়িওয়ালা লোকটা এল না, এলেন তারাবাঈ, তানাজীর বিধবা। মুখ গম্ভীর। বললেন, শিবাজী অসুস্থ। এক দুষ্ট লোক তাঁকে ছুরি মেরেছে। আঘাত অবশ্য গুরুতর নয়। শাহজাদীর মনে সংশয়ের ঝড়। তবে কে সে তাঁকে বাঁচাতে রক্ত দিলেন?

তারাবাঈ বললেন, সেই দুষ্ট লম্পটের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময়, খুনেটা শিবাজীকে ছুরি মারে। তারই রক্ত তোমার ঘরের গালিচায়। রোশেনারা বিস্ময়ে, বেদনায় ব্যাকুল হলেন। বললেন, তাঁকে একবার দেখবো।

তারাবাঈ বললেন, তিনি নিজেই আসবেন তোমায় দেখতে, একটা সুখবর দিতে।

দুদিন কাটলো দারুণ প্রতীক্ষায়। তারাবাঈয়ের সঙ্গে এলেন বিচিত্রবেশী এক মানুষ। মাথায় ধুচুনির মতো লম্বা টুপি। যেন বাঙালী বরের মাথায় টোপর। চওড়া কপালে অসামান্য ধীশক্তির আভা, কপাট বক্ষ, শালখুঁটির মতো বিশাল দুই বাহু। দুটি চোখে বিদ্যুৎবহ্নি। রোশেনারা অবাক হলেন, এ যে তাঁর মালকোঁচা মারা খাটো ধুতি পরা ভৃত্য— হাততালি দিতে ছুটে আসে।

—শাহজাদী তোমার মুক্তির দিন সমাগত। সন্ধির কথাবার্তা চলছে।

সেই দুষ্ট লম্পট মরেনি। ছুঁড়ে ফেলে দিতে সে পড়েছিল, প্রাকার পার্শ্বের গড়ের ভিতর। সেখানে জলকাদা আর লতাগুল্মের ঝোপে তার দেহটা আটকে যায়।

চন্দ্ররাও মরেনি। কিন্তু তার একটা পা ভেঙে যায়। সেই ভাঙা পা নিয়ে দু ক্রোশ দূরে মোগল শিবিরে হাজির হয় সে। তার মনে তখন আগুন জ্বলছে। তার গ্রাস থেকে রূপসী নারীকে ছিনিয়ে নিয়েছে শিবাজী। শিবাজীর নিধন তার চাই। মোঘল সেনাপতি বেশ অবাক হলেন। কিন্তু যখন শুনলেন, সিংহগড় দুর্গে প্রবেশের একটা গোপন পথ আছে, সে পথে দুর্গ অধিকার সম্ভব, মোগল সেনাধ্যক্ষ খবর পাঠালেন প্রধান সেনাপতি জয়সিংহকে। জয়সিংহ শিবাজী নিধনে অগ্রসর হলেন। সঙ্গে তার এক লক্ষ মোগল ও রাজপুত সেনা আর বিশাল বিশাল তোপ। শিবাজী প্রমাদ গুণলেন। এবার জয়সিংহ শিবিরে গেরুয়াধারী এক সাধুর আগমন, হাতে একতারা। জয়সিংহ মহাধার্মিক, সাধুসন্তে তাঁর গভীর ভক্তি। এগিয়ে এসে প্রণামের জন্য নত হলেন। সাধু তাঁকে বাধা দিলেন। বললেন, মহারাজ আপনি আমার পিতৃতুল্য, সারা ভারতের হিন্দুগৌরব, প্রণাম আপনার প্রাপ্য। শুধু দুঃখ যবনের ভৃত্য হয়ে হিন্দু নিধনে এসেছেন। যে বিদেশী তুর্কিদের শোষণ অত্যাচার থেকে দেশকে উদ্ধার করতে চায়, চায় হিন্দু স্বাধীন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে।

সন্ন্যাসীর চোখে জল। — চিনেছি তোমায় শিবাজী। নইলে এত দুঃসাহস কার?

মোগল সেনা চিনতে পারলে তোমাকে হত্যা করত।

— বেঁচে লাভ কি? মহাবীর জয়সিংহ আওরঙ্গজেবের সহায় থাকতে স্বাধীন ধর্মরাজ্য স্থাপন সম্ভব হবে না।

— শিবাজী, তোমার স্বপ্ন সার্থক হবে। আমি আর ক'দিন? তবে যশোবন্তের মতো হারবো না।

হিন্দু সত্যে আবদ্ধ। মোগলের চাকরি স্বীকার করেছি। তাই তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবেই।

— মহারাজ আমার চাপল্য ক্ষমা করবেন। কার স্বার্থ রক্ষায় আপনার যুদ্ধ? বিদেশী যবন, যারা সোমনাথ চূর্ণ করেছে, অযোধ্যায় রামমন্দির ভেঙেছে, কেশব মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির, কাশী-বিশ্বনাথ মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়েছে— তাদের ভৃত্য হয়ে আমার মতো হিন্দুধর্ম সেবকের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গড়ার স্বপ্নদর্শীর শিরশ্ছেদ চান আপনি? রক্ত চান আমার। এই মুহূর্তে বক্ষে ছুরিকাঘাত করে তা দিতে পারি। ভুলে গেলেন, আপনার ইষ্টদেব শিবের মন্দিরে বেগম আর্জুমন্দের মৃতদেহ কবর দিয়ে শাজাহান তাকে তাজমহল নাম দিয়েছে!

বৃদ্ধ জয়সিংহের চক্ষুতে ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুৎবহ্নি দেখা গেল। বললেন, — রাজপুতানা আজ বীরশূন্য, আমরা আজ মোগলের দাস। জায়গীর ভোগী মাত্র। সে শক্তি কোথায়?

আছে সে শক্তি, যদি রাজপুত মারাঠা এক হয়। ফুৎকারে উড়ে যাবে বিদেশী যবন।

তা আর সম্ভব নয় শিবাজী। মোগেলর নুন খেয়েছি। হিন্দু কখনও বেইমানী করে না।

কার সঙ্গে বেইমানী! ভারতগ্রাসী নৃশংস হিন্দু ধর্মদ্বেষীদের সঙ্গে! যারা নারীহরণ করে গো-মাংস খাইয়ে ধর্ম নষ্ট করে, এ দেশকে বলে দার-উল-হারব! বিদেশ যুদ্ধ ক্ষেত্র, — তাদের প্রতি আনুগত্য যে দেশদ্রোহিতা! জিজিয়া কর দিতে বুকে জ্বালা করে না?

তোমার কথার প্রতিবাদ করি না। সব কথাই সত্য। তবে আমার সত্য আনুগত্যে। তা থেকে ভ্রষ্ট হতে অপারগ। যুদ্ধ হবে।

শিবাজী বললেন— না, যুদ্ধ হবে না, হবে সন্ধি। জয় করা তেইশটা দুর্গ ছেড়ে দিলেন শিবাজী। হাতে রইল মাত্র বারোটি দুর্গ— তাও বিজাপুরের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া। সন্ধির বড় শর্ত— শাহজাদীর মুক্তি। জয়সিংহ আমন্ত্রণ জানালেন শিবাজীকে আওরঙ্গজেবের দেওয়ানী খাসে উপস্থিত হতে। রাজি হননি শিবাজী। কপট আওরঙ্গজেব। হিন্দু ভারতের দুষমন। শিবাজীকে মিথ্যা স্তোক দিয়ে বন্দী করতে চান তিনি। সেনাপতি দিলীর খাঁ শিবাজীকে খুন করতে পারে। তাই শিবাজীকে আশ্বাস দিলেন। দিল্লীতে শিবাজীর কোনও বিপদ ঘটবে না। তিনি জামিন রাইলেন। শিবাজীও সন্ধি করলেন — সর্তগুলি মেনে নিলেন শাহজাদী রোশেনারার মুখ চেয়ে। সন্ধি হলে শাহজাদী ফিরে যাবেন দিল্লীতে লালকেল্লায় পিতা আলমগীরের কাছে। সন্ধি হচ্ছে। মুক্তি পাবেন— একথায় কিন্তু রোশেনারার মনের মধ্যে কোনও আনন্দ খুঁজে পেলেন না। সেই রঙমহল সেই মদ্যপায়ী লাম্পট্যের উচ্ছৃঙ্খলতা— নেই প্রীতি, স্নেহ, সরল সৌহার্দ্য, নেই মধুর মা ডাক...

এমন সময় এক 'জাসুস' এসে জানালো— বিজাপুর সুলতান মূলানা আহমদের পুত্রবধূকে বন্দিনী করে আনা হয়েছে। শিবাজী ব্যস্ত হয়ে জানালেন, নিয়ে এসো তাঁকে। দোলা থেকে নামলেন বিংশতি বর্ষীয়া এক নারী, রূপের তাঁর অবধি নেই। মাওলে সেনাপতি আবাজি — প্রভুর ভোগের জন্য তাঁকে পাঠিয়েছেন। শিবাজী হেসে বললেন, — মা, তোমার মতো রূপ যদি আমার মায়ের থাকতো তবে আমিও দেখতে রূপবান হতাম।

আমার গুরু রামদাস স্বামী বলেছেন— সব নারী মা ভবানীর অংশ। তাই তুমিও আমার আরাধ্যা মা। যাও ফিরে তোমার মঞ্জিলে। নিয়ে যাও পিতার কিছু উপহার। দিলেন তাঁকে সোনার সুতোয় কাজ করা চুনি, পান্না বসানো পেশোয়াজ। আর হীরা মুক্তা বসানো কণ্ঠহার। দেখা গেল মেয়েটির চোখে জল, মাথা নীচু করে কুর্নিশ করে বললেন, বাপজান, আল্লা আপনাকে দোয়া করুন। তাঁকে রওয়ানা করিয়ে শিবাজী ফিরে এলেন রোশেনারার ঘরে। রোশেনারা তখন হতবাক। — এ কেমন পুরুষ, নারী ভোগের সুযোগ ছেড়েছেন।

— প্রস্তুত হও, কাল সকালে তুমি যাবে শিবিকায় — তোমার বাপজানের কাছে।

— আমি যাবো না। আমায় বেগম করে আপনার দুর্গে ঠাঁই দিন।

— তুমি কি পাগল হয়েছ শাহজাদী! তোমাকে বিবাহ করলে আমার জাত যাবে। হিন্দুরা আমায় ত্যাগ করবে। আমার স্বাধীন হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া তোমার বয়স এখন মাত্র সতের। আমার প্রায় চল্লিশ। তুমি আমার কন্যার মতো। একমাসে তোমায় ভালবেসেছি। তবে সে ভালবাসায় নেই কোনও খাদ। আছে অপত্যস্নেহ। আমার কন্যার বয়স তোমার মতো।

আর সেই জন্যই অনেক ক্ষতি করে সন্ধি করেছি, জয়সিংহর অনুরোধে নয়।

শিবিকায় উঠলেন শাহজাদী রোশেনারা।

বিষাদময়ী তাঁর হাতে শিবাজী তুলে দিলেন হাতির দাঁতের তৈরি একটি পেটিকা। তা খুলে রোশেনারা অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, কবুতরের ডিমের আকারের মুক্তামালা।

বিশ ক্রোশ দূরে আওরঙ্গজেব তাঁর শিবিরে অপেক্ষায় ছিলেন কন্যার। তাঁর প্রথম প্রশ্ন— কুত্তার বাচ্চা, পাহাড়ী ডাকাতটা তাঁর কি বেইজ্জত করেছে?

রোশেনারা জানালেন, বেইজ্জত দূরের কথা এত আদর আপ্যায়ন তিনি দিয়েছেন দিল্লী হারেমেও তা পাননি।

শুনে বাদশা আলমগীর রেগে আটখানা হলেন। যখন দেখলেন লক্ষ মোহর দামের মুক্তাহার, লোভে পাগল হবার দশা হল তাঁর। মনে পড়ল, পিতা শাজাহানের সংগ্রহে রাশি রাশি হীরা জহরত আছে। শাজাহানকে তিনি আগ্রায় বন্দী করে রেখেছেন। এবার কৌশলে সেগুলো হাতাতে হবে।

আগ্রায় বন্দী শাজাহানের কাছে আওরঙ্গজেবের কাছে হরকরাবাহিত 'খত' এল। শাহজাদী রোশেনারা অসুস্থ। নানার কাছে যাচ্ছেন, চিকিৎসার যেন ত্রুটি না হয়।

দিল্লী থেকে এল এক শিবিকা। শিবিকা থেকে নামলেন শাহজাদী রোশেনারা। সে রূপ কই — এ যেন বিকালে ভোরের ফুল। পিতার আদেশে বন্দিনী। তিনি যে কাফের শিবাজীকে দিয়েছেন হৃদয়। করেছেন উদার প্রশংসা। তাই তাঁর স্থান হল আগ্রা দুর্গের গুপ্ত কুঠুরিতে। পাশেই বন্দী শাজাহান। নাতনিকে বুকে তুলে নিলেন। শুনলেন, শিবাজীপ্রেমের কাহিনী। ঠিক করলেন, শিবাজীর হাতেই তুলে দেবেন ছোট রাঙা গোলাপটিকে।

কিন্তু কোথায় শিবাজী? দেওয়ানী খাসে। আলমগীর পাঁচহাজারী মনসবদারের সারিতে দাঁড় করালেন মারাঠি সিংহকে। অপমান করাই উদ্দেশ্য ছিল। দারুণ অসম্মানে চেতনা হারালেন শিবাজী। তাঁকে বন্দী করে রাখা হল আগ্রাতেই স্বতন্ত্র এক প্রাসাদে। জয়সিংহ পুত্র রাম সিংহ আর ফৌজদার ফুলাদ খাঁ রইলেন তাঁর পাহারায়। এ নিদারুণ খবর পৌঁছালো আগ্রা দুর্গে। রোশেনারা আর্তকান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধ নানার কোলে।

— "আমি ভারতসম্রাট শাজাহান এখনও জীবিত। কোটি মোহরের জহরত আছে আমার। উৎকোচে কী না হয়? শাজাহান আশ্বাস দিলেন নাতনিকে। এমন সময় আগ্রা দুর্গে এল এক খুবসুরত নাচনেওয়ালী। শাজাহানের সুরা আর রূপের তৃষ্ণা তখনও যায়নি। শাহজাদীর হাতে গোপনে সেই বারনারী পৌঁছে দিল এক চিরকূট— তাতে এক অজানা বন্ধু জানিয়েছেন, শিবাজী আগ্রা থেকে পালাবেন — পরিকল্পনা প্রস্তুত। শাহজাদী কি সহযাত্রী হবেন? তাঁকেও উদ্ধারের ব্যবস্থা হবে। চিরকূট পড়ে উৎফুল্ল হলেন শাজাহান। নাতনিকে বললেন, ছোটি পিয়ারি, পালাও আমি রাস্তা বাৎলে দেব। পিসিমা জাহানারাও ভাইঝিকে আশ্বাস দিলেন, তাঁরও যে ওই একই জ্বালা, রাঠোর দুর্গাদাসকে তিনি হৃদয় দিয়েছিলেন।

বাধা হল— মহান আকবরের নিষ্ঠুর নির্দেশ। মোগল কুমারীরা বিবাহ করতে পারবে না। যদিও হিন্দু রাজপুতানীকে বেগম বানিয়েছেন মোগল বাদশা। শুধু পদ্মিনীর মতো সতী নারী জওহরব্রতে যবনের মুখে পয়জার মেরে হিন্দু নারীর সতী ধর্মের মহিমা দেখিয়েছেন। কাফের কুত্তা, দস্যু শিবাজীকে ঘৃণা করতেন জাহানারা। সুরাট বন্দরের কোটি টাকার শুল্ক তাঁর প্রাপ্য ছিল। সেই সমৃদ্ধ নগর শিবাজী লুঠ করেন, ধ্বংস করেন বাণিজ্য কুঠিগুলো। জাহানারা দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু ভাইঝি রোশেনারার মুখে যখন শুনলেন শিবাজীর মহত্ত্ব ও উদারতার কথা, জানলেন তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্রের কথা। রোশেনারা স্বেচ্ছায় শিবাজীর বেগম হতে চাইলেও, শিবাজী তাকে কন্যা রূপেই ভালবেসেছেন— মোগল রঙমহলের নরক থেকে উদ্ধার করতে হয়েছেন অভিলাষী। তাই পিতা শাজাহানের সঙ্গে রোশেনারার পলায়নের পরিকল্পনায় যোগ দিয়েছেন। আওরঙ্গজেবের আর এক কন্যা জেবুন্নিষাও প্রেমে পড়েছিল রাজপুতবীর ছত্রসালের। তাকে তিনি রক্ষা করতে পারেননি। সহসা একদিন শাহজাদী জেবুন্নিষা নিখোঁজ হয়েছিলেন, আলমগীরের রোষ এমনই ভয়ঙ্কর।

এল 'নওরোজ', নতুন বছরের উৎসবের দিন। দিল্লী থেকে দূত এল আগ্রায় শাহজাহানের কাছে নওরোজের সওগাত নিয়ে। সোনার থালায় রেশমী ঢাকনাটা খুলেই শাজাহান চেতনা হারালেন। দেখলেন, ছিন্নমুণ্ড। তা তাঁর প্রিয়পুত্র দারা শিকোর। পেলেন এক রক্তে রাঙা খত। তাতে ফরাসী জবানে লেখা হয়েছে— শাজাহানের কাছে যে মোগল দরবারের মণিমুক্তা হীরা জহরতের সঞ্চয় আছে, তাতে বর্তমান বাদশার অধিকার। অবিলম্বে তা যেন দূতের হাতে ফেরত পাঠানো হয়। রুষ্ট হয়ে শাজাহান খোজা রক্ষীকে আদেশ করলেন, একটা হামানদিস্তা আনতে। আপন হাতে মরক্কো চামড়ায় ভরা হীরা, মুক্তাগুলিকে হামানদিস্তায় চূর্ণ করে যমুনায় নিক্ষেপ করলেন। রাতের আধার যখন নামে

পূর্ণিমায় পূর্ণ চাঁদের আলোয় যখন আকাশ ভরে যায়, আগ্রা দুর্গের অলিন্দ থেকে তাজমহলের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ পঙ্গু শাজাহানের মনে পড়ে তিনিও একদিন তার বড় ভাই খসরুকে গলা টিপে মেরেছিলেন। ছোট ভাই শাহরিয়রকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করেছেন। আল্লা তাই প্রেমময়ী বেগম আর্জুমন্দকে অকালে বেহেস্তে টেনে নিলেন। প্রিয়তমাকে হারানোর বেদনা তাঁর বুকে শেলের মতো বিদ্ধ হয়ে আছে। রোশেনারাকে সে দুঃখ পেতে দেবেন না। রোশেনারা কিন্তু গোপনে পালাতে রাজি হলেন না। ক'মাসে তিনি বদলেছেন, দেহ ও মনে। ছিলেন ভোগ বিলাসে অভ্যস্ত আদরিণী শাহজাদী, কাফের হিন্দুদের প্রতি তীব্র ঘৃণা। শিবাজীর ক'মাসের সাহচর্যে বুঝেছেন, যথার্থ ভালবাসা কি, ভোগে নয়, ত্যাগেই প্রেম সার্থক। শিবাজীর গৃহে যদি তিনি আশ্রয় নেন, বেগম নয়, কন্যা রূপেও, তাহলে বাদশা আলমগীরের ক্রোধে শিবাজী ভস্মীভূত হবেন। আর শিবাজী হিন্দু সমাজে পরিত্যক্ত হবেন যবনী গমনের অলীক অপবাদে। তাঁর হিন্দু স্বাধীন ধর্মরাজ্য গঠনের স্বপ্নও মিথ্যা হয়ে যাবে।

বারবধূটিকে বললেন, রাজা যেন তাঁকে ভুল না বোঝেন। মরণের পরেও যদি কিছু থাকে, সেখানে বেগম নয়, কন্যা রূপে রোশেনারা তাঁর।

শিবাজী সুকৌশলে চতুর আওরঙ্গজেবের শ্যেন চক্ষু ফাঁকি দিয়ে নানা ছদ্মবেশে হাজার মাইল, কখনও ঘোড়ায়, কখনও নৌকায়, কখনও পায়ে হেঁটে রায়গড় দুর্গের দরজায় এসে ঘন্টায় ঘা দিলেন। উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় পরিশ্রান্ত দেহটা মা জিজাবাঈয়ের কোলে ফেলে দিলেন। আর তার ক'দিন পরে ঘোর অমাবস্যার আঁধারে দুজন খোজা যমুনার নীল জলে কালো কাপড়ে মোড়া, একটা ক্ষীণ দেহ পাথরে বেঁধে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে দেহ শাহজাদী রোশেনারার। রামসিংহের জায়গীর জপ্ত হল। মনসবদারী খতম। জয়সিংহ পেলেন, খেলাৎ, হীরের গুঁড়ো করা তাম্বুল। আওরঙ্গজেব মহা দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, মোগল দরবারের পরমসুহৃদ মহাবীর জয়সিংহ সহসা ষাট বছর বয়সে হৃদরোগে এন্তেকাল প্রাপ্ত হয়েছেন।

শতবর্ষের আলোকে

১৯০৮ সালের বোমার গল্প

অধ্যাপক রবি রঞ্জন সেন

২মে ১৯০৮-এর সকাল। ভগিনী সরোজিনীর চীৎকারের শব্দে শ্রীঅরবিন্দের ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলতেই তিনি দেখেন সরোজিনী দৌড়ে ঘরে প্রবেশ করছেন ও তাঁর পিছন পিছন দুজন রিভল্‌ভারধারী ব্যক্তি। তারা ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করে, 'আপনি কি অরবিন্দ ঘোষ'? এই দুজন ছিলেন সুপারিন্টেন্ডেটস্ ক্রীগন ও ক্লার্ক এবং তাদের সঙ্গে ছিলেন তিনজন ইন্স্‌পেক্টর, দুজন সাব-ইন্স্‌পেক্টর, ছয়জন সার্জেন্ট ও ২৫-৩০ জন হাবিলদার। অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার করার পর সাড়ে পাঁচ ঘন্টা ধরে গ্রে স্ট্রীটের এই 'নবশক্তি' পত্রিকার কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে কাগজ নথি সেখান থেকে বাজেয়াপ্ত হয়।

১লা মে ১৯০৮ রাতে কলকাতার পুলিশ কমিশনারের বাস - ভবনে শহরের সমস্ত প্রধান পুলিশ অফিসারদের নিয়ে উচ্চস্তরীয় বৈঠক সম্পন্ন হয়। এই বৈঠকে আটটি দলে ভাগ করে তাদের শহরের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয় তল্লাশি এবং গ্রেপ্তার অভিযানের প্রস্তুতি হিসেবে।

অন্য সাতটি তল্লাশির দলও ইতিমধ্যে উত্তর কলকাতার বিভিন্ন ঠিকানায় পৌঁছে যায় — ৩৮/৪ নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে হেমচন্দ্র দাসকে গ্রেপ্তারের পর তাঁর রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ও পুস্তক বাজেয়াপ্ত করে। ১৫ গোপী মোহন দত্ত লেন থেকে কিছু রাসায়নিক দ্রব্য ও নোটবইয়ে লেখা ফর্মুলা বাজেয়াপ্ত হয় এবং নিরাপদ রায় ও কানাইলাল দত্ত গ্রেপ্তার হয়। ৪ হ্যারিসন রোড ও ২৩ স্কট লেনে তল্লাশি সত্ত্বেও বিশেষ কিছুই মেলে না। ৩০/২ হ্যারিসন রোডে পাওয়া কিছু সন্দেহজনক নথিপত্র বাজেয়াপ্ত হয়। ১৩৪ হ্যারিসন রোডে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার সহ একটি ট্রাঙ্কের মধ্যে প্রায় দুই শত বোমা বানানোর মতো পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে।

কিন্তু পুলিশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসে মাণিকতলার মুরারিপুকুরে যেখানে অরবিন্দর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সহ ১৫ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রচুর পরিমাণে বোমা, অস্ত্র, বিস্ফোরক পদার্থ ও নথিপত্র বাজেয়াপ্ত হয়। গ্রেপ্তার করা বিপ্লবীদের লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ৪-৫ মে সেখান থেকে আলিপুর জেল নিয়ে যাওয়া হয়। ১৫ মে ২৪ পরগণা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে শুরু হয় যা বাংলা এবং ভারতের ইতিহাসে আলিপুর বোমা মামলা নামে বিখ্যাত। এই বিখ্যাত মামলা শুধু যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নতুন পথ দেখিয়ে ছিল তাই নয়, তৎকালীন বাঙালী সমাজকে প্রচন্ডভাবে নাড়িয়ে তুলেছিল এবং বাঙালী চিন্তায় ও কল্পনায় এখনও কিংবদন্তীর আকার ধারণ করে আছে।

বাংলায় বিপ্লবের ইতিহাসের প্রাক্‌কথন

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস শুরু হয় ১৮৬০-৭০-এর দশক থেকেই যখন আমরা প্রথম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যযুক্ত কিছু আখড়া ও গুপ্ত সমিতির উল্লেখ পাই। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' তে ১৮৭০-এর দশকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ছোটবেলার গুপ্ত সমিতি খেলার তিনি উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমের রচনা, বিশেষ করে 'আনন্দমঠ', 'ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন' প্রভৃতিতে শরীর চর্চা, নীতি-শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশীলনের সঙ্গে দেশাত্মবোধের সংমিশ্রণ ঘটে। ১৮৯০-এর দশকে বিবেকানন্দের শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের বার্তা এবং নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকে ওকাকুরা ও নিবেদিতার প্রভাব বাঙালী যুবকদের একাংশকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

প্রকৃত গুপ্ত সমিতির কাহিনী অবশ্য শুরু হয় ১৯০২ তে, যে সালে চারটি সমিতি গঠন হয় — তিনটি কলকাতায় ও একটি মেদিনীপুরে। এই চারটি দলের মধ্যেই একটি ছিল অনুশীলন সমিতি, যা ২১ মদন মিত্র লেন-এ, ২৪ মার্চ ১৯০২ (দোল পূর্ণিমার দিনে) সতীশচন্দ্র বসু

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই অনুশীলন সমিতিকে প্রকৃত গুপ্ত সমিতি হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্বভার পান ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র এবং বরোদা ফেরত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বৃটিশ সরকারের অত্যাচারী চরিত্রকে আরও স্পষ্ট করে তোলে এবং বাঙালী জনগণের মধ্যে অত্যাচারী বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষকে ক্রমশ তীব্র করে তোলে। ১৯০৬ সেপ্টেম্বর বিপিনচন্দ্র পাল ও প্রমথনাথ মিত্র ঢাকার অনুশীলন সমিতির শাখা উদ্বোধন করেন। সরলা দেবীর আখড়ার প্রশিক্ষিত পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে এই ঢাকা অনুশীলন সমিতি পরবর্তীকালে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

চরমপন্থী সাংবাদিকতা — 'অগ্নিযুগের ত্রিমুখী পাঞ্চ জন্য'

চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ এবং সশস্ত্র বিপ্লবের বার্তাকে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য এই সময়ে তিনটি সংবাদপত্র শুরু হয় — বাংলা সাপ্তাহিক 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' এবং ইংরাজী দৈনিক 'বন্দে মাতরম্'। ত্রিমুখী পাঞ্চ জন্য হিসাবে বর্ণিত এই তিনটি সংবাদপত্রের মধ্যে অগ্রজ ছিল 'সন্ধ্যা' — ১৯০৫ এর ৭ আগস্ট ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ১৯০৬-এর গোড়ার দিকে কেবলমাত্র লাঠি খেলা ও শরীর চর্চায় অসন্তুষ্ট হয়ে অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নেতৃত্বে অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সহ কলকাতা অনুশীলনেরই একদল যুবক 'খাঁটি সশস্ত্র বিপ্লবতন্ত্রের কাগজ' হিসাবে 'যুগান্তর' পত্রিকা চালু করে। ১৮ মার্চ ১৯০৬ তে প্রকাশিত 'যুগান্তর'-এর প্রথম সংখ্যাই ঘোষণা করে যে স্বদেশ আগে, স্বদেশী — স্বদেশ ছাড়া স্বদেশী অর্থহীন। পরবর্তী (অর্থাৎ নিজের দেশের উৎপাদিত দ্রব্য) পরে কে বলা হয়েছিল 'The first and most সময়ের বৃটিশ সরকারি রিপোর্টে 'যুগান্তর'- of Calcutta.' perricious of the revolutionary papers

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

'বন্দে মাতরম' দৈনিকও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পালের প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছিল। পরে অরবিন্দ ঘোষ এই কাগজের কর্ণধার হিসেবে পরিচিত হন। ৭ আগস্ট ১৯০৬-তে 'বন্দে মাতরম্' এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সময় অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' বারোদা থেকে এনে কলকাতার একটি ছাপাখানায় গোপনভাবে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়। 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠী দ্বারাই প্রকাশিত দুটি জাতীয়তাবাদী পত্রক, 'রাজা কে?' এবং 'সোনার বাংলা' সমগ্র বঙ্গে ব্যাপক সাড়া জাগায়। মার্চ ১৯০৬-তে মেদিনীপুরে 'রাজা কে?' বিতরণের দায়ে একটি ১৬ বছরের যুবককে গ্রেপ্তার করা হয় ও রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা করা হয়। এই যুবকটির নাম ক্ষুদিরাম বসু।

১৯০৭-এর ৭ জুন 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' ও 'বন্দে মাতরম্'-এই 'ত্রিমুখী পাঞ্চ জন্য'-র সম্পাদকদের নামে সরকার দ্বারা রাজদ্রোহের নোটিশ পাঠানো হয়। ৫ জুলাই ওই একই অভিযোগে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয় ও ২৪ জুলাই চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড তাঁকে এক বছর সশ্রম কারাদন্ডের সাজা দেন। ১৬ আগস্ট অরবিন্দ গ্রেপ্তার হন, ৩ সেপ্টেম্বর ব্রহ্মবান্ধব গ্রেপ্তার হন, যুগান্তরের প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে 'যুগান্তর'-এর বিরুদ্ধে ক্রমাগত রাজদ্রোহের মামলার ফলে এর বিক্রি সংখ্যা খুব দ্রুত ২০০ থেকে ৭,০০০ স্পর্শ করে এবং তারপর ২০,০০০ ছাড়িয়ে যায়। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা হিসাবে 'যুগান্তর' এর আবির্ভাব হয়!

মাণিকতলা বাগান বাড়ি

১৯০৭-এর গোড়ার দিক থেকেই বারীন ঘোষ তৎকালীন কলকাতার শহরাঞ্চলের বাইরে ৩২ মুরারিপুকুর রোডে অবস্থিত তাঁর পারিবারিক একটি বাগান বাড়িতে সময় কাটাতে শুরু করেন। অক্টোবর ১৯০৭-এর মধ্যে এই মাণিকতলা বাগান বাড়িকে কেন্দ্র করে একটি নতুন সমিতি গড়ে ওঠে। এই সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন বারীন ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উল্লাস্কর দত্ত, প্রফুল্ল চাকী, বিভূতি ভূষণ সরকার, অবিনাশ ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, নলিনীকান্ত গুপ্ত, পরেশ মল্লিক, শিশির ঘোষ, ইন্দ্রভূষণ রায়, বিজয় কুমার নাগ, শচীন সেন, নরেন্দ্রনাথ বক্সী, পূর্ণ চন্দ্র সেন, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, নিরাপদ রায় প্রমুখ। বলা বাহুল্য, সর্বোপরি নেতৃত্বে ছিলেন শ্রী অরবিন্দ যদিও তিনি সরাসরি সশস্ত্র কার্যের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন না।

এই মাণিকতলা গুপ্ত সমিতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই কারণেই যে এটি আধুনিক ভারতের প্রথম স্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যযুক্ত সশস্ত্র ও সংগঠিত বিপ্লবী দল। পরবর্তীকালে বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশে গঠিত বিপ্লবী দলগুলির কাছে অনেক ভাবেই 'মডেল' হয়ে থাকে এই মাণিকতলা গুপ্ত সমিতি। পরবর্তী প্রজন্মের বিপ্লবীদের বিভিন্নভাবে প্রেরণা জোগায় এবং প্রভাবিত করে এই সমিতির কাহিনী। সমিতির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। উল্লেখযোগ্য, ভারতের চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ২৫ বছর পূর্বেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতাকে লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছিল। 'যুগান্তর'-এর তৃতীয় সংখ্যাতেই অরবিন্দ লিখেছিলেন যে আমাদের শৈক্ষিক, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে কোনভাবে স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে।

মাণিকতলায় বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ পর্ব

সমিতির সদ্যসদের স্মৃতিচারণা এবং পুলিশী তল্লাশির সময় প্রাপ্ত নথিপত্র থেকে আমরা আধুনিক ভারতের প্রথম সংগঠিত বিপ্লবী দলের

মানিকতলা বোমা মামলার সেই বিখ্যাত বাগানবাড়ি।

অনুগামীদের প্রশিক্ষণ এবং এই বাগানবাড়ির কঠোর জীবনযাপনের বিবরণ পাই। সমিতির কার্যপদ্ধতির দুটি দিক ছিল — একটি গোপন প্রচার ও সদস্য বৃদ্ধি, অপরটি সামরিক — আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা, বোমা তৈরি ইত্যাদি। সামরিক শিক্ষা ছাড়াও রাজনৈতিক শিক্ষা শারীরিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা এখানে বিপ্লবীদের পাঠক্রমের অংশ ছিল। অর্থনীতি, ইতিহাস ও ভূগোল ছিল রাজনৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে ছিল সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা', মাৎসিনির আত্মজীবনী, কুমুদিনী মিত্রের 'শিখের বলিদান'। একদিকে বিপ্লবের দর্শন ও রুশো-জাপানী যুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হত, অপরদিকে বিভিন্ন বিস্ফোরক রাসায়নিক পদার্থ সংক্রান্ত সামরিক শিক্ষা প্রদান করা হত। আবার আরেকদিকে গীতা উপনিষদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হত।

সমিতির বিপ্লবী শিক্ষার্থীদের ভোর ৪ টায় উঠতে হবে। দুই ঘন্টা শরীরচর্চা, ব্যায়াম ও ধ্যানের পর প্রথম ক্লাস শুরু হত। ক্লাসের পর রান্না এবং টার্গেট প্র্যাক্টিস্। দুপুরে অল্প বিশ্রামের পর আবার রাত দশটা পর্যন্ত আরও ক্লাস— ব্যায়াম, পড়া, রান্না, ধ্যান ইত্যাদি ছিল সেখানকার নিয়মিত জীবনের অঙ্গ।

এই সমস্ত পাঠক্রমে উত্তীর্ণ বিপ্লবীদের দুটি শপথ গ্রহণ করতে হতো — একটি সংস্কৃত ও একটি বাংলা। বৈদিক মন্ত্রের ধাঁচে রচিত সংস্কৃত শপথটিতে বরুণ, অগ্নি সহ অন্যান্য দেবদেবী এবং পিতৃপুরুষদের স্মরণ করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করার অঙ্গীকার ছিল। তারপর অস্ত্র প্রণাম করে আদ্যা শক্তির নম নিয়ে তরবারি হাতে তুলে নিতে হতো। বাংলা শপথ গ্রহণের সময়ও তরবারি ও গীতা হাতে নিতে হতো।

বাংলায় বিপ্লবী কার্যকলাপের সূচনা

নভেম্বর ১৯০৭-এ বাংলার ছোট লাট স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেসারকে হত্যার পরিকল্পনা বাংলায় বিপ্লবী যুগের সূচনা করে। ৫ নভেম্বর ফ্রেসারের ট্রেনের তলায় ডাইনামাইট দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাবার চেষ্টা হয় কিন্তু এই প্রচেষ্টা বিফল হয়। ৫ ডিসেম্বর খড়্গপুরের কাছে নারায়ণগড়ে একই প্রচেষ্টা করা হয় — সেই বিস্ফোরণে ফ্রেসারের ট্রেন প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তিনি বেঁচে যান। ১৯০৮-এর জানুয়ারিতে চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট স্যার ডগ্‌লাস কিংসফোর্ডকে হত্যা করার পরিকল্পনা হয়। এই কিংসফোর্ডই 'যুগান্তর' মামলায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে জেলে পাঠিয়েছিলেন এবং ১৪ বছরের বালক সুশীল কুমার সেনকে বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়েছিলেন। একটি আইন গ্রন্থের মাঝখানটা কেটে গর্ত করে তার মধ্যে বোমা ভরা হল, এমনভাবে যে বইটি খুলতে গেলেই বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয় কারণ কিংস্‌ফোর্ড বইটিকে না খুলেই বইয়ের তাকে তুলে রেখে দেন।

১১ এপ্রিল চন্দননগরে ফরাসী গভর্ণর তার্দিভেল-কে হত্যার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। যদিও এই প্রচেষ্টায় তার্দিভেল আহত হন। সেই মাসেই দলনেতা বারীন ঠিক করেন যে কোনও মূল্যে কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করতে হবে — কিন্তু ইতিমধ্যে কিংস্‌ফোর্ড মুজফ্‌ফরপুরে বদলি হয়ে যান। ঠিক করা হয় যে রঙপুরের তরুণ বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী এবং সেই সঙ্গে সুশীল সেন যাকে তিনি বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়েছিলেন — এই দুজন মুজফ্‌ফরপুর গিয়ে কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে শ্রীহট্টে পিতার মৃত্যুশয্যার খবর পেয়ে সুশীল বাড়ি ফিরে যায়। সুশীলের বিকল্প হিসাবে তখন মেদিনীপুর থেকে ১৮ বছরের তরুণ ক্ষুদিরাম বসুকে চয়ন করা হয়।

মুজফ্‌ফরপুরের হত্যাকাণ্ড

এপ্রিলের শেষে, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল মুজফ্‌ফরপুর গিয়ে একটি ধর্মশালায় ওঠে। তাদের সঙ্গে ছিল একখানা অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা ও তিনটি রিভল্‌ভার। ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যাবেলায় তারা মুজফ্‌ফরপুর ক্লাবের সামনে ময়দানে সময় কাটিয়ে কিংস্ফোর্ডের বাড়ির ঠিক বিপরীত গাছের আড়ালে একটি অন্ধকার জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। রাত ৮.৩০ নাগাদ ক্লাব থেকে একটি ঘোড়ার গাড়ি বেরিয়ে কিংস্‌ফোর্ডের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছতেই গাছের আড়াল থেকে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল দৌড়ে বেরিয়ে আসে এবং কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ি ভেবে ক্ষুদিরাম বোমা ছোঁড়ে। কিন্তু গাড়িতে কিংস্‌ফোর্ড ছিল না, ছিল তার বন্ধু প্রিঙ্গল্ কেনেডীর স্ত্রী ও কন্যা। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেনেডী-কন্যা গুরুতরভাবে জখম হয়ে ঘটনার এক ঘন্টার ভিতরে মারা যান — তার মা মিসেস্ কেনেডীও দুই দিন পর মারা যান।

অন্যদিকে, বোমা ছোঁড়ার পর মুহূর্তেই ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী দৌড়াতে শুরু করে। ক্লাবের সামনে পুলিশ পাহারাদাররা তাড়া করার চেষ্টা করেও পারে না। ধর্মশালা পৌঁছে দুইজন আলাদা পথে পালাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ক্ষুদিরাম রাতের মধ্যে ২৪ মাইল পথ অতিক্রম করে সমস্তিপুর থেকে ৮ মাইল দূরে ওয়াইনি বলে একটি ছোট শহরে এসে একটি দোকানে মুড়ি খেতে বসে। খেতে খেতেই দুজন ব্যক্তি এসে তাকে জেরা করতে শুরু করে। তাদের একজনের পায়ে বুট দেখে সে সঠিক অনুমান করে যে তারা পুলিশের লোক। পালাবার চেষ্টা করায় তাকে পিছন থেকে জাপ্‌টে ধরে। পোঁটলা থেকে রিভল্‌ভার বার করে সে গুলি করার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। সেদিন দুপুরেই তাকে মুজফ্‌ফরপুর নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে সে গত রাতের ঘটনার জন্য পূর্ণ দায়িত্ব মেনে নিয়ে স্বীকারোক্তি দেয়।

ইতিমধ্যে প্রফুল্ল মুজফ্‌ফরপুর থেকে বেরিয়ে ১ মে দুপুরে সমস্তিপুর জংশনে পৌঁছায়। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ মোকামার ট্রেনে উঠে তার এক

বাঙালী সহযাত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপ হয়। এই যাত্রীটি ছিলেন পুলিশের সাব-ইন্স্পেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি ইতিমধ্যে মুজফ্ফরপুরের ঘটনা ও দোষী ধরাতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কারের ঘোষণা শুনেছিলেন। ট্রেন ছাড়ার পূর্বেই নন্দলাল মুজফ্ফরপুরে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাঁর সন্দেহ ব্যক্ত করেন।

গ্রেপ্তারের পর (দিরাম বোস।

রাতে নন্দলালের ক্রমাগত প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে প্রফুল্ল ট্রেনের অন্য ডিববায় চলে যায় যদিও পরদিন সকালে নন্দলালের সঙ্গে বসে জল-খাবার খায়। মোকামা পৌঁছাতেই একটি সাধারণ পোশাকের পুলিশ নন্দলালের টেলিগ্রামের জবাব নিয়ে আসে, যাতে লেখা ছিল, 'Arrest and bring the man here.' প্রফুল্লের দিকে তাকিয়ে নন্দলাল জানায় যে তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে — প্রফুল্ল দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু তিনটি হাবিল্দার তাকে ধরতে গেলে সে প্রথমে তাদের দিকে গুলি করে ব্যর্থ হয়, তারপর পরিস্থিতি বুঝে নিজের মুখে রিভল্ভার ঢুকিয়ে গুলি করে। এইভাবে ১৯০৮ এর ২ মে মোকামা জংশনের প্ল্যাটফর্মে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী মৃত্যুবরণ করে।

হাসি হাসি পরব ফাঁসি ....

ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয় এবং মুজফ্ফরপুরের অ্যাডিশনাল সেশন্স্ জজের আদালতে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। হাইকোর্ট এই রায় বহাল রাখে এবং ১১ আগস্ট ১৯০৮ ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়। ১০ আগস্ট সে উকিলকে বলেছিল, "পুরাতন দিনের রাজপুত মহিলাদের মতো নির্ভয়ে আমি মৃত্যুবরণ করব।" পরের দিন ভোরে মাথা উঁচু করে সহাস্য বদনে ক্ষুদিরাম ফাঁসিকাঠে চড়েছিল। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ইংরাজী দৈনিক 'বন্দে মাতরম্' লেখে, 'He not only read the Gita but also acted it.'

ধরপাকড়

মুজফ্ফরপুর ঘটনার খবর কলকাতায় পৌঁছাতেই পুলিশ এবং সি আই ডি কাজে নেমে পড়ে। পুলিশ কমিশনার হ্যালিডের বাড়িতে ১ মে রাতের বৈঠকে বাগানবাড়ি সহ আটটি স্থানে একসঙ্গে তল্লাশি অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। অন্যদিকে বাগানবাড়িতেও বারীন এবং অন্যরা সংবাদপত্রের মুজফ্ফরপুরের খবর দেখে পরিস্থিতি যে অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ তা বুঝতে পেরে পরদিন সকালে বাগানবাড়ি ছেড়ে অন্য কোনও নিরাপদ স্থানে চলে যাবার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু এই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার পূর্বেই ভোর ৪টার সময় বাগানবাড়িতে পুলিশ এসে উপস্থিত হয়!

মামলা ও পরবর্তী

মামলা শুরুর পূর্বেই মুজফ্ফরপুরের ঘটনা এবং কলকাতার ধরপাকড় সারা দেশে একটা ঝড় তুলে দেয়। রাজধানী কলকাতায় বৃটিশ রাজ এবং পুলিশের ঠিক নাকের তলায় এরকম একটি সংগঠিত বিপ্লবী দলের অস্তিত্বই বৃটিশ এবং ভারতীয় উভয়কেই অবাক করে দেয়। এতদিন বৃটিশদের চোখে এবং অনেকাংশে বাকি ভারতবর্ষেও বাঙালীকে নিরীহ, কাপুরুষ এবং শারীরিকভাবে দুর্বল জাতি হিসাবে দেখা হত। এই দুর্বল ও নিরীহ জাতি যে এত ভয়াবহ ধরনের কার্যকলাপ চালাতে পারে তা অনেকের পক্ষেই বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। সংবাদপত্রে প্রশ্ন ওঠে যে 'এও কি সম্ভব যে এতদিনকার ভীরু বাঙালী এই ধরনের হত্যাকাণ্ড চালাতে পারে? 'Indian World' সংবাদপত্র মন্তব্য করে, 'Say what you may, all this is a glorious vindication of Bengalee character.' লাহোরের 'Observer' মন্তব্য করে যে অবশেষে মেকলের ওপর বাঙালী প্রতিশোধ নিয়েছে ('the Bengalee has been avenged upon Makaulay')!

বারীন্দ্র কুমার

মামলার অভিযোগ পত্র তৈরি হতেই তিন মাস লেগে যায়। এই সময়ে ভয় ও বৃটিশ প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (বিপ্লবী ইতিহাসে নরেন গোঁসাই নামে কুখ্যাত) অন্য আসামীদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হতে রাজি হয়ে যায়। অরবিন্দের বিরুদ্ধে ও নরেন গোঁসাই সাক্ষী দেয়। ৩১ আগস্ট ১৯০৮ মেদিনীপুরের বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত।

আলিপুর জেলেই সকাল ৭.৩০-তে নরেন গোঁসাইকে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে গুলি করে হত্যা করেন। এই অপরাধে ১০ নভেম্বর কানাইয়ের ফাঁসি হয় ও ২১ নভেম্বর সত্যেন-এর।

বাকি আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র তৈরি হবার পর সেশন্স্ আদালতে প্রকৃত মামলা শুরু হয় ১৯অক্টোবর ১৯০৮। এই মামলার জন্য বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যা পূর্বে কোনও মামলার জন্য হয়নি। মামলা ছয় মাস চলে — অবশেষে ৬ মে ১৯০৯-এ ২৪

পরগণার জেলা অ্যাডিশনাল সেশন্‌স্ জজ্ চাল্‌স পর্টেন বীচক্রফ্‌ট মামলার বিচারের রায় শোনান — বারীন ঘোষ ও উল্লাস্কর দত্তের ফাঁসি, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস সহ নয় জনের আজীবন দীপান্তর, আটজনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ড। চিত্তরঞ্জন দাসের দক্ষ ওকালতির জেরে অরবিন্দ রেহাই পান। হাইকোর্টে আপীল মামলায় বারীন ও উল্লাস্করকে ফাঁসির পরিবর্তে আজীবন দীপান্তরের সাজা দেওয়া হয়।

এক বছর জেলে থাকাকালীন অরবিন্দের জীবন দর্শনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। ১৯০৫-এ তিনি যোগ-সাধনা শুরু করেছিলেন। প্রধানত তাঁর দেশাত্মবোধক কাজের জন্য আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে। ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক জীবন এবং সাধনার গুরুত্ব বেড়ে চলে এবং অন্য কাজ বরং তাঁর যোগের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯০৯-তে জেল থেকে মুক্ত হবার পরও তিনি রাজনৈতিক কাজে নেতৃত্ব দেন, লেখনী, ভাষণ এবং জনসভার মাধ্যমে। ১৯১০-এর গোড়াতে যখন চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর প্রবল সরকারি নিপীড়ন নেমে আসে তখন অরবিন্দ অন্তরাত্মার আদেশ মেনেই প্রথমে চন্দননগর তারপর পন্ডিচেরি যান। যাবার সময় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কিছুদিন বাদে আবার ফিরে আসার, কিন্তু তা আর হল না — পন্ডিচেরি গিয়ে চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতা অরবিন্দ ঘোষ হলেন আধ্যাত্মিক জগতের বিশ্ববিখ্যাত উজ্জ্বল তারকা শ্রীঅরবিন্দ।

তনয়া

সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত

উড়োজাহাজ ও মিমি

আকাশ দিয়ে গর্জন করে একটা এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে। মিমি জানালার গরাদে মুখ রেখে ওপরের দিকে তাকাল। জানালার ওপারে যে একটুকরো আকাশ, সেখানে এরোপ্লেনটা নেই। ওটা তবে গেল কোথায়? মিমির চোখের তারা চারপাশে ঘুরতে থাকে হারানো এরোপ্লেনের খোঁজে। মিমির বয়স চবিবশ। এখনও ওর চোখ কেন আকাশে এরোপ্লেন খোঁজে?

ঝিমলি, ওর ছোট বোন, টিউশান পড়ে বাড়িতে ঢুকল। ঢুকেই দেখল, দিদি জানালার গরাদ ধরে মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সময়টায় ওকে ধরে বার দুই-তিন ঝাঁকুনি দিতে হয়। তবে ওর হুঁশ ফেরে। ছোটবেলায়, দক্ষিণেশ্বর ব্রিজ দিয়ে গম্ গম্ করে ট্রেন যেত, ওরা দু-বোনে ছুটে উঠে যেত দোতলার ছাদে। সেখান থকে পরিষ্কার দেখা যেত ট্রেনটাকে। মাঝে-মাঝে ওরা চলে যেত বালিঘাট স্টেশনে। স্টেশন মাস্টারকে ডাকতো 'স্টেশন-কাকু' বলে। ওদের দেখলেই কাকু বলত, 'ট্রেন দেখবি? আয়। যা, ওই স্টপ লেখা বোর্ডটার সামনে গিয়ে দাঁড়া। শুধু ট্রেন কেন, যে চালায় তাকেও দেখতে পাবি।'

ওরা দেখত, হুম-হুম করে ছুটে আসা ট্রেনটা কেমন বাধ্য ছেলের মতো টুক্ করে এসে 'স্টপ' লেখা বোর্ডটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ত। কখনও কখনও সিগন্যালের লাল বাতি আর সবুজ হত না। দাঁড়িয়েই থাকত ট্রেনটা। যে চালায়, সে তার কামরা থেকে নেমে হেসে বলত— 'কি খুকিরা, ট্রেন দেখতে এসেছ? তারপরেই পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে ঘাড়-গলা মুছতে মুছতে হয়তো বলত, উফ্! আজ যা গরম!'

আচ্ছা, প্লেনের ওরকম কোনও লাল সিগন্যাল হয় না? মিমি আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই সিগন্যালটা খুঁজছিল। শব্দটা মিলিয়ে গেছে মানে তো এই নয় যে, চলে গিয়েছে প্লেনটা? হয়তো দাঁড়িয়েই আছে। ছাদে উঠলেই দেখা যাবে আকাশে ঝুলে আছে প্লেনটা। ওর ড্রাইভারও নেমে আসছে। আকাশে খুব রোদ এখন। সূর্য ঝলসাচ্ছে। ওরও গরম লাগছে। সূর্যের অত কাছে রয়েছে তো! পকেট থেকে রুমাল বার করে বলছে.....

এইসময় ঝিমলি তাকে ধরে ঝাঁকুনি দিল। বলল, 'দিদি, খাবি আয়। মুড়ি মাখব।' আশ্চর্য! কে এখন মুড়ি খেতে চায়? মিমির এখন কোনও খিদে নেই। ছাদে গেলেই ড্রাইভারটাকে দেখা যাবে। সে তাই ছাদের দিকে দৌড় লাগাল। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঝিমলি পেছন থেকে টেনে ধরল ওকে। কারণ, সে জানে ছাদের দরজায় একটা বিচ্ছিরি, ভারি তালা লাগানো আছে। তালাটা বাবাই লাগিয়ে রেখেছে। চাবিটা যে বাবা কোথায় রাখে, কেউ জানে না। মিমির জন্য ঝিমলিরও ছাদে ওঠা বন্ধ। অথচ, ছাদ মানেই তো আকাশ! আর আকাশ মানেই মুক্তি!

আসলে, বাবার মনে খুব ভয়, প্রায় ন্যাড়া ছাদটায় উঠলেই তার পাগল মেয়েটা নিচে ঝাঁপ মারবে। ঝিমলির অবশ্য তা মনে হয় না। নিচে ঝাঁপ দিতে যাবে কেন দিদি? সেখানে তো আর এরোপ্লেন ওড়ে না। দিদির চোখ তো শুধু আকাশে! সেখানে যে একটা হারিয়ে যাওয়া এরোপ্লেন আর তার চালককে খোঁজে।

চানাচুর আর আচারের তেল দিয়ে মুড়ি মাখল ঝিমলি। একটা কাঁসার বাসনে ঢেলে মিমিকে একটা প্লেটে কিছুটা এগিয়ে দিল। সে এখন স্থির হয়ে বসে আছে। ঝিমলি বলল, 'কি রে দিদি, খা?' মিমি বাঁ-হাতটা এগিয়ে দিল। একটা বাদাম হাতে তুলল শুধু। তারপর ঝিমলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা খাই?'— 'তোর যা ভাল লাগে, খা।'

কচর-মচর করে নিজে মুড়ি চিবোতে লাগল ঝিমলি। বড় খিদে। সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছে। অঙ্ক আর ভূগোলের টিউশান পড়তে তাকে যেতে হয় এই বালি থেকে কোন্নগর ফেরিঘাটের কাছে। এখন বেলা এগারোটায় মুড়ি চিবোচ্ছে। এরপরই রান্না চাপাতে হবে। খেতে খেতে বেলা দুটো। তারই মধ্যে আবার মিমিকে স্নান করাতে হবে। ডাক্তার বলেছে, 'স্নানটা রোজ করাবেন। করতে চাইবে না, তবু ধরে-বেঁধে করাবেন।' অবশ্য খুব একটা ধরতে-বাঁধতে হয় না। আসল সমস্যা হচ্ছে তাকে তোলা। পা ছড়িয়ে সেই যে বিছানায় বসে থাকবে তো থাকবেই। শুধু মাঝেমধ্যে একটু দুলবে। নড়াচড়া বলতে ওইটুকুই। আর কখনো-সখনো নিজের মনেই বলে উঠবে— 'অ্যাঁ?'

পুরো একতলার মোটে তিনটে ঘর ওদের ভাগে। বাকিটায় তিন-চারটে ভাড়াটে বসে আছে। ছোটখাটো দোকানদার। এটা ছোটকাকার কীর্তি। নিজের ভাগ থেকে ভাড়া হিসেবে চার-ছ' পয়সা যা আদায় হয়। এদিকে ডাক্তার, তবুও কি উঞ্ছবৃত্তি। দোতলাটা বেবাক ফাঁকা পড়ে আছে। বড়জেঠু আর সেজকাকার ভাগ। ফাঁকা পড়ে থাকায় দোতলার অবস্থা আরও খারাপ। মেঝে ফাটা, দেয়ালে চিড় ধরছে। বাবা চিঠি লিখলে সেজকাকা অবশ্য টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে। জেঠু নেই, তবে সোনাদাও কিছু কিছু দিচ্ছে। কিন্তু শুধু টাকায় কি হয়? বাবা কিছু দেখবে না। ঝিমলি একা আর কত পারে? সোনাদা আর আসে না। বউদিও না। মনে হয়, সোনাদাই বারণ করে দিয়েছে। আসলে, সবাই সবসময়ই ওদের একটু এড়িয়ে চলেছে। ওদের অবস্থা তো ভাল নয়। তবুও বছর দুই আগে পর্যন্তও মোটামুটি যাতায়াত ছিল। বউদিও আসত বিন্দি আর টুককে নিয়ে। অন্তত নববর্ষে কিংবা বিজয়ায়। এখন আর কেউ আসে না। এবাড়িতে একটা পাগলি রয়েছে যে!

পাগলিটার চুলে জট। খুলতে খুলতে হাত ব্যথা হয়ে যায় ঝিমলির। দেখতে দেখতে চুলটাও কত রুক্ষ হয়ে গেল দিদির। কোনওদিনই ফর্সা নয়, তবুও রংটাও জ্বলে গেল। কাঠি-কাঠি হাত-পা। আদ্দেক খায়, আদ্দেক ছড়ায়। ঘরে একটা ছোট টিভি আছে। দেখেও না।

মনটাই কি মানুষের সব? সেটা মরে গেলে শরীরটা বোধহয় আপনিই মরে যায়। চিরুনি দিয়ে রুক্ষ চুলের জট ছাড়াতে থাকে ঝিমলি। হাতে-পায়ে নখগুলোও বড় হয়েছে। কেটে দিতে হবে। উঠোনের কল থেকে টিপ টিপ করে জল পড়ছে। আজ দিদিকে কলের নীচে বসিয়ে চলে আসবে ঝিমলি। রোজ রোজ সাবান মাখানোর দরকার নেই। এখনও রান্না হয়নি। চারটের মধ্যে আবার তাকে উত্তরপাড়ায় দৌড়তে হবে। সেখানে সে ক্লাস ফোরের দুটো বাচ্চা ছেলেকে পড়ায়।

তবুও এরই মধ্যে দিদির হাত-পায়ের নখ কেটে দিল ঝিমলি। যতবারই কাটে, অবাক হয়ে যায় সে। দিদির পা দুটো কিন্তু এখনও খুব সন্দর। হাঁটে না, বেরোয় না বলেই বোধহয়। ঠাকুমার কথা মনে পড়ল ঝিমলির। বুড়ি দিদির পা দেখিয়ে বলত, 'লক্ষ্মীর পা। তোর মতো?' আরও বলত, 'দিদির জন্যই তোর বাবার অবস্থা ফিরবে দেখবি।' ঠাকুমা মারা গেছে বেশ কয়েক বছর হল। কই, বাবার অবস্থা তো ফিরল না! আর অমন লক্ষ্মীমন্ত পায়ের গড়ন নিয়েও তার দিদিকে.....

হঠাৎ-ই শুনতে পেল ঝিমলি, কলে জল পড়েই যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে। কি করছে দিদিটা? হুড়মুড় করে উঠোনে বেরিয়ে এল ঝিমলি। রান্নাঘরে আধ-ফোটা ভাত প্রেসারে বন্দী হয়ে সিটি মারছে। খোলা কলের নিচে এক বিচিত্র দৃশ্য। স্নানের জন্য পরানো সাদা সেমিজটা পুরো খুলে ফেলেছে মিমি। কলের নিচে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে। অঝোরে জল পড়ে যাচ্ছে তার নগ্ন শরীরে। শিউরে উঠল ঝিমলি। দৌড়ে গিয়ে এক ঝটকায় কল বন্ধ করে দিল। দিদির অবশ্য কোনও বিকার নেই। সে ঝিমলির দিকে চেয়ে হাসল। তারপর, আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওই দ্যাখ, দেখেছিস?'

ঝিমলি চোখ তুলে তাকাল। দুপুরবেলার নির্মল আকাশ। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। বলল, 'কি দেখব?' মিমি আবারও হাসল। পাগলের হাসি কি এত মধুর হয়? নাকি সরল? ঠিক বুঝল না ঝিমলি। শুধু মনে হল, দুপুরের চড়া রোদে দিদির সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের মাথাটাও বোধহয় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাই ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়েই রইল ঝিমলি।

পাগল বলল, 'ওই দ্যাখ্, উড়োজাহাজ!'

"তবু তুমি সুন্দরী কত"

দু-হাজার আটশো নয় নম্বর ডাউন মুম্বই-হাওড়া মেল দু-ঘন্টা দেরিতে চলছে। .....টু এইট জিরো নাইন ডাউন..... দো আট শূন্য নয় ডাউন....।'

একই কথা তিনবার তিনরকম ভাষায় শুনতে শুনতে সঞ্জয় বিরক্ত হয়ে নিজের মনেই বলে উঠল, 'দূর!'

ভোর সাড়ে চারটেয় বরানগরের বাড়ি থেকে বেরোতে হয়েছে তাকে। সামান্য তিন পিস রুটি আর চায়ের ওপর আর কতক্ষণ থাকা যায়? একটু আগে স্টেশনের রেস্তোঁরায় ঢুকে সে দুটো চিকেন কাটলেট খেয়ে এসেছে। তাতেই অম্বল হয়ে গেল কিনা কে জানে! পেটে কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে।

শনিবারের ছুটিটা মাঠে মারা গেল। এর এক নম্বর কারণ হল সুজাতার পাকামি। সুজাতা, অর্থাৎ পিংকি, সঞ্জয়ের দশ বছরের বিবাহিত স্ত্রী। যার কাছে সঞ্জয়ের পরিচয় হল 'প্যাঁচা'। কারণ, সে অমিশুক, স্বার্থপর, নিজেকে ছাড়া নাকি আর কাউকে ভালোবাসে না। তা অবশ্য খুব অসত্য নয়। পিংকি তাকে ঠিকই চিনেছে। তবে তাতে কি? তার জীবনের মূলমন্ত্রই হল 'ঝামেলা হটাও।' যে সরকারি অফিসে সে চাকরি করে, সেখানের আদর্শের সাইনবোর্ডে যতই 'সত্যের জয় হোক'-টোক লেখা থাক না কেন, আসল আদর্শ হল 'ঝামেলা হটাও'। ফলে অফিস একেবারেই তার মনের মতো। যত অশান্তি তার বাড়িতে। এবং একটা বুরবাক বউয়ের জন্য। সে যদি 'প্যাঁচা' হয় তো, পিংকি নিজে কি? খালি ঝামেলা বাড়ায়!

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবারও ঘোষণার ভাঙা রেকর্ড বাজতে শুরু করেছে। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে সঞ্জয় একটা সিগারেট ধরাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় পাশের সিটে বসা এক প্রৌঢ় খবরের কাগজের আড়াল থেকে মুখ বার করে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, 'ট্রেনটা তাহলে আঠারো নম্বর প্ল্যাটফর্মেই আসবে, কি বললেন?' সঞ্জয় তিক্তভাবে বলল, 'ট্রেনই এল না, তার আবার প্ল্যাটফর্ম কি?'

নাঃ, এও একটা বুরবাক। সঞ্জয় উঠে হুইলার স্টলে গিয়ে বইপত্র দেখতে লাগল। এসবেও অবশ্য তার খুব একটা উৎসাহ নেই। কিন্তু কি আর করবে? সমস্যা হল, বিলাসপুর থেকে রিয়া একা আসছে। মেজকাকার বড় মেয়ে আর সেটাই পিংকির ট্রাম্প কার্ড হয়ে গেল। হাওড়া গিয়ে তাকে নিয়ে আসতে হবে। কেন, সে একটা ট্যাক্সি ধরে একা আসতে পারে না? বরানগর আর কি এমন দূর? তাছাড়া মাঝরাতে এসে তো পৌঁছচ্ছে না। নাঃ, সেটা নাকি খারাপ দেখায়। এই মহিলাকে হাত করেই মা রিয়াকে এখানে আনার ব্যাপারটা ম্যানেজ করে ফেলল। অথচ এদিকে সঞ্জয়ের আদর্শচ্যুতি ঘটে যাচ্ছে। কারণ, এসবের মানেই হল ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া। ঠিক যেমন রিয়ার ছোটবোন লিজার ব্যাপারে সঞ্জয় জড়িয়ে পড়েছিল। ওর ঘাড়ে বন্দুক রেখে সেজকাকা-কাকি দিব্যি নিজেদের ছোটমেয়ের বিয়েটা সেরে ফেলল।

সাধে কি আর সঞ্জয় 'ঝামেলা হটাও'-এর নীতি গ্রহণ করেছে? তার বাবা আর কাকারা সব মিলিয়ে চার ভাই। মেজকাকার দুটো মেয়ে, সেজকাকারও তাই। ছোট কাকার এক মেয়ে। ছেলে বলতে সঞ্জয় একা। আর কে না জানে, মেয়ে মানেই যত ঝামেলা। এই তো মেজকাকার ফ্যামিলিতে মিমিকে নিয়ে কি একটা কাণ্ডই না ঘটে গেল। একটা কদর্য ব্যাপার। বুরবাক বউটার জন্য তারও হ্যাপা পোয়াতে হল সঞ্জয়কে। ছোটকাকার মেয়ে মিলিকে নিয়ে অবশ্য তাকে মাথা ঘামাতে হয় না। ছোটকাকা-কাকি দুজনেই খুব সেয়ানা। মেয়েটাও তাই। তারপর বড়লোক ডাক্তারের মেয়ে। ওকে বিয়ে করে ঘরজামাই হয়ে থাকলেও একটা ছেলের লাভ।

কিন্তু সেজকাকা-কাকি এটা কি করল? চাকরির খোঁজে রিয়াকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিল? এখন এই দায় কে বইবে? কলকাতায় চাকরির ফল যেন থোকা-থোকা ঝুলছে। আর রিয়ার চাকরি করার দরকারই বা কি! পড়াশুনা করে যেন মাথা কিনে নিয়েছে। ওরকম কত ছেলেমেয়ে এখানকার রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবুও ওই নেই নেই-এর শহরে আছে আছে করে হামলে পড়ার লোকও তো কিছু কম হচ্ছে না। বরং সঞ্জয়ের মনে হয়, উত্তরোত্তর বাড়ছে। এখন তার সঙ্গে রিয়াও এসে জুটল।

দু-ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট লেট করে অবশেষে মুম্বই মেল ঢুকছে। আঠারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে। সঞ্জয় ইঞ্জিনের কাছে গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। একের পর এক লোক বেরিয়ে আসছে। মালপত্র, বাচ্চাকাচ্চা কুলিদের হৈ-হৈ। তারই মধ্যে জিন্সের প্যান্ট আর টি-শার্ট পরা রিয়াকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল সঞ্জয়। ওর হাতে একটা সুটকেস, আর কাঁধে চামড়ার বড় একটা ব্যাগ। সঞ্জয়কে দেখেই ওরও চোখ চকচক করে উঠল। ভিড় ঠেলে প্রায় দৌড়ে এসে বলল, 'সোনাভাই, তুমি একা এসেছ, বউদিকে আনোনি যে?'

সঞ্জয়ের বয়স এখন আটত্রিশ। রিয়া ওর চেয়ে প্রায় পনের বছরের ছোট। সঞ্জয়কে ও বরাবর সোনাভাই বলেই ডাকে। আসলে মেজকাকা আর সেজকাকা ওর বাবার চেয়ে অনেকটাই ছোট। মধ্যে ওদের দুই পিসি আছে।

দাদাকে প্রণাম করল রিয়া। একটু চমকে ওর বয়-কাট চুলে ঢাকা মাথায় হাত রাখল সঞ্জয়। মুখখানা খুব সুন্দর। পানপাতার গড়ন। দোষ বলতে দুটো— রোগা আর রংটাও কালো।

— দে, তোর সুটকেসটা দে। একটা কুলি ডাকি।

— জানো তো সোনাভাই, একা আসছি বলে মা-র সে কি চিন্তা। আমি বলেছি, একা আসছি শুনে আর কেউ না হোক, সোনাভাই ঠিকই আসবে।

নিরেট পাথরের মতো মুখকরে কুলির মাথায় মাল চাপাচ্ছে সঞ্জয়। এইজন্যই কারও ঝামেলায় সে নিজেকে জড়াতে চায় না। রিয়া তো বুঝছে না, ওর 'সোনাভাই' ডাকটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে সঞ্জয়ের বুকের ভেতরে।

ট্যাক্সি হাওড়া ব্রিজ পার হচ্ছে। সামনেই সুন্দরী কলকাতা। রিয়ার ভাবী অন্নদাত্রী।

— মিমি কেমন আছে গো, সোনাভাই?

— আছে। ওর আবার থাকা।

— আচ্ছা, ঝিমলির কি হবে বলো তো? মা সবসময় বলে, মিমির জন্য ঝিমলির বিয়েটাও আটকে গেল।

— ওসব ছাড়। এবার আমরা তোর বিয়ে দেব।

— মোটেও না। আমি চাকরি করব।

— চাকরি কোথায় বলতো? কলকাতার লোকই চাকরি পায় না, আর তুই তো একটা বাইরের মেয়ে। কলকাতার পথঘাটও ভালো করে চিনিস না।

— আমার কম্পিউটারে ডিপ্লোমা আছে, এম বি এ করেছি। একটা সাত-আট হাজার টাকা মাইনের চাকরিও পাব না? তুমি যে কি বলো

না, সোনাভাই।

সঞ্জয় আর কিছু বলল না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। রহস্যময়ী কলকাতা। সুন্দরী রমণীর মতো। কাউকে দেয়, কাউকে ফেরায়। তবুও তার আকর্ষণ অদম্য। সেই আকর্ষণেই সুদুর বিলাসপুর থেকে আর একটা পতঙ্গ ধেয়ে এল আলোর বৃত্তের দিকে। কিন্তু সেই বৃত্তের নিচেই চাপ-চাপ অন্ধকার। কি দেবে এই শহর রিয়াকে?

মুগ্ধ দৃষ্টিতে কলকাতার পথ-ঘাট দেখে যাচ্ছে রিয়া। 'আহা তুমি সুন্দরী কত.... কলকাতা!'

ঠা ঠা রোদে কাকতাড়ুয়া

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন আবার রোদ্দুর। বাস থেকে নেমে ফুটি-ফাটা ছাতাটা খুলে গলির ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে বাড়ির দিকে এগোচ্ছে দিবাকর। গলিটার অবস্থা বেশ খারাপ। প্রায় তার ছাতাটারই মতো।

বৃষ্টিটা এক পশলা হলেও বেশ জোরেই হয়েছে। বড় বড় গর্তে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কাছের বস্তির দু-একটা বাচ্চা উদোম হয়ে সেই জল খল্-খল্ করে ছিটোচ্ছিল। দিবাকরের গায়ে এসে পড়তেই সে চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠল— 'এ-ই!' ছোঁড়াগুলো অবশ্য ভ্রূক্ষেপও করল না।

ঘটনাটা সামান্য। তবু এর থেকেই দিবাকরের মনে হয়, আজকাল তাকে আর কেউ ভয়-টয় পায় না। করবেই বা কেন? তার ডাক্তার ছোট ভাইয়ের মতো দু-তিনটে ঝাঁ চকচকে গাড়ি নেই, এমনকি বড়দার মতো একটা ছিমছাম বাড়িও নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু বাপের কালের একটা ধ্যাড়ধ্যাড়ে বাড়ি, যার মাত্র তিনখানা ঘরে তার আস্তানা। সেখানে থাকে তারা তিনজন— সে নিজে আর দুটো মেয়ে, বড় মেয়েটা আবার পাগল।

শ্রীরামপুরে ডাক্তার চ্যাটার্জীর ওষুধের দোকান তার কর্মস্থল। পাটকলের চাকরিটা যাবার পর এই চাকরিটা সে পেয়েছে মাত্র একটা কারণে। ডাক্তার চ্যাটার্জী ডানলপের ডাক্তার মুখার্জীর শালা। আর ডাক্তার মুখার্জী দিবাকরের বড়দা প্রভাকরের আই এস সি-র সময়কার ক্লাসমেট। বড়দা তখনও বেঁচে। তারই অনুরোধে আর ডাক্তার মুখার্জীর সুপারিশে এই চাকরি।

গলি দিয়ে এগোতে এগোতে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল দিবাকর। আজকাল সে মাঝেমাঝে বিড়বিড়ও করে। তবে যা বলে তা সবই কোনও না কোনও নাটকের পার্ট। কমবয়সে তার নাটকের খুব জোর নেশা ছিল। এইসব করতে গিয়ে লেখাপড়া বেশি দূর হয়নি। তবে এখনও অনেক নাটকের পার্টই তার মুখস্থ। যেমন এই মুহূর্তে সে আলিবাবার সংলাপ বিড়বিড় করে যাচ্ছিল— 'আল্লা, এই কাঠুরে আলির নসীবে কি শুধু কাঠ কাটাই লিখে রেখেছিলে?'

আজকাল তাকে কেউ আর ভয় পায় না। উল্টে তারই ভয় এখন বেশি। অথচ একসময় সে ছিল চটকলের জঙ্গি নেতা। কথায় কথায় অফিসারদের দাবড়ে চালু মিল বন্ধ করে দেওয়ার হিম্মত রাখত সে। ওঃ, কি দিনই ছিল সেসব। ঘরে তখন নতুন বিয়ে-করা বউ। তারই দোস্ত দীপচাঁদ বারুইয়ের বোন। চৌধুরী বামুন হয়ে বারুইয়ের মেয়ে বিয়ে করায় বাবা সেই যে তাকে একতলায় ঠেলে নামিয়ে দিলেন, আর জীবনে দোতলায় ওঠা হল না। যাক্ গিয়ে। একতলায় সে কিছু খারাপ ছিল না। তখন সবে মিমি হয়েছে। মায়েরই মতো গোলগাল গড়ন। পুজোর আগে মিল খুলে দিয়ে বোনাস আদায় করত সে। সেই বোনাসের টাকায় তার বউ মায়া গায়ে নতুন তাঁতের শাড়ি চাপাত। তার কি সুবাস! সেই গন্ধের টানেই না ঝিমলিটা জন্মাল!

তবে যতই জঙ্গি ইউনিয়নবাজী করুক, বড়সাহেবের গায়ে হাত চালিয়ে ভাল করেনি সে। বৃটিশরা চলে গেলেও সে একটা লালমুখো সাহেব তো বটে! লোকটারও অবশ্য 'সোয়াইন' বলা উচিত হয়নি তাকে। তাদের অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশ। বিলেতে ফিরে গিয়েই বাণ মেরে দিল। বেগতিক দেখে দিবাকর দৌড়ল ইউনিয়নের দাদাদের কাছে। কিন্তু ওরা বলল যে, হিংসা, হানাহানির সমর্থন ওরা করে না। একটা নীতি নিয়ে রাজনীতি করে। ভূতের মুখে রামনাম শুনে দিবাকর আকাশ থেকে পড়েছিল।

চাকরিটা গেল। তারপর, বউটাও। ঝিমলির জন্মের পরই তার অ্যানিমিয়া ধরা পড়েছিল। কিন্তু দুটো মেয়ের পর চাকরি খুইয়েও দিবাকরের ছেলে-ছেলে বাই। চাকরি যাওয়ায় তার হাঁকডাকও বন্ধ। কেউ আর তাকে পাত্তা-টাত্তা দেয় না। সেই অন্ধ রাগটা রাতের অন্ধকারে বাঘ হয়ে বউটাকে আঁচড়ে-কামড়ে ফালাফালা করে দিত। ছেলের জন্ম দিল বটে সে, তবে প্রচুর রক্ত খুইয়ে নিজের জীবনটাও দিয়ে গেল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে দিবাকর আলিবাবা থেকে 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশ হয়ে গেল। — 'হায়! আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।' বাড়ির পাশে একটা পানাপুকুর ছিল। এখন সেখানে মস্ত ফ্ল্যাট উঠেছে পুকুরটাকে বুজিয়ে। বেশ হয়েছে। আরও আগেই হল না কেন? তাহলে দু-বছরের একটা মা-হারা শিশু হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে নেমে যেতে পারত না। কেউ কিছু টের পায়নি। বাড়িময় খোঁজ-খোঁজ চলছে। পুকুরটার কথা কারও মনেই হয়নি। বিকেলের দিকে লাশটা ভেসে উঠল। মা-হারা ছেলে মায়ের কাছেই ফিরে গেল।

'যোগেশ' এখন বাড়ি গিয়ে স্নান করবে। বউ আর ছেলের ফটোতে ধূপ-দীপ দেখাবে। আসনে বসে গণ্ডূষ করবে। তারপর ফাঁকা বাড়িতে বসে বাপ আর মেয়েতে খাবে। পাগলিটার বোধহয় এতক্ষণে খাওয়া হয়ে গিয়েছে। .... এক এক করে সবাই কেমন ওদের ফেলে পালাল। বড়দার মৃত্যুর আগে থেকেই সঞ্জয়ের উড়ু উড়ু মন। বড় বউদির মুখে সর্বক্ষণই 'আমি কি করব' গোছের একটা ভাব। একমাত্র বউমা পিংকিই তাকে একটু খাতির-টাতির করত। কিন্তু তারও মনে নতুন বাড়ির লোভ। ভাগের বাড়িতে বোধহয় ভাল লাগত না। দোতলাটা ফাঁকা করে ওরা চলে গেল বরানগরে। সেজভাইটা, সুধাকর, বরাবরই বিলাসপুরে, দিবাকরকে একা পেয়ে ছোটভাই রত্নাকর একতলার দক্ষিণ দিকটায় ভাড়া

বসিয়ে দিল।

তবু মন্দের ভাল। এই ভাড়াটেরা না থাকলে ফাঁকা বাড়িতে একটা পাগল মেয়ে নিয়ে দিবাকর শুধু ভয়েই মরে যেত। ভয়েই সে ছাদের দরজায় তালা মেরে রেখেছে। পারলে সে গোটা বাড়িটাতেই তালা ঝুলিয়ে দেয়। রাতে ঘরের দরজায় খিল এঁটে আবার ভেতর থেকে তালা মেরে শোয়। ঝিমলি গজগজ করে। ঘুমের চোখে বাথরুম-টাথরুম যেতে অসুবিধা। তাতে কি? ভয় তার ঝিমলির জন্যও। চতুর্দিকের বজ্র আঁটুনির মধ্যে এই ঝিমলিটাই ফস্কা গেরো। আচ্ছা, বাড়িটাকে একেবারে এয়ার-টাইট করে দেওয়া যায় না? কোনওরকম আগন্তুকের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

— দোরে খিলটা মেরে রাখতে পারিস না?— বাড়িতে ঢুকে ঝিমলিকে খিঁচিয়ে উঠল দিবাকর।

— দুপুরে আবার কি খিল এঁটে বসে থাকব? — ঝিমলিও পাল্টা খিঁচিয়ে উঠল। — 'ভেজিয়ে রেখেছিলাম, হাওয়াতে খুলে গিয়েছে। বেশ হয়েছে। একটু রোদ-হাওয়া ঢোকার জো নেই। কি যে তোমার এত ভয়!'

কেউ কোনও কথা শোনে না। কেউ আর দিবাকরকে ভয় পায় না। কল খুলে মাথায় জল ঢালতে ঢালতে সে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব হয়ে গেল। — 'বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব জনাব আলিবর্দী খাঁ, দাদু, তুমি বলেছিলে ইংরেজকে প্রবেশাধিকার দিও না, আমি দিইনি.....'

পুত্রবতী ভব

শুধু বসে থাকা, নয় শুয়ে থাকা। একেই বলে কমপ্লিট বেডরেস্ট? এই দু-মাসেই যে হাঁফিয়ে গেল লিজা। আরও আট মাস। দিনগুলো যেন এখনই আর চলতে চায় না, শুধু হামাগুড়ি দেয়।

মাত্র একটা বছরেই জীবনের কত পরিবর্তন হয়ে গেল। কেউ বিশ্বাস করবে, মাত্র এক বছর আগেও সে বিলাসপুরের রেল কলোনীর রাস্তায় সাইকেল নিয়ে টো-টো চক্কর দিত! মা বলত, 'তোর অমন ধবধবে ফর্সা রংটা এইভাবে জ্বালিয়ে ফেলবি।' বাপি বলত, 'তুমি সবসময় চুটকির গায়ের রং নিয়ে এত চিন্তা কর কেন বলো তো?' মা একটা চাপা শ্বাস ফেলে বলত, 'কেন যে করি, তার তুমি কি বুঝবে!'

বাপি না বুঝুক, লিজা বুঝত। দিদিটা টরটর করে এগিয়ে গেল অনেক। গ্র্যাজুয়েট হল, কম্পিউটার শিখল, এম বি এ করল। বাপির বন্ধু আর পরিচিতদের মুখে শুধু রিয়া, রিয়া আর রিয়া। 'এই মেয়ের জন্য হাইলি কোয়ালিফায়েড ছেলে দেখুন, সুধাকরদা।' আর লিজা? ও তো সাধারণ গ্র্যাজুয়েট, তাও একবার ঠেকে। কিন্তু তাতে কি? ও যে সুন্দরী।

মাত্র বছরখানেক আগে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল দুই বোন। উঠেছিল বড়জেঠির কাছে, বরানগরে। মা হাত-চিঠি দিয়ে টিপে দিয়েছিল। বেড়ানোটা যেন নিছক বেড়ানো না হয়। অন্তত, লিজার জন্য।

তা-ই হল। অনন্যায় ম্যাটিনি শো-য়ে সিনেমা দেখতে এসেছিলেন লিজার শাশুড়ি। সঙ্গে তাঁর বাপের বাড়ির দিকের দু-চারজন সখী। রিয়া আর লিজার পাশের সিটটাতেই বসেছিলেন। টুকটাক আলাপ করে ঠিকানাটা জেনে নিয়েছিলেন। তারপর? এক চান্সে পাশ। ও যে সুন্দরী। ছেলে? বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার। না, রিয়াকে বউমা করার কথা ভাবেননি ওঁরা। হোক না কোয়ালিফায়েড।

দিদির ওপর মধুর প্রতিশোধ নিতে পেরে বুক জুড়িয়ে গিয়েছিল লিজার। তখন মনে হয়েছিল, জিতেছে। এখন মনে হচ্ছে, কোথায় জিত? মাত্র তিন মাসের মধ্যে প্রেগনান্ট হয়ে কি হালটাই না হয়েছে। বরং দিদিটাই ভাল আছে। বরানগরে বড়জেঠির কাছে এসে উঠেছে। কালকেই ফোন করেছিল। এখন চাকরি খোঁজার নাম করে কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। আর লিজা! হয় শুয়ে আছে, নয় বসে আছে। যেন আশি বছরের ঠানদি!

জিনি এসে ঘরে ঢুকল প্রায় নাচতে নাচতে। লিজার ননদ। কতই বা ছোট লিজার থেকে! অথচ দ্যাখো, কেমন নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে।

— হাই, বউমণি, হোয়াই সো গ্লুমি?

... আহা! ন্যাকা আমার। বোঝোনা যেন কিছু!

— গ্লুমি?

— সরি, সরি, ড্রিমি। বুঝলে বউমণি, তোমার এই স্ট্যাচুর মতো বসে থাকা দেখলে মনে হয় কি জানো? তুমি সবসময় স্বপ্ন দেখছ।

— স্বপ্নই তো দেখছি।

— কিসের স্বপ্ন? খুব সিক্রেট কিছু?

— একদম না। স্বপ্ন দেখছি, আমি আবার কবে তুমি হব।

— দূর! তা আবার হয় নাকি? কেউ কি কারো মতো হতে পারে?

লিজা নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, 'তা বটে। স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই। ... তা কোথায় গিয়েছিলে?

— টাইটানিক দেখে এলাম, বুঝলে বউমণি! আঃ! ফ্যান্টাস্টিক!

— তুমি একা?

— ভ্যাট্! একা আবার কেউ মুভি দেখতে যায় নাকি? ওমপ্রকাশ ছিল।

— ভালো আছ। আজ ওমপ্রকাশ, কাল সুপ্রকাশ। তা এদের মধ্যে কোন্‌টাকে বিয়ে করবে বলো তো?

— আঃ, বউমণি! ডোন্ট টক লাইক আ ঠানদি! তুমি এযুগের মেয়ে।

— কোথায় আর এ যুগের মেয়ে? বসে থেকে থেকে তো বুড়ি।

— আরে এটা তো টেম্পোরারি। টিল ইওর চুন্নু-মুন্নু কাম্‌স।

— তারপরেই বুঝি ফ্রি?

— অফ কোর্স!

— নিজের বিয়ে হোক, তারপর বুঝবে।

— কে এখন বিয়ে করছে?

— করলে ওমপ্রকাশটাকেই করো। ছেলেটা হ্যাণ্ডসাম।

— বাট বড্ড কিপটে। ফুচকা পর্যন্ত খাওয়াতে চায় না। জাস্ট ইমাজিন!

লিজা আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জিনির কত সুযোগ। আর সে! বিদেশ বিভুঁইয়ে বড় হওয়ায় মা তাকে চিরকাল তোলা-তোলা করে রেখে দিল। সবসময় ভয়। এই বুঝি তার সুন্দরী মেয়েটার মুখে কেউ অ্যাসিড ছুঁড়ে দিল। অথচ, দিদির বেলায় নো রেস্ট্রিকশান। দিদি তেমন সুন্দরী নয়। কালো, রোগা। স্কলার মেয়ে। খুব গম্ভীর। ছেলেরাই ওকে ভয় পায়।

অথচ, দিদিরও অনেক ছেলে বন্ধু ছিল। এদের মধ্যে যে কোনও একজনকে ও বিয়ে করতেই পারত। বিশেষত, ভাস্করণ। দিদি কি কিছুই বুঝত না? নাকি, ভাস্করণ খৃষ্টান বলে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল? আসুক দিদি, তাকে দেখতে। সে নিজেই কথাটা তুলবে। — 'এটা কি তুই ঠিক করলি? তোর জন্যই ঘরছাড়া হল ছেলেটা।'

জিনি এখন চোখমুখ ঘুরিয়ে ওর আরেক বন্ধু কেদার বড়ুয়ার সঙ্গে নলবনে বোটিং-এর গল্প করছে। লিজা শুনতে লাগল হাঁ করে। আহা! এইটুকুই যা মুক্তি! নিজের তো আর কিছু হল না, আর হবারও নয়।

লিজা মাঝে মাঝে তার বরাতের কথা ভাবে। এত রূপ নিয়েও তার অ্যাফেয়ার করা হল না। উল্টে রূপটাই কাল হয়ে দাঁড়াল। এক চান্সে বিয়েটা হয়ে গেল। অথচ, এই যে তার ইঞ্জিনিয়ার বর আশিস, আঠাশ বছরেই মাথায় টাক, মুখখানা তোম্বা মতো, গাল ভাঙা। কেলে বামুন। হাইটে লিজার মাথায় মাথায়। ঠিক এইরকম দেখতে একটা মেয়ে যদি ইঞ্জিনিয়ার হয়, তার বরাতে একটা হ্যাণ্ডসাম বর জুটবে?— 'আগেই বলে রাখি, আমার ছেলে কিন্তু দেখতে খুব ভাল নয়।' লিজাকে দেখতে এসে শাশুড়ি বলেছিলেন। — 'আমার শ্বশুরবাড়ির ধারা পেয়েছে। আমি সে ধারা পাল্টাব। বউ যেন সুন্দরী হয়।'

আবদার! কোনও মেয়ের মা এসে এ-কথাটা বলুক দেখি! লোকে তার মাথায় জল ঢালবে। তার নিজের মা-ই বলতে পারবে দিদির ব্যাপারে?

তবুও লিজাকে তো সেই আবদারই মানতে হল। পারল কি বলতে— 'ওই টেকোকে আমি বিয়ে করব না?' হয়তো দিদি বলতে পারত। ও যে হাইলি কোয়ালিফায়েড। এক্ষুণি বিয়ে না হলেও সে চাকরি করতে পারে। লিজা আর কি-ই বা করতে পেরেছিল? শুধু একটু গোঁজ হয়ে ছিল দিনকতক। আর তাতেই ফোনে খবর পেয়ে বাপি আর মা ছুটে এসেছিল বিলাসপুর থেকে। —'কত ভাল ছেলে একবার ভেবে দ্যাখ। কত ভাল ফ্যামিলি। একটা কুটোও দাবি নেই। রূপটাই কি সব? পুরুষ মানুষের আবার রূপ কি রে?'

নো চয়েস, নো চয়েস। লিজা, তোমার কোনও অ্যাফেয়ার নেই, তুমি তোমার দিদির মতো হাইলি কোয়ালিফায়েডও নও। তোমার যা আছে, তা হল শুধু রূপ। তবু সেই রূপের বিনিময়েও তুমি একটি রূপবান রাজপুত্তুর দাবি করতে পারো না। আবার দ্যাখো, তোমার অত রূপের আড়ালেও ইউটেরাসটি নড়বড় করছে। মিস্‌ক্যারেজ হয়ে গেলে তোমাকেই লোকে দুষবে। বলবে— 'অত ভাল স্বাস্থ্য, কিন্তু বাচ্চা ধরে রাখতে পারে না।' এখন রূপের ডালিটি হয়ে গুটিশুটি মেরে বিছানায় বন্দি হয়ে থাকো। কি করবে বলো? মেয়ে হয়ে জন্মেছ যে!

মাননীয় মহাশয়

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ভগবানের নামটা সেরে ফেলেন সবিতাদেবী। বাষট্টি বছর বয়স হল। শরীরটা আজকাল প্রায়ই ভোগায়। হার্টের টস্কিমিয়া, যখন তখন প্রেসার চড়ে যাওয়া, গাঁটে ব্যথা, মাথা ঘোরা— আজ এটা, কাল সেটা। স্রেফ মনের জোরেই চলতে হচ্ছে। বিছানায় পড়ে গেলেই বউ-ছেলের গলগ্রহ।

কর্তা চলে গেলেন বছর চারেক হল। কাঁটায়-কাঁটায় ছেষট্টি। ভাগ্যবান পুরুষ। শরীরে রোগ ছিল না কোনও। যেদিন চলে গেলেন সেদিনও সকালের বাজারটা করে রেখে গেছেন। ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজটা খুলে বললেন, — 'আর এক কাপ চা দাও।' সবিতা বলেছিলেন— 'আমার পুজো হয়নি এখনও। তুমি পিংকিকে বলো।' কিছুক্ষণ পর চায়ের কাপটা পড়েই আছে দেখে 'এ আবার কি? কাগজ পড়তে পড়তে এত ঘুম?' বলে আল্‌তো করে সবিতা একটা ধাক্কা মারতেই ঘাড়টা বাঁ-পাশে কাত হয়ে পড়েছিল।

ঘর ফাঁকা করে চলে গেল মানুষটা। তবে কিছুই বোধহয় ফাঁকা থাকে না। নাতনী বিন্দিয়া আর নাতি টুক এসে অর্ধেক ফাঁকা হয়ে যাওয়া বিছানাটার দখল নিয়েছে। পাশে আর একটা খাট। সেখানে রিয়া ঘুমোচ্ছে।

এই মেয়েকে কাছে নিয়ে এসে কি ভুল করলেন সবিতা? কর্তা বেঁচে থাকলে বোধহয় এসব ভাবতেন না। ছেলে সঞ্জয় অন্যরকম। খুব একটা দায়িত্ব নিতে চায় না। তবু যা হোক পিংকিই বলেছিল— 'আপনি সেজকাকিকে বলে দিন, রিয়াকে পাঠিয়ে দিতে। চাকরি করতে চাইছে মেয়েটা, করুক না।'

মধ্যবিত্তের সবচেয়ে বড় জ্বালা হল বিবেক। মরেও না, ছাড়েও না। কর্তার মধ্যেও কি বিবেকের দংশন ছিল? হয়তো সেই দংশনেই হৃৎপিণ্ডটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। কোনওদিন কিছু বলেনি মানুষটা। তবুও চল্লিশ বছর সংসার করে বুঝেছেন সবিতা, কোনও কোনও কথা কখনোই বলা হয় না, মনের ভেতরেই থেকে যায়।

বরানগরের এই বাড়িটার সন্ধান দিয়েছিল সঞ্জয়েরই অফিসের এক বন্ধু। মাত্র এক বছর আগে বাড়িটা বানিয়েছিলেন রোহিত চ্যাটার্জী নামে এক ভদ্রলোক। কিন্তু তিনি হঠাৎই মারা যেতে ওঁর স্ত্রী পড়ে গেলেন মহাবিপদে। ভদ্রমহিলার চোখের একটা সমস্যা ছিল। খুব কম দেখতেন। একমাত্র ছেলে বিদেশে থাকে। সেই এসে মাকে নিয়ে গেল, আর বাড়িটাও বেচে দিল প্রায় জলের দরে। সঞ্জয় কিছুতেই এই সুযোগ ছাড়ল না।

শ্বশুরমশাই দোতলাটা কমপ্লিট করে যেতে পারেননি। কর্তা শেষপর্যন্ত বড়বাজার পোস্টাপিসের পোস্টমাস্টার হয়ে রিটায়ার করেছিলেন। খুব একটা কিছু টাকা-পয়সা পাননি। তবে পেনসনটা ছিল। তার মধ্যে আবার সঞ্জয়ের বিয়ের খরচ। নেহাৎ সেজভাই সুধাকর বিলাসপুরে আছে, তাই ওর ভাগের একটা ঘর নিয়ে চলে যেত। বিয়ের পর সে ঘরটা দেওয়া হয়েছিল সঞ্জয়কে। হয়তো সেটা পিংকিরও ভাল লাগত না। কিংবা, আরও কিছু। মোট কথা, সঞ্জয় থাকতে চাইছিল না।

কর্তা কিন্তু যেতে চাননি। বলেছিলেন,— 'আমরা চলে গেলে ওই মেয়েদুটোর কি হবে? দিবুটা একটা গুড ফর নাথিং।'

সবিতার মনেও কি তখন নতুন বাড়ির লোভ? নাকি, নাতি-নাতনীকে ছেড়ে থাকতে মন চাইছিল না?

কর্তাকে বোঝানোর জন্য বলেছিলেন— 'সুধারা যদি কখনও ওদের ভাগের ঘর ফেরত চায়? তখন আমার ছেলে-বউ থাকবে কোথায়?'

কর্তা বলেছিলেন— 'তাহলে না হয় সঞ্জয় তিনতলার ছাদে একখানা ঘর তুলে....'

সবিতা ঝাম্‌টে বলেছিলেন,— 'ছাদে? ছাদের আছেটা কি যে ঘর তুলবে? তাপ্পি মেরে মেরে নিজেই কুল পাচ্ছ না, ফি বর্ষায় জল পড়ছে... ছাদে!'

কর্তা আর কথা বাড়াননি।

মিমিটার মাথা খারাপ তাঁকে দেখে যেতে হয়নি। কিন্তু সবিতার পাগলে বড় ভয়। তাই আর ও-বাড়ির ধার মাড়ান না। কারণ, একমাত্র পাগলরাই যা মুখে আসে তাই বলে দিতে পারে। তাঁকে দেখে যদি বলে বসে— 'বড়মা, তোমরা সবাই চলে গেলে, আর দ্যাখো, আমার কি হয়ে গেল।' মুখ দেখাবেন কি করে সবিতা?

কর্তা সত্যিই ভাগ্যবান। পরিবারের এত বড় অসম্মান তাঁকে সহ্য করতে হয়নি।

নাঃ, এসব কথা আর ভাববেন না সবিতা। বুক ধড়ফড় করে, শ্বাসের কষ্ট হয়। যা গেছে তা গেছে। এখন বরং তিনি রিয়ার জন্য ভাববেন। ঘুমটা একটু ফিকে হয়ে এসেছে মেয়েটার। রংটা কালো, একটু রোগা, মুখখানা কিন্তু পদ্মফুলের মতো। এই মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না।

রিয়া ধড়মড় করে উঠে বসল।

— ও কি রে? স্বপ্ন-টপ্ন দেখলি নাকি?

রিয়া হেসে মাথা নাড়ল, — নাঃ।

— ইস! কত বেলা হয়ে গিয়েছে। আমাকে ডাকোনি কেন গো বড়মা?

— ঘুমো, ঘুমো। ঘুমিয়ে শরীরটা মোটাসোটা কর।

— আমি থোড়ি এখানে ঘুমোতে এসেছি।

— তোর মার কিন্তু চাকরি বাকরিতে মত নেই।

— জানি। মার তো শুধু একটাই চিন্তা। মেয়েদের বিয়ে দেওয়া।

— সেটা অন্যায় কিছু নয়। নিজে মেয়ের মা হও, তখন বুঝবে।

— 'আঃ, বড়মা!' রিয়া এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ রাখল। এখনও কত ছেলেমানুষ! এই মেয়ে করবে চাকরি! কলকাতার ঘোর-প্যাঁচের যে কি বোঝে?

পিংকি এসে বিন্দিয়া আর টুককে ঘুম থেকে টেনে তুলল। সবিতাকে বলল, —'মা, আপনাকে এইখানেই চা দিয়ে যাই?'

— দাও।

— আর রিয়া? তুই কি বেড-টি খাস?

— খাই।

— এই দ্যাখ, তাহলে বলবি তো!

— উঁহু, উঁহু, বউদি। আমাকে একদম তোলা-তোলা করবে না। আমি এখানে খাটতে এসেছি, আরাম করতে নয়।

— সে বাইরে গিয়ে খেটোখন। ঘরে একটু যত্ন-আত্তি না করলে চেহারা টিকবে?

— সব সময় তোমরা এত চেহারা চেহারা করো কেন গো বউদি?

— কি করব ভাই? বিয়ে তো করতে হবে।

— উফ্, বউদি! তোমরা সবাই না, সত্যি। ইনকরিজিবল্!

ছোঁ মেরে সবিতার বিছানার একপাশে পড়ে থাকা কাগজটা তুলে নিল রিয়া। একটু চোখ বুলিয়ে বলল, —'এমা! খুব একটা তো চাকরির বিজ্ঞাপন নেই। বড়মা, একটা ইংরাজি কাগজ রাখবে? পয়সা যা লাগে, আমি দেব।

— আমার বাড়িতে এসে তুই পয়সা দিয়ে কাগজ রাখবি?

— ওহো, মরি, মরি, বড়মা।

সবিতা হেসে ফেললেন। বললেন,— 'এখন যা তো, মুখ ধুয়ে আগে কিছু খেয়ে নে। পেটে পিত্তি পড়াসনা।'

দুপুরে খাওয়ার পর সবিতা নিজের ছোট হাতবাক্সটা খুললেন। রিয়া পাশে বসে একমনে ওর ফাইলপত্র গুছিয়ে চলেছে। বছরখানেক আগে, লিজার বিয়ের সময়, রিয়ার জন্যও কয়েকটা সম্বন্ধ দেখা হয়েছিল। সে সবেরই কিছু চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি এখনও সবিতার হাতবাক্সে রয়ে গেছে। আশ্চর্য! একটা সম্বন্ধও লাগল না। রোগা, কালো শুনেই কি সব বানচাল হয়ে গেল? মেয়েদের ক্ষেত্রে রূপটাই কি সব? গুণ কিছু নয়?

সবিতা একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেললেন। একবছর আগেও শরীরটা যেন আরও একটু মজবুত ছিল। তাঁর একার ক্ষমতা আর কতটুকু? এখন কি আর পারবেন? ছোট দেওর রত্নাকর ডাক্তার। কত নাম, কত প্রতিপত্তি! কিন্তু বড্ড স্বার্থপর। কারও জন্য কুটোটি নাড়বে না। ছোট জা

শীলাও তেমনটি। ফোন করে একটা খবর পর্যন্ত নেয় না। আর মেয়ে মিলি? সে তো মেমসাহেব। মাটিতে পা পড়ে কি পড়ে না। আজ কর্তা থাকলে এতটা অসহায় বোধ করতেন না সবিতা। তবুও মিমির জন্য যা করতে পারেননি, রিয়ার জন্য সেই চেষ্টাটুকু অন্তত করতেই হবে তাঁকে। নয়তো, পরলোকে গিয়ে কর্তাকে মুখ দেখাবেন কি করে?

আবারও কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন সবিতা। আবারও চিঠি লিখবেন পাত্রপক্ষকে। 'মাননীয় মহাশয়....'

রিয়ার পিঠে হাত রাখলেন সবিতা। ও অন্যমনস্ক ভাবে বলল— 'উঁ?' সবিতা কিছু বললেন না। শুধু ওর পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন।

আমি উর্বশী..... আমি মেনকা....

গোলাপি রঙের বাথটবে খেলা করে যাচ্ছে নিরাবরণ এক যুবতীর গোলাপি শরীর। বিদেশী সাবানের গন্ধে ম-ম করছে স্নানাগার। বাথটবের জলে ফুটে উঠছে লাল-নীল রঙের হালকা বুদবুদ। স্বপ্নের মধ্যে যেন ভাসছে নিরাবরণ সুন্দরী। স্কাইলাইট দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে কমলা রঙের আলো। কুল-কুল করে জল এসে পড়ছে বাথটবে। যেন পাহাড়ি ঝোরা।

এভাবে অনেকক্ষণ ধরে সময় কাটাবে মিলি। মিলনমালা চৌধুরী। ডাক্তার রত্নাকর আর শীলা চৌধুরীর নয়নের মণি। পার্টিতে বা ক্লাবে সবাই যাকে একডাকে চেনে মিলি নামে।

হাতের মুঠোয় জল নিয়ে ছুঁড়ে দিল সুন্দরী। বাথরুমের ছাদে ফুটে উঠল জলের বিচিত্র আলপনা। আবারও জল ছুঁড়ে দিল সে। আগের নক্সার উপর ফুটে উঠল আরেক নক্সা। জলের আর এক নাম জীবন। সুন্দরী কী জল নিয়ে খেলা করে শুধু, নাকি জীবন নিয়েও?

রিং হচ্ছে। বাথরুমেও মোবাইল ফোন নিয়ে ঢুকেছে সুন্দরী। ওপারে পুরুষকণ্ঠ। এপার থেকে সুন্দরী বলল— 'হাই পিঙ্কু।'

— হাই ডার্লিং। ..... হোয়াট আর ইউ ডুয়িং?

সুন্দরী হেসে উঠল খিলখিল। কল থেকে কুল-কুল করে বাথটবে নেমে আসা জলের সঙ্গে মিশে গেল তার হাসির সুর। বলল— 'ওয়াচিং আ মুভি। সিনেমা দেখছি।'

— রিয়্যালি? কি সিনেমা?

— ফ্যান্টাস্টিকা।

— ইজ্ ইট আ ফ্যান্টাসি?

— নো, রোমান্স। পিওর রোমান্স।

— ফাইন! চ্যানেলটা বলবে?

— স্যুয়র। ... চ্যানেল ফোর। ... বাই!

বাথটবের জলে ডুব দিল সুন্দরী। খুব ঠকিয়েছে বুদ্ধুটাকে। দু-মিনিটের মধ্যেই ফোনটা বেজে উঠল আবার। বুদ্ধুটাই হবে। আঁতি-পাতি করে খুঁজছে। হাত বাড়িয়ে ফোনটাকে অফ করে দিল সুন্দরী। আবারও তলিয়ে গেল জলের নিচে।

পরের দৃশ্য।

স্নান সেরে পরিপাটি করে ব্রেকফাস্ট সারছে সুন্দরী। ফ্রুট-জুস, ফ্রুট-স্যাণ্ডউইচ। পরিপাটি হলেও মাত্রার তারতম্য হবে না কোনও। মাম্মি বোধহয় এতক্ষণে মিসেস সিংহানিয়ার পার্লারে। একাই ব্রেকফাস্ট সারছে সুন্দরী।

টেবিলে রাখা ল্যাণ্ডফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। চোখ কুঁচকে একবার কি যেন ভেবে নিল সুন্দরী। নাঃ, সে বুদ্ধুটা নয় বোধহয়। তবুও একটু ইতস্তত করে রিসিভার তুলে নিল সে। গম্ভীর ভাবে ইংরাজিতে বলল— 'মিলনমালা চৌধুরী স্পিকিং।'

ওপারে নারীকণ্ঠ।

— আমি রিয়া বলছি।

— হু? — চোখমুখ কুঁচকে ফেলল সুন্দরী।

— রিয়া। বিলাসপুরে থাকি। কলকাতায় এসেছি।

বিলাসপুর! রিয়া! সুন্দরীর মগজের কম্পিউটারে নামটা খোঁজাখুঁজি হতে থাকে।

—ওহ্ রিয়া! ... সুধা আঙ্কল অ্যাণ্ড চন্দ্রা আন্টি!

— হ্যাঁ।

— হাউ নাইস টু টক টু ইউ!

— থ্যাঙ্ক ইউ।

— কলকাতায় কোথায় এসেছ?

— আমি বরানগরে বড়জেঠির বাড়িতে উঠেছি। সেখান থেকেই বলছি।

— বড়জেঠি! বরানগর! ওহ্, দ্যাট মিন্‌স সঞ্জয়দা।

— হ্যাঁ, বলো।

— তোমরা তো সল্ট লেকে থাকো। আমাকে একটা অফিসের ডিরেকশন দিতে পারবে? সল্ট লেকে শুনেছি খুব ঘোরপ্যাঁচের জায়গা।

— হোয়াটস দ্য নেম?

রিয়া নামটা বলল।

— স্যরি। কান্‌ট হেল্প ইউ।.... কিন্তু .... ওখানে তোমার কি দরকার?

— ওরা কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছে। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট চাইছে।

— সো...?

— আই হ্যাভ অ্যাপ্লায়েড ফর দ্য জব।

— জব! তুমি চাকরি করবে? কেন? হ্যাজ ইওর পাপা রিটায়ার্ড?

— নো, নো। ইটস্ ফর মাইসেল্ফ। নিজের জন্য।

— নিজের জন্য?.... অল রাইট! বেস্ট উইশেজ। চাকরি পেলে জানিও। .... বা-ই।

ফোন ছেড়ে দিল মিলি। রিয়া মেয়েটাকে শেষ কবে দেখেছে সে? ওর ছোট বোন লিজার বিয়েতে যাওয়া হয়নি। তখন ও শেখরের সঙ্গে বোধহয় গ্যাংটকে। বাপি গিয়েছিল কি? মনে হয় না। আর মাম্মিরও তো একা যাওয়ার কথা নয়।

এই মেয়েটার নাম অবশ্য শুনেছে মিলি। মেয়েটা নাকি খুব কোয়ালিফায়েড। তা এরকম মেয়েরা তো সাধারণত টিচার হয়। এ অফিসের চাকরি খোঁজে কেন?

তার আরেকটা কাজিন-সিস্টার নাকি পাগল হয়ে গিয়েছে। বালিতে বাপিদের পুরনো বাড়িটায় থাকে। সে বাড়িতে কোনওদিনই যায়নি মিলি। ওর জন্ম আলিপুরে। সেখান থেকে বছর পাঁচেক হল ওরা চলে এসেছে সল্ট লেকের এই প্রাসাদে।

মিলি কিন্তু ওই পাগলটার প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করে। কেন, সে নিজেও জানে না। পাগলটা পাগল হল কেন? মনে হয়, কোথাও একটা গড়বড় আছে। বছর দুই আগে বাপি আর মাম্মি অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিল। বাপি তখন গর্জাচ্ছে। বলছে— 'শি ইজ আর হোর। একটা বেশ্যা।' মাম্মি বলেছিল— 'হোল্ড ইউর টাং। কি যা তা বলছ। আফটার অল, মেয়েটা তোমার ভাইঝি।' —'ভাইঝি!' বাপি আবারও গর্জন করে উঠেছিল— 'তাহলে আমাকে আগে জানালো না কেন? একটা সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে.... ছিঃ ছিঃ! মান ইজ্জত আর কিছু রইল না আমার! ধরে চাবকানো উচিত অমন মেয়েকে।'

কি করেছিল পাগলটা? ফেঁসে গিয়েছিল? জানত না, লাইফ ইজ আ গেম? জীবনটা তো একটা খেলা। এখানেও ড্রিবলিং আছে, ফাউল আছে, অফসাইড আছে। আইন ভাঙলে মাঝেমাঝে পেটি পেনাল্টি ও আছে। সেসব সামলে ওঠা যায়। সামলানো যায় না শুধু পিছল মাঠে হড়কে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেললে। পাগলটার বোধহয় সেরকমই কিছু হয়েছিল। বুদ্ধুরাই পাগল হয়। কিংবা ঘুরিয়ে বলতে গেলে, সব পাগলই আসলে বুদ্ধু। কলকাতার বাইরে মফঃস্বলের মেয়েরা বোধহয় খেলার ঘাঁত-ঘোঁত জানত না। অথচ মিলি কেমন 'মেল-ইলেভেন' টিমটাকে ট্যাক্‌ল করে চলেছে। একের পর এক প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে মাঠে গড়াগড়ি খাইয়ে সে ঠিক পৌঁছে যাবে গোলপোস্টের মুখে। সেখানে তখন দাঁড়িয়ে শুধু একা, অসহায় গোলকিপার। শেষ প্রতিপক্ষ। সে যখন ডানদিকে ঝাঁপাবে, বল তখন গোলে ঢুকছে তার বাঁ দিক দিয়ে। মাথা নিচু করে জাল থেকে বল কুড়িয়ে আনা সেই গোলকিপারটাকেই মালা পরাবে মিলনমালা চৌধুরী।

পরজন্মে, হে ভগবান....

মাথা ঝুঁকিয়ে একমনে খুরপি দিয়ে বাগানের মাটি কুপিয়ে যাচ্ছে মানুষটা। চন্দ্রা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে শুধু দেখে যাচ্ছেন। তাঁর বাগানে কোনও উৎসাহ নেই। আর উৎসাহ থাকলেও হাঁটুতে বাত নিয়ে অতক্ষণ উবু হয়ে বসে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভবও নয়। আর এ-ও এক আশ্চর্য মানুষ। সারাটা সপ্তাহ তো শুধু অফিসে দৌড়োদৌড়ি। রেলের অফিসার পোস্টে আজকাল বড্ড খাটুনি। রেল কলোনীও এক বিচিত্র জায়গা। এখানে পুরুষগুলো শুধু অবিরাম খেটে যাচ্ছে, আর বাড়িতে বসে বউগুলো হচ্ছে ডিপ্রেশান, নয়তো ম্যানিয়ার শিকার।

মেয়ে দুটো যখন কাছে ছিল, খুব একটা অসুবিধা হতনা চন্দ্রার। একটু বড় হলে মেয়েরা মায়ের একরকম বন্ধুই হয়ে যায়। সুধাকরকে নিয়ে আলাদা কোনও মাথাব্যথা ছিল না তাঁর। মানুষটা থাকত তার কাজ আর অবসর সময়ের বাগান নিয়ে।

কিন্তু এখন তো একটু বউয়ের কথাও ভাবতে হয়। অথচ দ্যাখো কেমন একমনে বাগানের মাটি কুপিয়ে চলেছে। বলি, মালি তো একটা আছে নাকি! সব কাজই যদি তুমি করো তো ওটাকে মাইনে দিয়ে পোষা কেন?

থাকতে না পেরে চন্দ্রা বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন— ' কি হল, উঠবে তো এবার, নাকি?'

সুধাকর বললেন— 'হুঁ।'

ওঃ, এই এক মানুষ! লোকের কাছে এরা ভালমানুষ। আসলে স্বার্থপর। নিজেকে নিয়েই আছে। দু-দুটো মেয়ে তোমার, বড় হচ্ছে, তাদের বিয়ের জন্য সকাল-সন্ধে দৌড়াও, তা নয়, ঝিম মেরে বসে আছে। দ্যাখো তো, রামবাবু কিংবা সেনবাবুকে। মেয়েদের বিয়ের জন্য আসমুদ্র হিমাচল ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলি, ওরা ছুটি পায় কি করে? আর তোমারই শুধু ছুটি নেই। তুমিই একেবারে রেল কোম্পানির পরিত্রাতা মহাপ্রভু!

আর তা নয়তো, পরিষ্কার বলে দাও, মেয়েদের চন্দ্রা ছেড়ে দিক, আর ওরা বে-জাতে, বে-ধর্মে যেমন ইচ্ছে বিয়ে করুক গিয়ে। তাও তো কোনও কিছু মুখ ফুটে বলবে না। এই খোট্টার মুলুকে চন্দ্রা একা তাহলে করেন কি?

লোককে তুতিয়ে-পাতিয়ে কাজ করানো। বরানগরে বড় জা সবিতাকে চিঠিতে বা ফোনে অনুনয়-বিনয়। তোমারই বউদি, তোমারই ভাইপো, আর তুমি তাদের সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারো না? এখন ধ্যানস্থ হয়ে মাটি কোপানো হচ্ছে। শীতে চন্দ্রমল্লিকা ফোটাবেন। হুঁঃ!

যা হোক তবু লিজার বরাত ভাল। একবার ঠেকে গ্র্যাজুয়েট হলেও বিয়ের পরীক্ষায় এক চান্সে পাশ। সেও বুদ্ধি করে চন্দ্রাই ওদের দু-বোনকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন বলে।

খুরপি সরিয়ে রেখে বাগানের কলে হাত ধুচ্ছেন সুধাকর। কাঁধের তোয়ালেতে হাত মুছলেন। ধীরে-সুস্থে পরিপাটি করে। তারপর বারান্দায় উঠে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে বললেন,— 'বলো, কি বলছিলে?'

— বলছিলাম আমার মাথা আর মুণ্ডু।

— তোমার কি প্রেসারটা আবার বেড়েছে?

— থামো তো! আর জ্বালিও না। .... সকালে লিজার ফোনটা পাওয়ার পর থেকেই মনটা খিঁচড়ে আছে।

— অত চিন্তার কি আছে? কলকাতায় চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হচ্ছে না।

— উন্নতিও তো হচ্ছে না। দু-মাসের ওপর হয়ে গেল, বাড়ছে না বাচ্চাটা।

— ওরা তো ডাক্তার পাল্টাচ্ছে।

চন্দ্রা কোনও উত্তর দিলেন না। ওঁর সারা মুখে চিন্তার ভ্রুকুটি।

চিন্তা, চিন্তা, শুধু চিন্তা। লিজার জন্য, রিয়ার জন্য। যত চিন্তা কি শুধু মেয়েদের মায়েদেরই? নাকি, ছেলেদের মায়েদেরও চিন্তা আছে? আছে নিশ্চয়ই। তবে এ জন্মে তো অন্তত সেটা বোঝা হয়ে উঠল না।

লিজাকে নিয়ে একটু বেশিই চিন্তা ছিল চন্দ্রার। আজকাল শুধু রূপে হয় না, বিদ্যেও লাগে। কাজেই ওর বিয়ে দিতে পেরে চন্দ্রার মনে হয়েছিল, গঙ্গাস্নান সেরেছেন। জামাইটিও কৃতী, বিদ্বান। টাকমাথা তো ভারি বয়েই গেল। চন্দ্রার একটা লালিত সংস্কার আছে। তিনি রূপবান পুরুষদের সন্দেহের চোখে দেখেন। ওদের চরিত্র ভাল হয় না।

তবুও দ্যাখো, চিন্তা কি ফুরলো? এই বংশের মেয়েদের উপর বোধহয় অভিশাপ আছে। একটি তো বেঘাটের জল খেয়ে মাথাটা খারাপ করে বসে রইল। এর জেরে অন্যটার বিয়ে হবে কিনা কে জানে। আবার লিজাকেও দ্যাখো! এত ভাল ঘর-বর। অথচ বাচ্চা হতে গিয়ে এ কী অশান্তি!

কেউ দেখলে বিশ্বাস করবে, অত ভাল গড়নের মেয়েটার ইউটেরাস কমজোরি! লিজার শ্বশুরবাড়িতে মুখ দেখাতে এখন লজ্জা হয় চন্দ্রার। যেন ওরা লুকিয়ে-ছাপিয়ে একটা ডিফেক্টিভ মেয়ে চালান করে দিয়েছেন! অবশ্য ওর শ্বশুরবাড়ি খুবই ভদ্র। কিন্তু তাতেই কি আর লজ্জার নিবৃত্তি হয়?

অন্ধকার হয়ে আসছে। চন্দ্রা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সাইকেল নিয়ে টো-টো চক্কর দিত মেয়েটা। কত বকাবকি করেছেন। আর এখন? বিছানায় বন্দি হয়ে পড়ে আছে।

— রিয়ার জন্য টাকা পাঠিয়েছ?

— পাঠিয়েছি।

— সঞ্জয়কে একটু ফোন-টোন কোরো। বিজ্ঞাপনটা যেন বড় কাগজে দেয়। বাংলা, ইংরাজি দুটোতেই।

— করব।

— কি খালি হাঁ-হাঁ করে উত্তর দিচ্ছ বলোতো? চন্দ্রা আবারও অস্থির হয়ে উঠলেন।

সুধাকর হাসলেন।

— হাসছ কি? তোমার জন্যেই তো রিয়ার বয়েসটা বেড়ে গেল।

— কিছু বাড়েনি। চবিবশ বছর বয়েসটা কোন বয়েসই নয়।

— সে যারা সুন্দরী, তাদের কাছে নয়। কালো, রোগা মেয়ের ক্ষেত্রে ওটাই ফ্যাক্টর। চবিবশকে আঠাশ বলে মনে হয়।

বিপদ বুঝে সুধাকর চুপ করে গেলেন।

— কি দরকার ছিল ওইসব কম্পিউটার, ম্যানেজমেন্ট ছাতামাথা পড়ানোর? মেয়েও আব্দার করল, আর বাবাও গলে গেলেন।

— এটা কি বলছ? পড়তে চাইছে, পড়াব না?

— এবার দ্যাখোনা কি হয়? গরিবের কথা বাসি হলে ফলে। এইসব ডিগ্রি, ডিপ্লোমার বহর দেখে পাত্রপক্ষ ল্যাজ তুলে পালাবে।

— কেন?

— কেন আবার কি? আমাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারে সবাই ঘরোয়া মেয়ে চায়।

— এটা ভুল কথা। লোকে এখন চাকুরে মেয়েও চায়।

সত্যি বলতে কি, কি করলে যে কি হয়, চন্দ্রা নিজেও সবসময় বুঝে উঠতে পারেন না। অস্থির-অস্থির লাগে। লিজার ক্ষেত্রে মনে হত, শুধু রূপে হবে না বিদ্যেও চাই। আবার রিয়ার ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে, শুধু বিদ্যেতেই কি হবে?

'এইসব ছাতামাথা পড়াশোনা করতে গিয়ে চেহারাটাও ঝরে গেল।' চন্দ্রা গজগজ করতে থাকেন। — চশমা ছাড়া দূরের জিনিস দেখতে পায় না। এসব পাত্রপক্ষ খেয়াল করবে না?

— তাহলে আর চট্টরাজের মেয়ের বিয়ে হয় না'। — সুধাকর মৃদু প্রতিবাদ না করে পারলেন না।

— আরে, ওদের অবাঙালি সমাজ। আমাদের মত নয়। চুল খোলো তো মা, হাসো তো মা — এসব ওদের মধ্যে আছে?

— এসব আমাদের নষ্টামি।

— 'নষ্টামি তো তার কোন প্রতিবিধান আছে?' চন্দ্রা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। — 'নাকি তুমি সমাজ সংস্কারক? একাই সমাজকে পাল্টাবে'?

— আচ্ছা, চন্দবাবুর মেয়ের কেন বিয়ে হচ্ছে না? সে তো দেখতেও খারাপ নয়, আর তোমার ভাষায় ছাতামাথা পড়াশোনাও করেনি।

— ও বেঁটে বামন, তাই হচ্ছে না।

— এ তো তুমি পাত্রপক্ষের মতই কথা বলছ। খুঁত বার করছ মেয়েটার। আমার তো মেয়েটাকে খারাপ লাগে না।

— তা তোমার তো আর ছেলে নেই যে ছেলের বউ করে ঘরে আনবে। তোমার ভাল-লাগা-না-লাগায় কি আসে যায়?

সুধাকরের হঠাৎ নিজেকে ভীষণ অপমানিত বোধ হল। আশ্চর্য! মেয়ের বাপ হয়েছেন বলে কি তাঁর কোন পছন্দ-অপছন্দ থাকতে নেই?

— তার ওপর, মেয়েটাকে তোল্লাই দিয়ে কলকাতার চাকরি করতে পাঠালে। আমি দিদিকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, ওসব চাকরি-বাকরি যা-ই-করুক না কেন, তুমি বিয়ের সম্বন্ধ দ্যাখো।

— আহা, আমি কি তাতে আপত্তি করছি?

— এবার ধরো, চাকরি করতে গিয়ে রিয়ার এমন কোন ছেলেকে পছন্দ হল যে সঞ্জয় মা দিদির মনোমত নয়। এই নিয়ে ওদের সংসারে একটা অশান্তি বাধবে না?

— সে আর কি করা যাবে? যে বিয়ে করবে তার পছন্দ তো বড় কথা।

— আমার মন কিন্তু কু গাইছে, জানোতো? এদিকে মিমিটা এমন একটা কাণ্ড করে বসে রইল, সম্বন্ধ করতে গিয়ে কেউ যদি ভাংচি দেয়? আমি অবশ্য রিয়াকে বলে দিয়েছি, তুই ও-বাড়িতে যাবি-টাবি না।

— এটা তোমার বাড়াবাড়ি।

— তুমি তো সবেতেই আমার বাড়াবাড়ি দেখতে পাও। তোমার বড়লোক ডাক্তার ছোট ভাইয়ের মেয়ে মিলি, তার সম্বন্ধেও কানা ঘুষোয় আমি অনেক খারাপ রিপোর্ট পাই।

— ওখানেও যেতে বারণ করে দিয়েছ তো? — সুধাকর হাসলেন।

— কি যে হাসোনা। গা জ্বলে যায়।

সুধাকর মোড়া ছেড়ে উঠলেন। আড়মোড়া ভেঙে বললেন — 'চলো, একটু গাড়িটা বের করে ঘুরে আসি।'

— তুমি যাও নিয়ে। আমার মন ভালো নেই।

— আরে, চলো, চলো। যত চিন্তা করবে, ততই চিন্তা পেয়ে বসবে। মেয়ের মা কি শুধু তুমিই একা নাকি? সবাই কি মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে?

বিলাসপুর রেল-নগরীর মসৃণ কালো পিচের রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে সুধাকরের গাড়ি। এখানকার পথ-ঘাট কত মসৃণ, কত পরিচ্ছন্ন! আর কলকাতার রাস্তায় লোক ঘষটে ঘষটে চলেছে। গাড়ির জঙ্গল, মানুষের জঙ্গল কোঠাবাড়ির জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে পথ হাতড়ে খুঁজছে কালো, রোগা একটা মেয়ে। আচ্ছা .... চশমাটা সবসময় পরছে তো রিয়া? এখানে থাকতে তো পরতে চাইত না। নাঃ, আজই বাড়ি ফিরে একটা ফোন করতে হবে। দূরের জিনিস দেখতে পায়না ..... শেষটায় যদি গাড়িচাপা পড়ে?

আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন চন্দ্রা। নির্বিকার মুখে স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন সুধাকর। একটা নিশ্বাস ফেলে সিটে গা এলিয়ে দিলেন চন্দ্রা। ভাল লাগেনা .... কিছু ভাল লাগেনা। সবসময় খালি চিন্তা হয়। ....ভগবান, আর জন্মে তুমি আমাকে দুই ছেলের মা কোরো!...

মে আই কাম ইন?

খুঁজতে খুঁজতে গণেশ টকীজের কাছে অফিসটাকে শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেল রিয়া আর সঞ্জয়। অফিস বলতে পুরনো দোতলা একটা বাড়ি। একতলায় গুদামঘর। সাহেবি আমলের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে হয়। দোতলাটা অবশ্য মোটামুটি ছিমছাম, সাজানো-গোছানো। কাঠের ছোট ছোট পার্টিশান করে বেশ কয়েকটা ঘর বানানো হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটা মাঝারি আকারের ঘর। সেখানে দরজায় একজন কর্মচারী বসে আছে। — 'এটা কি অমুক অফিস' জিজ্ঞেস করতেই সে মাথা নেড়ে ইন্টারভিউ লেটারটা চাইল। রিয়া সেটা ব্যাগ থেকে বার করে দিতেই একটা কলম আর রেজিস্টার এগিয়ে দিয়ে বলল— 'সই করে ডেট দিন।'

পাশের মাঝারি মাপের ঘরটায় পা দিয়েই সঞ্জয়ের চক্ষুস্থির। এত লোক! দুটো অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট আর গোটা পাঁচেক সেল্‌সম্যানের জন্য তো মনে হচ্ছে গোটা রাজ্যটাই ভেঙে পড়েছে। যারা আগে এসেছে, বসার সিটগুলো সবই তাদের দখলে। বাকিরা সবাই দাঁড়িয়ে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে।

ঘরের মধ্যে কিটকিট করে দুটো ফ্যান চলছে। একটা বদ্ধ গুমোট ভাব। মার্চের শেষ, মোটামুটি গরম, সকলেই ঘামছে। সঞ্জয় আগের সেই কর্মচারীটিকে জিজ্ঞেস করল— 'কতক্ষণ লাগবে?' লোকটা ভাবলেশহীনভাবে জবাব দিল— 'এই তো এলেন! দশটা থেকে লোক এসে বসে আছে।'

দশটা থেকে! সঞ্জয়ের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। এই বদ্ধ ঘরে এতগুলো লোকের মধ্যে একঠেঙে বকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হলে শুধু রিয়া কেন, সঞ্জয়ও ফ্ল্যাট হয়ে পড়বে।

ভেতরে গিয়ে সে রিয়াকে বলল, — 'চল্, নিচের কোনও একটা দোকান থেকে চা-টা খেয়ে আসি। তোর ডাক আসতে এখনও বহুৎ দেরি।'

রিয়া রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছছিল। একটু ইতস্তত করে বলল— 'এই গরমে চা?'

— তাহলে ঠাণ্ডা কিছু খা?

— কুলকুল করে ঘামছি। সর্দিগর্মি লেগে যাবে যে!

— কিন্তু..... এখানে এভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবি?

একটা লম্বামতো ছেলে কোথা থেকে এগিয়ে এসে বলল— 'আপনারা আমার সিটটায় বসতে পারেন।'

সঞ্জয় আর রিয়া দুজনেই অবাক হয়ে তাকাল।

— না, মানে, আমি একটু স্মোক করতে বাইরে যাব তো, এখানে ঘরের ভেতর স্মোকিং প্রহিবিটেড।

— ও, আচ্ছা, থ্যাংকস্। রিয়া, তুই বসে যা।..... আমি একটু চা খেয়ে আসি।

পর-পর দু-কাপ চা খেয়ে সময় কাটাল সঞ্জয়। তারপর সিগারেট ধরাল। একটা দিন ছুটি চলে গেল। তবে তার চেয়েও বড় কথা, এতক্ষণ সময় কিভাবে কাটাবে। সিগারেট টানতে টানতে হেঁটে গেল গণেশ টকীজ অবধি। একটা হিন্দি ছবি চলছে। ঢুকে পড়বে নাকি? নাঃ, থাক, রিয়া একা-একা বোরড্ হবে।

আরও খানিকক্ষণ এধার-ওধার করে অফিসে ফিরল সঞ্জয়। দু-চারজন করে ক্যাণ্ডিডেট নেমে আসছে। সব পণ্ডশ্রম। এত লোকের মধ্যে কি আর দুটো-পাঁচটাকে বাছবে? নিশ্চয়ই নিজেদের লোক ঠিক করা আছে।

ঘরে ঢুকে প্রথমটায় রিয়াকে খুঁজেই পাচ্ছিল না সঞ্জয়। তারপর অবশ্য খুঁজে পেল এবং একটু অবাকও হল। সেই লম্বামতো ছেলেটা ওর ঠিক পাশের চেয়ারটাতে বসে আছে। সে নিজের চেয়ারটা রিয়াকে ছেড়ে দিয়েছিল, তারপর এত লোকের মধ্যে রিয়ার ঠিক পাশের চেয়ারটা ম্যানেজ করল কি করে?

দুজনে দিব্যি গল্প হচ্ছে। সঞ্জয় চোখ কুঁচকে ছেলেটার দিকে তাকাল। রিয়ারই বয়সী হবে। লম্বা, দোহারা গড়ন। প্যাণ্ট-টাই পরা বেশ ফিটফাট চেহারা। ব্যাকব্রাশ করা চুল। টিকালো নাক, সরু গোঁফ। এই ধরনের চেহারার ছেলেরা সাধারণত সেলস্-লাইনের হয়। কি এত গল্প হচ্ছে দুজনের?

সঞ্জয় গিয়ে পাশে দাঁড়াতেই রিয়া বলল— 'সোনাভাই তুমি এসে গেছ? এর নাম অতীন। অতীন মিত্র। একসময় ওরাও বিলাসপুরে থাকত।

— ও আচ্ছা, তাই নাকি?

ছেলেটা ত্বরিত উঠে দাঁড়িয়ে সঞ্জয়কে বলল,— 'আপনি বসুন।'

— বাববাঃ! এ আবার কি? অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

মুখে অবশ্য সঞ্জয় বলল, — 'না, না, আপনি বসুন।'

— আপনি আমাকে তুমিই বলবেন। আপনি রিয়ার অনেক বড় দাদা।

সঞ্জয়ের মনের ভেতর থেকে একটা প্যাঁচা হুমহুম করে উঠল। এই আটত্রিশ বছরের জীবনে সে অনেক কিছু দেখেছে। অনেক না-হক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে মানেই তার কাছে ঘি আর আগুন। বহ্নি ও পতঙ্গ।

— জানো তো সোনাভাই, অতীনের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই আমরা হিন্দিতে কথাবার্তা চালাচ্ছি। বাববাঃ, তোমাদের কলকাতায় এসে হিন্দি প্রায় ভুলতে বসেছিলাম।

রিয়া যেন একটু বেশি ছলবল করছে না? আচ্ছা, সঞ্জয়ের এখন কি করা উচিত? এখানে দাঁড়িয়ে দুজনেক পাহারা দেবে, নাকি আবারও বাইরে এক চক্কর ঘুরে আসবে?

রোমিও (কেন কে জানে এই নামটাই সঞ্জয়ের মনে এল) আবারও তাকে সিট অফার করছে। ছোকরা তো দেখা যাচ্ছে মহা চালু! এ সেলস্ লাইনের না হয়েই যায় না। পাল্টা ভদ্রতা করে সঞ্জয়কে ওর সিট ওকেই ফেরত দিতে হল। আর উপায়ই বা কি? এখানে বসা মানেই তো কাবাবমে হাড্ডি হয়ে থাকা।

আবারও রাস্তায় ফিরে এল সঞ্জয়। দুপুরের রোদ ক্রমশ চড়ে উঠছে। তবু ভাগ্য ভাল যে, ফুটপাথের এদিকটায় ছায়া। সময় কাটাতে এবার একটা কোল্ড ড্রিংক খেল সে। তারপর, অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আবিষ্কার করল যে, পোস্তা পেট্রল পাম্পের কাছে একটা ব্যাঙ্কে তার কলেজ-জীবনের এক সিনিয়র দাদা কাজ করত। মাঝে-মাঝে পথে-ঘাটে দেখা-টেখা হয়েছে। একবার তার খোঁজ করা যেতে পারে। অবশ্য, এতদিনে সে বদলিও হয়ে থাকতে পারে। তবুও হেঁটে যেতে দশ মিনিট, ফিরতে আরও দশ — এই হল গিয়ে কুড়ি মিনিট, এ-ছাড়া খোঁজ খবর আরও মিনিট দশেক, মোট আধঘন্টা, আর দেখা পেলে তো কথাই নেই।

যা-হোক, তার ভাগ্য ভালই বলতে হবে। ভদ্রলোককে পাওয়া গেল। বেশ খানিকক্ষণ আড্ডা মেরে হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসছে সঞ্জয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। আবারও চমক!

একসঙ্গে নেমে আসছে ওরা। রিয়া আর রোমিও। রিয়া বলছে — 'অব্ তুম হমারা ঘর চলো।'

সর্বনাশ! এসব কী কথা!

— 'আজ ছোড় দো, দুসরা কোই দিন হোগা'-রোমিও বলছে। সঞ্জয় যে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে, সেদিকে তাদের খেয়ালই নেই!

বাধা হয়ে তাকেই পথ আটকে দাঁড়াতে হল। রিয়া একটু চমকে উঠে বলল — 'ওঃ সোনাভাই তুমি ! তোমাকেই তো খুঁজতে নিচে যাচ্ছিলাম। জানোতো, আমাদের দুজনেরই ইন্টারভিউ দারুণ হয়েছে।'

— বাঃ, খুব ভালো। এবার তাহলে বাড়ি চল। আচ্ছা ভাই....

রাস্তা পার হয়ে বাস ধরবে ওরা, হঠাৎ পিছন থেকে রোমিও বলে উঠল— 'আপনারা কি বাসেই যাবেন?'

আরেঃ! আপদ তো যায়নি এখনও! সঞ্জয় গম্ভীরভাবে বলল— 'হ্যাঁ। বরানগর তো বাসেই যায়।'

— তা ঠিক। তবে আমার এক বন্ধু এইমাত্র মোবাইলে খবর দিল, আজ দুপুর থেকে কাশীপুরে একটা রাজনৈতিক দলের পথ অবরোধ চলছে, ও সেইজন্য এই ইন্টারভিউতে আসতেই পারল না।

— অ্যাঁ! তাই নাকি!

রিয়া বলল— 'সোনাভাই, ট্রেনে যাওয়া যায় না?'

— ট্রেন মানে তো ডানকুনি লোকাল। শেয়ালদা থেকে। তার তো এখনও ঘন্টা দুয়েক দেরি।

রোমিও বলল— 'আপনারা আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আমার বাড়ি চন্দননগরে। হাওড়া থেকে ট্রেনে বালি পর্যন্ত গিয়ে বাকিটা অটোতে....'।

হুঁ! তার মানে আরও প্রায় ঘন্টাখানেক একসঙ্গে!

— আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমরা তাহলে বাসে....

— বাসে যাবেন কেন কষ্ট করে? এখান থেকে প্রচুর শেয়ার ট্যাক্সি মেলে। এই-এই ট্যাক্সি....

বলতে বলতে বিদ্যুৎগতিতে একটা শেয়ার ট্যাক্সি ধরে রিয়া আর সঞ্জয়কে প্রায় ঠেলে সেটাতে তুলে দিয়ে সামনের সিটের ছয় ইঞ্চি

পরিমাণ জায়গায় নিজেকে কোনওক্রমে গুঁজে দিয়ে রোমিও হুকুম করল— 'হাওড়া স্টেশন।'

এই ভর দুপুরেও হাওড়ায় মোটামুটি ভিড়। রোমিও কিন্তু রিয়ার সঙ্গে ঠিকই সেঁটে আছে। বরং ভিড়ের ধাক্কায় সঞ্জয়েরই এক আধবার দল-ছুট হবার উপক্রম হল। দু-দিকে দুটো ট্রেন দাঁড়িয়ে। একটা ব্যাণ্ডেল লোকাল, অন্যটা বর্ধমান কর্ড। দুটোই অবশ্য বালি হয়ে যাবে। এই শেষ সুযোগ। সঞ্জয় আর তিলমাত্র দেরি করল না। 'আচ্ছা'..... বলে রোমিওর দিকে আলগা হাত নেড়ে রিয়াকে প্রায় ঠেলে উঠিয়ে দিল কর্ড লাইনের ট্রেনে। রোমিও পেছন থেকে কি একটা বলার চেষ্টা করল, সঞ্জয় ভ্রূক্ষেপই করল না।

ট্রেনে উঠে রিয়া বলল, 'বাববাঃ, কি ভিড়! এটাতে উঠলে কেন গো সোনাভাই?'

সঞ্জয় স্রেফ আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ল। বলল,— 'এটা আগে ছাড়বে।'

এতক্ষণে রাহুমুক্তি! আর যাই হোক, চন্দননগরের ছেলে কর্ড লাইনের ট্রেনে উঠতে পারবে না। একটাই খুচরো অশান্তি, আন্দাজে বলা মিথ্যেটা না রিয়া ধরে ফেলে। তবে ক্রমশই ভিড় বেড়ে যাচ্ছে কামরাটায়। রিয়া আর কোনও কিছু লক্ষ্য করার মতো অবস্থাতেই নেই। ব্যাগ আর চশমা সামলাতেই ব্যস্ত।

একটা ট্রেনের ভোঁ বাজল। কর্ড লাইনেরটাই আগে ছাড়ল। আপনাদের শান্তি!

যখন পাতা ঝরে যায়

সেদিন বালি থেকে বরানগর ফেরার সময়ই রিয়া সঞ্জয়ের কাছ থেকে বাড়িটার একটা ডিরেকশান নিয়ে রেখেছিল। তার সদা-সাবধানী এবং বেজায় খুঁতখুঁতে মায়ের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও রিয়া সেদিনই মনে মনে ভেবে রেখেছিল, একদিন সে ওই বাড়িটায় যাবে।

সঙ্গে যাবার মতো কাউকে অবশ্য পেল না সে। বউদি যাবে বিন্দিয়া আর টুকুকে নিয়ে ওদের নাচ আর ছবি আঁকার স্কুলে। বড়মাকে জানাতে গিয়ে লক্ষ্য করল, ও-বাড়িতে যাবার ব্যাপারে ওঁরও যেন ঠিক মত নেই।

দুপুরে যাবার পর একটু বিশ্রাম নিয়েই বেরিয়ে পড়ল রিয়া। বালি সেতু পার হয়ে বাসটা তাকে নামিয়ে দিল নির্দিষ্ট স্টপে। সেখান থেকে সামান্য হেঁটে রিয়া পৌঁছে গেল বাড়িটাতে।

শেষ কবে যে সে এখানে এসেছে, মনে করতে পারল না। বছর দেড়েক আগেও যখন ওরা দুই বোন বরানগরে এসে উঠেছিল, তখনও আসা হয়নি। তারপর হঠাৎই লিজার বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সবাই বিয়েটা নিয়েই মেতে উঠেছিল।

তার আগেও অনেক বছর আসা হয়নি। রিয়ার নিজের পড়াশুনো, বাপির ছুটির অসুবিধা— এইসব সাত-পাঁচ। তবে খুব ছোটবেলায়, অন্তত বছর দশেক বয়েস পর্যন্ত, মাঝে-মাঝে আসা হয়েছে। তখন জেঠু, বড়মা-রাও এই বাড়িতেই থাকত। সোনাভাইয়ের তখনও বিয়ে হয়নি। মিমি আর রিয়া প্রায় পিঠোপিঠি, এক আধ বছরের বড়-ছোট। খুব ভাব ছিল দুজনের। সেই মিমি এখন পাগল হয়ে গিয়েছে।

পুরনো, ক্ষয়ে যাওয়া চেহারা বাড়িটার। দোতলার প্লাস্টার জায়গায় জায়গায় খসে পড়েছে। এই বাড়িতে নাকি বাপিরও একটা অংশ আছে। মা অবশ্য প্রায় বলে— 'ও ভূতের বাড়িতে গিয়ে কে থাকবে? তার ওপর একতলায় একটা পাগল।'

বাড়ির সামনে কতকগুলো ঘোমটা-টানা বউ আর ন্যাংটো, ঘুন্‌সি-পরা বাচ্চা ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। এরা আবার কারা? বারান্দায় উঠে দরজার কড়া নাড়তে যে এসে দরজা খুলে দিল, তাকে চিনতে সামান্য সময় লাগল রিয়ার। .... এ নিশ্চয়ই ঝিমলি। ঝিমলিও অবাক। জিন্‌স প্যান্ট, টি-শার্ট, উঁচু হিলের জুতো পরে বয়কাট চুলে এই মেয়েটা কে?

— আমি রিয়া— .... বিলাসপুরে থাকি।

— ও, রিয়াদি! চিনতেই পারিনি। আমি ঝিমলি। এসো, ভেতরে এসো। শুনেছি, তুমি বরানগরে এসেছ।

বাইরের ঘরে একটা সস্তার টেবিলের দু-পাশে দুটো স্টিলের চেয়ার। একটা ঝরঝরে সিলিং ফ্যান। একটা তক্তাপোষ। তাতে রাজ্যের জিনিস ডাঁই করা আছে।

— ক'দিন পর পয়লা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ। সেইজন্য ঘর-দোর একটু গুছোচ্ছিলাম।' ঝিমলি বলল।

— এসে ডিস্টার্ব করলাম না তো?

— না, না ওকি কথা? তবু তো তুমি এলে। কেউ তো আসে না।

— মিমি কোথায়? ঘুমোচ্ছে?

— ও ঘুমোয় না। ঘুমের বড়ি খেয়েও জেগে থাকে।

— ওকে একটু দেখব।

— এসো, এ-ঘরে এসো।

একটা খাটের ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে মিমি। গায়ে একটা নীল সুতির ম্যাক্সি। চুল খোলা, হাত-পা কাঠি কাঠি।

রিয়া গিয়ে সামনে দাঁড়াল। মিমি বসে বসে দুলছিল। হঠাৎ তার দুলুনি বন্ধ হয়ে গেল। রিয়ার দিকে চেয়ে হাসল। তারপর বলল— 'রিয়া!'

আশ্চর্য! এত বছর পরেও পাগল হয়েও মিমি কি করে চিনল তাকে?

রিয়া ঝিমলিকে জিজ্ঞেস করল— 'বসব?'

— বোসো। ভয় নেই। ও কাউকে কিছু করে না।

রিয়া বসল মিমির গা ঘেঁষে। ওর কাঠি হয়ে যাওয়া ডানহাতটা তুলে নিল নিজের হাতে। তারপর ডাকল— 'মিমি!'

পাগল বলল— 'অ্যাঁ?'

ঝিমলি বলল— 'ওইরকমই। ডাকলেও 'অ্যাঁ', না ডাকলেও। ওর সঙ্গে কথা বলতে যেও না। কথা ও কিছু বলে না।

চৈত্রের শেষবেলায় হঠাৎ-ই একটুকরো মেঘ এসে সামান্য ছায়ার সৃষ্টি করেছে। ঝিমলি ঘরের বাতিটা জ্বেলে দিল।

রং-চটা, পলেস্তারা-খসা দেওয়াল। মাথার ওপরে ময়লা হয়ে যাওয়া সিলিং ফ্যান। দু-পাশে দুটো খাট। একটা মিমির, অন্যটায় বোধহয় ঝিমলি শোয়। একটা মিটসেফ। তার পাশে টেবিলের ওপর রাখা একটা ছোট টিভি। ঘরের সব পুরনো, বিবর্ণ আসবাবপত্রের মধ্যে শুধু টিভিটাকেই একটু নতুন মনে হল রিয়ার।

এরই মধ্যে ঝিমলি কোথা থেকে চারটে মিষ্টি নিয়ে এসেছে। দুটো সন্দেশ, দুটো লেডিকেনি। একটা রেকাবিতে করে রিয়াকে এগিয়ে দিয়ে বলল— 'খাও। আমি জল দিই।'

— এসব আবার আনাতে গেলে কেন?

— খাও। কতদিন পরে এলে।

— তোমরাও খাও।

— আমরা একটু পরে খাব। আমাদের খেতে বেলা হয়। চিঁড়ে ভাজব, তারপর খাব।

— আমার জন্যও সেটাই করতে পারতে।

— তা কি হয়? তুমি চিঁড়ে-মুড়ি খেতে যাবে কেন?

রিয়াকে কথাটা সামান্য বিঁধল। মুখে বলল— 'আহা, আমরা যেন আর চিঁড়ে-মুড়ি খাই না?'

জোর করে ঝিমলির হাতে একটুকরো সন্দেশ গুঁজে দিল। মিমিকেও দিল। মিমি হাতে নিয়ে হাসল। ঝিমলিকে জিজ্ঞেস করল— 'কি করব? খাব?'

— খা। রিয়া দিয়েছে। না খেলে ও কষ্ট পাবে।

এই বাড়িতে একটা ছাদ ছিল। রিয়া আর মিমি সেই ছাদে উঠে খেলত। একটু দূরে ব্রিজ দিয়ে গুম্‌গুম্ করে ছুটে যেত ট্রেন। ছাদ থেকে গঙ্গা দেখা যেত। ওপারে দক্ষিণেশ্বর মন্দির।

মা অবশ্য খুব বকাবকি করত। বলত — 'খবরদার, ন্যাড়াছাদে যাবে না।' রিয়া বলত— 'মিমি যে যায়!' মা বলত—' মিমিরা এখানেই থাকে। ওরা যায় যাক গিয়ে। তুমি অন্য জায়গায় থাকো। পড়ে গেলে তুমিই পড়ে যাবে।'

সেই ছোটবেলাতেও খুব অস্পষ্টভাবে হলেও রিয়া বুঝতে পারত, মিমিরা আর ওরা ঠিক এক নয়। ওদের মা নেই, ভাইটা পুকুরের জলে ডুবে মারা গেছে, বাবা একটা ওষুধের দোকানে চাকরি করে। এক পরিবারের, এক রাজ্যের হয়েও ওরা ভিন্ন গোত্রের।

জল খেয়ে রিয়া উঠে দাঁড়াল। ঝিমলি বলল — 'আর একটু বোসো না? এই তো এলে!'

— একটু ছাদে যাব। তুমিও চলো না।

ঝিমলি হেসে উঠল খিলখিল। রিয়া অবাক।

— হাসছ কেন?

— ছাদের দরজায় তালা পড়ে গেছে। ওখানে আর ওঠা যায় না। চাবি বাবা কোথায় রাখে, আমরা জানি না।

— ও!

রিয়া ঘরের চারপাশে তাকাল। এইটুকু ঘরটায় দুই বোন বন্দি হয়ে আছে! ওদের দমবন্ধ লাগে না? এই সামান্য সময়েই রিয়ার হাঁফ ধরে গেছে। ছাদে উঠে যে একটু নিঃশ্বাস নেবে ভেবেছিল। কিংবা চেয়েছিল, নিজের শৈশবকে ছুঁতে।

— এবার তাহলে যাই?

— এসো। তুমি যে মনে করে এলে, খুব ভাল লাগল।... দাঁড়াও, তোমাকে একটু এগিয়ে দিই।

রিয়া চশমাটা পরল। বলল - 'লাগবে না। আমি ঠিক যেতে পারব।'

ঝিমলি তবু এল দরজা পর্যন্ত। হিল-জুতোর স্ট্র্যাপ বাঁধছে রিয়া। বলল 'মিমির কোন ট্রিটমেন্ট হয় না?'

— হয়। আবার হয়ওনা।

— মানে?

— বাবা ওষুধের দোকানে বসে বলে ডাক্তারদের সঙ্গেচেনাশুনো আছে। ডানলপের ডাক্তার মুখার্জী জেঠুর বন্ধু। উনিও হেল্‌প করেন। এভাবে যতটা হয়।

— উন্নতি হচ্ছে?

— তেমন কিছু না। তাছাড়া ...

— তাছাড়া কি?

— না, থাক। কতদিন পরে এলে, যাবার মুখে সেসব শুনতে তোমার ভাল লাগবে না।

রিয়াও চুপ করে গেল। কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে, সে-ও বোঝে। মা ফিসফিস করে কি সব বলত বাপিকে। বাপির মুখ কালো হয়ে যেত।

— চলি। তুমি একদিন বরানগরে এসো না?

— আমরা কোথাও যাইনা।

— কেন?

ঝিমলি মুখ নামাল। — 'বললাম যে, সে অনেক কথা। আমরা লিজাদির বিয়েতেও তো যাইনি। ...সোনাদা পছন্দ করেনা। এখন তো আর জেঠু নেই। বড়মা সোনাদার মুখের ওপর কিছু বলতে পারেনা।'

গলি দিয়ে হেঁটে জি. টি. রোডে পৌঁছে গেল রিয়া। দেখে-শুনে রাস্তা পার হল। বাস-স্টপের ছাউনির নিচে একটা ভিখিরি বউ তার হাড়-

জিরজিরে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ভিক্ষে করছে। এম. বি. এ করার সময় একটা শর্ট-টার্ম প্রজেক্ট করেছিল রিয়া। বিষয় ছিল ভারতবর্ষের দারিদ্র্য। কম্পিউটারের পর্দায় ফুটে উঠত বিভিন্ন ধরনের রেখাচিত্র, নক্সা। এভাবেই দারিদ্র্যকে সে চিনেছিল কম্পিউটারের পর্দায়। তাদের সাজানো-গোছানো রেল-নগরীতে দারিদ্র্যকে চেনার অন্য কোন উপায় নেই। সেখানে কোন ফুটপাথের মা তার বাচ্চাকে জীর্ণ আঁচল সরিয়ে শীর্ণ বুকের দুধ খাওয়ায় না। রিয়ার মা তাদের দুই বোনকে তোলা-তোলা করে মানুষ করেছিল। যেন, দারিদ্র্য আছে শুধু তথ্যে আর কম্পিউটারের পর্দায়! এখানে এসেই না রিয়া দেখতে পেল। শুধু ওই ভিখিরি-মা-ই নয়, ভারতবর্ষের অগণ্য নিরন্ন, বুভুক্ষু মানুষের মধ্যে এমনও কেউ-কেউ আছে যাদের শরীরে বইছে রিয়ারই শরীরের রক্ত।

একটা পুরনো বাড়ি জরাজীর্ণ হয়ে ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের প্রতীক হয়ে আছে। সেটাই রিয়ার পৈতৃক বাড়ি। আর সেই বাড়ির রং-চটা ঘরে দিন কাটাচ্ছে তিনটি অসহায় প্রাণী। ঝিমলির পরা ফ্রকটা ফাটা লক্ষ্য করেছে রিয়া। অথচ, তার নিজের সুটকেসে গাদা-গাদা পোষাক। তার ডাক্তার ছোটকাকা নাকি টপ্ গাইনি সার্জন, রমরমা প্র্যাকটিস। সল্ট লেকে বিশাল অট্টালিকা। ততটা না হলেও, রিয়ার বাবারও যা আছে, তা-ও কম কিছু না। ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, এয়ার-কুলার থেকে শুরু করে নিজেদের গাড়ি পর্যন্ত। আর এখানে শুধুই নেই! ঝিমলির একটা আস্ত ফ্রক নেই, মিমির চিকিৎসা ঠিকমত হয়না।

কোথায় এতদিন ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে খুঁজছে রিয়া? সে তো রয়েছে তার নিজের পরিবারেই, তার রক্তের সম্পর্কের মানুষগুলোর মধ্যেই।

চৈত্রের মাতাল বাতাসে পাতারা ঝরে গেল ঠিকানাহীন নিরুদ্দেশে। দ্রিমি দ্রিমি শব্দ তুলে বালি ব্রিজ হয়ে গাড়িয়ে যাচ্ছে একটা মাল-গাড়ি। .....দ্রিমি-দ্রিমি-দ্রিমি। .... কোয়ানড্রো কাড্রেম লি ফোলি। .... কোথায় কবে যে লাইনটা শুনেছিল রিয়া।

..... হ্যাঁ, মনে পড়ছে। ....মিস্টার যোসেফাইনের আবৃত্তি। 'এর মানে কি মিস্টার?' — 'হোয়েন ফল্ দ্য লীভ্স।' — যখন পাতা ঝরে যায়। এইমাত্র একটা পাতা-ঝরা গাছকে দেখে এল রিয়া।

মিমি! ওর ছোটবেলার খেলার সাথী।

কন্যা সুশ্রী, বিদুষী এবং.....

— ১৫/৩ ঈশ্বর ভট্টাচার্যি লেন। আমার ঠাকুরদার নামেই রাস্তা। আপনার চিনতে তো অসুবিধা হবার কথা না।

সঞ্জয় একটু হাসল। হেঁ হেঁ।

পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছেন ভদ্রলোক। বসার ধরণই বলে দিচ্ছে তিনি ছেলের বাবা। প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য। পরণে আদ্দির পাঞ্জাবি। সাদা পায়জামা। চোখে ফিনফিনে চশমা। মাথায় প্রায় সব চুল সাদা। সিনেমায় যেমন হয়।

সঞ্জয়ও বসে আছে সিনেমার কন্যাপক্ষটি হয়ে। মুখে তেল-চকচকে হাসি নিয়ে, ঘাড় সামান্য গুঁজে।

— এই যে ঢাকুরিয়া অঞ্চ ল— আজ এত জমজমাট। এর গোড়াপত্তন তো আমার ঠাকুর্দারই হাতে।

— 'ও আচ্ছা, তাই নাকি?'— সঞ্জয়ও বিনয়ের অবতার।

— এসব অঞ্চ ল তো কর্পোরেশনের আণ্ডারে গেল এই সেদিন। তার আগে তো মিউনিসিপ্যালিটি। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম চেয়ারম্যান। সেরকমই শুনেছি।

— তাহলে তো স্বনামধন্য লোক।

— যে বছর সি আর দাশ মারা গেলেন, সেই একই বছরে ওঁরও মৃত্যু। আমার জন্মের আগের কথা। আমার দিদিরা ঠাকুর্দাকে দেখেছেন, আমারই দেখা হল না।

— 'ইস্স্!'— সঞ্জয়ও যেন দুঃখে ভেঙে পড়ল।

— সি আর দাশের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন, মশাই। ঠাকুমা বলতেন, ওই মৃত্যুর শোকটাই সহ্য হল না।

— আগেকার দিনের মানুষ তো! সেন্স অফ লয়্যালটিই আলাদা।

ঘরখানা পেল্লাই। মেঝেতে টাইলস্। ছাদ থেকে ঝুলছে কাট-গ্লাসের ঝাড়বাতি। কাঠের আসবাবপত্র। সঞ্জয় মনে মনে দামের হিসাব কষছিল।

— কাজেই, বাড়ি চিনতে তো অসুবিধা হবার কথা নয়।

আবারও সেই রেকর্ড। উফ্! কি কুক্ষণেই যে সঞ্জয় বলেছিল যে, বাড়িটা খুঁজে বার করতে একটু সময় লেগেছে। তাতেই যে এত আঁতে লেগে যাবে কে জানত!

—'না, না। সে তেমন কিছু নয়।'— সঞ্জয় আবারও ব্যাপারটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করল।

— আপনাদের মেয়ের ফটো যথাসময়েই পেয়েছি। সেদিন আপনার মায়ের সঙ্গেও টেলিফোনে কথা হল।

যাক! এতক্ষণে পথে এসেছে। সঞ্জয় আশ্বস্ত হল।

— বাই দ্য বাই, আমার একটা কোয়েরি আছে।

সর্বনাশ! সঞ্জয়ের বুক ধড়াস্ করে উঠল।

— বলুন।

— আপনাদের বিজ্ঞাপনে দেখলাম, উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। তা, উচ্চ অসবর্ণ বলতে আপনারা কি বোঝেন?

— এই বদ্যি-টদ্যি, কিংবা কুলীন কায়েত....

ভদ্রলোক জিভে চুক্ করে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে বললেন, 'আপনারা নিজেরা তো ব্রাহ্মণ? রাঢ়ী, না বারেন্দ্র?

— রাঢ়ী।

— তবে বাড়ির মেয়েকে উচ্চ অসবর্ণে দেবার কথা ভাবছেন কেন? আপনাদের ফ্যামিলিতে কি অলরেডি কোনও ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ হয়েছে?

সঞ্জয় ঢোঁক গিলল। তার মেজকাকা দিবাকর বারুইয়ের মেয়ে বিয়ে করেছিল বটে। তাতে নাকি ঠাকুর্দা খুব চটেও গিয়েছিলেন। তবে সেসব তো কোন জন্মের কথা। মেজকাকীও তো কবেই মরে ভূত! এখন তাহলে কি চেপে যাওয়াই শ্রেয় নয়?

গলাখাঁকরি দিল সঞ্জয়। তারপর বলল,— 'না।'

— স্ট্রেঞ্জ! তাহলে আপনাদের এরকম অ্যাটিচুড কেন? এতটা লিবারেল হওয়া কিন্তু উচিত নয়।

সঞ্জয় হাসল। — হেঁ হেঁ।

..... লিবারেলের নিকুচি করেছে। গতবার পাঁচ-পাঁচটা সম্বন্ধ এল রিয়ার। দুটো অপছন্দ করল, আর তিনটে ক্লিন কেটে পড়ল। অথচ লিজার জন্য কোনও খোঁজই করতে হল না। এখন আর বামনাই নিয়ে বসে থাকলে চলে? চবিবশ পার হতে চলল। সত্যি বলতে কি, রিয়ার ক্ষেত্রে এবারটা 'নাও অর নেভার'। বিয়ে হলে এবারই হবে, নয়তো ভোগে গেল! ফোনে সেজকাকীর সঙ্গে কথা বলেই কাজটা করেছে সঞ্জয়।

পর্দা সরিয়ে এক মহিলা এসে ঢুকলেন। শ্বেত পাথরের রেকাবিতে ফল, মিষ্টি।

— আমার মেয়ে, তিলোত্তমা। সেকেন্দ্রাবাদে থাকে। জামাই খুবই কৃতী। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। ছেলের স্কুলে এখন গরমের ছুটি। সেই সূত্রেই এসেছে। .... ইনি সঞ্জয়বাবু।

নমস্কার প্রতিনমস্কার। তারই মধ্যে সঞ্জয় লক্ষ্য করল, তিলোত্তমা বেশ সুন্দরী। অর্থাৎ ইনি যদি মেয়ে দেখতে আসেন, তাহলে রিয়ার বিপদ আছে।

— 'ফলটা আমাদের গৃহদেবতা নারায়ণের প্রসাদ।' — ভদ্রলোক বললেন। —'আমার বাড়িতে আবার পুজোআচ্চার খুব চল। তা, মেয়ের ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি আছে তো? আজকালকার মেয়ে কিনা, তাই বললাম।'

সঞ্জয় চোখ বুজে মাথা নেড়ে দিল। — হ্যাঁ। প্রমাণস্বরূপ নিজে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে একটুকরো আপেল কপালে ঠেকিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করল। এমনিতে তার ফলে অরুচি। মিষ্টিও সে বিশেষ পছন্দ করে না। একটা অমলেট আর এক কাপ চা হলেই চলত।

— তাহলে মেয়ে দেখার ব্যাপারটা....

— ব্যস্ত কি? খাওয়াটা সারুন।

..... ব্যস্ত কি সাধে? আজই আরও দুটো কেস আছে যে! ...

পর্দা সরিয়ে আরেকজন প্রৌঢ়ের প্রবেশ। প্রিয়ব্রতবাবুর সঙ্গে চেহারায় মিল আছে।

— আমার ভাই শিবব্রত। পাশেই থাকে। আমার ডানহাত। আমাদের যৌথ পরিবারের কালচার মশাই।

— 'আজকাল তো এসব দেখাই যায় না।'— কোনক্রমে ফল শেষ করে মিষ্টির দিকে হাত বাড়াল সঞ্জয়। একটু কমাতে বলা উচিত না?

— চিঠিপত্র সব ওই লেখে। আমি শুধু সইটা করি।

নমস্কার-প্রতিনমস্কার।

— 'আপনাদের মেয়ের ফটো দেখেছি।'— শিবব্রতবাবু শুরু করলেন। — 'বেশ একটু রোগা।'

এই রে! গেল! এত কায়দা করিয়ে ফটো তোলা.... পিংকির তাঁতের শাড়ি পরিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে .... তবুও সেই একই কথা।

— হ্যাঁ, মানে, স্কলার মেয়ে তো— পড়াশুনোর খুব চাপ।

— 'হুঁ।' — শিবব্রত গম্ভীর হয়ে রইলেন। লোকটা কথা বলে ভেবে ভেবে, থমকে থমকে। এসব লোক খুব সেয়ানা হয়।

— মা-বাবা যেন কোথায় থাকেন— বিহারে, না ইউ-পিতে?

— বিলাসপুরে।

— 'ও, হ্যাঁ। বিলাসপুরে।' — আবারও চুপ। তার মানে, মতলব আঁটছে। কিন্তু কিছু করারও নেই। সঞ্জয় অপেক্ষা করতে লাগল।

— আপনি যেন মেয়ের কে হন?

..... দেখেছ! সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে এখন সীতা কার বাপ!

— জ্যাঠতুতো দাদা।

— হুঁ। ঠিক আছে। আপনাকে দিয়েও চলবে।

চলবে! সঞ্জয় কি সিকি না আধুলি যে চলবে?

— মেয়ের হাইটটা যেন কত?

— পাঁচ তিন।

— নট ব্যাড। চলবে।

— তাহলে মেয়ে দেখার ব্যাপারটা....?

— বউঠানকে ডাকো। — শিবব্রত অন্দরমহলে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

অতঃপর বউঠানের আবির্ভাব। নমস্কার-প্রতিনমস্কার।

— উনি মেয়ে দেখার কথা বলছিলেন। — প্রিয়ব্রতবাবু গিন্নিকে জানালেন।

— কিন্তু, পাপন তো আসবে সেই সেপ্টেম্বরে। ওর পছন্দই তো আসল। আমরা তো গৌণ।

সর্বনাশ! এ আবার কি নতুন প্যাঁচ?

— 'কি যে বলেন!'— সঞ্জয়ও মরিয়া হয়ে উঠল।— 'আপনাদের যৌথ পরিবারের কালচার। আপনাদের মত হলে ছেলের অমত হবে না।'

— 'আপনি পাপনকে একবার টেলিফোন করুন না।'— শিবব্রত বললেন। এবং এই প্রথম লোকটাকে ভাল লাগল সঞ্জয়ের।

— কি যে বলো, ঠাকুরপো! শুধু মেয়ে দেখতে সে আসবে?

— আহা, ওকে বুঝিয়ে বলুন, একজনকেই দেখবে কেন, একসঙ্গে খান তিন-চার....

— কিছু বলতে গেলেই রেগে যায়। বলে, তোমরা যা ভাল বোঝ করো।

— 'এই তো! ঠিকই বলেন।'— সঞ্জয় ভাসতে ভাসতেও কুটোগাছা চেপে ধরল। — 'আপনারা এসে দেখে যান, আমি নিশ্চিত, ছেলেও না বলবে না।'

— 'আর মাস খানেক পরে গেলে হত না? যা গরম এখন...' ভদ্রমহিলা গাঁই-গুঁই করতে থাকেন।

বেগতিক দেখে সঞ্জয় পরিষ্কার অসত্যের আশ্রয় নিল।

— আসলে, মাঝে মাস-দুয়েক মেয়ে আবার বিলাসপুরে ফেরত যাবে। একটু হোম-সিক হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, কি যেন দু-একটা পরীক্ষা-টরীক্ষাও....

কিছুক্ষণ পর বাসস্টপে এসে সঞ্জয় মৌজ করে একটা সিগারেট ধরাল। .... নাঃ, সেলস্‌ম্যান হিসেবে সেও খারাপ নয়। পার্টিকে রাজি করিয়ে তবে তো ছাড়ল! এবার যেন কোথায়? নোটবুক খুলল সে। ..... এস পি মুখার্জী রোড, টালিগঞ্জ। সেখান থেকে ফুলবাগান। ওটাই একটু অফ-রুট হয়ে গেল। যাক্ গে। আজ এক ঢিলে তিন পাখি মারবে সে। একেই বলে ঘটকালি।

ঢাকুরিয়া থেকে টালিগঞ্জ। দুপুরের ফাঁকা বাসে জানালার ধারে সিট পেয়ে গেল সঞ্জয়। গড়িয়াহাটের মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালে বাসটা আটকে আছে। হঠাৎই সঞ্জয়ের মনে হল, একটু দূরে ফুটপাথে তার দিকে পেছন ফিরে যে মেয়েটা হাঁটছে, সে কে? রিয়া না? সঙ্গে যে ছেলেটা আছে, সেটাও বেশ লম্বা। তবে কি?

আর দু-এক মুহূর্ত সময় পেলে সুবিধা হত তার। পাশ দিয়ে আরেকটা মিনিবাস এসে আড়াল করে দিল। মুখটা হঠাৎ তিতো হয়ে গেল সঞ্জয়ের। আজকাল প্রায় কোনওদিনই রিয়া বাড়িতে থাকে না। রোজই কি ইন্টারভিউ? এই যে সঞ্জয় তারই জন্য চরকি-পাক খাচ্ছে, এসব নিয়েও বিশেষ কোনও উচ্চবাচ্য করে না। নাঃ, আজই বাড়ি ফিরে সাফ সাফ কথা বলতে হবে ওর সঙ্গে। ....তুমি কি করতে চাও বলো? তোমার জন্য আমি দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে পারব না।

চারু মার্কেটের কাছে এসে বাস থেকে নেমে গেল সঞ্জয়।

"আমরা করব জয়"

যোধপুর পার্কে লিজাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গড়িয়াহাটের মোড়ে চলে এল রিয়া। সেখানে অতীন দাঁড়িয়ে ছিল ওর জন্য।

— কেমন আছে তোর বোন?

— আছে একরকম। ঘরে বন্দি থেকে ডিপ্রেস্‌ড হয়ে যাচ্ছে।

রিয়ার মুখে চিন্তার ছায়া। একটু যেন অন্যমনস্ক। অতীন বলল— 'আমার হাত ধর, রাস্তাটা পার হব।'

রাস্তা পার হল দুজনে। সত্যিই, নানা কারণে আজ তার মনটা ভাল নেই। দু-মাস হয়ে গেল, একটার পর একটা ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছে সে। কোথায় চাকরি? অতীন তাও কোনওক্রমে একটা জোটাতে পেরেছে। লিজা অবশ্য বলছিল— 'তোর কি মজা! ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস।'

— কোথায় মজা দেখলি? চাকরিই জোটাতে পারলাম না এখনও।

— 'আছে, আছে, মজা আছে।'— লিজা চোখ মটকেছিল। — 'ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে একসঙ্গে ঘোরাও হচ্ছে। সব খবরই পাই, ম্যাডাম। আমার ননদ জিনা তোদের ঠিকই দেখেছে।'

রিয়া চুপ করে রইল।

— চুপ করে আছিস যে? তোরা কি কিছু ঠিক করেছিস?

রিয়া একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল— 'নাঃ।'

— আবারও কিন্তু তুই ভুল করছিস দিদি। ঠিক যেমন করেছিলি বিলাসপুরে ভাস্করণের বেলায়।

ভাস্করণ! এই নামটা মনে পড়লেই কে জানে কেন রিয়ার ভেতরটা ব্যথায় অসাড় হয়ে যায়। সেই কি রিয়ার প্রথম প্রেম? বলি বলি করেও কেন যে কেউ কাউকে কিছু বলে উঠতে পারল না। অথচ একসঙ্গে কত বছর পড়াশুনা করেছে ওরা। লিজা তখনও অনেকবার বলেছে— 'তুই কি কিছুই বুঝিস না? আমি তো বুঝতে পারি। ভাল চাস তো বাপি-মাকে বল, দিদি। এভাবে নিজেকে ঠকাস না।

ভুলই কি করেছে রিয়া? কিন্তু তখন যে ওর মনে কলকাতায় এসে চাকরি করার স্বপ্ন। ভালই যদি বেসে থাকে তবে আরও কিছুদিন কেন অপেক্ষা করল না ছেলেটা? কেন এভাবে নিজেকে সরিয়ে নিল রিয়ার জীবন থেকে? যাবার আগে কেন কিছু বলে গেল না, কোথায় যাচ্ছে? বিলাসপুর থেকে একদিন কোথায় হারিয়ে গেল যে? লিজা বলত, 'তুই-ই দায়ী। তোরই জন্য বিরাগী হল ছেলেটা'।

সত্যিই আজ তার মনটা ভাল নেই। কি হল কলকাতায় এসে? স্বপ্ন কি পূর্ণ হল? কোনওদিন কি হবে? তবুও ভাগ্যিস অতীন আছে! নয়তো..... আর ভাবতে পারে না রিয়া।

অতীন তার স্বভাব অনুযায়ী বকবক করে চলেছে। সে নাকি আজ রিয়াকে একটা সারপ্রাইজ দেবে। তার আগে এসপ্ল্যানেডের কোয়ালিটি-ইন-এ খাওয়াবে তাকে।

— 'মস্ত চাকরি পেয়েছিস, বল?— রিয়া জিজ্ঞেস করল।

অতীন মুচকি মুচকি হাসছিল।

কলকাতার কঠিন পথে একাই চলতে হবে, ভেবেছিল রিয়া। কোথা থেকে যে এল এই ছেলেটা! রিয়ার মত ওরও বিলাসপুরেই জন্ম। সেইজন্যই কি প্রথম আলাপ থেকে এত আপন মনে হত ওকে? এই ক'মাসে যেন আরও আপন হয়ে উঠেছে।

কি একঘেয়ে, নিষ্করুণ এই ইন্টারভিউগুলো। রিয়া আগে কখনও বোঝেনি। আর সব কটারই পরিণতি এক। হয় নিরুত্তর, নয় না।

এটা কি একটা শহর, না মরুভূমি! রুক্ষ, বৃক্ষহীন। কোথাও বাড়ানো নেই কোনও সাহায্যের হাত। এই কোণঠাসা, নিঃসঙ্গ জীবনে বাঁচার রসদ মাত্র একটাই। অতীন। .... কেন যে লিজা আজ আবার ভাস্করণের কথা মনে করিয়ে দিল!

একমাত্র অতীন আছে বলেই দুঃসহ সব ইন্টারভিউয়ের পর পথে নেমে স্ট্র ডুবিয়ে খাওয়া ডাবের জল এত সুস্বাদু। স্টলে দাঁড়িয়ে এগরোল খাওয়া। সিনেমা হলে ঢুকে হিন্দি কি ইংরেজি কমেডি ছবি দেখে একসঙ্গে হাসা। মাঝেমাঝেই ওর চুলের ঝুঁটি নেড়ে দিয়ে বলা— 'আমার জন্য তোর নিজের চাকরিটাও যাবে। এত কামাই।'

পাশাপাশি হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছে ওরা। একটি বেকার মেয়ে, আর একটি আধা-বেকার ছেলে। কলকাতার পথে এরকম অগুন্তি জোড়ার মধ্যে একটি।

— মুম্বইয়ের চাকরিটা পেলে তুই কি সত্যিই চলে যাবি, অতীন? এখানে তো পাঁচের বেশি দিচ্ছেই না তোকে।

অতীন কিছু বলল না। শুধু ওর হাতের মুঠিতে একটু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল।

— হাত ছেড়ে দিলি যে?

— তুই-ই তো ছাড়িয়ে নিলি!

— 'মোটেই না।'— রিয়া ম্লান হাসল।

— আয়, তোকে আবার হাত ধরে রাস্তা পার করে দিই।

— ভ্যাট! ফাজলামি হচ্ছে?

সত্যি সত্যি রিয়ার হাত ধরে ওকে হিড়হিড় করে রাস্তায় টেনে নামাল অতীন। তারপর এ গাড়িকে হাত দেখিয়ে, ও-গাড়িকে— 'এভাই জেনানাকো সামালকে' এইসব বলে আঘাটা দিয়ে ওকে রাস্তা পার করিয়ে ঠেলে তুলল দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্যাক্সিতে। হুকুম করল— 'এসপ্লেনেড। কোয়ালিটি ইন্।'

— 'ব্যাপারটা কি বলতো?— রিয়া চোখ কুঁচকে তাকাল। — 'লটারি জিতেছিস মনে হচ্ছে?'

— জিতেছিই তো।' অতীন মৌজ করে একটা সিগারেট ধরাল। — 'এবার একটু হাস। কি তখন থেকে প্যাঁচার মতো মুখ করে আছিস!'

রিয়া সামান্য হাসল। হাসিটা তেমনভাবে ফুটলনা ওর পাতলা ঠোঁটে। আজকাল একটুতেই বড় ক্লান্ত লাগে। হাঁফ ধরে যায় যেন। কলকাতায় এত ঘাম হয়! ট্যাক্সিতে উঠেই যেন শরীরটা ছেড়ে দিয়েছে।

মনটাই বোধহয় দমে যাচ্ছে। বোনটা বন্দি হয়ে আছে বিছানায়। কি যে হবে কেউ জানে না। মা হতে গিয়েও মেয়েদের কত কষ্ট! চলে আসবার সময়ও জড়িয়ে ধরেছিল। — 'আবার আসবি তো, দিদি? আমার কাছে এসে কিছুদিন থাক্ না!' রিয়া বলেছিল— 'দেখি।' লিজা ওর শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিল— 'বাবা, যাই করিস, শরীরটার দিকে খেয়াল রাখিস। ঘুরে ঘুরে চেহারাটা যা করেছিস। বউদিকে বলিস, ঘর থেকে যেন টিফিন বানিয়ে দেয়। রাস্তার খাবার একদম খাবি না। আলুসেদ্দ, মটর সেদ্দ আর শসার কুচি— তোর ফেবারিট টিফিন আমি বানিয়ে দিতাম, মনে আছে?'

— কিরে, কিছু বল?— অতীনের কথায় চমক ভাঙল রিয়ার।

— ভাবছি। কিছুদিন লিজার কাছে এসে থাকব।

— কেন?

— 'কিছুই তো হচ্ছে না। দিনরাত শুধু ঘুরেই বেড়াচ্ছি। এই নিয়ে বরানগরের বাড়িতেও একটা চাপা টেনশন।'— চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলল রিয়া।

— জেঠী কিংবা দাদা কিছু বলেছে?

— বলছে না কেউ কিছুই। কিন্তু পছন্দও তো করছে না।

— হুঁ। তোর দাদা গোড়া থেকেই আমাকে পছন্দ করেনি। সেবার যেভাবে তোকে কর্ড লাইনের ট্রেনে ঠেলে তুলে দিল!

রিয়া একটু হাসল। সোনাভাই ভাবতে পারেনি এরপরেও ওদের যোগাযোগ থেকে যাবে। একটার পর একটা ইন্টারভিউই হয়ে দাঁড়াবে ওদের মিটিং পয়েন্ট। লিজা যদি ঘরে বন্দি হয়ে থেকেই ওদের খবর পায়, তাহলে সোনাভাইয়ের চোখে কি কোনওদিনই ওরা ধরা পড়েনি? কিন্তু, কিছু জিজ্ঞেসও তো করে না। শুধু দিন-দিন কেমন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে বউদির সঙ্গে চাপা কথা-কাটাকাটিও হয়। বোধহয়, ওকে নিয়েই! রিয়ার ভাল লাগে না।

— 'চল, এই রবিবারে একটু বেড়িয়ে আসি।'— অতীন বলল।

— কোথায়?

— ধারেকাছে। বেলুড় মঠে যাবি? জায়গাটা খুব সুন্দর, নিরিবিলি।

— হবে না।.... আমার ইন্টারভিউ আছে।

— কোন অফিসে? আমাকে বলিসনি তো?

— বাড়িতেই। .... তোকে বলা যায় না।

— 'ওঃ!' — অতীন হাসল। — 'সেই চুল খোলোতো মা, হাসতো মা, এইসব তো? তা তোর তো বয়-কাট চুল, কি করে খুলে

দেখাবি? পরচুলা পর।

— ফাজলামি করিসনা। তোদের আর কি?.... কি যে বোকা বোকা লাগে না!

— তবে দে ফুটিয়ে!

— মারব এক থাপ্পড়। অতই সহজ, না? দাদাটা আমার জন্য চরকি-পাক খেয়ে মরছে, টেলিফোনে বকবক করে বড়মার প্রেসার চড়ে গেল, ছুটির দিনেও বউদিকে লুচি-আলুর দম বানাতে হচ্ছে, আর তুই বলছিস দে ফুটিয়ে?

— আরে, আরে, ফায়ার হয়ে যাচ্ছিস কেন?

— না, ফায়ার হবো না? যোগাড় কর না, বিশ হাজার টাকা মাইনের একটা চাকরি। দিচ্ছি সব ফুটিয়ে।

— তাহলে তো মুম্বইয়ের অফারটা নিতে হয়!

— তা নে না। কে তোকে আটকে রেখেছে? মুম্বই যা, গিয়ে মুম্বইয়ের মেয়ে বিয়ে কর।

চোখে জল এসে গেল রিয়ার। এমনিতেই আজ মনটা ভাল নেই। চশমাটা খুলে ফেলল চোখ থেকে। ... প্রতিদিন... প্রতিদিন এই মহানগরীর কাছে অপমানিত হচ্ছে সে। একটু একটু করে কলকাতা ছিনিয়ে নিচ্ছে তার সমস্ত অহঙ্কার। অথচ বিলাসপুরের রেল নগরীতে সে ছিল একটা আইডিয়াল। সকলের মুখে শুধু রিয়া আর রিয়া। কম্পিউটার ওয়ার্কশপে, কলেজের ডিবেটে, ম্যানেজমেন্টের সেমিনারে— সর্বত্র একটাই নাম— রিয়া চৌধুরী। মায়ের উচ্ছ্বাস, বাবার চাপা গর্ব, বোনের ঈর্ষামিশ্রিত অনুরাগ, বন্ধুদের স্তুতি, এমনকি স্তাবকতা পর্যন্ত। আর এখানে! লক্ষ লক্ষ বেকার ছেলেমেয়ের মধ্যে সে একটা নামমাত্র। কিংবা নামও নয়। নামহীন একটা অস্তিত্ব।

এর পরেও আছে বিয়ের ইন্টারভিউ। সেখানের চিত্রও আশাপ্রদ নয়। সে নাকি কালো, সে নাকি রোগা। কারও সঙ্গে তার নাকি আবার ঠিকুজী মেলে না! কত কি! প্রত্যেকটা দিন তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, কলকাতার এই ভিড়ে সে কত নগণ্য, কত অকিঞ্চিৎকর! না আছে তার সার্টিফিকেটগুলোর কোনও দাম, না আছে তার রূপের কোনও কদর!

খ্যাঁচ করে ট্যাক্সিটা থেমে গেল হঠাৎ। অতীন লাফিয়ে নেমে বলল, — 'দাঁড়া, আসছি।' মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ফিরে এল। হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ। — 'চলুন ভাই।' ট্যাক্সিওয়ালাকে বলল।

— কি নিয়ে এলি?

অতীন ব্যাগ থেকে দুটো প্যাকেট বার করল। একটা রিয়ার হাতে দিয়ে বলল— 'নে খা। কোল্ড ড্রিংক। যেরকম আগুন হয়ে আছিস। আর ফোঁস ফোঁস করছিস। কিছুটা খা, বাকিটা মাথায় ঢাল।'

এই জন্যই অতীন অতীন! রিয়ার মন খারাপ হলেই সে ভাল করে দেয়। ঠাণ্ডা ফলের রসে চুমুক দিয়ে আরামই লাগল রিয়ার। সত্যিই যেন ভেতরের জ্বালাটা জুড়োচ্ছে।

— 'ভাল লাগছে?' — অতীন যেন বাচ্চাকে ভোলাচ্ছে।

— 'ভ্যাট্।' — কুলকুল করে হাসতে লাগল রিয়া।

এসপ্ল্যানেডের কাছে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ওরা। সামনে একটা মিটিং চলছে। চোঙা বেঁধে কারা যেন খুব চেঁচাচ্ছে। অগুন্তি লোক। পরিবেশে যেন বেশ উত্তপ্ত। অতীন কি একটা রাজনৈতিক দলের নাম বলল। রিয়া এখানকার রাজনীতির কিছুই জানে না। তবুও তার কেমন মনে হল, আজ এখানে না এলেই বোধহয় ভাল হত। একদিকে ঢাল উঁচিয়ে আছে একদল পুলিশ, আর যারা বক্তৃতা করছে তাদের ভাষাও খুব উগ্র। মনে হচ্ছে, যে কোনও সময় গণ্ডগোল বেধে যাবে।

অতীন অবশ্য কোনও পাত্তাই দিল না। কোয়ালিটি ইন-এ ঢুকে চাইনিজ খাবারের অর্ডার দিল। ভেতরটা ঠাণ্ডা, আরামদায়ক। গদি আঁটা চেয়ারে পাশাপাশি বসে ওরা যেন বাদশা-বেগম। বাইরের সব কোলাহল স্তব্ধ।

খাবার শেষে পুরো বিল মিটিয়ে দিল অতীন। রিয়ার কোনও বারণ শুনল না। বাইরে বেরিয়ে এসে বলল— 'এবার চল্, আউট্রাম ঘাট।'

— 'ওঃ, আর কত ঘোরাবি বলতো? কি এমন সারপ্রাইজ তোর? ভাল চাকরি পেয়েছিস, এই তো?'— রিয়া মৃদু প্রতিবাদ করেছিল।

মিটিংয়ের চিৎকার চলছে। এখন যেন আরও বেড়েছে। এসপ্ল্যানেড ট্রামগুমটি পার হয়ে যাবে ওরা। হঠাৎই ঝুমঝুম করে শেল ফাটার শব্দ। অতীন বিপদ বুঝেই রিয়ার হাত ধরে বলল— 'দৌড়ো।' রিয়া দেখল, আশেপাশের অগুন্তি লোক, সবাই দৌড়চ্ছে। এদিকে অতীনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে গিয়ে হাঁফ ধরে যাচ্ছে রিয়ার। বুকে মধ্যে ধক্ ধক্ করছে। কিন্তু কিছু করারও নেই। আবারও শেল ফাটার শব্দ। অন্ধের মতো সবাই দৌড়চ্ছে— যে যেদিকে পারে। ওদিকে লাঠি উঁচিয়ে ছুটে আসছে একপাল পুলিশ। ক্ষুধিত নেকড়ের মতো দেখাচ্ছে ওদের। — 'অতীন, অতীন, পারছি না আমি।' রিয়া হাঁফাতে হাঁফাতে বলছে। আবারও বুম্... বুম্ শব্দ। আবারও উন্মত্তের মতো চলা। ধাক্কা লেগে চোখের চশমাটা খুলে কোথায় পড়ে গেছে রিয়ার। শালোয়ারের চূর্ণি লাট খাচ্ছে রাস্তার ধুলোয়। অন্ধের মতো অতীনের হাত ধরে শুধু দৌড়চ্ছে রিয়া। ঢাল হাতে নিয়ে একপাল পুলিশ ওই ছুটে এল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ধাক্কা খেয়ে অতীনের হাত ছিটকে গেল রিয়ার হাতের থেকে। অন্ধ চোখে রিয়া দেখল তার স্বপ্নের কলকাতাকে। কোথায় কলকাতা? এ তো সমুদ্র। বীভৎস, উত্তাল, ভয়ঙ্কর। ঢেউয়ের পর ঢেউ ধেয়ে আসছে তাকে গ্রাস করে নিতে। আবারও একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে তলিয়ে যেতে যেতে রিয়া অনুভব করল, কার দুটো হাত যেন পিছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে যেতেও অল্পের জন্য বেঁচে গেল রিয়া। কিন্তু সে হাত কি কোনও লম্পটের? কোনও সুযোগসন্ধানীর? জানে না, রিয়া জানো না।

সন্ধে হয়ে এল। আকাশে ফুটি ফুটি করছে তারা। সব শান্ত। আউট্রাম ঘাট। কোথায় গেল সেই ভয়াল সমুদ্র? যেন ম্যাজিক। মিলিয়ে গিয়েছে।

অতীনের কাঁধে মুখ রেখে ঝিম মেরে বসে আছে রিয়া।

অতীন বলল— 'এবার মুখ তোল। তোকে সারপ্রাইজটা দিই?

— 'কিছু দিতে হবে না। তুই শুধু আমার সঙ্গে থাক।'— রিয়ার শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে এখনও।

— 'আরে, আমি তো আছি।' — বলে জামার ভেতর থেকে একটা সাদা খাম বার করল সে। বলল— 'ভাগ্যিস গোলমালে হারিয়ে যায়নি।'

— কি এটা?

— পড়ে দ্যাখ।

— পড়ব কি করে? একে অন্ধকার, চশমাটাও নেই।

— আমার সেই বন্ধু কেদার বড়ুয়াকে তোর মনে আছে?

— কোন্ কেদার?

— সেই যে রে, বড়ুয়া এন্টারপ্রাইজ! গত মাসে ইন্টারভিউ দিয়ে এলি পার্ক স্ট্রীটে ওদের অফিসে।

— ও। তা হবে।

— সর্বক্ষণ ফিয়াসেঁর সঙ্গে লাট খেয়ে বেড়ায়। এখন সল্ট লেকের কোনও এক ডাক্তারের মেয়ের পাল্লায় পড়েছে। এদিকে অফিস লাটে ওঠার যোগাড়।

— তাতে আমার কি?

— আছে, আছে। আজ ধরেছিলাম বসকে। এই নে।

— কি এটা?

— আরে, তোর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার।

— 'অতীন।' — রিয়ার হাত খামচে ধরল ওকে।

— আরে, ছাড় ছাড়। মাইনে কত শুনলে তো বোধহয় কামড়েই দিবি আমাকে।

— কত?

অতীন দু-হাতের চারটে করে আঙুল মেলে ধরল ওর দিকে। মুখে বলল— 'প্লাস, কাজ ভাল করতে পারলে ডাবল ইনক্রিমেন্ট।'

— অতীন! অতীন!

— এবার চল। আমার হত ধর। বাড়ি পৌঁছে দিই তোকে। চশমাটা তো ভেঙে ফেলেছিস। গাড়ি চাপা পড়ে মরবি নাকি শেষে?

নষ্ট চাঁদ

রাস্তাটা যেখানে রেলের লাইন বরাবর গিয়ে উত্তরপাড়া স্টেশনের আপ প্ল্যাটফর্মে ঠেকেছে, সেই রাস্তার এপার থেকেই ঝিমলি অস্পষ্ট দেখতে পেল একজনকে। সেও বোধহয় তাকে দেখতে পেয়েছে। তার হাতের সাইকেলটা নড়ে উঠল। সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে রাস্তার অন্য প্রান্ত থেকে সে এগিয়ে আসছে। লম্বা রোগাটে চেহারার জন্য মনে হয় যেন একটা ঢলঢলে পাঞ্জাবি আর পাজামাই এগিয়ে আসছে। মুখটা তখনও আবছা।

রাস্তার মাঝামাঝি এসে দুজনের দেখা হল। সাইকেল ঠেলা থামিয়ে সে বলল— 'আজ তোর এত দেরি?' এখন বিকেলের ম্লান আলোতেও তার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লম্বাটে, হালকা চাপদাড়ি, মাথার চুল একটু পাতলা, মাজা-মাজা গায়ের রং, নাক সামান্য ভোঁতা। বয়স মেরেকেটে একুশ-বাইশ।

— সোমনাথ, তুই?

— অবাক হচ্ছিস কেন? এর আগে কি কোনওদিন আমাদের এখানে দেখা হয়নি? বরং তুই-ই কিছুদিন পরে এলি।

— জ্বর হয়েছিল ক'দিন। আসতে পারিনি।

— এখানে সেই টিনা-নিনাদের বাড়িতেই পড়াচ্ছিস?

ঝিমলি ঘাড় নাড়ল। — হ্যাঁ।

— এতক্ষণ ধরে কি পড়াস?

— জ্বরের জন্য দু-সপ্তাহ কামাই হল। পুষিয়ে দিচ্ছিলাম।

— শোন্, তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

ঝিমলির বুকটা ধড়াস করে উঠল।

— বল্।

— এখানে নয়, আমার সাইকেলের পিছনে বসতে পারবি?

— পারব।

কালভার্টের তলা দিয়ে ওরা রেল লাইনের অপর পারে চলে এল। এদিকটা বেশ ঘিঞ্জি, জমজমাট। সোমনাথ কৌশলে ভিড় বাঁচিয়ে সাইকেল চালাতে লাগল।

কিছুটা দূরে গিয়ে একটা পুকুরের পাশে সিমেন্টের বাঁধানো বসার জায়গা। আশপাশে কিছু গাছ-গাছালি থাকায় রাস্তার পাশে হলেও জায়গাটা একটু একটেরে মতো। সামান্য দূরে দুটো বাড়ির ফাঁকে একচিলতে মাঠ। সেখানে বাচ্চা ছেলেরা ফুটবল খেলছিল।

সোমনাথ সাইকেলটা সিমেন্টের বেঞ্চে হেলিয়ে রেখে ঝিমলিকে বলল— 'বোস্।'

ঝিমলি বসল। বুকটা এখনও ধক্‌ধক্ করছে।

— 'তুই কি ঠিক করলি?'

সোমনাথের চোখ ঝিমলির চোখে। ঝিমলি চোখ সরিয়ে নিল। বলল— 'বলেছি তো, আমার বি এস সি পরীক্ষা শেষ না হলে কিছুই বলতে পারব না।'

— আর আমি কি করব? হাঁ করে বসে থাকব? কখনও দেখাচ্ছিস দিদিকে, কখনও দেখাচ্ছিস পরীক্ষা, বাহানার তোর অন্ত নেই আর!

ঝিমলি আবারও চুপ করে গেল। উত্তরপাড়া কলেজে ইলেভেনে পড়ার সময় সোমনাথের সঙ্গে আলাপ। ও কমার্সে পড়ত। দুজনেই টুয়েলভ্ পাশ করল। কিন্তু তারপরই মিমির গণ্ডগোলটা ঘটে গেল। ফলে ঝিমলির ছেদ পড়ে গেল পড়াশোনায়। পুরো একটা বছর কেটে গেল তালেগোলে। এখন আবার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গ্র্যাজুয়েট হবার চেষ্টা করছে। তাও প্রাইভেটে।

সোমনাথ অবশ্য ওসবের ধার ধারেনি। ওদের রং-এর ব্যবসা। দরজা, জানালা, আসবাবপত্রের রং তৈরি করে। পাইকারি থেকে খুচরো বাজর পর্যন্ত সর্বত্র ওদের রংয়ের চাহিদা। ওদের ব্যবসায়ী পরিবার। অনেক পয়সা।

এই সোমনাথ তাকে ভালবাসে। কি জানি, বাসে হয়তো। শুধু ঝিমলিই ভালবাসার অনুভূতিকে সেভাবে জাগাতে পারে না।

— 'তোর দিদির ব্যবস্থা তো আমি করে দেব বলেছি।'— সোমনাথ সুর সামান্য নরম করল। — 'মেন্টাল হসপিটালে আমাদের ভাল চেনাজানা আছে। ঠিকঠাক ট্রিটমেন্ট হবে। তোদের বাড়িটাও সারিয়ে দেব। তোর বাবার থাকতে কোনও অসুবিধা হবে না।'

খুবই সুবন্দোবস্ত। সত্যিই, সোমনাথ এসব আগেও বলেছে। মন থেকেই বলে হয়তো। শুধু ঝিমলিরই মনে হয়, লোভ! সোমনাথ ওকে লোভ দেখাচ্ছে।

ঝিমলি নিজেও জানে, সে বাহানা মারছে। একবার দিদিকে দেখাচ্ছে, একবার পরীক্ষা। কিন্তু এই সত্যিটা কি সে কোনওদিন সোমনাথকে বলতে পারবে? আর নাই যদি বলতে পারে, তবে কিসের ভালবাসা? আবার সোমনাথই কি এই সত্যিটাকে মেনে নিয়ে অপেক্ষা করতে পারবে? যদি অপেক্ষাই না করতে পারে, তবে ওরই বা কিসের ভালবাসা?

— আমি তো তোকে বলেছি, খরচা নিয়েও তোর বাবাকে কিছু ভাবতে হবে না। শুধু রেজিস্ট্রি, ব্যস।

এও বেশ সুবন্দোবস্ত। তবুও ঝিমলির কেন বিশ্বাস হচ্ছে না? কেন মনে হচ্ছে, এই ভালবাসা বন্য, অস্থির? টিকবে না!

— তুই তোর মা-বাবাকে বলেছিস?

— সে বলব'খন সময় করে।

— কি বলবি?

— তোদের কথা, তুই যা যা বলেছিস। তোর দিদির কথা, বাবার কথা।

সে সব তো ঘটনা। তবে ঘটনার আড়ালেও ঘটনা থাকে। থাকে নিজের কিছু বোধ, বিশ্বাস। সেসব কি সোমনাথকে কখনও বলতে পেরেছে ঝিমলি? যতবারই বলতে চেয়েছে, জিভ জড়িয়ে গিয়েছে।

— 'ঠিক আছে, আগে বলে দ্যাখ, কি হয়।'— ঝিমলি উঠে পড়ল।

অন্ধকার হয়ে আসছে। মাঠে ছেলেদের খেলা শেষ। পুকুরে ঘনিয়ে আসছে গাছগাছালির গাঢ় ছায়া। রাস্তা দিয়ে দু-চারটে সাইকেল, কিংবা রিক্সা যাতায়াত করছে।

সোমনাথের চোখের দিকে তাকাল ঝিমলি। মনে হল, ওর চোখ চোখ নয়। দুটো আগুনের টুকরো। জ্বলছে। পারলে এই আগুনে সে দেখে নিকনা ঝিমলির ভেতরের যত না-বলা কথা। কিন্তু ঝিমলি জানে, এই আগুনের শুধু দহন আছে, আলো নেই।

সাইকেলের পিছনে বসিয়ে ওকে এগিয়ে দিচ্ছে সোমনাথ। মেয়েদের কলেজের কাছটায় এসে ঝিমলি বলল— 'এখানেই ছেড়ে দে আমাকে। আর একটু হাঁটলেই তো জি টি রোড। আমি বাস বা অটো ধরে নেব।'

সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে সোমনাথ। ঝিমলির মনে হল, ওকে ডাকে। —'যাস্ না সোমনাথ, দাঁড়া।'

... আমার দিদিটা পাগল, বাবা আধা বেকার, আমরা গরীব। পুরনো ভাঙা বাড়ির রং-চটা ঘরে থাকি। এসব তুই জানিস। কিন্তু এটা কি জানিস, দিদি আসলে বরাবরই পাগল? সব পাগলামির গোড়ায় আরেকটা পাগলামি থাকে। খুব কাছে না থাকলে সেটা চোখে ধরা পড়ে না। দিদির সেই পাগলামি ছিল। শরীর নিয়ে।

সে দেখেছিল আমাদের 'নেই'-এর সংসার। মা নেই, ভাই নেই, বাবার ভাল রোগজার নেই, পরিজন নেই, থাকার মতো একটা ভাল বাড়িও নেই। তাই সে খুঁজত, কি আছে। খুঁজতে খুঁজতে পেয়েছিল নিজের শরীরটাকে। সে আহামরি সুন্দরী কিছু নয়, তবে মোটের ওপর একটা চটক ছিল। জেঠুরা বরানগর চলে যাবার পর বাড়ি তখন ফাঁকা। বাবা প্রায় সারাদিনই বাইরে, আমারও কলেজ। দিদি সুযোগ বুঝে ঘরের দরজা খুলে দিল।

ঠিক কিভাবে প্রকাশদার সঙ্গে দিদির আলাপ হয়েছিল, আমার জানা নেই। টুয়েলভ্ পাশ করার পর দিদি আর লেখাপড়ার ধার ধারল না। সংসার ঠেলার অজুহাত দেখাত। কিন্তু আমি জানি, ওটা অজুহাতই। দিদি বুঝেছিল, শরীরটা ব্যবহার করতে পারলেই ওর মুক্তি।

দিদি মুক্তি চেয়েছিল। অভাব থেকে মুক্তি, অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি। সে জানত, তার বিয়ে দেবার জন্য কারও গরজ নেই। নিজের ব্যবস্থা তাকে নিজেকেই করতে হবে।

দিদির সব তথাকথিত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে প্রকাশদাই ছিল সবচেয়ে ব্রাইট। এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত। তোদের মতো না হলেও, ওদেরও বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল। দিদি ওরই সঙ্গে নিজেকে জড়াচ্ছিল।

তোরা বলবি, বামন হয়ে চাঁদে হাত। আমি জানি, আমার নাক উঁচু ডাক্তার ছোটকাকাও দিদির সম্বন্ধে কি বলেছে। সে কথা আমি উচ্চারণ করতে পারব না। কারণ, দিদি অতটা খারাপ ছিল না।

অন্যদের সঙ্গে হা-হা হি-হি যতই করুক, দিদি কিন্তু তার লক্ষ্যে স্থিরই ছিল। সে নিজেকে জড়াচ্ছিল একজনের সঙ্গে— প্রকাশদা।

সমস্যাটা হল প্রকাশদা যখন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স করতে দিল্লি চলে যাবে, তখন। তার আগে সে দিদিকে বুঝিয়েছিল, দিল্লিতে তার চাকরি বাঁধা। হতেই পারে। এমনকি, একথাও সে দিদিকে বলেছিল, চাকরি পেলেই ওরা বিয়ে করবে।

কিন্তু দিদি আমাদের 'নেই'-এর সংসারের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই হারাতে অভ্যস্ত, পেতে নয়। সুতরাং ওর মনে ভরসা ছিল না, ভয় ছিল। নেই-এর সংসারে যা 'আছে' সেটারই মোক্ষম প্রয়োগ ঘটিয়ে ছাড়ল।

এক নির্জন দুপুরে সে প্রকাশদাকে দরজা খুলে দিল। শুধু ঘরের নয়, নিজের শরীরেরও।

এইভাবেই দিল্লি যাবার আগে ও প্রকাশদাকে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিল। আর এটাই দিদির সবচেয়ে বড় পাগলামি। গোড়ায় গলদ।

তারপর প্রায় দু-তিন মাস ও চুপ করে ছিল। ঠিকমত খেত না, লুকিয়ে লুকিয়ে বমি করত। বাড়ির সামনের টেলিফোন বুথটা থেকে মাঝে মাঝেই ফোন করত প্রকাশদাকে। কি কথা হত, কিছু বলত না।

একটা জিনিস দিদি কখনও বুঝতে পারেনি। কিংবা বুঝতে চায়নি। মেয়েদের শরীরটা আসলে একটা দায়, মূলধন নয়। বাচ্চাটা দিদির শরীরের মধ্যে বেড়ে উঠতেই ও সেটা বুঝতে পেরেছিল। দিদি জড়াতে চাইছিল প্রকাশদাকে, কিন্তু আসলে জড়িয়ে পড়ছিল নিজেই।

এই সময়ে প্রকাশদা তাকে টেলিফোনে কি বলেছিল, আমি জানি না। হয়তো, বাচ্চাটাকে নষ্ট করতেই বলে থাকবে। ঠিক তক্ষুণি হয়তো দিদিকে বিয়ে করার অবস্থায় সেও ছিল না।

দিদি তখন দিশেহারা। সময় বয়ে যাচ্ছে, বাচ্চাটা বেড়ে উঠছে পেটের ভেতর। মরিয়া হয়ে সে আর দ্বিধা করল না। আমাদের ভাড়াটে বউ গীতার সঙ্গে চলে গেল একটা সস্তার ক্লিনিকে।

মাঝরাতে শুরু হল ব্লিডিং। রক্তের সমুদ্র। আমাদের তো মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা। কিছুই বুঝতে পারছি না। বাবা কোথা থেকে একটা গাড়ি যোগাড় করে আনল। সঙ্গে ভাড়াটেদের দু-একজনকে নিয়ে পথে গাড়ি থামালাম বরানগরে। সোনাদা বলল— 'আমি ফোন করে দিচ্ছি। আর জি করে নিয়ে যা।' বউদি রুখে উঠল। বলল— 'তুমি কি? শুধু ফোন করে বসে থাকবে? মেয়েটা যে মরবে!' সোনাদা তবুও গাঁইগুঁই করতে লাগল। বড়মা নীরব। শেষটায় বউদিই বলল— 'চল তো, আমিই যাব।' বেগতিক দেখে সোনাদাও চলল।

যমে-মানুষে টানাটানি হল। হাসপাতালের নার্স আয়ারা যাচ্ছেতাই করে শোনাল আমাদের। বলল— 'আপনারা না ভদ্রঘর? এসব কি করে হয়?' সোনাদারও তখন মাথা গরম, হাসপাতালেই তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল বউদির সঙ্গে। শেষটায় আমার ডাক্তার ছোটকাকাকেও খবর দিতে হল। এসে অবশ্য কিছুই করল না। শুধু যাবার সময় বলে গেল, দিদি আসলে একটা বেশ্যা, সেরে উঠলে যেন আগাপাস্তলা চাবকানো হয়। আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল কথাটা শুনে। বাবাকে বলেছিলাম,— 'তুমি বলতে পারলে না, ওর নিজের মেয়েটা কি? ওর নামেও অনেক কানাঘুষো আছে!'

'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা'। বাবার বলার মুখ ছিল না। তার মেয়ের চুরি ধরা পড়ে গিয়েছিল। গোটা এলাকায় ঢি-ঢি পড়ে গেল। আর প্রকাশদা? হয়তো তার কানেও সব পৌঁছেছিল। আর ফিরেই এল না। শুনেছি, দিল্লিতেই থাকে, একটি পাঞ্জাবি মেয়েকে বিয়েও করেছে।

দিদি পাগল হল কেন? ওর অ্যানিমিয়া ছিল। ডাক্তাররা বলল, পুষ্টির অভাব, রক্তাল্পতা— এসবের কারণে ওর ব্রেনের নার্ভ শুকিয়ে যাচ্ছে। তোরা বলবি, প্রকাশদা ওকে ছেড়ে গেল বলে। সবই সত্যি। তবে পুরো সত্যি বোধহয় নয়। আমার কি মনে হয় জানিস? দিদির মাথাটা খারাপ হয়েছে একটা পাপবোধ থেকে। নিজের স্বার্থে নিজেরই শিশুকে হত্যা করার পাপ।

দিদি নিঃস্ব হয়ে গেল, আমরাও। আজ আমার বাবা ছাদের দরজায়, ঘরের দরজায় তালা মেরে রাখে। হাসিও পায়, দুঃখও হয়। ভয়েই লোকটা চতুর্দিক বন্ধ করে রাখে। তবুও আকাশে প্লেনের গর্জন শুনলেই একচিলতে জানালা দিয়ে আমার পাগল দিদিটা খোঁজে তার স্বপ্নের এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে। কলতলায় খোলা আকাশের নিচে উদোম হয়ে পড়ে থাকে। আকাশকে ওর শরীর দেখায়। লোভে পড়ে আকাশ যদি নেমে আসে। দিদি আকাশে উড়তে চেয়েছিল। বাজি রেখেছিল নিজের শরীরটাকে। এখন সেই শরীর শুকিয়ে কাঠি হয়ে গিয়েছে। আকাশ রয়েছে আকাশেরই মতো। নির্লিপ্ত নির্বিকার, সুদূর!

আমরা গরীব নই, সোমনাথ, গরীবেরও কিছু আশা ভরসা থাকে। আমরা নিঃস্ব। আমাদের 'নেই'-এর সংসার। আশা নেই, স্বপ্ন নেই, বিশ্বাস নেই। কেউ স্বপ্ন দেখালে আমরা ভাবি, লোভ দেখাচ্ছে। আর যেখানে বিশ্বাস নেই, সেখানে বোধহয় ভালবাসাও নেই। আমি কি কোনও দিন তোর কাছে সমস্ত সত্যিটাকে প্রকাশ করতে পারলাম? আর যতদিন না পারি, বিয়ের কথা মুলতুবি রেখে দে, সোমনাথ। দোহাই তোর! শুধু শরীরের টানে আমাকে জড়াস না।...

স্মল বস্

এই অফিসে দুই ভাইয়ের দুটো নাম আছে। উদয় বড়ুয়াকে সবাই বলে বিগ বস্। তার হাবভাবও সেরকমই। হাঁটা-চলা, কথাবার্তা, কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে সে বেশ একটা স্টাইল ফুটিয়ে তুলতে পারে। ঘড়ি ধরে অফিসে আসে, সারাদিনই ব্যস্ত থাকে, আবার ঘড়ি ধরে সন্ধে ছ'টায় অফিস ছাড়ে।

ছোট ভাই কেদার বড়ুয়া হল স্মল বস্। দুই ভাইয়ের চেহারায় কোনও মিল নেই। উদয় যত না হ্যাণ্ডসাম, তার চেয়ে বেশি স্মার্ট। কেদার ঠিক উল্টো। ভীষণই হ্যাণ্ডসাম। কিন্তু অদ্ভুত চরিত্রের। কেদার অবশ্য উদয়ের ঠিক নিজের ভাই নয়, সৎ ভাই।

বড়ুয়াদের টি এস্টেট আছে অসমে। কলকাতার পার্ক স্ট্রীটে এটা ওদের মার্কেটিং অফিস। মাস তিনে হয়ে গেল রিয়া এখানে কাজ করছে।

একই অফিস হলেও দুই ভাইয়ের দুটো আলাদা অংশ। উদয় ন্যাশনাল মার্কেটটা দেখে, ফরেন এক্সপোর্টের ব্যাপারটাও তারই। কেদারকে ছাড়া আছে শুধু রিজিওনাল মার্কেট। সেটাও সে ভালভাবে চালাতে পারছে না বলে রিয়াকে তারই অংশে কাজ করতে দেওয়া হয়েছে।

এই স্মল বস্‌কে নিয়ে অফিসে একটা কানাঘুষো আছে। ছোটবেলায় অসমে হাতির পিঠ থেকে নাকি পড়ে গিয়েছিল সে। মাথায় চোট

লেগেছিল। তারপর থেকেই নাকি খানিকটা অস্থির প্রকৃতির। ভীষণ আবেগপ্রবণ। ব্যবসায়ীদের যা একেবারেই মানায় না।

লোকটাকে অবশ্য খারাপ লাগে না রিয়ার। বয়স, মেরেকেটে ত্রিশ-বত্রিশ। অবিবাহিত। অফিসের আরও খবর, বহু মেয়ের সঙ্গে নাকি ফ্লার্ট করে বেড়ায়। এখন নাকি সল্ট লেকের কোনও এক বড়লোক ডাক্তারের মেয়ের কব্জায় পড়েছে।

পুরো অফিসটাই একরকম রিয়ার ওপরে ছেড়ে দিয়েছে সে। ফলে রিয়ার চাপ বেড়ে যাচ্ছে খুব। নিজে একটা মিটিং-এ পর্যন্ত থাকতে চায় না।

সুইং ডোর ঠেলে রিয়া ঢুকল কেদারের ঘরে।

— গুড মর্নিং।

— মর্নিং।

দু-একটা মামুলি কথাবার্তার পর রিয়া বলল— 'কাল কিন্তু একটা ইম্পর্টান্ট মিটিং আছে, স্যার।'

— রিয়া, বলেছি না, তুমি আমাকে কেদার বলেই ডাকবে।'

রিয়া চোখ নামিয়ে নিল। মৃদুকণ্ঠে বলল— 'ইউ আর মাই বস্, স্যার।'

— নো, রিয়া, আয়াম ইওর ফ্রেন্ড। আমার কোনও বন্ধু নেই। তুমি আমার বন্ধু হবে?

কথাবার্তা অস্বস্তিজনক বাঁক নিচ্ছে। কিন্তু কিছু করার নেই। লোকটা এরকমই। সত্যি ওর মাথার গণ্ডগোল আছে।

রিয়া একটু কঠিন হল। কোনও সম্বোধন না করেই বলল— 'মিটিং কিন্তু ঠিক তিনটেয়।'

— 'তিনটেয়! অসম্ভব।' — চেয়ারে বসেই প্রায় লাফিয়ে উঠল স্মল বস্।

— কেন?

— আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

রিয়া বিরক্ত হল। লোকটা কি! মুখে অবশ্য শুধু বলল— 'ও। তাই নাকি?'

— তুমি তো আছ। তাহলেই হবে। আর বিগ বস্? সে থাকবে না?

রিয়া এই প্রগল্‌ভতাকে প্রশ্রয় দিল না। বলল— 'মিটিংটা কিন্তু আপনার রিজিওনাল মার্কেট নিয়েই। উদয় স্যার থাকবেন কিনা আমি জানি না।'

— ঠিক আছে। আমি বলে দিচ্ছি।

রিয়া গম্ভীর হয়ে রইল। এই দুর্বলচিত্ত, ঈষৎ ছিটগ্রস্ত মানুষটা আসলে খারাপ নয়। কিন্তু একটা মারাত্মক দোষ আছে। যাকে বিশ্বাস করে, তাকে পুরোটাই বিশ্বাস করে বসে। এটা ভাল নয়। আঘাত পেলে এই ধরনের মানুষ নিজেকে শেষ করেও দিতে পারে। ওর অফিসটাও তো শেষ হতেই বসেছিল। প্রাণপণ পরিশ্রম করে রিয়া আবার সব কিছু গুছিয়ে তুলেছে। এখন একটা ফাইল খুঁজতে চোখে অন্তত অন্ধকার দেখতে হয় না। একটু একটু করে রিয়া অফিসটার রেঞ্জও বাড়াতে চাইছে। কলকাতা ছাড়িয়ে অন্তত বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোলের দিকে। ওদিকের অনেকটাই শিল্পাঞ্চল। একটা স্যাম্পল্ মার্কেট সার্ভেও করিয়েছে সে। রিপোর্ট মোটের ওপর ভাল। অথচ এই লোকটা অফিসকে এক মিনিটও সময় দেবে না!

টেবিলে ফিরে এসে কম্পিউটারে একটা অর্ডার-লেটার টাইপ করছিল রিয়া। অফিসের কিছু জিনিসপত্র কেনা দরকার। ইন্টারকামটা হঠাৎই বিপ্‌বিপ্ করে উঠল। — কেদার! আবার কি হল?

রিয়া ঘরে ঢুকতেই কেদার বলল— 'বোসো রিয়া। রাগ করলে?'

আবার শক্ত হল রিয়া। ইচ্ছে করেই ইংরাজিতে বলল— 'ইউ আর মাই বস্। নো কোশ্চেন অফ টেকিং অফেন্স।'

কেদার হাসল। বলল— 'কফি খাও।'

মাথা নাড়ল রিয়া। — 'নো, থ্যাঙ্কস্।'

— দ্যাট মিন্‌স ইউ আর অফেণ্ডেড।

জোর করে রিয়াকে কফি খাওয়াল কেদার। তারপর বলল— 'আমি জানি, তুমি অফিসের জন্য খুব খাটছ।'

রিয়া খুব সংযতভাবে বলল— 'থ্যাংকস্।'

— পুজোর আগে তোমার স্যালারি আমি বাড়িয়ে দেব।

রিয়া একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল— 'শুধু আমার একার জন্য বাড়ালে সেটা কি ভাল দেখাবে স্যার? অফিসের জন্য সকলেই খুব খাটছে।'

কেদার রিয়ার অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল— 'শুধু আমিই ফাঁকি মারছি, না?'

রিয়া চোখ নামিয়ে নিল। কিছু বলল না।

— রিয়া, আমি জানি, আমাকে সবাই খুব লাইটলি নেয়। ভাবে গুড ফর নাথিং। কিন্তু আর দুটো মাস যেতে দাও। তারপর দেখো, আমি কাজে মন দিই কিনা।

— 'ঠিক আছে, স্যার।'— বলে উঠে পড়ল রিয়া।

— শোনো, রিয়া, যেও না। আমি কথা দিচ্ছি, কালকের মিটিংয়ে অন্তত আধ ঘন্টা হলেও আমি থাকব। দেয়ার আফটার, ইউ প্লিজ কনডাক্ট।

— থ্যাংকস্ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।

টেবিলে এসে আবার কাজে মন দিল রিয়া। তবুও মনটা যেন পুরোটা বসল না। দু-মাস সময় চাইল কেন লোকটা? এই দু-মাসে সে কি করবে? কাল কার সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট? সল্ট লেকের সেই ডাক্তারের মেয়ে?

আবারও ইন্টারকামের বিপ্ বিপ্। বিরক্ত হয়েই রিসিভার তুলল রিয়া। না, কেদার নয় তো! ওধারে এক নারীকণ্ঠ। তড়বড় করে বলল— 'হ্যালো কেদার, হোয়াই হ্যাভ ইউ সুইচ্ড অফ ইওর মোবাইল?' দ্রুত ইন্টারকামের বোতাম টিপে দিল রিয়া। মুখে বলল— 'প্লিজ, হোল্ড অন।'

এই কি সেই ফিয়াসেঁ। যার জন্য কেদার দু-মাস সময় চাইছে? কম্পিউটারে চিঠিটা টাইপ করা হয়ে গিয়েছিল রিয়ার। প্রিন্ট আউট নিতে নিতে হঠাৎ-ই তার কেমন মনে হল, এই কণ্ঠস্বর কবে, কোথায় যেন সে একদিন শুনেছে।

পরদিন বেলা তিনটেয় মিটিং রুমে গিয়ে রিয়া দেখল, বিগ বস্ হাজির আছে, কিন্তু কেদারের চেয়ারটা খালি।

— 'লেট আস ওয়েট ফর মিস্টার কেদার।' — রিয়া বলল।

— 'ইউ নিড নট।'— বিগ বস্ গম্ভীরভাবে বলল। — 'হি হ্যাজ লেফ্ট।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলল রিয়া। মিটিং শুরু হয়ে গেল।

যুগলবন্দি

পিংকি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে ক্রিম ঘষছিল। ক্লক ওয়াইজ, অ্যান্টিক্লক ওয়াইজ। আয়নার মধ্যেই সে নিজের মুখের পিছনে আরেকটা মুখ দেখতে পাচ্ছিল। সে মুখটা একটা প্যাঁচার। পিংকি তার স্বামীর এই মুখের ভাব খুব চেনে। আলো নিভিয়ে ডিম লাইটটা জ্বালিয়ে দিতেই আধো অন্ধকারে প্যাঁচাটা হুমহুম করে উঠল।

— ওই ছোঁড়াটা আজ এখানে এসেছিল কি করতে?

— 'ছোঁড়া! ছোঁড়া বলছ তুমি কাকে?'— পিংকি সত্যিই আকাশ থেকে পড়ল।

— ওই যে, অতীন না রথীন কি যেন নাম! এখানে কি করতে?

— 'কি করতে আবার?'— পিংকি মশারিটা বাইরে থেকে গুঁজতে গুঁজতে বলল— 'ও তো প্রায়ই আসে।'

— 'প্রায়ই আসে?' — সঞ্জয় হুমকে উঠল। — 'অথচ, আমাকে তো তোমরা কেউ কিছু বলোনি?'

— বলার আবার কি আছে? ও আসে, আধ ঘন্টাটাক বসে, একটু চা-টা খায়, তারপর চলে যায়।

— বাঃ, চমৎকার! আমার বাড়িটা তো দেখছি রেস্টুরেন্ট হয়ে দাঁড়াল।

— 'রেস্টুরেন্ট হবার কি আছে?— পিংকি নাইটির ফিতেটা সামান্য ঢিলে করল। — 'কেউ বাড়িতে এসে এক কাপ চা খেলেই বাড়িটা রেস্টুরেন্ট হয়ে যায় না।'

সঞ্জয় বেতের চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে জানালার ধারে গিয়ে বসল। একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বলল— 'ওর সঙ্গে রিয়ার সম্পর্কটা কি?'

— সেটা রিয়াকেই জিজ্ঞেস করো।

— রিয়া আমার হাঁটুর বয়সী ছোট বোন। ওর সঙ্গে আমি এসব ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে যাব?

— তাহলে খামোকা আমাকে জেরা করছ কেন?

— করছি এই কারণে যে, তুমিই তো ওদের মাই-ডিয়ার বউদি হয়ে দাঁড়িয়েছ।

— দ্যাখো, মাঝরাতে কতগুলো আলতু-ফালতু কথা বলবে না বলছি।

— আলতু-ফালতু কথা বলছি? আর আলতু-ফালতু কাজ তুমি করছ না? কি কারণে তুমি ওই অতীন ছেলেটাকে রোজ রোজ বাড়িতে ঢোকার পারমিশান দিচ্ছ?

— আশ্চর্য! পারমিশান আমি দিচ্ছি? তোমার বাড়িটা কি রাষ্ট্রপতি ভবন, যে গেটে সিকিউরিটি চেক করে লোক ঢোকাতে হবে? আর পারমিশানের কথাই যদি তোল, আমি পারমিশান দেবার কে? তোমার মা আছেন।

— মার কথা ছাড়ো। মা'র ভীমরতি হয়েছে। নয়তো এই দায়িত্ব কেউ ঘাড় পেতে নেয়? আমি তখনই বারণ করেছিলাম, তুমিই মাকে উস্কে দিলে।

— 'একদম বাজে কথা বলবে না।'— পিংকির মুখ লাল হয়ে উঠল। — 'রিয়ার এখানে আসার ব্যাপারে অতই যদি তোমার আপত্তি, তাহলে সেজকাকা কাকীকে পরিষ্কার বলে দিলে না কেন? এখন আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ।'

— 'একশোবার চাপাব।'— সঞ্জয়ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।— 'তুমি নিজে হ্যাঁ, হ্যাঁ, রিয়া আসুক না বলে সকলের কাছে ভাল বউমাটি সাজবে, আর মধ্যে থেকে ভিলেন সাজব আমি, না?'

সিগারেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সঞ্জয়। তারপর বলল— 'মিমির সময়েও তুমি ঠিক এই কাণ্ডটাই করেছিলে। — 'চল, আমিও হাসপাতালে যাব।' তোমার জন্য আমাকেও যেতে হল।'

— বোলোনা, বোলোনা। আমি তোমাকে টেনে বার না করলে মেজকাকা আর ঝিমলির কাছে তোমার ইজ্জত থাকত?

— চুলোয় যাক ইজ্জত! হাসপাতালে গিয়ে ভারি আমার ইয়ে হয়েছে। ইজ্জত! চূড়ান্ত বেইজ্জতি!

— তবুও তো মিমিটা প্রাণে বেঁচেছে।

— প্রাণে বেঁচেছে। ও বাঁচা আর না-বাঁচা একই কথা। আমি বলে দিচ্ছি, আবারও এই একই কাণ্ড ঘটবে। মাইডিয়ার বউদি হয়েছ!

— 'একই কথা বারবার বলবে না বলছি।' — পিংকি টেবিলের ওপর থেকে জলের গ্লাস তুলে ঢক্‌ঢক্ করে অনেকটা জল গলায় ঢালল।

— না, বলব না! বাইরের ছেলে বাইরেই থাকবে। তাকে ঘরের দরজা খুলে দিলে ফল একই হতে বাধ্য।

— তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, রিয়া আর মিমির অবস্থা একরকম না।

— তুমিও ভুলে যাচ্ছ যে, সেজকাকার যতই পয়সা থাক, আর রিয়ার যতই বিদ্যে থাক, বিয়েটা কিন্তু ওরও হচ্ছে না।

— তুমি কি বলতে চাইছ, রং চয়েস?

— একশোবার। কোন ঘোড়াড্ডিমের চাকরি করে ছেলেটা? সর্বক্ষণ রিয়ার পেছনে ঘুরঘুর করছে।

— ও রিয়াকে নানান জায়গায় ইন্টারভিভতে নিয়ে যেত। তুমি ক'দিন অফিস কামাই করতে পারতে? আর রিয়া কলকাতার কিছু চেনে না জানে?

— মরে যাই! শখের প্রাণ, গড়ের মাঠ। এখানে যখন এসেছিল, তখন কি জেনে এসেছিল যে তার একজন পার্মানেন্ট বডিগার্ড জুটে যাবে?

— ও নাকি ফোনে সেজকাকীর সঙ্গে কথা বলেছে।

— তারপর?

— সেজকাকী নাকি বলেছেন, তুমি যখন কলকাতার রাস্তাঘাট ভাল চেন না, তখন সঙ্গে একজন বন্ধু থাকা ভাল।

— বাঃ! একেবারে দেবীর আদেশ হয়ে গেল! সে বন্ধুটি কেমন তার কোনও খোঁজ নেবার দরকার নেই!

— তা তুমিই বা ছেলেটাকে অত খারাপ ধরে নিচ্ছ কেন? ও গ্র্যাজুয়েট, কম্পিউটার কোর্স করেছে। আজ না হয় একটা কম টাকার চাকরি করছে, পরে উন্নতি করতেও তো পারে?

— উন্নতি করতে হলে চেষ্টা থাকা চাই। দিন-রাত একটা মেয়ের খানসামা হয়ে ঘুরে বেড়ালে আর উন্নতি করতে হয় না। খালি ঘোরাঘুরি আর আড্ডা। সারাদিন, সারারাত। চলছেই চলছেই।

— পার্ক স্ট্রীট জায়গাটা ভাল নয়। রিয়ার প্রায়ই অফিস থেকে বেরোতে দেরি হয়। ও বলে, ওর গা ছমছম করে। সেজন্যই অতীন ওকে.....

— থামো তো। ওর বুদ্ধিতে চলেই রিয়া সেদিন এসপ্ল্যানেডে বিপদে পড়েছিল। আশ্চর্য! তিন-তিনটে কাগজে সেদিন আগাম হুঁশিয়ারি ছিল, এসপ্ল্যানেডে গণ্ডগোল হতে পারে, আর উনি সেখানে রিয়াকে নিয়ে গেলেন ফূর্তি মারতে। ইডিয়েট একটা!

সঞ্জয় আবার একটা সিগারেট ধরাল। বলল— 'রিয়ার চিন্তা করা উচিত যে, ওর বাবার স্ট্যাটাসটা কি। বিয়ে হচ্ছে না বলে যার-তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেই হয় না।

— 'বাপের স্ট্যাটাস ধুয়ে জল খেলে আর মেয়েদের হয় না।'— পিংকি ঘড়ঘড়ে গলায় বলল।

— জানি, জানি, তুমি কি বোঝাতে চাইছ। তা তোমার মতো বড়মানুষের মেয়ের আমার হাতে পড়ে যে কষ্টটা হচ্ছে, সেটা যাতে রিয়ার না হয়। একটা ভ্যাগাবণ্ডের সঙ্গে যাতে জড়িয়ে না পড়ে, সেটাই দয়া করে ওকে একটু বোঝাও না!

— একদন বাজে বকবে না তো! কাকে তুমি ভ্যাগাবণ্ড বলছ? চন্দননগরে ওদের নিজেদের বাড়ি আছে। ওর বাবা ইলেকট্রিক্যাল কাজকর্মের কনট্রাক্টরি করেন, ওর ছোট ভাই টিভি মেকানিক।

— চমৎকার! বাপ ঠিকাদার, ভাই মিস্ত্রি। আর ইনি রিয়ার হুকুম-বরদার।

— ছিঃ ছিঃ। কি জঘন্য যে কথাবার্তা না তোমার! মানুষকে এত ছোট করতে পারো!

— শোনো, আমি সাফ একটা কথা বলতে চাই। রিয়া ওর মনের ভাব পরিষ্কার করে বলে দিক। কার জন্য আমি ত্রিভুবন ঘুরে ঘুরে বিয়ের সম্বন্ধ দেখছি বলতে পারো? আমি আর পারবো না। এবার থেকে তাহলে তুমি যাবে।

— আমি রিয়াকে দু-একবার জিজ্ঞেস করেছি অতীনের সম্বন্ধে। ও চুপ করে থাকে।

— কেন? চুপ করে থাকবে কেন? এটা তো আরেকটা অন্যায় করছে। তুমি তাহলে সেজকাকীর সঙ্গে ফোনে কথা বলো।

— দয়া করে এবার একটু চুপ করবে? অসহ্য লাগছে কিন্তু আমার! আর তো মেরে কেটে একমাস, পুজোর মুখে লিজার বাচ্চা হবার সময় তো ওঁরা আসছেনই, যা বলার তখনই বোলো। এবার আমাকে একটু ঘুমোতে দাও।

মশারি তুলে বিছানায় ঢুকতে যাবে পিংকি, হঠাৎই প্রচণ্ড শব্দ করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। এত রাত্রে? সঞ্জয় প্রায় লাফ দিয়ে উঠে রিসিভারটা তুলে বলল— 'হ্যালো?'

ওপাশ থেকে এক পুরুষকণ্ঠ বলল— 'আমি আশিস।'

— আশিস। এত রাত্রে? লিজা.... কি বললে? হঠাৎই শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল?.... নার্সিং হোমে.... ইউটেরাস থেকে ফ্লাইড বেরিয়ে যাচ্ছিল?..... তাহলে বাচ্চাটা?.... ওঃ! লিজা ঠিক আছে?... হ্যাঁ, আমরা কাল সকালে রিয়াকে নিয়ে....

ফোন নামিয়ে রেখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সঞ্জয়।

পিংকি অস্ফুট স্বরে বলল— 'কি হল?'

সঞ্জয় জড়িয়ে জড়িয়ে বলল— 'লিজা ঠিকই আছে। তবে... ওর বাচ্চাটা.... বাঁচানো গেল না।'

পিংকি মুখে হাত চাপা দিল। সঞ্জয় বিমূঢ়। একটু আগেও বেড়াল বেড়ালির মতো ঝগড়া করে যাচ্ছিল ওরা। এখন সব চুপ। একটি সদ্যোজাত শিশুর অকালমৃত্যু ওদের সমস্ত বাক্‌শক্তি যেন হরণ করে নিয়েছে। সেই নৈঃশব্দের মধ্যে দরজায় কার যেন মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

— 'আমি রিয়া। বউদি, সোনাভাই, দরজাটা খোলো।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রী তাকাল একে অপরের দিকে। ও ঘরের টেলিফোনের শব্দে রিয়ার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। — 'দরজা খোলো, সোনাভাই। লিজার কি কিছু হয়েছে?'

দরজা খুলে দিল সঞ্জয়। রিয়া এসে ঢুকল।

— বউদি! কথা বলছ না কেন তোমরা?

— রিয়া! লিজা ভালই আছে। তবে....

— তবে কি, বউদি? বলো না গো, চুপ করে থেকো না।

— রিয়া, ওর বাচ্চাটা...

— বউদি!

— চুপ, রিয়া চুপ! বড়মার ঘুম ভেঙে গেলে সর্বনাশ হবে।

পিংকিকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েছে রিয়া। সঞ্জয় সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সিস্টার যোসেফাইন

চুপ করে বালিশ আঁকড়ে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে রিয়া। রাত একটার ঘন্টা পড়ল। পুরো বাড়িটা, গোটা পাড়াটা নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে শুধু ইতস্তত কুকুরের ডাক রাতের নৈঃশব্দকে ভাঙার চেষ্টা করছে। বড়মা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। দুই পাশে শোয়া বিন্দিয়া আর টুকও ঘুমে অচেতন। ঘুম নেই শুধু রিয়ার চোখে।

ইদানিং প্রায়ই তার এরকম হচ্ছে। সারাদিন অফিসের খাটুনি, যাতায়াতের পরিশ্রম— কোনও কিছুই তার চোখে ঘুম এনে দিতে পারছে না। একা শুয়ে শুয়ে ঘড়ির টিক্‌টিক্ আর ঘন্টা শুনে সে বুঝতে পারছে রাত কতদূর এগোল।

লিজা বাড়ি ফিরে গেছে দিনকয়েক হল। তবুও যোধপুর পার্কে এখনও যাওয়া হয়নি রিয়ার। রোজ অফিস থেকে বেরোতে রাত প্রায় আটটা বেজে যাচ্ছে। ফোনে অবশ্য কথা হয়েছে। দু-একটা কথার পর রিয়ারই গলা ধরে এসেছে। এত কষ্ট পেল বোনটা, অথচ....। লিজাই তখন ওকে উল্টে সান্ত্বনা দিয়েছে। বলেছে— 'তুই আর অতীনদা বিয়েটা করে ফ্যাল দিদি। মা তো হতে পারলাম না, অন্তত মাসি হই।'

নিজের দুঃখকে রিয়ার সুখ দিয়ে ভরাতে চাইছে লিজা। পারলে সে কালই ওদের বিয়ে দেয়। শুধু রিয়াই মনস্থির করতে পারছে না। বলেছে— 'দাঁড়া, মা আগে একটু সামলে উঠুক। রোজই ফোনে এত কান্নাকাটি করছে।' এদিকে সুধাকরের ছুটির আবেদনও বাতিল হয়ে গিয়েছে। ক'দিন ধরেই এসব নানা কারণে মা-বাবাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে রিয়ার। জন্মস্থান বিলাসপুর যেন টানছে তাকে। স্মৃতিতে ভেসে আসছে হারিয়ে যাওয়া দু-একটি অতি প্রিয় মুখ, কানে যেন শুনতে পাচ্ছে ভুলে যাওয়া কিছু কথা!

.... 'ইন হিজ উইল, আওয়ার পিস্।' ....'কোয়ানডো কাড্রেম লী ফোলি।' — যখন পাতা ঝরে যায়। .... সিস্টার আপনি আমাকে বলুন, এই পাতা ঝরে যাওয়াও কি ঈশ্বরের ইচ্ছা? .... ইয়েস্, মাই চাইল্ড, সবই তাঁর ইচ্ছা। পাতা ঝরে যায়, আবার নতুন পাতারা আসে।...

... কিন্তু মিমি? সে তো একটা পাতা-ঝরা গাছই হয়ে পড়ে রইল, সিস্টার! কিংবা, লিজার দুঃখ? শিশুর মৃত্যু? একটা সম্ভাবনার অকাল-বিনাশ? সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা?

রিয়া জানে, সিস্টার হাসবেন। অনেক প্রশ্নেরই উত্তর তাঁর নীবর, মধুর হাসি। কিংবা হয়তো বলবেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা অতি গূঢ়, জটিল, রিয়া! আমাদের সাধ্য কি তার সবটুকু বুঝি?.

একটানা দশ বছর বিলাসপুরে সিস্টার যোসেফাইনের কনভেন্ট স্কুলে পড়েছে রিয়া। পাশেই ছিল ছেলেদের কনভেন্ট। তার কর্ণধার ফাদার ফিলিপ। একজন যাজক, অন্যজন যাজকিনী। দুজনে মিলে পরামর্শ করে চালাতেন দুটি প্রতিষ্ঠান। হঠাৎই ফাদার ফিলিপের ডাক পড়ল সুদুর অস্ট্রেলিয়ায়। রিয়ারা তখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী। সিস্টার ওদের ডেকে বললেন, 'আই উইশ টু লিভ হিম আ হার্টি ফেয়ারওয়েল। অ্যারেঞ্জ আ নাইস প্রোগ্রাম।'

দারুণ একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল সেবার। শেষে ফাদার ফিলিপের হাতে একগুচ্ছ লাল গোলাপ তুলে দেবে রিয়ারা। কিন্তু ওরা গিয়ে ধরল যোসেফাইনকে। — 'সিস্টার, ইউ গিভ হিম দ্য বোকে।' সামান্য ইতস্তত করে ওদের সে আবদার রক্ষা করেছিলেন সিস্টার। গোলাপের গুচ্ছ ফাদার ফিলিপের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, — 'গুড বাই, ফিলিপ! ... গড ব্লেস ইউ!' সেই মুহূর্তে রিয়ার মনে হয়েছিল একটা পবিত্র, অপার্থিব আলোর বলয় যেন ঘিরে রেখেছে ওঁদের দুজনকে।

সেই আলোর সন্ধান কি রিয়া পেল তার এই চবিবশ বছরের জীবনে সেই শান্ত, পরিশুদ্ধ আলো?

ঘুম না আসা চোখের সামনে ভেসে উঠল আরেকটি মুখ। — ভাস্করণ! পাশাপাশি স্কুলে পড়েছে ওরা। তারপর একসঙ্গে কলেজে। কম্পিউটার কোর্সে, ম্যানেজমেন্টের ক্লাসে— শৈশব, কৈশোর পার হয়ে যৌবনের গোড়ার দিনগুলো পর্যন্ত। অতীনের বিপরীত মেরুর চরিত্র ভাস্করণ। ভীষণ চাপা, স্বল্পবাক্। শুধু রিয়াই যে কি করে ওর বন্ধু হয়ে উঠেছিল, কে জানে! প্রবল বৃষ্টিতে কম্পিউটার ক্লাসে যাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে রিয়া, হঠাৎই কোয়ার্টারের সামনে বাইকের গর্জন এসে থমকে দাঁড়াল। — ভাস্করণ। আগাপাস্তলা বর্ষাতিতে ঢাকা। রিয়া হাসতে হাসতে বলল— 'ওঃ ভাস্করণ! ইউ আর ট্যু সিরিয়াস।' শুনে মুচকি মুচকি হাসত ছেলেটা। বলত— 'ইয়েস। ইন অল্ রেস্পেক্টস্।'

'ইন অল রেস্পেক্টস্!' — সব ব্যাপারে? কি বলতে চাইত ভাস্করণ? মুখে সে বলেনি আর কিছুই। সে অতীনের মতো ফুটন্ত চরিত্রের ছেলে নয়। কিন্তু রিয়া যখনই কোনও সাহায্য চেয়েছে, একটা কথাই বলেছে— 'অল রাইট রিয়া। ইউ উইল গেট ইট।' যা কিছু যত দুষ্প্রাপ্য আর দুর্লভই হোক না কেন, ঠিক এনে তুলে দিয়েছে রিয়ার হাতে। লিজা তখনই বলেছে— 'কিছুই কি বুঝিস না দিদি? আমি তো বুঝতে পারি।' রিয়া চুপ করে থেকেছে। খুব বেশি হলে বলেছে— 'আমরা শুধু বন্ধু।' আর কি বলবে? সে বুঝত, বাপির না হোক, মার আপত্তি আছে। ওরা ব্রাহ্মণ, আর ভাস্করণ ক্রিশ্চান।

কিন্তু, আজ তবে কেন মনে হয়, ভুল করেছে? শুধু ভুল নয়, অন্যায়। এতখানি ভালবাসার প্রতিদানে কি দিতে পেরেছে? ওর মা মারা গেলেন হঠাৎ। বাবার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না ওর মায়ের। রেল কলোনীর স্কুলে চাকরি করে ছেলেকে বড় করে তুলছিলেন ভদ্রমহিলা। সেই মায়ের মৃত্যুতে ভাস্করণ যখন সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে গেল, তখন রিয়া কি করল? কলকাতায় চলে এল। নিজের কেরিয়ারই তার কাছে সবচেয়ে বড় স্বার্থ হয়ে দাঁড়াল। মুখে কিছু বলেনি ভাস্করণ। জোর খাটিয়ে বাধাও দেয়নি। তবুও যাবার আগে একদিন এসেছিল। বলেছিল—

'আয়্যাম অলসো লিভিং টুমরো।' — 'হোয়্যার?'. — রিয়া অবাক হয়েছিল। ভাস্করণ কোনও উত্তর দেয়নি। শুধু মাথা নেড়েছিল। বলবে না। সে কি ওর অভিমান?

চলে গেল ভাস্করণ। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। সেই অন্ধকারে দৃশ্যমান শুধু ওর বাইকের পিছনের লাল আলো। রিয়াদের কোয়ার্টার্স ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে ডাইনে বাঁক নিল আলোটা। তারপর অদৃশ্য। সেই শেষ, আর দেখা হয়নি কখনও। কোথায় চলে গেল বলেও গেল না। লিজার কথাই কি তবে ঠিক? তারই জন্য ঘরছাড়া হল ছেলেটা? আর আজ অতীনকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছে রিয়া। অন্যায় হচ্ছে না তার? অথচ, অতীনকেই বা সে ঠেকাবে কেমন করে?

.... সিস্টার, আপনি আমাকে পথ দেখান। অতীনের ভালবাসা আমি বুঝি। স্পষ্ট, সহজ ভালবাসা। কিন্তু যে ভালবাসা নির্বাক, তাকে বোধহয় আমি বুঝতেও পারিনি। ভালবাসার উপলব্ধি হয় দুঃখে, একাকীত্বে, দৈন্যে, নিঃস্বতায়। কলকাতার পথে একা হয়ে, পদে-পদে ধাক্কা খেয়ে আমি অতীনের ভালবাসাকে চিনলাম। বিলাসপুরে সে অবস্থা আমার ছিল না। তাই হয়তো ভাস্করণকে বুঝিনি, বোঝার চেষ্টাও করিনি।...

... কলকাতায় আসার আগে আপনাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। আপনি বলেছিলেন— 'তুমি যাও রিয়া, তোমার ভাল হবে।' এই কি সেই 'ভাল' সিস্টার? এখানে এসে যা দেখলাম, এত অভাব, এত দারিদ্র্য, এত বেকারি, পদে-পদে মনুষ্যত্বের অপমান! পথে-পথে দেখতে পাই ভিখিরি-মায়ের কোলে জীর্ণ শিশু, আমারই বয়সী অসংখ্য ছেলেমেয়েদের ক্লান্ত, বিষণ্ণ মুখ। বলুন সিস্টার, ঈশ্বরের সৃষ্টি এই পৃথিবীতে কেন এত যন্ত্রণা, কেন এত দুঃখ? সবই মেনে নিতে হবে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে?...

... নাকি আপনি বলবেন, রিয়া, ঈশ্বর তো দুঃখেরই মধ্যে। বিত্তে নয়, ঐশ্বর্যে নয়, গর্বে নয়, দুঃখে, দারিদ্র্যে, দীনতায়। যেমন, ভালবাসার উপলব্ধি দুঃখে, তেমনই ঈশ্বরের উপলব্ধিও দুঃখেই। সেই অর্থে ভালবাসাই ঈশ্বর, ঈশ্বরই ভালবাসা। দুঃখও তাই তাঁরই ইচ্ছায়। আর এই দুঃখকে চেনাতেই তোমার প্রকৃত মঙ্গল, রিয়া। আমি সেই 'ভাল'র কথাই তোমাকে বলেছি। দুঃখের মধ্যেই ক্লান্ত, বিপন্ন, বিষণ্ণ মানুষ একদিন তাঁর ঠিকানা খুঁজে পাবে।....

... আমি আপনাকে চিঠি লিখব, সিস্টার। আপনি বলেছিলেন, হয়তো আপনি বিলাসপুর থেকে রাঁচি চলে যাবেন একটা অনাথ আশ্রমের দায়িত্ব নিয়ে। জানি না, এই ক-মাসের মধ্যে আপনি সেখানে চলে গিয়েছেন কিনা। সে ঠিকানা তো আমি জানি না। আমি আপনাকে পুরনো ঠিকানাতেই চিঠি দেব। আপনি উত্তর দেবেন তো, সিস্টার?...

ঘড়িতে রাত দুটোর ঘন্টা বাজল। কিন্তু রিয়ার কানে আর সেই শব্দ পৌঁছল না। ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুন্দরীর মন

একটা গাড়ি এসে থামার শব্দ পাওয়া গেল। ঘড়ির দিকে তাকালেন শীলা। রাত এখন এগারোটা বেজে দশ। গাড়ির দরজা বন্ধ হবার শব্দ আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ণ এক যুবতীকণ্ঠের চিৎকার— 'বা-ই।'

আজ মনস্থির করেই বসে আছেন শীলা। একটা হেস্তনেস্ত করবেনই। রত্নাকর এখন বিদেশে। কানাডায়, একটা কনফারেন্সে। যাবার আগে স্বামীকে একদিন ধরেছিলেন শীলা।

— মিলির সম্বন্ধে তুমি কি ভাবছ?

রত্নাকর পাত্তাই দিতে চাননি। বলেছিলেন— 'মিলি? ওর সম্বন্ধে আর কি ভাবব? শী ইজ অ্যাডাল্ট আণ্ড দ্যাটস্ অল।'

— 'এরকম বললে হয় না।'— শীলা প্রতিবাদ করেছিলেন।— 'ওর চালচলন আজকাল আমার একটুও ভাল লাগছে না। বড্ড ডেস্পারেট। হয় নিজে নষ্ট হবে, নয়তো অন্যকে শেষ করবে।'

রত্নাকরের ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল। বলেছিলেন— 'নষ্ট হয় তারাই, যাদের পয়সা-প্রতিপত্তি কোনওটাই নেই। যেমন, মেজদার মেয়ে মিমি।'

কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। তবুও শীলার শুনতে ভাল লাগেনি। বলেছিলেন— 'এমন কথা তুমি বলতে পারলে? মেয়েটা না তোমার নিজের ভাইঝি!'

রত্নাকর এবার একটু গম্ভীর হয়েছিলেন। বলেছিলেন— 'আমার ভাইঝিরা কি তাদের কাকাকে চেনে? তোমাকে চেনে? লিজার বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেল, আমি কলকাতার টপ্ গাইনি সার্জেন, অন্তত লোকে তো তাই বলে, সেজদা বা সেজবৌদি একবারও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে?

শীলা চুপ করে গেলেন। এই অভিমান তাঁরও আছে। খ্যাতি, পয়সা, প্রতিপত্তি এসব কি মানুষকে তার পরিবার থেকেও বিচ্ছিন্ন করে দেয়? হয়তো।

রত্নাকর বললেন— 'তুমি কি জানো, সেজদার বড় মেয়ে রিয়া কলকাতায় এসেছে?'

— জানি। একদিন বরানগরের বড়দিকে ফোন করেছিলাম।

— আমাদের এখানে একদিনও এসেছে?

শীলা আবারও চুপ করে গেলেন।

রত্নাকর নিজেই বললেন— 'আসবে না। বড়লোক হয়ে আমরা মহাপাপ করেছি যে!'

শীলা একথার কোনও প্রতিবাদ করতে পারলেন না। একটা কথা তাঁর বরাবরই মনে হয়েছে। চন্দ্রা কোনওদিনই শীলাকে পছন্দ করে না। হয়তো রিয়াকে এখানে আসতেও সেই বারণ করে দিয়েছে।

একেকসময় শীলার মনে হয়, মিমিরা আর ওঁরা নিজেরা যেন প্রায় একই অবস্থায়। পয়সা নেই বলে মিমিদের পাশে কেউ নেই, আর পয়সা আছে বলে তাঁদেরও সবাই একরকম ব্রাত্য করেই রেখেছে। আজ মিমির মতো মিলিরও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিণাম যদি একই হয়....

ভাবতেই শিউরে ওঠেন শীলা। মিমিরা যা পারেনি, ওঁরা হয়তো তা পারবেন। পয়সা ঢেলে স্ক্যাণ্ডাল আড়াল করে দেবেন। কিন্তু সেটা কি একটা সুস্থ সমাধান?

আজ রাতে তাই মিলির মুখোমুখি হবার জন্য বসে আছেন শীলা। নয়তো, রোজই দশটার মধ্যে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুতে চলে যান তিনি। মিলি কখন বাড়িতে ঢোকে টেরই পান না। কিন্তু, না। এভাবে আর চলবে না। আজ রাতে ঘুমের ওষুধটা বাদই দিয়েছেন তিনি। থাক, একরাত না ঘুমোলেও তেমন কিছু যাবে আসবে না।

সিঁড়িতে মিলির পায়ের খুটখুট শব্দ। ওপরে উঠেই ডানদিকে বাঁক নেবে সে। ওইদিকেই তার ঘর। ঠিক উল্টোদিকের ঘরে বসে আছেন শীলা। পায়ের শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে। আর দেরি করা যায় না। দ্রুত উঠে সিঁড়ির মুখে চলে এলেন শীলা। মিলি তখন প্রায় শেষধাপে। এত রাত্রেও শীলাকে জেগে থাকতে দেখে যেন সামান্য অবাক। তাহলেও মুখে একটা চটুল, স্মার্ট হাসি টেনে এনে বলল— 'হাই মাম্মি, নট ইয়েট টু বেড?'

শীলা বললেন— 'তুমি ড্রিংক করেছ?'

মিলি বলল— 'ইয়েস। সো হোয়াট? তোমরা করো না?'

শীলা চুপ করে গেলেন। অর্থ মানুষকে অনেক কিছুই দেয়, আবার ছিনিয়েও নেয় বোধহয় অনেক কিছু। আরও অনেক আগেই বোধহয় বাধা দেওয়া উচিত ছিল শীলার। তিনি দেননি। বিত্তের একটা মোহ আছে। সেই মোহে অন্ধ হয়ে ছিলেন। আর সেই অন্ধ চোখের সামনে একটু একটু করে লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে মিলি। আজ কি আর পেরে উঠবেন? অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে যে!

তবু বললেন— 'একবার আমার ঘরে এসো।'

মিলি বলল— 'বাট, হোয়াট?'

— এসো না? তোমার জন্যই এত রাত অবধি জেগে বসে আছি।

মিলি কুলকুল করে হাসল। এই হাসিকে চেনেন শীলা। মাতালের হাসি। তিনি নিজেও কি এরকম হাসি হাসেননি? হেসেছেন, অনেকবার হেসেছেন। এখন তাঁকে মেয়ের এই হাসি তো দেখতেই হবে।

তবুও কঠোর হলেন শীলা। বললেন— 'দশ মিনিটের জন্য হলেও এসো।'

— আজকের রাতটা ছেড়ে দাও, মাম্মি। প্লী-ই-জ। কতদূর থেকে ফিরছি। রাস্তায় এত জ্যাম....

আরও কঠোর হলেন শীলা। বললেন— 'তুমি আসবে কিনা?'

ঠোঁট বেঁকাল মিলি। ভঙ্গিটা খুবই অশোভন লাগল শীলার। তবু কিছু করার নেই। এই অসম্মানও তাঁর প্রাপ্য। কোনওদিনই বাঁধ বাঁধেননি যে।

— ঠিক আছে, চলো।

ঘরের মধ্যে নাইট-ল্যাম্পের মৃদু, মায়াবি আলো। সোফায় মুখোমুখি বসল মা আর মেয়ে।

— কোথায় গিয়েছিলে?— শীলা এবার একটু হালকা ভাবেই জিজ্ঞেস করলেন।

— স্ট্রেট টু বর্ধমান।

— 'বর্ধমান!'— শীলা চমকে উঠলেন। — 'সে তো অনেক দূর! সেখানে কি?'

— 'নাথিং।' আবার হাসতে লাগল মিলি। মাতালের হাসি। পৃথিবীকে তুচ্ছ করা এক সর্বনাশের হাসি। শীলার বুকে ভেতরটা কেঁপে উঠল সেই হাসি দেখে।

আগুন রং-এর একটা টি-শার্ট পরে আছে মিলি। যেন সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। গায়ের ফর্সা রং আর স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে। চুল খোলা। কাঁধ পর্যন্ত। নাক ছোট, কিন্তু টিকালো। ওপরে ঠোঁট সামান্য ভারি, দাঁত ঝকঝকে সাদা, যেন ধারালো, চোখের মণি কুচকুচে কালো। কিন্তু দৃষ্টি চঞ্চল। শীলা কিংবা রত্নাকর দুজনেই দেখতে মোটামুটি। কিন্তু, মিলি এত সুন্দরী হল কি করে?

— 'অত দূরে গিয়েছিলে কে ছিল তোমার সঙ্গে?' — শীলা জিজ্ঞেস করলেন। — 'জয়?'

— জয়? ও তো এখন স্টেটসে।

— সে কি? তোমরা এতদিনের বন্ধু!

আবার ঠোঁট ওল্টাল মিলি। বলল— 'ওরকম ডজন ডজন বন্ধু আমার আছে।'

— তোমরা কি বর্ধমানেই যাচ্ছিলে?

— ও নো। বোলপুরে।

— তারপর?

— 'গেলাম না।' মিলি আবার হাসতে শুরু কর।

চোখ ফিরিয়ে নিলেন শীলা। বারবার এই হাসির ফাঁদে পড়লে আসল কাজটাই পণ্ড হবে। বললেন, —'মিলি, তোমাকে আমার একটা সিরিয়াস কথা বলা আছে।'

— 'বলো।' — মিলি মুখে হাত চাপা দিয়ে আলগা একটা হাই তুলল।

— আমরা এবার তোমার বিয়ে দেব।

— 'বিয়ে!' — মিলি কপট বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাকাল। আর তারপরেই হাসিতে ফেটে পড়ল।

— হাসছ যে? তোমার কি কোনও চয়েস আছে?

— 'ওপেন চয়েস।'— মিলি দু-হাত ছড়িয়ে দেখাল।

— 'ঠিক বুঝলাম না।'— শীলা নিজের গাম্ভীর্য ধরে রাখলেন। — শোনো মিলি, আয়্যাম সরি টু সে, তোমার সম্বন্ধে আজকাল খুব

ভাল রিপোর্ট আমি পাচ্ছি না।'

— আজকাল? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আজকাল? আমার সম্বন্ধে রিপোর্ট কোনওকালই ভাল না। অ্যাণ্ড আই এনজয় ইট।

শীলার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। এতদূর! কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন— 'কেন, এরকম হবে কেন? সবাই খারাপ বলবে কেন তোমার নামে?'

— বিকজ দে আর জেলাস অফ মি। আমি যা করে দেখাতে পারি, সেটা আর কেউ পারে না। আমার কোনও হাইড অ্যাণ্ড সীক নেই। সবটাই ওপেন।

— তুমি বাড়াবাড়ি করছ, মিলি।

— না। কিছু বাড়াবাড়ি করছি না। আমাদের সোসাইটিতে এসব কোনও ব্যাপারই নয়।

— কে বলেছে? যদি তোমার কিছু হয়ে যায়....

মিলি খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর বলল— 'তাহলেও আমার বিয়ে আটকাবে না, মাম্মি। তুমি মিড্‌ল ক্লাস মায়েদের মতো কেন উল্টোপাল্টা ভাবছ?

— 'মিলি।' — প্রায় গর্জন করে উঠলেন শীলা।— 'তুমি জানো তোমাদের ফ্যামিলিতে কত বড় একটা বিপদ ঘটেছে?'

মিলি এবার মুচকি হাসল। বলল— 'জানব না কেন? জানি। আমার একটা কাজিন-সিস্টার পাগল হয়ে গিয়েছে। কেউ ওকে সিডিউস করে পালিয়ে গিয়েছিল। তা বলে আমার মাথাটা মোটেও খারাপ হবে না, মাম্মি। ওসব বোকাদের হয়।'

— মিলি!

— স্টপ্, মাম্মি, স্টপ্।..... আমাকে বলতে দাও। ওই যে মিসেস সিংহানিয়া, যার সঙ্গে কোলাবরেশানে তুমি তোমার বিউটি পার্লারটা চালাও, বলো তো, মাস ছয় আগে সোয়ানসী নার্সিং হোমে ওর মেয়ে ললিতার ঠিক কি হয়েছিল?

শীলার মুখ চুন হয়ে গেল।

মিলি আবারও খিলখিল করে হাসল। তারপর বলল— 'সেজন্য ওর বিয়েটা কি আটকে গেল, মাম্মি? বলো? উত্তর দাও?'

শীলা চুপ।

— আমার বিয়ে আমি নিজেই করব মাম্মি। যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা। তোমাকে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

— 'মিলি!' — আর চুপ করে থাকতে পারলেন না শীলা। — 'তুমি তৈরি থাক, তোমার বাপি কানাডা থেকে ফিরলেই আমরা তোমার বিয়ে দেব। কি ভেবেছ তুমি? যা খুশি তাই বলবে আর যা খুশি তাই করবে? আর আমরা দাঁড়িয়ে শুধু দেখে যাব?'

মিলি উঠে দাঁড়াল সোফা থেকে। তারপর বলল— 'শুয়ে পড়ো, মাম্মি। তোমার মাথাটা আজ খুব গরম হয়ে গিয়েছে।'

— 'কি বললে?'— শীলা চাপা গর্জন করে উঠলেন। — 'ঠিক আছে, আসুক তোমার বাপি!'

— টিল দেন, গুড নাইট মাম্!

ফুটফুট করে হিল জুতোর শব্দ তুলে নিজের ঘরে চলে গেল মিলি। একটু পরেই দরজা বন্ধ করার শব্দ হল।

ড্রয়ার খুলে ঘুমের ওষুধ বার করলেন শীলা। সমস্ত শরীরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, একসঙ্গে সব কটা ঘুমের বড়ি খেয়ে তবে এই জ্বালা জুড়োবে। কিন্তু না, তা হয় না। এতদিনের শিথিলতার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে তাকে। এই মেয়েকে বাঁধতেই হবে সংসারের বন্ধনে। ফিরুন রত্নাকর। মিলির বিয়ে তিনি দেবেন। দেবেনই!

ওরা দু'জনে

বালিশে ঠেস দিয়ে বিছানায় বসে আছে লিজা। রিয়া ঘরে ঢুকতেই বলল— 'আয়! জানতাম, আজ তুই আসবি।'

লিজা মোটামুটি সুস্থই আছে। যমে-মানুষে টানাটানি হয়েছিল বাচ্চাটাকে নিয়েই। প্রি-ম্যাচিওর ডেলিভারি। মাত্র ঘন্টা দুয়েক বেঁচেছিল। এই দু-ঘন্টার মধ্যেই আই সি ইউ, ইনকিউবেটর লোফালুফি খেলেছিল ওকে নিয়ে। তারপর চলেই গেল। — ছেলে।

শোকের প্রাথমিক ঝড়টা নার্সিং হোমেই বয়ে গিয়েছিল। লিজা এখন শান্ত। যেন একটু বেশিই শান্ত।

ওর শ্বশুরবাড়িতে ব্যাপারটা সবাই মেনে নিয়েছেন। শ্বশুর শাশুড়িও স্বাভাবিক ব্যবহারই করছেন। ননদ জিনি টিভি দেখছে আর বক্‌বক্ করছে। এমনকি লিজার বর আশিসও কাজে জয়েন করে গেছে। তবুও কোথাও যেন একটা ছন্দপতন ঘটিয়ে দিয়েছে দু-ঘন্টা আয়ুর সেই মানবশিশু।

রিয়া এসে বসল বিছানার পাশে রাখা চেয়ারটাতে। মুখে হাসি টেনে এনে বোনকে বলল— 'কি করে জানতিস আজই আমি আসব?'

— বা রে, আজ শনিবার না? কাল তো ছুটি। আজ তুই এখানে থেকে যাবি।

— না রে, একগাদা অফিসের ফাইলপত্র আছে ব্যাগে। বাড়িতে বসে সব ক্লিয়ার করতে হবে।

— উফ্! বাড়িতেও অফিসের কাজ! একেবারে আমার বরটার মতো।

— 'হাসছিস কি?' — লিজা মুখ গোমড়া করল। তারপর বলল— 'মা ফোনে এত কান্নাকাটি করছে না, আমার ভাল লাগছে না।'

রিয়া চুপ করে রইল। চন্দ্রাকে বোঝানো সত্যিই ভার। কেমন করে তাঁর মনে হয়েছে, এই দুর্ঘটনার পর লিজার শ্বশুরবাড়িতে মুখ দেখানোর নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন তিনি। বারবার একই কথা বলছেন,— 'ওঁরা কি ভাবছেন বলতো রিয়া? আমরা কি কোনও কিছু লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছি? আমাদের মেয়ের শরীরে যে ওরকম একটা ডিফেক্ট আছে, সেটা কি আমরা জানতাম?' রিয়া প্রথমটায় বিরক্ত হয়েছে। বলেছে— 'আঃ মা, কি যে উল্টোপাল্টা সব ভাবো না তুমি? ওসব নিয়ে কেউ কিছুই বলছে না।' কিন্তু চন্দ্রার এরকম ভাবাটা প্রায় বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে রিয়াকেই নরম হতে হয়েছে। ধৈর্য ধরে চন্দ্রার প্রলাপ শুনতে হচ্ছে, আরও বেশি ধৈর্য ধরে বোঝাতে হচ্ছে। এতসব

কথা লিজাকে বলা যায় না। রিয়া তাই চুপ করেই রইল।

— 'অতীনদার খবর কি বল?'— লিজাই নীরবতা ভাঙল। — 'নিয়ে এলি না কেন ওকে?'

— যাঃ, কি যে বলিস!

— 'আহা!' — লিজা ঠোঁট বেঁকাল— 'বিয়ে তো তোরা করবিই!'

— কবে কি হবে তার ঠিক নেই, শুধু শুধু এখানে এনে....

— দিদি! তুই মাকে জানিয়েছিস?

রিয়া একটু চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল— না।

— আবার কিন্তু তুই একই ভুল করছিস দিদি! কেন তুই বড়মা বা বউদিকে সব খুলে বলছিস না? বারবার বিয়ের কনে সেজে পাত্রপক্ষের সামনে বসতে ভাল লাগছে তোর?

রিয়া চুপ করেই রইল।

— সাহস করে ঝুঁকিটা নে দিদি। আর বয়সটা বাড়াস না। দুজনে মিলে যা রোজগার করিস, মোটামুটি চলে যাবে। নাহয় প্রথম প্রথম একটু কষ্টই করবি। আমাদের বাবাও তো একদিনে রেলের অফিসার হয়নি।

— 'তুই আগবাড়িয়ে মাকে কিছু বলতে যাসনি তো?' — রিয়া একটু ব্যস্ত হয়ে উঠল।

— মার এখন মাথাটা পুরো খারাপ হয়ে গেছে। এরই মধ্যে কে আবার বুঝিয়ে গেছে, পঁচিশের পর মেয়েদের সিজার ছাড়া বাচ্চা বার করা যায় না। সুতরাং তোর ক্ষেত্রে সিজারই হবে ধরে নিয়ে কালই ফোনে একপ্রস্থ কান্নাকাটি করল।

— সত্যি! মাকে না বুঝিয়ে ওঠা যায় না।

— তারপর আরও একটা কথা কাল যা বলেছে, শুনলে তুই চমকে উঠবি।

— 'কি কথা?'— রিয়া সত্যিই চমকে উঠল।

— মা নাকি চিঠি লিখবে।

— কাকে?

— ছোটকাকাকে।

— সে কি রে?

— আর বলিস কেন? সাধে কি বলছি, মার মাথাটা একদম গেছে! কষ্টও হয় রে। ভাবি, আমরা যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতাম....

— কিন্তু তা বলে ছোটকাকাকে লিখবে? ওদের সঙ্গে তো কারও কোনও সম্পর্কই প্রায় নেই। তাছাড়া মা তো কোনওকালেই ছোটকাকীকে....

— কি না বলত একবার ভেবে দ্যাখ। উত্তর কলকাতার এঁদো গলির মেয়ে... ছোড়দা যে কি দেখে ভুলল.... এখন মেমসাহেব হয়েছেন..... দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না.... যেমন মা, তার তেমনি মেয়ে....

— এখন তো ছোটকাকীও ছাড়বে না।

— আর এদিকে আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ। এবাড়ির সবাই জানে, ছোটকাকা টপ্ গাইনি সার্জেন। অথচ আমি সম্পর্কটা এড়িয়ে চলেছি স্রেফ মার কথা ভেবে। আর আজ সেই মা-ই যদি...

— মানছি ছোটকাকা টপ্ গাইনি সার্জেন। কিন্তু তোর তো ট্রিটমেন্টের কোনও ত্রুটি হচ্ছে না!

— ওই তো! সেটা মাকে কে বোঝাবে?.... তাছাড়া শুধু মার জন্যই নয়, আরও একজনের জন্যও আমি ছোটকাকাদের সঙ্গে তেমন কোনও সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই না।

— কার কথা বলছিস?

— মিলি। ছোটকাকার মেয়ে। ওর সম্বন্ধে যে আমাকে কত কথা শুনতে হয়.....

— কে এসব শোনায় তোকে?

— 'কে আবার?'— লিজা একটা নিশ্বাস ফেলল। — 'জিনি, আমার ননদ। ওদের বন্ধুদের একটা দল আছে। তার মধ্যে মিলিই নাকি সবচেয়ে ডেস্পারেট। ছেলেদের নাচাতে আর মাথা চিবিয়ে খেতে নাকি ওস্তাদ।

— ছেড়ে দে ওর কথা। তোর শ্বশুর শাশুড়ি বা আশিস তো কখনও কিছু বলে না তোকে?

লিজা আবারও একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বলল— 'না বলাতেও অনেক কিছু যায় আসে রে দিদি! তোর বিয়েটা হোক, তখন বুঝবি।'

লিজা একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল— 'তুই মিমিদের ব্যাপারটা জানিস?'

— না তো!' রিয়া চমকে উঠল।

— বউদি কখনও কিছু বলেনি তোকে?

— একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, তোমার দাদার বারণ আছে এসব নিয়ে কথা বলতে।

লিজা হাসল। বলল— 'এইভাবে কি শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় রে দিদি? এই বাংলাদেশে কথা বাতাসে হাঁটে। ফিসফাস, কানাকানির শেষ নেই এখানে। তুই অতীনদাকে বিয়েটা করে ফ্যাল দিদি, আর দেরি করিস না।

— 'আমার বিয়ের সঙ্গে মিমির কি সম্পর্ক?'— রিয়া অবাক হয়ে বলে।

— আছে রে! মিমিদি এমন একটা কাণ্ড করে ফেলেছে যে সম্বন্ধ করে এই কলকাতায় বসে তোর বিয়ে দিতে অসুবিধা হবে। ছোটকাকার মেয়ে মিলির হয়তো কিছু আসে যায় না, কিন্তু তোর-আমার মতো মেয়েদের যায় আসে।

— কি করেছে মিমি?

— কাছে আয়, বলছি।

লিজা রিয়াকে বিছানায় টেনে নিয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল— মিমিদির পেটে বাচ্চা এসে গিয়েছিল। আর সেই বাচ্চাটাকে নষ্ট করার পরই ওর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।'

— লিজা! কি বলছিস?

— একটা কথাও মিথ্যে নয় রে। বিয়ের আগে উড়ো চিঠি এসেছিল এবাড়ির ঠিকানায়। মিমিদির সম্বন্ধে যা-তা সব লেখা ছিল। আমার শ্বশুরমশাই খোঁজ না নিয়ে ছাড়েননি। আমার বিয়ে তো কেঁচেই যাচ্ছিল প্রায়।

— সে কি রে!

— শেষ পর্যন্ত আমার শাশুড়ির জেদাজেদিতেই বিয়েটা হয়।

— ওঁরা কি....

— বুঝেছি, তুই কি বলতে চাইছিস। না রে, এসব নিয়ে আমাকে কেউ কিছু বলে না। ব্যাপারটা আমি শুনেছি জিনির মুখ থেকে। কিন্তু ... কথা বলাটাই সব নয় রে দিদি! না-বলা কথাও আরও বেশি করে বোধহয় বেঁধে। শ্বশুরবাড়িতে বাপের বাড়ির সামান্য অসম্মানও যে মেয়েদের কতখানি বাজে.....

লিজার গলা ধরে এল।

রিয়া ওর পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, — 'চুপ কর, লিজা।'

— না রে দিদি, বলতে দে আমাকে। ... আমার একটা বাচ্চা হওয়াতে কত কষ্ট, কত অর্থ ব্যয় আর মিমিদি পেটে আসা বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দিল।

— কি করবে বল? যে ছেলেটা এসব করেছে, সে যদি পাশে না দাঁড়ায়....

— তুই আমার কথাটা শোন্ দিদি। আর দেরি করিস না। অতীনদাকে বিয়েটা করে ফ্যাল।

বাসে করে বরানগরে ফিরে যাচ্ছে রিয়া। আজ লিজাকে ছেড়ে আসতে মন চাইছিল না একেবারেই। আশিসও এসে জোরাজুরি করছিল। কথা দিয়েছে, সামনের সপ্তাহে গিয়ে কয়েকদিন থাকবে। হ্যাঁ, অতীনকেও একদিন নিয়ে যাবে। আজ বরানগরে ফিরে অফিসের ফাইলগুলো না দেখলেই নয়। তবে কতটা পেরে উঠবে নিজেই বুঝে উঠছে না রিয়া।

একটা রহস্যের পর্দা আজ সরে গিয়েছে তার চোখের সামনে থেকে। পুরুষরা এত নৃশংস হয়! একটা শিশুকে পৃথিবীর আলো দেখতে দেয় না? একটি মেয়েকে বাধ্য করে গর্ভের সন্তানকে নষ্ট করতে! মা হওয়ার মধ্যে যেমন যন্ত্রণা আছে, তেমন আনন্দও আছে। কিন্তু না হওয়ার মধ্যে? সেখানে তো শুধুই যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণায় লিজা আজ বিষণ্ণ, আর মিমি ঘোর উন্মাদ।

বুকের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরেই ঢেউ ভাঙছিল। এতক্ষণে নিজের চোখে সেই ঢেউকে অনুভব করল রিয়া। রাত্তিরের বাস এসপ্ল্যানেড পার হয়ে হু-হু করে ছুটে চলেছে। চশমাটা চোখ থেকে খুলে ফেলল রিয়া। কাঁচের আড়ালে পৃথিবী যেন আরও ঝাপসা হয়ে আসছে।

পাশের ফাঁকা সিটটায় কে একজন যেন বসল এসে। প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিল রিয়া। শুধু অনুভব করল, ঢেউটা ভাঙছেই..... ভাঙছেই ওর বুকের ভেতরে।

তুমি আমার ভালবাসা

চন্দননগর স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল অতীন। এইমাত্র আপ-এ একটা ট্রেন এল। লোকজন একটু একটু করে নামছে ওভারব্রিজ দিয়ে। অতীন একটু এগিয়ে ব্রিজের দিকে চোখ রাখল। না..... এই ট্রেনে রিয়া আসেনি। হয়তো মিস করেছে।

এই নিয়ে দুটো ট্রেন দেখা হয়ে গেল অতীনের। একটু হতাশ লাগছে। রিয়া আসবে তো? আজকাল ওর শরীরটা প্রায়ই খারাপ যাচ্ছে। পেটে নাকি একটা ব্যথা হয়। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলে না। এড়িয়ে যায়। আর ওর বস্‌টাও হয়েছে তেমনি। কেদার। রাম ফাঁকিবাজ। অষ্টপ্রহর খাটাচ্ছে রিয়াকে। ওই রোগা শরীরে এত খাটুনি পোষায়? নিজে আরও একটু ভাল চাকরি পেলে সে আর চাকরি করতে দেবে না রিয়াকে। মোবাইল ফোনের বোতাম টিপতে শুরু করল অতীন।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ওর জামার কলার ধরে টানল। চমকে ঘুরে তাকাল অতীন। — রিয়া!

— তুই!

— বাববাঃ! এমন ভাব করছিস্, যেন চিনিসই না।

— কোন্ ট্রেনে এলি?

— এই ট্রেনেই তো!

— আমি তো দেখতে পেলাম না!

— মন দিয়ে খুঁজেছিস যে দেখতে পাবি?

— যাঃ, বাজে বকিস না। তোর দেরি হয়েছে।

— হয়েছেই তো!

— কেন?

— বুঝতে পারছিস না?

অতীন দেখল, রিয়া আজ শাড়ি পরে এসেছে। সাদা খোলের তাঁতের শাড়ির ওপরে হালকা নীল বুটি। ব্লাউজের রঙও হালকা নীল। গলায় সাদা পুঁতির মালা। কাঁধে চকোলেট রঙের একটা চোট ব্যাগ। এই ক-মাসে বয়কাট চুল বেড়ে কাঁধ পর্যন্ত এসে গিয়েছে। খোলা চুলে

একটা সাদা রঙের ক্লিপ আঁটা। কপালের মাঝখানে একটা ছোট্ট নীল টিপ। পায়ে কালো রঙের চকচকে পাম্প-শু। এই রিয়া যেন রোজকার রিয়া নয়। অন্যরকম। একদম অন্যরকম।

— শাড়িটা কোত্থেকে ম্যানেজ করলি?

— বউদি দিল। বলল, তুমি আজ প্রথম অতীনের বাড়ি যাচ্ছ। ওর জন্মদিন। শাড়ি পরে যাও।.... আর জুতোটা নতুন কিনলাম।

— ওরকম আঙুল-চাপা কিনেছিস কেন? যেন স্কুলের দিদিমণি!

— এই! বাজে বকবি না। কত দাম নিয়েছে জানিস? পিওর লেদার।

— 'আরে, দাম শুনে আমি কি করব?'— অতীন রিয়াকে কাছে টানল। বলল— 'পায়ের পুরোটাই তো ঢেকে ফেলেছিস, চুমু খাব কোথায়?'

— ভ্যাট্, অসভ্য!'— রিয়ার মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল— 'ওটা খাবার যেন আর জায়গা নেই!'

হাসতে হাসতে দুজনে বেরিয়ে আসছে স্টেশন চত্বর থেকে। অতীন বলল— 'দাঁড়া, একটা রিক্সা নিই।'

— তুই যে বলেছিলি, তোর বাড়ি হাঁটাপথে?

— হাটাপথই তো! কিন্তু তুই যেরকম জুজুবুড়ির মতো হাঁটছিস!

— বারে! একে শাড়ি পরেছি, আবার নতুন জুতো!

রিক্সা চলেছে চন্দননগরের রাস্তা ধরে। পুজোর আর দেরি নেই। মহালয়া প্রায় এসে গেল। রাস্তার ধারে প্যাণ্ডেল বাঁধার কাজ চলছে।

— 'পুজোয় চলে আয় না আমাদের এখানে? তোকে শ্রীরামপুরের ঠাকুর দেখাব। ওখানে অনেক পুজো হয়।'— অতীন বলল।

— পুজোর ক'দিন আমি যোধপুর পার্কে লিজার কাছে গিয়ে থাকব।

— ও।

— তুই বরং ওখানে চলে আয়। অষ্টমীর দিন লিজার বর আশিসের ছুটি থাকবে, আমরা একসঙ্গে বেড়াব।

— ঠিক আছে। দেখি.... এএই যে ভাই, বাঁদিকে...

একটা সাদা একতলা বাড়ি। সামনে গ্রিলের বারান্দা। অতীন কলিং বেল টিপল। এক মহিলা এসে দরজা খুলে দিলেন।

অতীন বলল— 'মা, এই রিয়া।'

রিয়া প্রণাম করল। উনি বললেন— 'এসো। তোমার কথা অতীনের মুখে কত শুনেছি। এতদিনে তোমাকে দেখলাম।'

রিয়া চোখ নামাল। উনি বললেন— 'অতীন, তুই ওকে তোর ঘরে নিয়ে যা।'

ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে। অতীন রিয়াকে বলল— 'আয়।'

— এই গরমে ছাদে?

— আয় না।

বাধ্য হয়ে রিয়া অতীনের পিছু নিল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই চমক। আস্ত একখানা ঘর। একদম নতুন।

— 'এটা তোর ঘর?— রিয়া অবাক।

অতীন ধীরে সুস্থে দুদিকের দুটো জানালা খুলে দিল। ফ্যান চালাল। ভেজিয়ে দিল দরজাটা। তারপর বলল— 'তোরও।'

রিয়া হেসে ফেলল। বলল— 'যাঃ।'

— এটা তোকে আমার জন্মদিনের সারপ্রাইজ।

ঘরটা অবশ্য খুব বড় নয়। তবে ছিমছাম। আসবাবপত্রের মধ্যে একটা খাট, দুটো হালকা স্টিলের চেয়ার, একটা ছোট টেবিল। একটা মাঝারি আকারের স্টিল আলমারি।

— কেমন হয়েছে বল্?

— 'ভাল, খুব ভাল।'— রিয়া খুশিমুখে ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল— 'তোর বাবা, ছোটভাই— ওদের তো দেখলাম না?'

— বাবা একটা কাজে দুর্গাপুর। আর ছোটভাই মালদায় একটা টিভির দোকানে সদ্য কাজ পেয়েছে। ওখানেই থাকছে।

— তোর জন্মদিনে আর কাউকে বলিসনি?

— নাঃ।

— কেন রে?

— আজকের দিনটা শুধু তোর জন্যই বরাদ্দ রেখেছি।

খাটের ওপর পাতা বিছানা। তাতে গোলাপি চাদর পাতা। অতীন রিয়াকে বলল— 'আয়, এখানে বোস্। ফ্যানের হাওয়াটা পাবি।'

মুখোমুখি বসল ওরা দুজন। সামান্য দূরে ট্রেনের শব্দ পাওয়া গেল।

— অতীন!

— বল্!

— আর দেরি করিস না। .... পুজোর পর আমার মা-বাবা আসছেন।

— তুই ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

রিয়া অতীনের হাতের ওপর হাত রাখল। বলল— 'তুই আমাকে তোর কাছে নিয়ে আয়, অতীন। বরানগরের বাড়িতে আর আমার ভাল লাগছে না।'

— তোর সেইসব সম্বন্ধ? সেসবের কি হল?

— আর সহ্য করা যাচ্ছে না। বিচিত্র সব লোক, উদ্ভট তাদের কথাবার্তা। বাধ্য হয়ে সেদিন আমি সব বলেছি বড়মাকে।

— শুনে কি বললেন?

— 'কি আর বলবেন বল্?'— একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিয়া। — 'সেই তোর মাইনেপত্তরের কথা।'

— সে তো বলবেনই। লিজার বর কত কোয়ালিফায়েড! সেখানে আমি....

— 'এসব ভেবে নিজের মনটাকে দুর্বল করিস না।' — রিয়া জড়িয়ে ধরল অতীনকে।

— তোর মা-বাবা....

— ফোনেই বলব ভেবেছিলাম। বউদি বলল,— আসতে দাও। যা বলার মুখোমুখি বোলো।

দুপুরে খাবার টেবিলে বসে রিয়ার চক্ষুস্থির। এত খাবার!

— 'ওরে বাপ্‌রে, এত আমি খেতে পারব না।' — লাফিয়ে উঠল রিয়া।

— 'খাও খাও। অতীনের জন্মদিনে এলে।' — ওর মা জোর করতে লাগলেন।

— এত খেলে আমার পেটে ব্যথা হবে।

— 'তোর পেটের ব্যথা আসলে না-খেয়ে।' অতীন ফুট কাটল। — 'গ্যাসট্রিকের ব্যথা। সারাদিন শুধু চা আর কফি খেয়ে আল্‌সার বাধাবি পেটে।'

— 'তোমার মা-বাবা কবে আসছেন?' — অতীনের মা জিজ্ঞেস করলেন।

— এই...লক্ষ্মীপুজোর পর।

— এলে আমাদের একটু খবর দিও, কেমন?

রিয়ার মুখে সামান্য আবির ছড়াল। ও ঘাড় নেড়ে বলল— 'আচ্ছা।'

খাওয়ার পরে দোতলার ঘরে সিডি প্লেয়ারটা নিয়ে এল অতীন। আস্তে করে একটা গান বাজিয়ে দিল। সুরে ভরে যাচ্ছে ঘরটা।

আকাশে পাতলা মেঘের ছায়া।

— গান শোন্, তোর মন ভাল হয়ে যাবে।' — অতীন বলল।

— আমার মন ভালই আছে। ... দেখি, তোর হাতটা দে তো।

— কেন?

— তোর জন্য জন্মদিনের গিফ্‌ট এনেছি।

— আরিববাস্! কই দেখা?

— উঁহু। আগে চোখ বোজ।

অতীন চোখ বুজল। রিয়া ওর ব্যাগ খুলল। তারপর, হঠাৎই লাফিয়ে উঠে বলল— 'এই দুষ্টু! মিটমিট করে তাকাচ্ছে দ্যাখো। দাঁড়া তো!'

নিজের রুমালটা দিয়ে অতীনকে কানামাছি করে দিল রিয়া। তারপর জিনিসটা বার করে ওর ডান হাতের মুঠোয় দিয়ে বলল— 'এবার রুমালটা খোল্।'

দারুণ হাতঘড়ি একটা। ঝকঝক করছে। চোখ থেকে রুমাল খুলে অতীন চমকে উঠল।

— করেছিস কি? এর তো অনেক দাম!

— 'দামের কথা তুলছিস কেন?'— রিয়ার মুখ ভার হল। অতীনের ডান হাতে ঘড়িটা পরিয়ে দিতে দিতে বলল— 'আর কারো কাছে দাম না থাক, আমার কাছে তো তুই দামি।'

অতীন রিয়াকে কাছে টানল। বলল— 'তুই এসেছিস, এটাই যথেষ্ট। এটাই আমার গিফ্‌ট হতে পারত।'

— আমি তো চলেই যাব একটু পরে। এসেছিলাম যে তার অন্তত একটা চিহ্ন তো রেখে যাব?

— যদি তোকে চলে যেতে না দিই? যদি বেঁধে রাখি?

রিয়া জড়িয়ে ধরল অতীনকে। বলল— 'রাখ বেঁধে।'

বাইরের পাতলা মেঘ ঘন হয়ে জড়িয়ে ধরল পৃথিবীকে। আধো-আলোতে যেন ছায়া-শরীর হয়ে গেল দুটি মানব-মানবী। ক্ষীণ হয়ে ভেসে আসছে গানের সুর। পৃথিবী মুখ তুলে ধরল আকাশের দিকে। ঝোড়ো বাতাসে সরে গেল তার বুকের আঁচল। মেঘে-মেঘে ঘর্ষণে সৃষ্টি হল বিদ্যুতের উত্তাপ। ধরণী অনাবৃতা হয়ে নিজেকে মেলে দিল আকাশের দিকে। আকাশও এসে দৃষ্টিবিন্দু হয়ে ধরা দিল ধরণীর উন্মুক্ত গহ্বরে!

কতক্ষণ কেটে গেল কে জানে!

আবেশে, আবেগে বিহ্বল ধরণী শুধু একবার অস্ফুটে বলল— 'অতীন।'

অতীন বলল— 'রিয়া! আমার রিয়া!'

তীক্ষ্ণ, তীব্র এক মুখের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে রিয়া অনুভব করল, তার সর্বাঙ্গ জুড়ে নেমে আসছে অতীনের তৃষ্ণি চুম্বন। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত।

ফিয়াসেঁ

পুজো কেটে গেল। অষ্টমীর দিন অতীন এসেছিল লিজাদের বাড়িতে। লিজার বর আশিস সেদিন ওদের গাড়িটা বার করেছিল। রিয়া-অতীন, লিজা আর আশিস চারজনে মিলে গাড়িতে করে সারারাত কলকাতার ঠাকুর দেখল। জায়গায় জায়গায় গাড়ি থামিয়ে যখন যেমন খুশি খাওয়া। খুব মজা হল।

কালও অতীন ফোন করেছিল রিয়াকে। একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে ওর চাকরি হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। ওর নামে নাকি নিয়োগপত্র পাঠানো হয়েছে, ভেতর থেকে এরকম একটা খবর যোগাড় করেছে অতীন। মাইনেও অনেক ভাল। — 'কোনওদিন ভগবান টগবান মানিনি। এবার মানছি।' — মোবাইলে গড়গড় করে বলে যাচ্ছিল অতীন। — 'তোর মা-বাবার সামনে যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি।'

কিন্তু এইসঙ্গে আরেকটা মুস্কিলও হয়েছে। অতীনের আর ইচ্ছে নয়, রিয়া চাকরি করে। এখন থেকেই রীতিমত জোর খাটাতে চাইছে ওর ওপর। এটা কিন্তু রিয়ার একেবারেই ভাল লাগছে না। এই নিয়ে ফোনে শেষের দিকটায় একটু কথা-কাটাকাটিও হয়ে গেল দুজনের।

চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া কিছুই নয়। ছেড়ে রিয়া দিতেই পারে। কিন্তু ওর আপত্তি অন্য জায়গায়। আজ যদি উল্টোটা হত? যদি রিয়া আরও বেশি মাইনের একটা চাকরি পেয়ে অতীনকে আর চাকরির চেষ্টা না করতে বলত? অতীন মানত সেটা? পুরুষরা মানতে চায় না। শুধু মেয়েদের মানাতে চায়। এটা ঠিক নয়। না, চাকরি রিয়া ছাড়বে না।

আরও একটা কারণ অবশ্য আছে। সেটা অতীনও জানে না। রিয়া কখনও সেভাবে ওকে বলেনি। বললেও অতীন বুঝত না। বরং ভুল বুঝত। সেই কারণটা হল, কেদার। স্মল বস্।

ইদানীং স্মল বসের চেহারায় একটা পার্থক্য লক্ষ্য করেছে রিয়া। মুখে যেন একটা হালকা কালির ছাপ, কথাবার্তার মধ্যে মাঝেমাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকবার সেই নারীকণ্ঠের টেলিফোন এসে পড়েছে রিয়ার ঘরে। আশ্চর্য! এই কণ্ঠস্বর শুনলে কেন যে রিয়ার মনে হয় কোথায় একদিন সে এই স্বর শুনেছে। একদিন টেলিফোনে প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি হচ্ছে, এরকম আভাসও সে পেয়েছে।

অতীনকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না যে এই মুহূর্তে রিয়া অফিসটা ছেড়ে দিলে ওটা ডুববে। ও বলবে— 'চুলোয় যাক। যার হ্যাপা সে সামলাক গিয়ে। তোর অত মাথাব্যথা কিসে?'

কারও জন্য কিছু আটকায় না, সেটা রিয়াও জানে। কিন্তু আটকাচ্ছে অন্য জায়গায়। যখন এই নির্মম শহর তার সমস্ত ডিগ্রি, কোয়ালিফিকেশন নস্যাৎ করে দিচ্ছিল, তখন এই লোকটাই অতীনের কাছে ওর কথা শুনে ওকে চাকরি দেয়। যে কোনও কারণেই হোক, লোকটার এখন একটা দুঃসময় চলছে। মুখ-চোখই বলে দিচ্ছে সেটা। এই দুঃসময়ে রিয়া তাকে ছেড়ে চলে আসে কি করে?

কালই সিস্টার যোসেফাইনের চিঠি পেয়েছে রিয়া। বিলাসপুর থেকে রিয়ার চিঠিটা রাঁচিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারই উত্তর দিয়েছেন সিস্টার। তার মধ্যে একটা কথা রিয়াকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। সিস্টার লিখেছেন— 'নিজের স্বার্থের সঙ্গে পরের স্বার্থকেও একটু মেলাতে শেখো, রিয়া। নয়তো, শুধু কাজই করে যাবে, কাজের সুখটা পাবে না।'

এই বাহান্ন বছর বয়সেও বিলাসপুর কনভেন্ট স্কুলের প্রিন্সিপালের নিশ্চিন্ত চাকরি ছেড়ে রাঁচিতে একটি অনাথ আশ্রম গড়ে তোলার কাজ নিয়ে চলে গেছেন সিস্টার। লিখেছেন, — 'একজনকে দেখে এই প্রৌঢ় বয়েসেও নতুন একটা সংগঠন গড়ে তোলার প্রেরণা পাচ্ছি। মনে রেখো, রিয়া, এই প্রেরণাটুকুই অনেকখানি। শুধু প্রেরণাই মানুষকে দিয়ে অসম্ভবকে কখনও কখনও সম্ভব করিয়ে তোলে।'

চিঠির সমস্ত কথাই রিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তার অন্তরে গ্রহণ করেছে। শুধু একটা জিনিসই বুঝতে পারছে না। সেই 'একজন' কে! যাকে দেখে সিস্টার নিজেই প্রেরণা পাচ্ছেন?

রিয়ারও সম্ভবত হয়তো একটু প্রেরণাই। সে জানে, এখানে সে সম্পূর্ণ একা। এমনকি অতীনও তার সঙ্গে নেই। একটা ভেঙে-পড়া, ডুবে-যাওয়া প্রতিষ্ঠানকে তিল-তিল করে গড়ে তুলছে সে। এ যেন নিছক চাকরি নয়, সৃষ্টির আনন্দ।

গোল বাধাচ্ছে শুধু দুটো কারণ। এক, রিয়ার নিজের শরীর। সেদিনের সঙ্গমের ফল কি হয়েছে, অনুমান করতে পারছে রিয়া। কিন্তু তাতে তার কোনও আফসোস নেই। অতীনের ভালবাসার সন্তানকে সে সানন্দে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছে। সে মা হবে। মা হওয়াও তো এক সৃষ্টি! মধুর এক আবেশে আজকাল তার মন ছেয়ে থাকে প্রায় সর্বক্ষণ। না, তার এই সন্তানকে সে অবৈধ ভাবে না। ভালবাসার চেয়ে পবিত্র আর কি আছে? সে ওদের ভালবাসার সন্তান।

কিন্তু তাকে ভোগাচ্ছে পেটের একটা না-ছোড় ব্যথা। আগে দিনে বড়জোর দু-চারবার হত, এখন প্রায়ই হচ্ছে। যখন-তখন, যেখানে-সেখানে। ক্রমশ বেড়েও চলেছে। হঠাৎ-ই খিঁচ ধরে তলপেট পর্যন্ত নেমে আসছে। অতীন যতই বলুক, গ্যাসট্রিকের ব্যথা এটা নয়। ওসব সমস্যা নেই রিয়ার। গত সপ্তাহে একদিন বরানগরের বাড়িতে বাথরুমের ভেতর কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিল সে। তারপরই ভয় পেয়ে চুপি চুপি শুধু বউদিকে বলেছে। বউদি ওকে নিয়ে গিয়েছিল জেঠুর বন্ধু, ডানলপের ডাক্তার মুখার্জীর কাছে। আগের ওষুধে তেমন কোনও কাজ হচ্ছে না জেনে উনি একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি করার পরামর্শ দিয়েছেন।

দু-নম্বর গণ্ডগোল হল ফিয়াসেঁ। স্মল বসের গার্ল ফ্রেণ্ড। যে মাঝেমাঝেই অফিসে ফোন করে। একে কোনওদিন স্বচক্ষে দেখেনি রিয়া। তবে অফিসের অনেকেই নাকি দেখেছে। প্রদীপ্ত, বিমান, সিদ্ধার্থ। প্রদীপ্ত বলেছে— 'ঘ্যাম দেখতে, রিয়াদি। এই তো সেদিনই দেখলাম, পার্ক স্ট্রীটের পিপিন রেস্তোরাঁ থেকে বেরোল। গট্‌গট্ করে গিয়ে উঠল একটা এসি গাড়িতে। পেছনে আমাদের স্মল বস।' বিমান বলেছে— 'মেয়েটা কিন্তু একেবারে সুবিধার নয়, রিয়াদি। বাজারে ওর নামে বহুৎ দুর্নাম। যত্ত বড়লোকের ছেলেদের মাথা খেয়ে বেড়ায়।' —'নামটা কি রে?'— রিয়া জানতে চেয়েছে। ওরা মাথা নেড়েছে— 'জানে না।'

এই অদেখা সুন্দরীটির সঙ্গে রিয়ার যেন একটা সূক্ষ্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। রিয়া যতই বাঁধ বাঁধতে চাইছে, সে ততই ঢুকিয়ে দিচ্ছে বেনোজল।

সেদিন স্মল বসকে ঘরে পেয়ে ফাইলপত্র নিয়ে ঢুকে পড়ল রিয়া। বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল— এইসব জায়গা থেকে হোলসেল ডিলাররা আসতে চাইছেন। বড়ুয়াদের টি-মার্কেট এক্সপ্যানশন প্রোজেক্টে ওঁদের ভালই সাড়া মিলেছে। এক্ষুণি এঁদের ধরা দরকার। এই ধরনের একটা বড় মার্কেট ধরতে পারলে কেদারের অফিসের হাল এক লাফে ফিরে যাবে।

কিন্তু কাকে কি বোঝাবে রিয়া! উল্টোদিকের চেয়ারে বসেই সে বুঝল, কেদার অর্থাৎ স্মল বসের শরীরটাই শুধু পড়ে আছে অফিসে, মনটা অন্যত্র।

— 'বলো রিয়া।'— কণ্ঠস্বর খুবই অন্যমনস্ক।

নাঃ, আর নয়। একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার।

— স্যার, আমি আপনাকে আগেও বলেছি, আবারও বলছি, ফর গড্‌স সেক, আপনি এবার অফিসের ব্যাপারে একটু মন দিন।

স্মল বস্ মুখ তুলল। ক্লান্ত, বিষণ্ণ এক মুখ।

তারপর, রিয়াকে চমকে দিয়ে বলল— 'আর ইউ সিক, রিয়া?'

আশ্চর্য! অফিসে কোনওদিন নিজের শরীরের ব্যাপারে কোনও আলোচনা করে না রিয়া। তবে এই লোকটা বুঝল কেমন করে?

নিজেকে অবশ্য সামলে নিল রিয়া। বলল— 'নো, স্যার, আমি ঠিকই আছি।'

স্মল বস একটু হাসল। বলল— 'কি বলবে, বলো?'

— স্যার, মে আই রিমাইণ্ড ইউ অফ ইওর প্রমিস'!

— ইয়েস, রিয়া।

— আপনি বলেছিলেন, দু-মাসের মধ্যে আপনি নিজেকে বদলে ফেলবেন। অফিসের কাজে মন দেবেন। সেই দু-মাস কিন্তু প্রায় শেষ হতে চলল।

— তুমি কি ভাবছ রিয়া?

— আমি এই দু-মাস পর্যন্তই অপেক্ষা করব.... বাট, আফটার দ্যাট....

— আফটার দ্যাট?

— আই... আই মে রিজাইন।

স্মল বস হাসল। বিবর্ণ, রক্তশূন্য হাসি। তারপর বলল— 'জানি রিয়া। ইউ আর অলরেডি এনগেজ্‌ড। অতীন বোধহয় তোমাকে চাকরি করতে দিতে চায় না।'

রিয়া চোখ নামিয়ে নিল। তারপর বলল— 'আপনি... আপনার অফিসের দায়িত্ব বুঝে নিন, স্যার। আর.... আর একটা কথা কি বলতে পারি?

— বলো, রিয়া।

— শুনেছি আপনার সঙ্গে একটি মহিলাকে প্রায়ই দেখা যায়। আপনি... আপনি কেন ওঁকে বিয়ে করছেন না, স্যার!

স্মল বস আবারও একটু হাসল। বলল— 'তোমাদের দুজনের মধ্যে একটা আশ্চর্য মিল রয়েছে, রিয়া। কোথায় জানো? চোখে। ... কি করে, সেটা আমিও বুঝি না। কিন্তু, আর সবই আলাদা। ... ও যে কেন তোমার মতো নয়।'

রিয়ার মুখ লাল হয়ে উঠল। আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে সে ফাইলপত্র খুলে প্রয়োজনীয় কথাবার্তায় চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর উঠে আসছে, হঠাৎ স্মল বস বলল— 'রিয়া, আমাকে কেউ সিরিয়াসলি নেয় না। অথচ আমার চেয়ে সিরিয়াস আর কে আছে? আমার আদর্শ কি জানো? ওয়ান পার্সুট অ্যাট আ টাইম। একবারে একটাই কাজ। সেই কাজটা যদি সারতে পারি, তবে একদিন আমি অফিসের কাজে ঠিকই ফিরে আসব। তোমাকে দেওয়া কথা আমি রাখব। ফর গড্‌স সেক, তুমি আর একটু অপেক্ষা করো। আমাকে ছেড়ে যেও না।'

মুহূর্তের জন্য রিয়ার হাতটা চেপে ধরল কেদার। পরক্ষণেই অবশ্য ছেড়ে দিল। বলল— 'সরি, ইউ আর অলরেডি এনগেজ্‌ড।'

রিয়া চোখ তুলে তাকাল কেদারের মুখের দিকে। বলতে চায়নি, তবুও সেই অসহায় মুখ দেখে কিভাবে যেন এই প্রথম তার মুখ দিয়েও বেরিয়ে এল— 'অল রাইট, কেদার! কথা দিলাম। ছেড়ে যাব না।'

আর ক'দিন পর সুধাকর আর চন্দ্রা আসছেন বিলাসপুর থেকে। কয়েকদিন ছুটিও নেবে রিয়া। বুধবারই তাই হোলসেলারদের সঙ্গে মিটিংটা স্থির করেছে সে। চুক্তিপত্রে এঁদের দিয়ে সই করাতে পারলেই অফিসটা দাঁড়িয়ে যাবে।

বুধবার, অফিস যাওয়ার সময়, শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে এসে বাস থেকে নেমে পড়ল রিয়া। আসলে, নেমে পড়তে বাধ্য হল। ভয়ঙ্কর ব্যথা হচ্ছে পেটে। তার সঙ্গে প্রচণ্ড বমির ভাব। মাথা ঘুরছে। কোনওক্রমে একটা ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে তার মধ্যে নিজেকে প্রায় এলিয়ে দিল রিয়া। ড্রাইভারটা কি ভাবল কে জানে! নাঃ, কাল থেকেই সে ছুটি নেবে। এভাবে আর ঝুঁকি নেওয়া যায় না। এখনই মনে হচ্ছে, বেহুঁশ হয়ে পড়বে। শুধুমাত্র মনের জোরে নিজেকে ভাসিয়ে রেখেছে।

অফিসে এসে এই প্রথম নিজের অসুস্থতার কথা কবুল করল রিয়া। সিদ্ধার্থকে ডেকে বলল— 'ভাই, একটু ফাইলগুলো গুছিয়ে দিবি?' ও বলল— 'ফোন করে মিটিং ক্যানসেল করে দেব, রিয়াদি?' — 'না, না। ওসব কিছু করিস না।'— আঁতকে উঠল রিয়া। — 'অফিসের দুর্নাম হয়ে যাবে তাহলে।'

বারোটার পর থেকে, বোধহয় ভগবানের দয়াতেই শরীরটা একটু সুস্থ বোধ করল রিয়া। ঘড়ি ধরে তিনটেয় মিটিং শুরু করল। কেদার যথারীতি নেই। বিশেষ কাজে ব্যস্ত বলে রিয়াকে মিটিং চালানোর অনুমতিপত্র দিয়ে গেছে।

সকলেই ঝানু ব্যবসাদার। তার ওপর খোদ মালিক নিজেই অনুপস্থিত। তবে রিয়াও ছাড়ার পাত্রী নয়।

ছ-মাসের বেশি চুক্তিতে রাজি হচ্ছে না ওরা। বিশেষত, দুর্গাপুর, আসানসোলের ডিলাররা। কিন্তু রিয়া চাপ দিচ্ছে, চুক্তিটা অন্তত এক বছরের জন্য হোক। এরই মধ্যে আবার পনের মিনিটের জন্য টি-ব্রেক। তারপর আবার দর কষাকষি। পাঁচটা বাজতে দুর্গাপুর, আসানসোলের ডিলারদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। ওরা ছটা কুড়ির এক্সপ্রেস ট্রেনটা ধরবে। সুযোগ বুঝে এই চঞ্চলতাটুকুকেই কাজে লাগাল রিয়া। প্রস্তাব দিল, শেষ ছ-মাসের জন্য অন্তত একটা অস্থায়ী চুক্তি করা হোক। যদি প্রথম ছ-মাস বড়ুয়াদের চা ভাল বিক্রি দেখাতে পারে, তবে পরের ছ-মাসের অস্থায়ী চুক্তিকে স্থায়ী করা হবে। আবার এক প্রস্থ দর কষাকষি। ইচ্ছে করেই একটু বেশি কথা বলল রিয়া। সময়টা কাটিয়ে দেওয়া দরকার। পৌনে ছটা নাগাদ বাজি জিতে গেল রিয়া। — 'ম্যাডাম, আপনি দেখালেন বটে!' — দুর্গাপুরের একজন ডিলার হাসতে হাসতে বলল। — 'আমাদের ট্রেনটা ফেল করিয়ে দিলেন।'

সবার সঙ্গে হাত মেলাল রিয়া। বলল— 'আমি বলছি, ট্রেন আপনাদের মিস্ হবে না। অফিসের ভ্যানটা বলে দিচ্ছি। আপনাদের হাওড়ায় ছেড়ে দিয়ে আসুক।'

সবকিছু গোছাতে আরও প্রায় মিনিট চল্লিশ। এরই মধ্যে মোবাইলে অতীনকে ফোন করল রিয়া। জরুরি কথা আছে, সে যেন অবশ্যই আসে। তার সন্তান-সম্ভাবনার কথা চুপি চুপি বউদিকে বলেছে রিয়া। শুনে বউদি আঁতকে উঠে বলেছিল— 'আবার? এ তুমি কি করলে রিয়া?' রিয়া অবশ্য তার মনের কথাও স্পষ্টভাবে খুলে বলেছে। এই সন্তানকে সে কিছুতেই হারাবে না। তখন বউদি যা বলেছে, সেটা অবশ্য মনে ধরেছে রিয়ার। — 'এক্ষুণি তোমরা রেজিস্ট্রি করো।' আজ অতীনকে সে কথাই বলবে রিয়া।

লিফ্‌টে নামছে, এমন সময় ব্যথাটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। সারাদিনের পরিশ্রম আর টেনশানের পর আর পারছে না রিয়া। প্রদীপ্ত, বিমানরা ধরে না ফেললে ও নির্ঘাত লিফ্‌টের মধ্যেই পড়ে যেত।

ঝড়াং করে লিফ্‌ট আছড়ে পড়ল একতলায়। আছে! অতীন আছে! সঙ্গে ওর দুই বন্ধু হিমালয় আর মৃগাঙ্ক। কিন্তু, কি ব্যাপার? ওরা ওরকম মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

— 'অতীন! কি হয়েছে রে?'— কোনওক্রমে বলল রিয়া।

— রিয়া! একটা খুব খারাপ খবর আছে রে। কেদার....

— কি হয়েছে কেদারের?

—কদিন ধরেই ওর সেই ফিয়াসেঁর সঙ্গে কি সব গোলমাল চলছিল। আজ নাকি সে জানিয়েছে, ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। কানাডায় চলে যাবে। সেটা শুনেই বাড়িতে নিজের ঘরে ঢুকে হাতের শিরাটা কেটে ফেলে।

— অতীন!

— ওকে আর বাঁচানো যায়নি, রিয়া!

— 'অতীন!' সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে রিয়ার।

— বি স্টেডি, রিয়া! তোদের এই অফিসটা সম্ভবত বিগ বস টেকওভার করবে। চাকরি যাবে কারও। তবে, তোকে আর আমি এখানে চাকরি করতে দিচ্ছি না।

মাথা ঘুরছে, চোখে অন্ধকার দেখছে রিয়া। তারই মধ্যে শুনতে পাচ্ছে অতীন বলে চলেছে— 'মেয়েটা বরাবরই পাজি। সল্ট লেকের কোন এক ডাক্তারের মেয়ে। নামটা অবশ্য খুব রোমান্টিক। মিলনমালা, মিলনমালা চৌধুরী।

— 'কি বললি?'— শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে ওঠে রিয়া।

.... মিলনমালা চৌধুরী! ছোটকাকা রত্নাকর চৌধুরীর মেয়ে! সেইজন্যই ফোনে গলাটা চেনা চেনা লাগত রিয়ার! সেইজন্যই ওদের দুজনের চোখের মধ্যে এত মিল!

হায় ঈশ্বর! এই ভাঙা শরীর নিয়েও যে মানুষটার জন্য রিয়া নিজেকে উজাড় করে দিল, তাকে দলে-পিষে দিয়ে চলে গেল আরেকটি রমণী, যার শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে রিয়ারই শরীরের রক্ত।

আর পারল না রিয়া। লাজলজ্জা ভুলে গিয়ে অতগুলো ছেলের সামনেই উপুড় হয়ে বসে পড়ল সে।

— কি হল, কি হল, রিয়া?

দুই হাত কি চেখের সামনে তুলে ধরল রিয়া? নাকি হাতের আড়াল ছাড়াই তার চোখের সামনে নেমে আসছে গভীর, ভীষণ এক কালো পর্দা?

'পুড়বে মেয়ে, উড়বে ছাই'....

ডানলপে ডাক্তার মুখার্জীর চেম্বারে গিয়ে সঞ্জয় যখন পৌঁছল, তখন রাত প্রায় আটটা। অফিস থেকেই সোজাসুজি চলে এসেছে সে। রাস্তায় জ্যাম থাকায় আরও একটু দেরিই হল।

কম্পাউণ্ডার মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জয়ের অনেকদিনের চেনা। — 'একটু দেখা করব।' — সঞ্জয় বলল। যতই চেনা হোক, চেম্বারে মৃত্যুঞ্জয় খোদ ডাক্তারের চেয়েও গম্ভীর। বুকপকেটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল— 'মোবাইলটা অফ্ করেছেন? এখানে মোবাইল চালু রাখা যাবে না।'

অগত্যা।

রাত আটটাতেও চেম্বারের ভিড় খুব পাতলা হয়নি। একটাই ভরসার কথা, গত বছর নিজেরই একটা হার্ট অ্যাটাক হবার পর থেকে ন'টার পর আর রুগী দেখছেন না ডাক্তার মুখার্জী। তবুও সারাদিন অফিসের পর আর কতক্ষণই বা বসে থাকা যায়?

পৌনে ন'টা নাগাদ ভিড়টা একটু পাতলা হয়েছে, মৃত্যুঞ্জয় বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট টানছে, সুযোগ বুঝে পর্দার ফাঁক দিয়ে চেম্বারের ভেতর একবার উঁকি মারল সঞ্জয়। সেখানে তখনও দুজনে রিপোর্টিং-এর জন্য দাঁড়িয়ে। ডাক্তার কিসব কাগজপত্র দেখছেন। সামান্য গলা খাঁকারি দিল সঞ্জয়। ডাক্তার মুখ তুলে সঞ্জয়কে দেখে তাঁর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন— 'ওয়েট, ওয়েট।'

বাপ্‌রে! একলাফে সঞ্জয় পিছিয়ে এল। প্রায় চল্লিশে পৌঁছেও বাবার এই ডাক্তার বন্ধুটিকে ভীষণই ভয় করে সঞ্জয়। উপকারী, সন্দেহ নেই। ডাক্তার হিসেবেও ভাল। কিন্তু যেমন গম্ভীর, আবার তেমনই দুর্মুখ।

চেম্বার যখন পুরো ফাঁকা হল, ততক্ষণে সঞ্জয় প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছে। প্রায় সাড়ে নটা। এমন সময় মৃত্যুঞ্জয় ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল— 'আপনি যান। ডাকছেন।'

সঞ্জয় গুটি গুটি গিয়ে ঢুকল। ডাক্তার তখন বেরিয়ে হাত ধুচ্ছেন। সঞ্জয়ের দিকে পিঠ ফেরানো। সেই অবস্থাতেই বললেন,— 'বোসো। তোমার বোনের আলট্রাসোনোগ্রাফির রিপোর্ট আজ বিকেলে আমার চেম্বার দিয়ে গেছে। কবে করাতে বলেছি... এত সময় নিলে চলে?'

সঞ্জয়ের মুখ শুকিয়ে গেল। বলল— 'ভয়ের কিছু আছে নাকি, ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তার তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে নিজের চেয়ারটায় বসলেন। বললেন— 'বোন এখন কেমন আছে?'

— আজও তো, যতদূর জানি, অফিসে গেছে।

— 'অফিসে গেছে!' — ডাক্তার জিভ দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করলেন। তারপর বললেন— 'কালই ওকে দমদমে ডাক্তার দত্তর নার্সিং হোমে ভর্তি করে দেবে।'

— 'কালই!'— সঞ্জয় আঁতকে উঠল।

— হ্যাঁ, কালই। পারলে আজ রাত্রেই।

— কিন্তু... ওর মা-বাবাকে না জানিয়ে...

— আজই ফোনে জানিয়ে দাও।

— না...মানে... ওঁরা তো আসছেন।

— কবে?

— তিনদিন পরে।

— অসম্ভব। ওয়েট করা যাবে না।

সঞ্জয় খুব ভয় পেয়ে গেল। বলল— 'আপনি কি খারাপ কিছু সাসপেক্ট করছেন?'

— ওভারিতে একটা টিউমার হয়েছে।

— টিউমার!

— খুব দ্রুত বাড়ছে। পুজোর আগে যখন বউমার সঙ্গে আমার চেম্বার এসেছিল, তখনও হাত দিয়ে আমি কিছু বুঝতে পারিনি। অবশ্য সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু এখন...দেখবে?

ডাক্তার ছবিটা সঞ্জয়ের চোখের সামনে তুলে ধরে একটা বিশেষ জায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। সঞ্জয় এসবের কিছুই বোঝে না। বোঝার কথাও নয়। তবুও টিউমারের আকৃতিটা দেখে ওর মাথা ঘুরে উঠল।

— শী নিড্স ইমিডিয়েট অপারেশন। আর এই মেয়েকে তোমরা অফিস করতে পাঠাচ্ছ?

— 'আমরা পাঠানোর কে?' — সঞ্জয় মিনমিন করে বলল— 'নিজেই তো যাচ্ছে।'

— যাকগে, যা বললাম তাই করো। ... ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা...

সঞ্জয় মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল। কোনওক্রমে মুখ তুলল।

— কদিন আগে মেয়েটি আমার চেম্বারে এসেছিল। একাই। সাধারণত বউমাকে ছাড়া আসে না। বলে, ওর প্রচণ্ড নমিয়া হচ্ছে। শুনে আমি কোনও ঝুঁকি নিইনি। কারণ, আনম্যারেড মেয়েদের এখন এসব আকছার হচ্ছে। দু-একটা রুটিন টেস্ট করাতে বলেছিলাম। মেয়েটি কিন্তু সেসব করিয়েছে। অবশ্য তোমাদের জানিয়েছে কিনা জানি না। ... ইওর সিস্টার ইজ অলরেডি প্রেগনান্ট!

— ডাক্তারবাবু!

— ওর কি কোথাও বিয়ে ঠিক হয়েছে?

— না, মানে, তেমন কিছু না, তবে একটি ছেলের সঙ্গে...

— রিলেশান আছে, এই তো? হয়তো তারই কীর্তি।

— 'এখন তাহলে আমি কি করব, ডাক্তারবাবু? — সঞ্জয় যেন অকূল পাথারে পড়ল। — 'আমার এখানে থেকে এইসব কাণ্ড.... আমি কাকা-কাকীকে মুখ দেখাব কি করে?'

— ভেরি আর্লি স্টেজ অফ প্রেগনান্সি। অ্যাবর্সন করাতেই পারো। তবে যা করবে, বোনের আর ওই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে করবে।

— 'আমি এসব নিয়ে কথা বলতে পারব না।'— সঞ্জয় বেঁকে বসল।

— তাহলে বউমাকে বলবে। ফট্ করে যেন কিছু করতে যেও না, এতে মেয়েটার সাইকোলজিক্যাল প্রব্লেম হয়ে যেতে পারে। আর কাকা-কাকীকে বলো, ওদের যেন ইমিডিয়েটলি বিয়েটা দিয়ে দেন।

— প্রাণে বাঁচবে তো?

— আঃ! উল্টোপাল্টা বোকো না। যা বললাম করো গিয়ে।

প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরল সঞ্জয়। পিংকি দরজায় দাঁড়িয়েছিল। ও ঢুকতেই উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠল— 'কি করো, বলো তো? বারবার মোবাইলে চেষ্টা করছি, প্রত্যেকবার একই কথা, সুইচ অফ!'

— ডাক্তার মুখার্জীর চেম্বারে গিয়েছিলাম। ওখানে মোবাইল ব্যবহার বারণ, তুমি জানো না?

— তা, চেম্বার থেকে বেরিয়ে তো অন্তত অন্ করবে!

— আঃ! কি হয়েছে তাই বলো না।

— রিয়া আজ অফিসেই প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অতীন আর ওর বন্ধুরা ওকে পার্ক স্ট্রীটেই একটা নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিয়েছে। বিকেল থেকে সেই যে অজ্ঞান হয়ে আছে, জ্ঞানই ফেরেনি এখনও!

— সেকি!

— তুমি ডাক্তার মুখার্জীর কাছ থেকে সব রিপোর্ট এনেছ?

— এনেছি বইকি!

— তাহলে এক্ষুণি নার্সিং হোমে চলে যাও।

— তুমি?

— অসম্ভব। আমি যেতে পারব না। মা ভীষণ কান্নাকাটি করছেন। ওঁকে কে সামলাবে?

— কিন্তু....

— কোনও কিন্তু নয়। এক্ষুণি যাও। মেয়েটার কিছু হয়ে গেলে আমরা সেজকাকা-কাকীর কাছে মুখ দেখাব কি করে?

প্রাণ হাতে করে বড় রাস্তা পার হয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল সঞ্জয়। সিটে শরীরটা এলিয়ে দিল। একটা বিষয়ে অবশ্য সে মনস্থির করেই ফেলেছে। রিয়ার পেটে আসা অসময়ের বাচ্চাটাকে নিয়ে ও ওই স্কাউন্ড্রেল অতীনটাকে একটা কথাও বলবে না। পিংকি থাকলে না হয়....।

ওটা ওদের দুজনের ব্যাপার। রাখলে ওরা রাখবে আর নয়তো...

মিলির কথা মনে পড়ল সঞ্জয়ের। কতবার... কতবার পিংকিকে সাবধান করেছে! সাধে কি আর বলে, গরীবের কথা বাসি হলে ফলে?

তুই ফিরে যা, অতীন

সুধাকর এখন মেয়েদের জন্য যতটা চিন্তিত, তার চেয়েও বেশি চিন্তিত স্ত্রী চন্দ্রাকে নিয়ে।

লিজার দুর্ঘটনার খবর পেয়েই যথেষ্ট ভেঙে পড়েছিলেন চন্দ্রা। সবসময়ই গম্ভীর, মাঝেমাঝেই কান্নাকাটি। এদিকে সুধাকর প্রায় সারাদিনই বাড়ির বাইরে। অশান্তিতে একটা সময় চাকরি ছেড়ে দেবার কথাও ভাবতে শুরু করেছিলেন উনি। রিয়াই ঠেকিয়ে রেখেছিল। সপ্তাহে দু-তিনবার করে ফোন করত চন্দ্রাকে। সেই রিয়া প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছে খবর পেয়ে সুধাকরের মতো স্থিরমস্তিষ্কের মানুষও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

তবু ভাগ্য ভালো, ছুটিটা পেয়েছিলেন। দিন-তিনেকের মধ্যেই এসে পৌঁছাতে পারলেন।

এই বিপদের মধ্যে লিজাই এসে হাল ধরেছে। আর শেষ পর্যন্ত ওর কাছ থেকেই সুধাকর-চন্দ্রা শুনলেন রিয়া-অতীনের বৃত্তান্ত। অতীন রোজই বিকেলে নার্সিং হোমে আসে। সদ্য কনস্ট্রাকশন কোম্পানির চাকরিটা পেয়েছে সে। মাইনে মোটামুটি খারাপ নয়। আগামী সোমবার কাজে যোগ দেবে। রিয়ার জন্য অবশ্য আরও ভাল পাত্র আশা করেছিলেন ওঁরা। যাক, কি আর করা যাবে। মেয়ের পছন্দই শেষ কথা।

অপারেশনের পর বাহাত্তর ঘন্টা পেরিয়ে গিয়েছে। রিয়া এখন বিপন্মুক্ত। টিউমারের বায়োপ্সি রিপোর্টও এসে গেছে। নর্মাল।

মধ্যবিত্ত পরিবারে এইসব সময়ে নার্সিং হোমেই একটা ছোটখাটো গেট-টুগেদার হয়ে যায়। এখানেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। একদিন লিজার শ্বশুর শাশুড়ি এলেন। একদিন ওর ননদ জিনি। মস্ত গাড়ি হাঁকিয়ে এলেন রত্নাকর। মেয়ের বিয়ের কথা জানিয়ে গেলেন। ছেলে ডাক্তার, কানাডায় থাকে। এমনকি যাকে সবাই খরচের খাতায় রাখে, সেই দিবাকরও একদিন এসে হাজির। সুধাকরের অবশ্য কষ্টই হল ওকে দেখে। বড্ড বুড়িয়ে গেছে মেজদা।

এসবই স্বাভাবিক। শুধু এর মধ্যে অস্বাভাবিক ব্যাপার একটাই। রিয়া যেন একটু বেশিই নীরব হয়ে গিয়েছে। তবু এরই মধ্যে একদিন চন্দ্রা মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অতীনের প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন— 'ডাক্তাররা মাস তিনেক একটু সাবধানে থাকতে বলেছেন। তারপরই আমরা তোদের বিয়ে দেব। সব শুনেছি আমি লিজার মুখে। পিংকিও বলেছে। যদি চাস, তো আমরা ফেরার আগে রেজিস্ট্রিও করিয়ে দিতে পারি।'

আশ্চর্য! রিয়া একেবার চুপ। হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকে।

লিজা আর অতীন এলে ওদের রিয়ার কাছে রেখে বেরিয়ে আসছেন বড়রা। ওরা একসঙ্গে একটু হাসি-ঠাট্টা করুক, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দুজনেই মুখ চুন করে নেমে আসছে নিচের লাউঞ্জে। চন্দ্রা ব্যস্তসমস্ত হয়ে লিজাকে বলছেন— 'কিরে, চলে এলি যে?' লিজা বলছে— 'কি যে হয়েছে দিদির, কিছু বুঝতে পারছি না। কোনও কথাই বলতে চাইছে না। শুধু বলছে, আমাকে তোরা একা থাকতে দে।'

এ আবার কি? ছেলেটা বিয়ে করতে রাজি, অথচ রিয়ার এরকম উদাসীন ভাব কেন? কোথাও কি তবে কোনও গণ্ডগোল আছে? অথচ লিজার কাছ থেকে যা শুনেছেন, তাতে স্পষ্ট যে ওদের সম্পর্কটা অনেক দূর এগিয়েছে। তাহলে?

একটা অস্পষ্ট বিপদের গন্ধ পেয়ে চন্দ্রা পাল্টা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। নার্সিং হোমে আত্মীয়দের মধ্যে যাঁরাই দেখা করতে আসছেন, তাদেরই রিয়ার কেবিনে নিয়ে গিয়ে গল্পচ্ছলে হাসতে হাসতে টুক করে বলে দিচ্ছেন— 'এই তো দ্যাখো না, পুজো তো কেটেই গেল। সামনের বৈশাখের মধ্যেই রিয়ার বিয়ে দিয়ে দেব। ছেলেটিকেও তো তোমরা দেখলে। ওই যে, নিচে বসে ছিল। হলুদ রঙের টি-শার্ট গায়ে। আচ্ছা, যাবার সময় আলাপ করিয়ে দেব।' এইরকম।

দিন-দুই এই খেলাটা চলল। আগামীকাল রিয়াকে নার্সিং হোম থেকে ছেড়ে দেবে। সন্ধেবেলা ভিজিটিং আওয়ারে চন্দ্রা আর সুধাকর পৌঁছানোর পর রিয়া হঠাৎ বলল,— 'মা, তুমি এভাবে সবাইকে আমার বিয়ের গল্প করে বেড়াচ্ছ কেন? বিয়ে আমি এখন করব না।'

— 'তার মানে?— চন্দ্রা একটু রুখেই উঠলেন।

— মানে কিছু নেই। আমি বিয়ে করব না।

— আশ্চর্য! ভেবেছ কি তুমি? এতদিন ধরে একটি ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করে... ছি, ছি, রিয়া! লোকে শুধু তোমাকে নয়, আমাদেরও যা তা বলবে।

— জানি, তবু আমার পক্ষে এই মুহূর্তে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

— ঠিক আছে, সে না-হয় এখন রেজিস্ট্রি না-ই বা হল। কিন্তু তিন-চার মাস পরে...

— না, মা! তারপরেও নয়।

— রিয়া! তোমাদের দু-বোনের জন্য ভেবে ভেবে আমার মাথা এমনিতেই খারাপ হবার যোগাড় হয়েছে। তুমি কি আমাকে পুরো পাগল করতে চাও?

স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন দেখে সুধাকর তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলেন।

— 'থামো তুমি!' — চন্দ্রা রুখে উঠলেন। — 'বেশ, অতীনকে নয়, তুমি কি আর কাউকে বিয়ে করতে চাও?'

— না, মা! বিয়ে আমি করব না।

— রিয়া! সত্যিই আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কারণটা কি আমাকে খুলে বলবে?

— বলে আমি তোমাকে সেকথা বোঝাতে পারব না মা।

— বাঃ! চমৎকার।.... দিদি তাহলে আমাকে ঠিকই বলেছেন!

— বড়মা! কি বলেছে বড়মা?

— তোমার অফিসের বস্... তার জন্য ভেবে ভেবে নাকি তোমার.... ছিঃ, রিয়া, ছিঃ! কলকাতায় এসে তুমি এইসব শুরু করেছিলে?

রিয়া চোখ বুজে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিল। সুধাকর বললেন— 'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? নার্সকে ডাকব?'

— না, বাবা। তোমরা একটা কাজ করবে? এখন আর কাউকে আমার কাছে আসতে দিও না।.... শুধু একটু পরে অতীন এলে.... ওকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বিছানায় বসে আছে রিয়া। অতীন কেবিনে ঢুকে ওর পিঠে হাত রাখল।

— রিয়া!

— উঁ!

— কি হয়েছে তোর? তুই তো ভাল হয়ে গিয়েছিস।

— 'জানি।' — রিয়া একটা শ্বাস ছাড়ল।

— আমার দিকে মুখ ফেরা। .... মাত্র তো তিন-চারটে মাস! দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তুই মন খারাপ করে থাকিস না।

রিয়া মুখ ঘোরাল। অতীনের চোখে চোখ রাখল। ওর চশমাহীন চোখে পুকুরের স্বচ্ছ জলের মতো টলটল করছে কুচকুচে কালো দুটো মণি।

— 'ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, রিয়া।'— অতীন বলল।— 'দ্যাখ্, ঠিক মোক্ষম সময়ে চাকরিটা পেয়ে গেছি। তবেই না তোর মা-বাবার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো গেল।'

— 'অতীন।' — চোখ সরিয়ে নিল রিয়া। বলল— 'মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো অত সোজা নয় রে! খুব কঠিন।'

— রিয়া! তুই কি বলতে চাইছিস?

— জানি, সবার কাছে তুই এখন সুপাত্র। এমনকি বোধহয় আমার দাদার কাছেও। কিন্তু, মুসকিলটা কি জানিস? সবাই আমাকে পাগল ভাবল। যখন আমি তোকে বিয়ে করতে চেয়েছি তখন, আবার যখন আমি তোকে বিয়ে করতে চাইছি না, তখনও!

— রিয়া! তুই কি বলছিস? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

— মাথা উঁচু করে যখন দাঁড়াতেই দিলি না অতীন, তখন ধরে নে না, মাথা খারাপই হয়ে গেছে।

— 'বাজে কথা! সব তোর বাজে কথা।'— অতীন ফুঁসে উঠল। — 'তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল।'

— কখন?

— কেদারের সুইসাইডের খবর শুনে তুই যেভাবে ভেঙে পড়েছিলি! অতগুলো ছেলের সামনে অমন নাটক করতে সেদিন তোর লজ্জা হল না?

— অতীন!

— যখনই তোকে চাকরি ছাড়তে বলেছি, তুই এড়িয়ে গেছিস। আমি জানি, কক্ষনো তুই ওই চাকরি ছাড়তিস না। নেহাৎ কেদারটা মরে গেল তাই.... অস্বীকার করতে পারিস একথা?

— 'অতীন!' বিছানায় উঠে বসল রিয়া। অতীন দেখল, ওর রুগ্ন বক্ষ উদ্বেল হয়ে উঠেছে। যেন এক শীর্ণ প্রণালীতে হঠাৎই ঢুকে পড়েছে সমুদ্রের নোনা ঢেউ।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রিয়া বলল— 'তুই কি অস্বীকার করতে পারিস একটা কথা?'

— 'কি কথা?'— অতীনও রুখে দাঁড়াল।

— আমার শরীরে যে এসেছিল, তুই... তুই তাকে নষ্ট করিয়েছিস?

— রিয়া!

— কেন করিয়েছিস, বল্ আমাকে!

— রিয়া, শোন্....

— তুই তো সব জানতিস অতীন! সব আমি বলেছি তোকে!

— তা বলে বাচ্চাটাকে রাখার কোনও কথা আমাদের মধ্যে হয়নি।

— যদি নাও হয়, তোর একার কি অধিকার ছিল ওকে নষ্ট করার?

— 'রিয়া!'— অতীন কঠিন হল। — 'মনে রাখবি, এটা মৃগাঙ্কর বন্ধুর বাবার নার্সিং হোম বলে সব কিছু চুপিচুপি মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য কোথাও হলে....

— কি হত অতীন?

— কি আবার হত? লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যেত।

— মাথা কাটা গেলে তোরই যেত অতীন, আমার নয়।

— রিয়া! কি যা-তা বকছিস! এসব শুনলে তোর মা-বাবা বেঁকে বসতেন না?

— মা-বাবা! আমি কি আমার মা-বাবার কথায় তোকে বিয়ে করতাম অতীন? করতাম, তোকে আমি ভালবেসেছি বলে।

— রিয়া! বি প্র্যাকটিক্যাল। বাচ্চা আমাদের আবারও হবে।

— কিন্তু যে চলে গেল, তার কি দোষ ছিল?

— সে অবৈধ। ইল্‌লেজিটিমেট।

— কি বললি! কি বললি তুই?

রিয়ার রুগ্ন হাত যেন বাঘিনীর থাবা হয়ে অতীনের জামার কলারটা চেপে ধরল।

— ছাড়, রিয়া, ছাড়। আমার লাগছে।

— লাগুক। .... তোরা সবাই একরকম। সবাই!

— শোন, রিয়া, শোন....

— চুপ কর, তুই!.... বেহুঁশ হয়ে পড়ে থেকেছি... প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বোধহয় মরেই যাব.... কিন্তু তাহলে যে আরেকজনও মরে যাবে..... সেই অবস্থাতেও বিড়বিড় করে বলেছি.... ডাক্তার.... ওকে মারবেন না.... ওকে বাঁচিয়ে রাখুন। কেউ কিছু বোঝেনি..... কিছু শোনেনি। ভেবেছে, ঘোরের প্রলাপ। .... আমার শেষ ভরসা ছিলি তুই! অথচ তুই.... তুই কেন অমন কাজ করলি? .... বল্‌, বল্‌, বলতেই হবে তোকে....

অঝোরে কান্নায় ভেঙে পড়ে রিয়া।

নার্স ঢুকে গম্ভীর ভাবে অতীনকে বলল— 'আপনি নিচে যান। দেখছেন না, পেসেন্ট রেস্টলেস হয়ে পড়ছে?'

রিয়া দেখল, মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে অতীন। পরমুহূর্তেই একটা সুঁচ এসে বিঁধল রিয়ার শরীরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব অন্ধকার।

শেষ খেলার শেষে

সংসারে এমন একেকটা মানুষ থাকে, হেরেও যারা হার মানতে চায় না। টাগ-অফ-ওয়্যারের দড়িটা তাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেলেও এক দুর্মর আশায় শুধু সেই দড়িটা ধরেই শূন্যে ঝুলে থাকে। চন্দ্রাকে দেখে এখন সেরকমই মনে হয় সুধাকরের।

আজ রবিবার। বিকেলে রিয়াকে নার্সিং হোম থেকে ছেড়ে দেবে। সকালে সেখানে আর একপ্রস্থ গেট-টুগেদার হয়ে গেল। তার মধ্যে পুরনো অনেকেই যেমন আছেন, আবার দু-একজন নতুনও আছেন। শুধু অতীনই অনুপস্থিত। আর সেটা লক্ষ্য করেই সুধাকর বুঝে গেছেন, আর কিছু হবার নয়। কোথাও একটা খুব বড় ধরনের গণ্ডগোল আছে, সন্দেহ নেই। রিয়া যথারীতি আবারও নীরব।

অবশ্য এরই মধ্যে এক ফাঁকে রিয়া তাঁকে জানিয়েছে যে, সে রাঁচিতে সিস্টার যোসেফাইনের অনাথ আশ্রমে চলে যাবে। অন্তত কিছুদিনের জন্য। একথা চন্দ্রাকে জানাতে তিনি যথারীতি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন। — 'বদমাইসি, ন্যাকামি' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন, আর সুধাকরের বিরুদ্ধে সেই পুরনো অভিযোগ এনেছেন যে তিনি মেয়েদের সব ব্যাপারেই হাত ধুয়ে বসে থাকেন। যত যন্ত্রণা চন্দ্রার একার।

আজ সকাল থেকেই তাই হেরে-যাওয়া গেমটা আবার খেলতে শুরু করেছেন চন্দ্রা। কাল রাতেই তিনি সুধাকরকে জানিয়েছেন, অতীন অর নো অতীন, রিয়ার বিয়ে তিনি দেবেনই। ভেবেছে কি সে? মঠে গিয়ে সন্ন্যাসিনী হবে? আর সেটা উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন! সুধাকরের 'ধীরো চলো' নীতিকে এক ঝাপটে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, ওই করে করেই চবিবশ পার হয়ে পঁচিশ হতে চলল। এরপর ওই রোগা, কালো আধবুড়িকে কে আর পছন্দ করবে? সুধাকর এটাও লক্ষ্য করেছেন, বরানগরে এসে ছোটজা শীলার মেয়ে মিলনমালা, অর্থাৎ মিলির বিয়ে পাকা হয়ে গিয়েছে জেনে চন্দ্রা যেন আরও অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।

সেইজন্য আজ সকাল থেকে চন্দ্রা জনে-জনে সবাইকে বলে চলেছেন— 'দ্যাখোতো, মেয়ের কি পাগলামি! বলে, বিয়ে করব না। বোধহয় ভাবছে, বাচ্চাকাচ্চা হতে যদি অসুবিধা হয়! ডাক্তাররা বোঝালেও বুঝবে না— কি জ্বালা বলো তো? দ্যাখোতো, তোমরা সবাই মিলে যদি রাজি করাতে পারো....'

এই খেলায় লিজা-আশিস থেকে শুরু করে খরচার খাতায় নাম উঠে থাকা দিবাকর পর্যন্ত কেউই চন্দ্রার কাছে অচ্ছ্যুৎ নয়। লিজা একবার শুধু ফিসফিস করে মাকে জিজ্ঞেস করেছে— 'অতীনদাকে তো দেখছি না?' আর অমনি চন্দ্রা ফোঁস করে উঠে বলেছেন— 'অতীনদা ছাড়া কি আর ছেলে নেই নাকি? তোমরা ওকে বিয়েটা করতে রাজি করাও না সোনা, ছেলের কি অভাব?'

কিন্তু একে একে সবাই মুখ চুন করে ফিরে আসছে। অসহিষ্ণু হয়ে চন্দ্রা পিংকিকে বলেছেন— 'তোমরা কেউ কথাটা ঠিকভাবে পাড়তেই পারছ না। হালকাচ্ছলে কথার মধ্যে টুক করে এসব সিরিয়াস প্রসঙ্গ তুলে দিতে হয়।.... কি আর বলব? আমারই কপাল! আত্মীয় স্বজনও হয়েছে সব তেমনই।'

সুধাকর আর সঞ্জয় ব্যস্ত ছিল শেষ মুহূর্তের নানা কাজে। ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করা, নার্সিং হোমের বিল মেটানো, আয়াদের বকশিস দেওয়া। এসব সেরে ওরা যখন নিচের লাউঞ্জে ফেরত এল, তখন সকালের ভিজিটিং আওয়ার শেষ হবার মুখে। ফিরতেই চন্দ্রা সঞ্জয়কে তলব করলেন।— 'আমি?' — সঞ্জয় প্রমাদ গুণল। একটু আগেই লিজার বর আশিস ওকে ডেকে কানে-কানে বলে গেছে, বিয়ের কথা তুলে এখন রিয়াকে ডিস্টার্ব না করাই ভাল। এমনিতেই ও ভীষণ চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। তার ওপর বিয়ের কথা তুললে নাকি একেবারেই চুপ। বড়জোর বলছে— 'অন্য কিছু বলো। এসব শুনতে আর ভালো লাগছে না।'

কাজেই 'আমি' বলে সঞ্জয় ঢোঁক গিলল।

— 'হ্যাঁ, তুই! তুই না অনেক বড় দাদা? যা না, বোনের কান মুলে দু-গালে দুটো চড় কষিয়ে আয়, ভাল কথায় যখন হচ্ছে না। ভেবেছেটা কি যে?' — সুধাকর মৃদু আপত্তি করায় ঝাম্‌টে উঠেছেন— 'তোমার আর কি? মেয়ে বলেছে সে যোগিনী হবে, আর তুমি তাকে একেবারে জোয়ান অফ আর্ক ঠাউরে বসে আছো।'

মাথা নিচু করে নার্সিংহোমের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠছে সঞ্জয়। এও তার অদৃষ্টে ছিল! এখন সুযোগ পেয়ে রিয়া যদি তাকে দু-কথা শুনিয়ে দেয়? যদি বলে, তুমি তো কোনওদিনই অতীনকে পছন্দ করোনি!

চিৎ হয়ে কপালের ওপর হাত রেখে চোখ বুজে শুয়ে আছে রিয়া। সঞ্জয় কাছে গিয়ে ডাকল— 'রিয়া!'

— উঁ?

— চোখ খোল। টায়ার্ড লাগছে?

— কে? ও সোনাভাই!.... তা একটু লাগছে। কিন্তু সোনাভাই, তুমিও নিশ্চয়ই একই কথা বলতে আসোনি?

মাথা নিচু করে সিঁড়ি ভেঙে এবার নিচে নেমে আসছে সঞ্জয়। কি যে হল সে নিজেও ঠিক বুঝছে না। অসময়ের ওই বাচ্চাটাকে নিয়েই কোনও গণ্ডগোল হল কি? কিন্তু নার্সিংহোম যখন চেপে গেছে, প্রাণ গেলেও এই বিষয়টা নিয়ে সে জীবনে মুখ খুলবে না।

নিচে নামতেই চোখে পড়ল ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতোই যেন সেজকাকী অপেক্ষা করে আছে লাউঞ্জে। সঞ্জয়ই যেন শেষ ব্যাটস্‌ম্যান। সঞ্জয়ের হার মানে টিমেরই হার। আর সেই সঞ্জয় শূন্য রান করে ফিরে আসছে।

দিন সাতেক পর। আজ মুম্বই মেলে সুধাকর আর চন্দ্রা ফিরে যাবেন। সুধাকরের আর ছুটি নেই। রিয়াকে অবশ্য আরও অন্তত তিন সপ্তাহ বরানগরেই থেকে যেতে হবে। তারপর ওর ফাইনাল চেক-আপ।

সুধাকরের কথামতো দু-বেলার জন্য দুটো নার্স রেখে দিয়েছে সঞ্জয়। সুধাকর বলেছেন— 'টাকা-পয়সা যদি আরও কিছু লাগে তো জানাস। পাঠিয়ে দেব। বউমাকে যেন খাটতে না হয় সেটা দেখিস। বেচারি এমনিতেই দু-দুটো বাচ্চা নিয়ে নাজেহাল।'

এই সাতদিন চন্দ্রা ভীষণই গম্ভীর। একেবারে পাথরের মতো মুখ। রিয়াও চুপ। মা-মেয়েতে একটিও কথা নেই। বাড়ির আবহাওয়া গুমোট। শুধু মাঝে-মাঝে ননদ জিনিকে নিয়ে লিজা এলে যেটুকু সামান্য হাওয়া লাগে।

সন্ধেবেলা ট্যাক্সি ডেকে কাকা-কাকীকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিল সঞ্জয়। শেষ মুহূর্তে লিজা জানিয়েছে, ও আসতে পারছে না। আজই আবার ও বাড়িতে কারা যেন জিনিকে দেখতে আসছে। সুধাকরের বাতানুকুল টু-টায়ার কামরার পাস। মোটামুটি ফাঁকাই, তবু মালপত্র সব গুছিয়ে দিল সঞ্জয়। গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। প্রণাম করল সুধাকরকে, চন্দ্রাকেও। বলল— 'আসি সেজকাকী।.... কি আর বলব? তোমরা সাবধানে থেকো।' আর সেই শেষমুহূর্তেই সঞ্জয়কে হতচকিত করে দিয়ে চন্দ্রার পাথরের মতো মুখ বিদীর্ণ করে জলের ধারা বেরিয়ে এল ফিন্‌কি দিয়ে। সঞ্জয়কে জড়িয়ে ধরে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে প্রায় হাহাকার করে উঠলেন চন্দ্রা। — 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না রে সঞ্জয়, আর আমি সহ্য করতে পারছি না। এই বাড়ির একটা মেয়ে মিমি পাগল হয়ে পড়ে রইল। সেই জেরে ঝিমলিটা না-ঘরকা না ঘাটকা। লিজার বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেল, আর এখন দ্যাখ, রিয়াও....। সঞ্জয় তুই আমাকে একটা কথা ঠিক ঠিখ বলবি? ... মিমির মতো রিয়ারও মাথাটা খারাপ হয়ে যায়নি তো?...'

সুধাকর মৃদু কণ্ঠে বললেন— 'ওকে নেমে যেতে দাও। ট্রেন ছাড়বে।'

আমি ভাল থাকব, বড়মা

দিন কেটে যাচ্ছে। রিয়া এখন সুস্থ। রাতের নার্সটাকে সেই জোর করে বিদায় দিল। চুপচাপই থাকে রিয়া। এর মধ্যে একদিন সঞ্জয়কে একটা চিঠি পোস্ট করতে দিল। সঞ্জয় দেখল, ঠিকানাটা রাঁচির।

একদিন নাকি সে সবিতার সঙ্গে কিছুক্ষণ একা কথা বলেছিল। কি কথা হয়েছিল পিংকিও শোনেনি। ও তখন নাচের স্কুলে গিয়েছিল বিন্দিয়াকে নিয়ে। ছেলে টুক্ বাইরের ঘরে ট্রাইসাইকেল চালাচ্ছিল। পিংকি ফিরতে সে মাকে বলল— 'পিসিমণি যেন আজ রিয়াকে কি বলছিল। বলতে বলতে কাঁদছিল। আমি শুনেছি।' পিংকি পরে শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করেছিল। সবিতা বললেন— 'ওর ওই অফিসের বস্ কেদারের কথা বলল। কিন্তু একটা কথা বুঝলাম না। মানছি, কেদারের সঙ্গে ওর তেমন কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাহলে অতীনকে ফিরিয়ে দিল কেন? এই কথাটা কিছুতেই ওর কাছ থেকে বার করতে পারলাম না।'

পিংকি চুপ করে গেল। কি হয়েছে, অন্তত সে কিছুটা বুঝেছে। কিন্তু, কোনওদিনই এই কথাটা সে কাউকে বলবে না। যা গোপন রয়ে গেছে, তা গোপনই থাক। মাঝে মাঝে তার আফসোস হয়। সেদিন রাত্রে সঞ্জয়ের সঙ্গে সে-ও যদি নার্সিং হোমে যেতে পারত....

মেডিকেল চেক-আপ হয়ে গেল। রিয়া এখন সুস্থ। শুধু সামান্য দুর্বল। সেটা ক্রমশ কেটে যাবে। চেক-আপের পর ফেরার পথে ট্যাক্সিতে সে সঞ্জয়কে বলল— 'সোনাভাই, আমার আরেকটা কাজ করে দেবে?'

— কি বল?

— সিস্টার যোসেফাইনের চিঠির উত্তর এসেছে। তুমি আমাকে একটা রাঁচির টিকিট কেটে দেবে?

— রিয়া! ... সত্যিই কি তুই সন্ন্যাসিনী হবি?

— সেরকম কিছু ভাবিনি। ... তবে কলকাতায় আর আমার ভাল লাগছে না।

আজ রিয়া চলে যাবে। সঞ্জয় গেছে ট্যাক্সি ডাকতে।

স্থির দৃষ্টিতে স্বামী প্রভাকরের ফটোর দিকে তাকিয়ে আছেন সবিতা। মনে মনে বলছেন...কি দেখছ? কিছুই করতে পারলাম না। মিমিটা পাগল হয়ে পড়ে রইল, ঝিমলিটারও কোনও গতি হল না, লিজার বিয়েটা যাও বা দিলাম, বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেল। আর রিয়া? তাকে তো বুঝলামই না।... জানি তবু তুমি আমাকে দোষ দেবে। বলবে... দেখলে তো? আমি না থাকাতেই যত গণ্ডগোল....

রিয়া এসে ঢুকল। প্রণাম করল প্রভাকরের ফটোতে। সব মৃত মানুষের মুখেই একটা উচ্চাঙ্গের হাসি থাকে। যেন, সব কিছুর উর্ধে থেকেও তাঁরা সব কিছুই বুঝতে পেরেছেন। প্রভাকরের মুখেও সেই বোদ্ধার হাসি।

সঞ্জয় ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে। রিয়া প্রণাম করল সবিতাকে। — 'ওরে!' .... বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন সবিতা। রিয়া আল্‌তো করে জড়িয়ে ধরল তাঁকে। বলল— 'কাঁদছ কেন বড়মা? কেঁদ না। আমি তোমাকে চিঠি দেব, ফোনে কথা বলব। আমি ভাল থাকব। বড়মা।'

সঞ্জয়কে প্রণাম করল রিয়া। পিংকি বলল— 'আর আমাকে ঝুঁকে প্রণাম করতে হবে না। পেটে লাগবে তোমার।' রিয়া একটু হাসল। জড়িয়ে ধরল বউদিকে। পিংকি কাঁদছিল। বিন্দিয়া আর টুক্‌কে চুমো খেল রিয়া। বলল— 'তোদের জন্য চকলেট রেখে গেছি, খাস। আর মা-বাবাকে খুব করে বায়না করবি, আমাদের পিসিমণির কাছে নিয়ে চলো। তাহলে তোদের রাঁচি বেড়ানো হয়ে যাবে।'

আবারও সেই হাওড়া স্টেশন। আবারও সেই আঠারো নম্বর প্ল্যাটফর্ম। আট মাস আগে মুম্বই মেল থেকে নেমেছিল যে মেয়েটি, আজ সে রাঁচি এক্সপ্রেসে কোন্ এক অনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে চলেছে। এই আট মাসে অনেক ঘটনা। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত। সে সবই যেন মেয়েটাকে বদলে দিয়েছে। এ যেন অন্য এক রিয়া। শান্ত, নির্লিপ্ত। কিন্তু সংকল্পে অনড়। সঞ্জয় বুঝেছে, তাকে আর ফেরানো যাবে না। একরকম জোর করেই সঞ্জয়কে ঠেলে পাঠিয়ে দিল রিয়া। বলল— 'সোনাভাই, তুমি চলে যাও। এই ট্রেন ছাড়তে রাত হবে। অত রাতে বরানগরে ফেরার বাস পাবে না তুমি।'

বোনের হাতে হাত বুলিয়ে ফিরে আসছে সঞ্জয়। আজ আর তার কোনও দায় নেই, নেই কোনও ঝুটঝামেলা। রিয়া তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। তবুও বুকের ভেতরটা কেন যে ভার হয়ে থাকে। চোখের সামনে সব কিছু কেন যে ঝাপসা!

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই রিয়া দেখল, পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে মৃদুমন্দ গতিতে ট্রেনটা চলেছে রাঁচির দিকে। ভাগ্য তার ভালই বলতে হবে। সামনের বার্থেই সে পেয়ে গেল যোসেফাইনের আশ্রমের এক সিস্টারকে।

মিল্লি.... কিতা..... বরওয়াদাগ.... একের পর এক ছোট ছোট পাহাড়ি স্টেশন পার হয়ে ট্রেন চলেছে রাঁচির দিকে। বেশ ঠাণ্ডা। রিয়া মাথায় স্কার্ফটা জড়িয়ে নিল। সকালের রোদ এসে আদর করছে পৃথিবীকে। চারপাশে জঙ্গল আর রহস্যময় পর্বতমালা।

রাঁচি স্টেশন থেকে অনাথ আশ্রম অটোতে প্রায় তিন কিলোমিটার। শহরের খানিকটা প্রান্তসীমায় এই জায়গাটা অনেকটাই ফাঁকা। আশ্রমের জন্য এখানে বেশ কিছুটা জমি সংগ্রহ করা হয়েছে। পাঁচিল পার হলেই বিশাল মাঠ। রিয়ার সঙ্গী সিস্টার মেরি বললেন, এই জায়গাটা বাচ্চাদের খেলাধুলোর জন্য রাখা হয়েছে। মাঠের অপর পারে একটা দোতলা বাড়ি। প্লাস্টার হয়নি এখনও। মেরি বললেন— 'ওটাই স্কুল। একতলায় অফিস ঘর, যোসেফাইন ওখানেই আছেন।' ডান হাতে, কিছুটা তফাতে আরেকটা দোতলা বাড়ি। মেরি জানালেন, ওটা বাচ্চাদের থাকার জায়গা। আর তার পাশে ছোট্ট একটি গির্জা। সামনে একটা ছোট বেদী। তার উপরে কাঁচের আধারে রাখা একটি মূর্তি। কুমারী-মাতা, কোলে পবিত্র শিশু।

যোসেফাইন অফিসঘরেই ছিলেন। রিয়াকে দেখে বললেন— 'এসো। ট্রেনে কোনও কষ্ট হয়নি তো? আরও রোগা হয়ে গিয়েছ।'

মেরি এক কাপ গরম চা এনে দিলেন। সঙ্গে দু-পিস কেক।

যোসেফাইন বললেন— 'খাও। এখানে কিন্তু খুব ঠাণ্ডা। সহ্য করতে পারবে তো?'

রিয়া চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একটু হাসল। বলল— 'আমি তো বিলাসপুরের মেয়ে, সিস্টার। ঠাণ্ডা গরম দুটোতেই অভ্যস্ত।'

চা খেতে খেতে টুকটাক কথা হচ্ছিল। তারই মধ্যে রিয়া জিজ্ঞেস করল— 'সিস্টার, আপনি কি গোড়া থেকেই এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত?'

যোসেফাইন হাসলেন। বললেন— 'না। আমাকে এখানে একজন টেনে এনেছে। সেই একজনই আমার প্রেরণা। তোমাকে একবার চিঠিতে তার কথা লিখেছিলাম।'

রিয়ার মনে পড়ল। বলল— 'সিস্টার, আপনি কিন্তু তার নাম লেখেননি।'

যোসেফাইন আবারও একটু হাসলেন। বললেন— 'তার কারণ, সে নিজেই বারণ করেছিল।'

— আশ্চর্য! কেন?

— কারণ, সে নিজের জীবন থেকে তোমাকে সরিয়ে দিয়েছিল। আবার নতুন করে জড়াতে চায়নি।

রিয়া অবাক হয়ে গেল। বলল— 'আপনি কার কথা বলছেন, সিস্টার? আমি কি তাকে চিনি?'

সিস্টার হাসলেন। বললেন— 'চেনো বইকি! পাশের ঘরে এসো, তাকে দেখতে পাবে।'

বিস্ময়ে বিমূঢ় রিয়া যোসেফাইনের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। পাশের ঘরে দরজায় একটা ভারি পর্দা টাঙ্গানো। সিস্টার পর্দা তুলে রিয়াকে ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করলেন।

দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে একমনে কম্পিউটারে কাজ করে যাচ্ছে একটি লোক। সিস্টার বললেন— ভাস্করণ! হিয়ার ইজ রিয়া।'

ভাস্করণ!

রিয়ার বিস্ময়ের বাঁধ যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল!

টেবিল ছেড়ে ভাস্করণ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। একটু হেসে বলল— 'ওয়েলকাম রিয়া।'

সিস্টার বললেন— 'তোমরা দুজনে কথা বলো। আমি দু-একটা কাজ সেরে আসি।'

ভাস্করণ বলল— 'বোসো রিয়া। তুমি যে আসছো, সিস্টারের কাছে শুনেছি। তবে, এ তো অনাথ আশ্রম। এখানে কেন এলে?'

রিয়া একটু চুপ করে রইল। কি বলবে ভেবে পেল না। তারপর বলল— 'কলকাতায় আমার আর ভাল লাগছিল না।'

ভাস্করণ একটু হাসল। তারপর বলল— 'তাহলে বিলাসপুরে কেন ফিরে গেলে না?'

এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া বোধহয় আরও শক্ত। রিয়া আবারও কি বলবে ভেবে পেল না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য রিয়াই নীরবতা ভঙ্গ করে বলল— 'আমি কি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

— বলো।

— তোমার অত ভালো কেরিয়ার, সেসব ছেড়ে দিয়ে তুমিই বা এখানে চলে এলে কেন?

ভাস্করণ একটু হাসল। তারপর বলল— 'কেরিয়ার দিয়ে কি হবে, রিয়া? আমার আসল পরিচয়টা কি ধুয়ে মুছে যাবে?'

— মানে?

— আমার বাবা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু মা ছাড়তে পারেননি.....

রিয়া বাধা দিয়ে বলল— 'সে তো জানি। কিন্তু....'

— পুরোটা জানো না। কেন ছেড়ে গিয়েছিলেন সেটা কি জানো?

রিয়া চুপ করে রইল। কানাঘুষোয় একটা কথা শোনা যেত বটে, কিন্তু রিয়ার সেটা সত্যি বলে মনে হত না।

ভাস্করণ রিয়ার সামনের চেয়ারটা থেকে উঠে দাঁড়াল। জানালার সামনে গিয়ে রিয়ার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলল— 'রিয়া, অনেকবার ভেবেছি, তোমাকে সত্যি কথাটা বলব। শুধু তোমাকেই। কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। যদি তুমি আমাকে ঘৃণা কর, যদি ফিরিয়ে দাও! তাই নিজেই তোমার কাছ থেকে দূরে সরে এসেছি। অথচ, দ্যাখো, ভাগ্যের কি পরিহাস! আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল।'

রিয়া চুপ করে রইল। ভাস্করণ হয়তো ঠিকই বলেছে। সত্যিই, ভাগ্যের পরিহাস!

ভাস্করণ জানালার দিক থেকে ফিরে রিয়ার মুখোমুখি হল। বলল— 'তুমি এখানে কতদিন থাকবে ঠিক করেছ?'

রিয়া মৃদুকণ্ঠে বলল— 'ঠিক নেই। বোধহয়, যতদিন থাকতে ইচ্ছে করবে।'

— তুমি বিলাসপুরে ফিরে যাও রিয়া। সেখানে তোমার বাবা-মা আছেন।

— আর তুমি?

— আমার তো কেউ নেই। এখানেই তো আমাকে থাকতে হবে।

— আশ্চর্য! তোমার কেরিয়ার...

— বারবার কেরিয়ারের কথা মনে করিয়ে দিও না রিয়া। কিসের কেরিয়ার? আমার তো বেঁচে থাকারই কথা নয়!

— মানে? তুমি কি বলতে চাইছ?

ভাস্করণ একটু হাসল। তারপর বলল— 'বলতে চাইছি, এতদিনে আমি ঠিক জায়গায় নিজের সঠিক কাজটি খুঁজে পেয়েছি। আমি যা, এখানের আশ্রিত শিশুরাও ঠিক তা-ই। আমারও যেমন বাঁচার কথা ছিল না, তেমনই ওদেরও ছিল না। তবুও আমরা বেঁচে আছি, কেন জানো?'

রিয়া অস্ফুটস্বরে বলল— 'কেন?

— বিকজ অফ আওয়ার মাদারস্। আমাদের মায়েদের জন্য। জীবনের এমনকি মান-ইজ্জতের ঝুঁকি নিয়েও তাঁরা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। বাট.... ফর আওয়ার ফাদারস্— আমরা ছিলাম অবাঞ্ছিত, আনওয়ান্টেড, ইল্লেজিটিমেট— অবৈধ।

— 'ভাস্করণ।'— দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলল রিয়া।

— জানি, তুমি এই সত্য সহ্য করতে পারবে না রিয়া। আর সেজন্যই বলছি, তুমি বিলাসপুরে ফিরে যাও। এখানে থাকার কথা ভেবো না। এ জায়গা তোমার জায়গা নয়, এ-কাজ তোমার কাজ নয়। এ জগৎ অভাগাদের জগৎ। বাবারা এদের ছেড়ে চলে গেছে, আর মায়েরা জন্ম দিতে গিয়ে মরেছে। এরা পিতৃ-পরিত্যক্ত, মাতৃহীন। এদের সঙ্গে তুমি কেন নিজেকে জড়াবে?

— 'চুপ করো, চুপ করো তুমি!'— রিয়ার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল।

ভাস্করণ এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত রাখল। বলল— 'সরি রিয়া। তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি। কিন্তু সত্যিটা যে আর না বললেই নয়।'

ঠিক এইসময় যোসেফাইন এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন— 'সরি। তোমাদের বোধহয় ডিস্টার্ব করলাম। রিয়া, আমার সঙ্গে একটু বাইরে এসো। তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব।'

মাঠে নেমে হস্টেলের বারান্দায় দাঁড়ানো একজনের দিকে ইঙ্গিত করে সিস্টার বললেন— 'ওদের পাঠিয়ে দাও।'

— কাদের কথা বলছেন?'— রিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

— 'দ্যাখোই না।'— সিস্টার মুচকি হাসলেন।

পরমুহূর্তেই রিয়া দেখতে পেল, মাঠ পার হয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে এক ঝাঁক শিশু। পরণে সাদা হাফ-প্যান্ট, সাদা শার্ট আর তার ওপরে সাদা পুল-ওভার। প্রত্যেকের হাতে একটি করে লাল গোলাপ ফুল।

— 'সিস্টার...?' যোসেফাইনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রিয়া।

— এরাই তো তারা! পিতৃ-পরিত্যক্ত, মাতৃহীন। পথে-ঘাটে পড়ে থাকা। এসো, রিয়া। ওরা তোমাকে ওয়েলকাম করবে।

ওরা এসে পড়েছে রিয়ার কাছে। খুদে-খুদে হাতে বাড়িয়ে ধরছে ফুল। পিছনে হাসছেন কুমারী মাতা, কোলে পবিত্র শিশু।

.... ঈশ্বর! তোমার সৃষ্ট এই পৃথিবীতে এত শিশু অবৈধ, অবাঞ্ছিত! পরিত্যক্ত! এদেরই মধ্যে কি মিশে আছে রিয়ার শরীরর সেই হারিয়ে যাওয়া প্রাণ?....

হাঁটু মুড়ে ওদের সামনে বসে পড়ল রিয়া। হাত বাড়িয়ে নিল ওদের ফুল। দু-হাতের বেষ্টনীতে ধরে নিতে চাইল ওদের সব ক'জনকে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কোথায় যেন বেজে উঠল ঘন্টার শব্দ। ডিং, ডিং, ডিং ডং। হয়তো সেই ঘন্টা কোনও গীর্জার, কিংবা কোনও মন্দিরের। রিয়া জানে না। আকাশ উপুড় করে দিচ্ছে আলোর রশ্মি। সেই আলোতে আর ঘন্টাধবনিতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে আশপাশের পর্বতমালা। ধবনিকে প্রতিধবনি করে ফিরিয়ে দিচ্ছে তারা। বাজতে-বাজতে সেই ধবনি যেন আর ধবনি হয়ে রইল না। একটা সুর হয়ে বাজতে লাগল। যেন শৈশবে শোনা যোসেফাইনের সেই কথা! — ইন হিজ উইল, আওয়ার পিস্!

... তোমার ইচ্ছাতেই আমার সুখ, আমার শান্তি।....

স্বরাজের দাবিতে ইংলণ্ডে প্রথম সভা

ডাঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্য

দেশ স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রবাসী ভারতীয় পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি' নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বৃটিশ সমাজতন্ত্রী নেতা হেনরী মায়ার্স হাইণ্ডম্যান (১৮৪২-১৯২১) ও অনেক প্রকৃত ভারতপ্রেমী ইংরেজ ব্যক্তিত্ব। সোসাইটির উদ্দেশ ছিল— ভারতে হোমরুল প্রতিষ্ঠা। বিশ্ববিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ কৃষ্ণবর্মা 'হোমরুল' শব্দটিকে 'স্বরাজ' বা 'স্বশাসনের' প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করেছিলেন। ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট পত্রিকায় ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে তিনি ঘোষণা করেছিলেন— "That a new organisatioan (Indian Home Rule Society) on independent lines should be set on foot for obtaining for India, what is its indefeasable right - 'A government of the people, by the people and for the people' — অর্থাৎ নতুন সংগঠনকে শক্তিশালী করে ভারতে জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকার ও জনগণের জন্য সরকার আদায় করতে হবে। এটা ভারতবাসীর অলঙ্ঘনীয় অধিকার।

একটি বিশেষ প্রস্তাবে ইংলণ্ডের মেট্রোপলিটান র‍্যাডিকাল ফেডারেশন এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক লীগ আহুত গ্রেট ইলেক্টোরাল কংগ্রেসের সাংগঠনিক সমিতি ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটির প্রতিনিধিদের ওই সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান এবং সর্বত্র স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রস্তাব পেশ করার জন্য অনুরোধ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজদের আহুত প্রকাশ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ সভায় ভারতের স্বাধীনতার দাবি আলোচনা করার দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই। তখন পর্যন্ত স্বাধীনতার দাবি নিয়ে ভারতবর্ষে কোথাও প্রকাশ্য সভায় আলোচনা হয়নি। বিষয়টি কেবলমাত্র বিপ্লবী সংগঠনের কার্যক্রমের মধ্যে সীমিত ছিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বয়স ২০-তে পৌঁছে গেলেও কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশে ইংরেজ শাসন মঙ্গলজনক ও বিধিনির্দিষ্ট ঘটনা মনে করতেন। নিজেদের বিশ্বস্ত রাজভক্ত বলে ঘোষণা করতে তাঁদের গর্ব হত। তথাপি সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী ইংরেজরা এই সভাতে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

১৯০৫ সালের ২৯ জুলাই, শনিবার হলবর্ণ টাউনহলে নির্বাচনী মহাসভায় যোগ দিতে এলেন ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, সহ সভাপতি ব্যারিষ্টার জে এম পারিখ ও সম্পাদক জে সি মুখার্জী। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছিলেন দাদাভাই নওরোজী (নর্থ ল্যামবেথ থেকে বৃটিশ পার্লামেন্টের নির্বাচন প্রার্থী), লালা লাজপত রায় এবং জে ভি দেশাই। সভায় সভাপতিত্ব করেন জন ওয়ার্ড (বৃটিশ পার্লামেন্টে স্টোক নির্বাচনী ক্ষেত্রের প্রার্থী, নেভি, বিল্ডারস্ ও জেনারেল লেবারস্ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক)।

সভার শুরুতেই সভাপতি জন ওয়ার্ড প্রারম্ভিক ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণ ভারতবর্ষের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ ছিল। সভার আলোচ্য বিষয়সূচী অনুযায়ী তিনি শ্যামজী কৃষ্ণবর্মাকে 'হোমরুল অল অ্যারাউণ্ড' বা 'সর্বত্র স্বরাজ' সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করতে অনুরোধ করলে সমবেত জনতা আসন ত্যাগ করে হর্ষধ্বনি দেন। শ্যামজী প্রস্তাব পাঠ করে তাঁর ভাষণে বলেন— "সর্বত্র স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পেশ করতে আহুত হওয়া আমার পক্ষে একটি বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। প্রস্তাবটিকে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমি বেশি কিছু বলতে চাই না। পৃথিবীর যে অংশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আমি গভীর সম্পর্কযুক্ত, সে প্রসঙ্গেই শুধু দু-একটি কথা বলব।

"ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এটা প্রথম ঘটনা যে, ইংরেজ শ্রোতৃমণ্ডলী ভারতবাসীর স্বরাজের অধিকার নিয়ে বিবেচনা করছেন। আপনাদের অনেকের হয়ত মনে আছে, লর্ড স্যালিসবারী আয়ারল্যাণ্ডের স্বরাজের দাবির বিরোধিতা করার সময় বলেছিলেন আয়ারল্যাণ্ডকে স্বরাজ দেওয়া হলে ভারতবর্ষ থেকেও একই দাবি উঠবে। লর্ড স্যালিসবারী মোটেই ভ্রান্ত ভবিষ্যতদ্রষ্টা ছিলেন না। যে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করি, সেই ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধ পরিকর। এখন আমি উল্লসিত যে ইলেক্টোরাল কংগ্রেসের মতো প্রভাবশালী ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনও এই দাবিকে শক্তিশালী সমর্থন জোগাচ্ছে।

"প্রায় সব অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা (ভারতে কর্মরত ইংরেজরা) মনে করে ভারতবাসীর স্বশাসন লাভ করার আদৌও কোন ইচ্ছে নেই। যদি তারা ভারতীয় হ'ত তাহ'লে জানতে পারত ভারতবাসীর দুঃখ কষ্টের উৎস কোথায়, — তারা স্বরাজ চাইছে কিনা। অনেকেই মনে করে ভারতীয়রা বেঁচে আছে শুধু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের লাভের জন্য এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ৩০ কোটি ভারতবাসীকে শাসন ও শোষণ করার অধিকার ন্যায় সঙ্গত"।

"ইংরেজরা অত্যাচারিত জাতির সফল বিদ্রোহকে ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করে থাকে, কিন্তু সেই প্রশংসাই ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধে রূপান্তরিত হয় যখন অত্যাচারিত জাতি তাদের অধীনে থাকে। আপনারা জারের বিরুদ্ধে রাশিয়ানদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল;কিন্তু আমরা ভারতীয়রা যদি বিদেশী স্বৈরাচারী দখলদারী থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য তৎপর হই, তখনই আমাদের খুনী নৈরাজ্যবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়। আপনারা ইংরেজরা গান করেন "স্বদেশ, মধুর স্বদেশ" কিন্তু আমাদের ভারতীয়দের কোন স্বদেশ নেই, নিজভূমে আমরা পরবাসী। আপনাদের দেশের কৌশলী চতুর স্বৈরাচারীদের কথা ভেবে দেখুন, যারা ভারতবাসীকে দমন করার জন্য ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবহার করে আসছে। এটা একটা পুরনো গল্প। বিড়ালে থাবা ব্যবহার করে বানরদের আগুনের মধ্য থেকে বাদাম বের করে খাওয়ার ধূর্ত নীতি। সারা ভারতে সব মিলিয়ে ইংরেজদের সংখ্যা মাত্র ২ লক্ষ। তারা ৩০ কোটি ভারতবাসীর প্রাণরক্ত শুষে খাচ্ছে। কেবলমাত্র স্বদেশবাসীর প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ স্বদেশপ্রেমই অধিকাংশ ইংরেজদের ভারতবর্ষের স্বরাজের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে মর্যাদা দিতে বাধা দিচ্ছে।"

শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা

"যদি ইংলন্ডের জনগণ বুঝতে পারেন, কোন জাতির পক্ষে অপর জাতির স্বৈরাচারের শিকার হওয়া কি ধরনের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক, তাহ'লে তাঁরা নিজেদের মত পরিবর্তন করবেন। ভারতের সম্পদ লুণ্ঠনের ভয়াবহ অপরাধের সুস্পষ্ট ছবি তুলে ধরার জন্য আমি আপনাদের সামনে একটি হিসাব পেশ করছি। এতে দেখা যাবে যে ভারতবর্ষ থেকে গড়ে ইংল্যান্ডের প্রতিটি নরনারী ও প্রতি শিশু, এককভাবে নয়, সামগ্রিক অর্থে, এক পাউন্ড করে পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ বৃটিশ শাসনের আশীর্বাদে ভারতবাসীরা প্রতি বৎসর গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডের জনসংখ্যার সমতুল ষ্টার্লিং পাউন্ড দিতে বাধ্য হয়। সংখ্যাটা ৪ কোটি ১০ লক্ষ — সেটা আপনারা সকলেই জানেন"।

"কয়েক বছর আগে, আমি যখন অক্সফোর্ডে ছিলাম, আপনাদের মহান প্রধানমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন দয়া করে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ভারতীয়রা বৃটিশ শাসন উপভোগ করে কিনা। আমি বলেছিলাম যে মুসলমান শাসনের তুলনায় আমরা কিছু সুযোগ পাচ্ছি বটে, তবে আমার দেশের লোকেরা তাঁদের নিজস্ব ভাষায় অবস্থাটা বুঝিয়ে বলে থাকেন। তাঁরা বলেন মুসলমানরা আমাদের পেছনে লাথি মারত, আর ইংরেজরা আমাদের পেটে লাথি মারছে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অস্বাভাবিক বেশী দাবির কথা না হয় বাদই দিলাম। যেদিন থেকে ভারতে মহারাণীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেদিন থেকে বাস্তবে বিনা প্রতিদানে শুধুমাত্র হোম চার্জ বাবদ ৪০০ কোটিরও বেশি ষ্টার্লিং পাউন্ড নেওয়া হয়েছে। এরকম সম্পদ শোষণের পরে পৃথিবীর কোনও দেশ টিকে থাকতে পারে? গ্লাডষ্টোন জানিয়েছিলেন যে বিশাল বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে ভারতে রাখতে হয়, অবশ্য তিনি সেই সঙ্গে সত্যকে অস্বীকার না করে বলেছিলেন যে এটা ইংল্যান্ডের দোষ, ভারতের নয়। আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন যে এত বড় একজন উদার রাষ্ট্রনেতার কথায় একজন ভারতীয় হিসাবে আমার মনের অবস্থা কি হয়েছিল।"

"পরিশেষে আমি বলতে চাই যে ভারতবর্ষকে স্বরাজ লাভ করতে দিলে ভারতীয়রা ইংরেজ, স্কচ আইরিশ ও ওয়েলসবাসীর কাছে চিরস্থায়ী কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবে"।

এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন লালা লাজপত রায় এবং ইন্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটির সহ-সভাপতি ব্যারিষ্টার জে. এম. পারিখ। লালা লাজপত রায় তাঁর ভাষণে বলেন যে পৃথিবীর যে কোন দেশের কোন ব্যক্তিবিশেষ যদি বলেন বিদেশী অধীনতায় সেই দেশের মঙ্গল হবে তবে তিনি হয় প্রতারক অথবা মূর্খ। ইংলন্ড যদি স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষের স্বরাজ না দেয়, তবে তাকে তা তার অনিচ্ছাসত্ত্বেই দিতে হবে।

বৃটেনের শহরাঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগঠনের ৬ লক্ষ সদস্যের প্রতিনিধিবর্গ সেদিন সর্বসম্মতিক্রমে ভারতের স্বরাজের দাবিতে আনা প্রস্তাব সহর্ষে অনুমোদন করেছিলেন। ইংলন্ডের মাটিতে ভারতবর্ষের স্বার্থের অনুকূলে এই সভাই সর্বপ্রথম এবং ইতিহাসের নিরিখে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ জনসমাবেশ যেখানে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা ভারতের স্বরাজের দাবি মেনে নিয়েছিলেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনা ৩০ শে জুলাই, ১৯০৫ এবং ৩১ শে জুলাই, ১৯০৫-এ যথাক্রমে Roynolds Newspaper এবং The Daily Chronicle-এ সবিস্তারে প্রকাশিত হয়। অথচ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটির মুখপত্র India পত্রিকায় লালা লাজপত রায়ের মূল বক্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৯২ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে ভারতবর্ষের মাটিতে India পত্রিকার জন্য ৬০,০০০ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে জাতীয় কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটি গঠিত হয়েছিল। বৃটিশ কমিটির কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় (অথবা অপ্রয়োজনীয়) অর্থ দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতীয়দের জোগাতে হত। অথচ এরা ভারতবর্ষের পরিবর্তে বৃটিশ স্বার্থরক্ষাতেই অধিকতর মনোযোগী ছিল।

এই সভার অব্যবহিত পরে আগষ্ট ১৯০৫-এ বৃটিশ কমিটি অব্ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভায় কমিটির সভাপতি প্রাক্তন আই. সি. এস স্যার হেনরী কটন ২৯ শে জুলাই-এর গ্রেট ইলেক্টোরোল কংগ্রেসের সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য দাদাভাই নওরোজী ও অন্য ভারতীয় সদস্যদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেন যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোন সদস্যই সমাজতন্ত্রী বা গণতন্ত্রী সংগঠনের সভায় যেতে পারবেন না। হেনরী কটন আরও বলেন যে জাতীয় কংগ্রেসের ভারতীয় নেতারা শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়া হাউসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। ভবিষ্যতে যদি কেউ কৃষ্ণবর্মার স্বরাজ আন্দোলন বা হাইণ্ডম্যানের সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের সঙ্গে কোনরকম মাখামাখি করেন, তবে তিনি তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেন না।

এই ঘটনার উল্লেখ করে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা লিখেছিলেন "ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে, এই ঘটনার পরও দাদাভাই নওরোজী ও অন্যান্য আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ভারতীয়রা কি ভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটিতে স্যার হেনরী কটনের মত লোকের অধীনে কাজ করে থাকেন?"

দেশের দুর্ভাগ্য যে গান্ধীজী সহ ভারতীয় কংগ্রেসের নেতারা হেনরী কটন, ওয়েডারবার্ণ প্রভৃতির দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতীয়দের অর্থে অবসর ভাতাভোগী বৃটিশ স্বার্থবাহী লোকদের পুজো করে গেছেন। হাইণ্ডম্যান, ডঃ রিচার্ড কনগ্রিভ, হার্বাট স্পেনসার প্রমুখ প্রকৃত ভারত প্রেমীরা তাঁদের কাছে ছিলেন অবজ্ঞাত।

পাদটীকা ঃ

(১) ১৯০৫, ৪ ঠা আগষ্ট প্রকাশিত 'India' পত্রিকায় শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার দেওয়া পরিসংখ্যান (অর্থাৎ ইংরেজরা যে প্রতিবছর ভারতবর্ষ থেকে গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডের জনসংখ্যার সমতুল স্টার্লিং পাউন্ড নিয়ে যায়) সম্পর্কে তীব্র আপত্তি জানানো হয়। এর প্রতিবাদে জনৈক ভারতীয় স্বরাজপন্থী রিফর্মপ্রেস ১ ও ২ নং টুকস্ কোর্ট, চ্যান্সেরী লেন, লন্ডন, ই.সি. থেকে British Rule and our Friend 'India' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। গ্রন্থকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মুখপত্র 'India'র প্রতিবেদন নস্যাৎ করে বিস্তৃত পরিসংখ্যানের সঙ্গে প্রমাণ করেন যে মাথাপিছু এক পাউণ্ড নয়, পরিমাণ আরও অনেক বেশী — মাথা পিছু ১৫ (পনের) পাউণ্ডের সমতুল। কৃষ্ণবর্মা তাঁর পত্রিকায় উক্ত পুস্তিকার লেখককে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন।

(২) "X X, Resolved that a sum of Rs 60,000 be assigned for the expenses of the British Committe and the cost of the Congress publication 'India' and that the several circles do coutribute as arranged either now or here after in the committe, for the year 1894" – S. R. Bakshi -- Indian Freedom Fights – Struggle for Independence. Anmol Publication, New Delhi, 1990, P 120.

নিষ্ক্রমণ

মানবেন্দ্র পাল

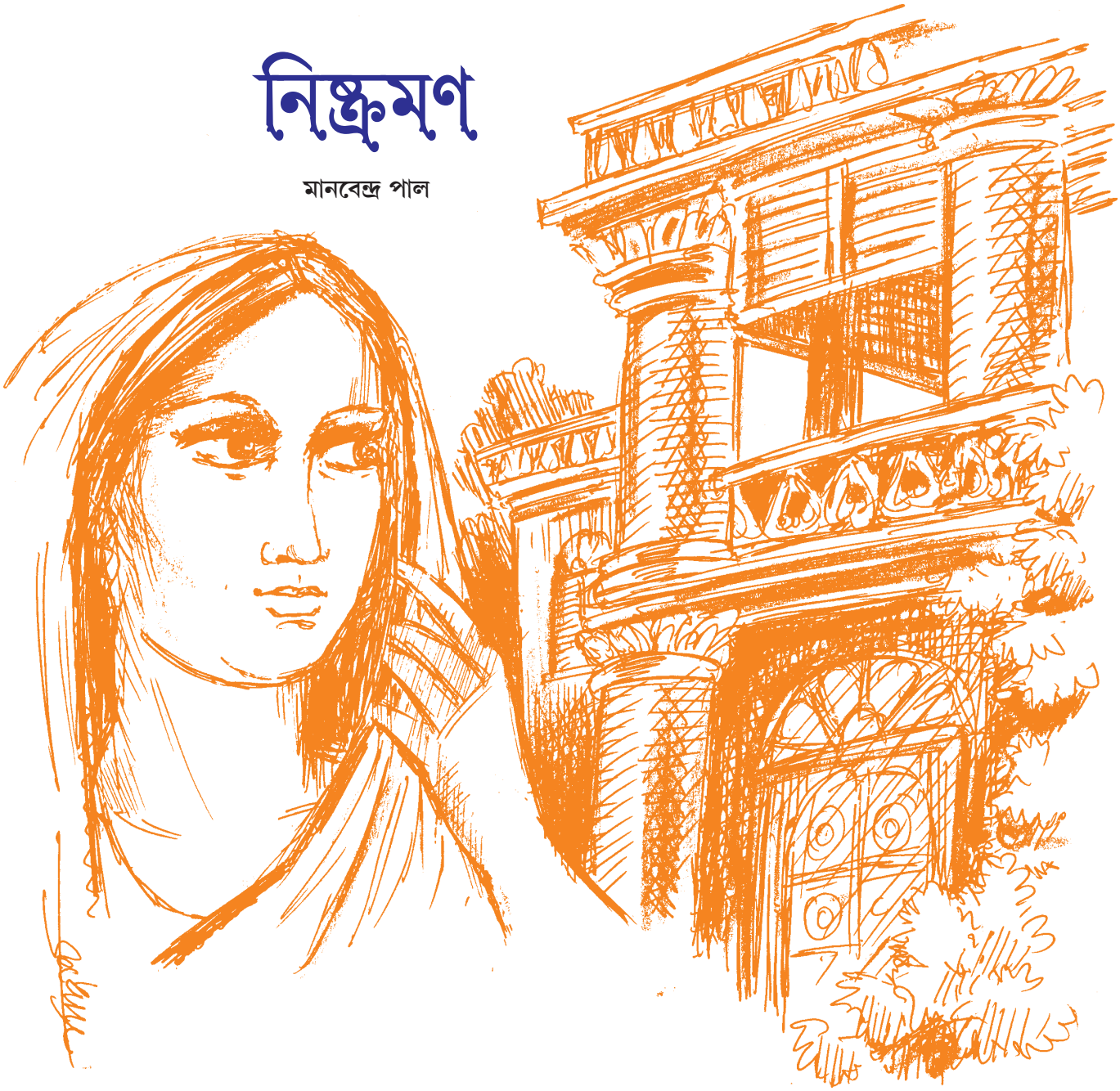

যুগ বদলে গেছে।

এখন আর পুরনো জিনিসের কদর নেই। মমতা আর আগ্রহ যদি না থাকে তাহলে কদর থাকবে কি করে? কথাটা প্রযোজ্য বিশেষ করে পুরনো বড়ো বড়ো অয়েলপেন্টিংগুলি সম্পর্কে। এক সময়ে বহুকাল ধরে এই রকম অনেকগুলো ছবি টাঙানো ছিল একতলার বৈঠকখানা ঘরে। উদ্দেশ্য ছিল সে সময়ে যেসব বড়ো বড়ো লোক এবাড়িতে আসতেন, তাঁরা যাতে ছবিগুলো দেখতে পান। শুধু দেখাই নয়, এই পরিবারের পূর্বপুরুষদের পরিচয়ও জানতে পারেন। পরিচয় জানার অসুবিধাও কিছু রাখেননি চৌধুরী পরিবারের উত্তরপুরুষেরা। ছবির নীচে নাম লেখা থাকত চাইনিজ ইংকে বড়ো বড়ো অক্ষরে।

তারপর একে একে চলে গেল প্রাচীন মানুষেরা। শেষ পর্যন্ত এ বাড়ির বড়ো তরফের বউ-এর শ্বশুর মৃগাঙ্কমৌলী চৌধুরী যতদিন বেঁচে ছিলেন ছবিগুলো টাঙানো ছিল বাইরের ঘরেই। আগে প্রতিদিন ছবিগুলো মোছা হত। সন্ধ্যায় নিজেই ধূপ, ধুনো দিতেন। প্রণাম করতেন ভক্তি সহকারে। তিনি জীবিত থাকাকালীন একেবারে শেষ দিকে রোজ আর ধূপ-গঙ্গাজল দেওয়া হত না। তাঁর মৃত্যুর পর ভাইদের ছেলেরা এসে বড়ো জ্যাঠাইমা সুমিত্রামাকে বলল— বড়ো মা, বাইরে ঘরটা বড্ড জবরজঙ্গল হয়ে আছে। একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলে ভালো হয় না?

সুমিত্রা মা মুহূর্তে দেওরপো-দের মতলব বুঝে ফেললেন। গম্ভীরভাবে বললেন— কি করতে চাও?

ওরা বলল— আগে ছবিগুলো সরাতে হবে। তারপর দেওয়ালগুলো ডিসটেম্পার করে ভালো ভালো বিলিতি ল্যাণ্ডিস্কেপ টাঙিয়ে দেব। তা হলেই ঘরের ছিরি ফিরে যাবে। তারপর....

কথা কেটে দিয়ে সুমিত্রা মা বললেন— বুঝলাম, তা ছবিগুলো থাকবে কোথায়?

— সেটাই তো ভাবছি। দু-বছর আগে কলকাতা থেকে যখন পুরনো কালের ছবি ব্যবসায়ীরা খুঁজে খুঁজে এবাড়িতে এসে পাঁচখানা ছবি কিনতে চেয়েছিল, বড়ো জ্যাঠামশাই লাঠি হাতে তেড়ে গিয়েছিলেন। তারা হেজিপেজি কাস্টমার নয়, কলকাতার পার্কস্ট্রীটের বড়ো ব্যবসায়ী। প্রচুর টাকা, প্রচুর নাম ডাক। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোয়। এত বড়ো অপমান মুখ বুজে সহ্য করে ফিরে গেল। ছিঃ!

একটু থেমে বলল— ভালো টাকা দাম পাওয়া যেত গো বড়ো মা। তোমরাও তো একটা অংশ পেতে।

সুমিত্রা মা সে আক্ষেপে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে শান্ত গলায় বললেন— ছবিগুলো রাখা হবে কোথায়?

মেজো দেওরের ছেলে ইন্দ্র বলল— দেখি, আমি একবার কলকাতায় যাব। যদি পার্ক স্ট্রীটে দোকানটার খোঁজ পাই — মুশকিল হয়েছে কলকাতা যাওয়া তো মুখের কথা নয়। ট্রেন ভাড়া, বাসভাড়া-রাহাখরচ।

সুমিত্রা বললেন, তার জন্যে ভেবো না। ছবি বিক্রি হলে তা থেকে ওসব খরচ দিয়ে দেওয়া হবে।

ইন্দ্র বলল, তুমি তো বলছ 'দেওয়া হবে' কিন্তু ছোটো তরফ বলছ্বেন্তুব্ধত্রপ্ত খরচটুকুই দেওয়া হবে। তা কি সম্ভব বড় মা? দু-কাপ চায়ের বদলে তিনি কাপ খেতে হয়, কিম্বা অন্যসব খুচখাচ খরচ - তা কি এত বাঁধাবাঁধির মধ্যে করা সম্ভব?

সুমিত্রা বললেন — ও নিয়ে ভেব না, আমার কাছে বিল এলে পাস করে দেব।

এতটা আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও ওরা যেন নিশ্চিন্ত হল না। ইতস্তত করে বলল — তোমার কথা কি ছোটো তরফ মানবে?

এটাই সার সত্য। 'সুমিত্রা মা' থমকে গেলেন। শুধু ছোট তরফ কেন ইন্দ্র.... দেবেনরাই কি তাঁকে মান্য করে? সুমিত্রা মা খুব বেশি লেখাপড়া না জানলেও নির্বোধ নন। ভাগ্যের ফেরে তাঁকে নেমে আসতে হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গের এই অখ্যাত অঞ্চলের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে। বৃহৎ পরিবারে এক-একটি তরফের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে কতরকম স্বার্থ বিষধর সাপের মতো খেলা করছে তা তিনি জানেন। আর জানেন বলেই এই বিরাট প্রাচীন প্রাসাদের দোতলার একপ্রান্তে তিনি একরকম নির্বাসিত হয়ে আছেন। কেউ তাঁর খবর রাখতে চান না। তিনিও চান না। তিনি একা দুটি ঘর নিয়ে থাকেন। একমাত্র কথা বলার মানুষ কাজের মেয়ে জয়া।

'সুমিত্রা মা' ডাকটি এখন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। সুমিত্রা যখন বিয়ের পর এ বাড়িতে প্রথম আসেন তখন এক জন বুড়ো নায়েব এ বাড়িতে ছিলেন। তিনিই আদর করে কন্যা সম বৌমাকে 'সুমিত্রা মা' বলে ডাকতেন।

পরিবারের সকলের চোখ টাটানোর দুটি কারণ ছিল। এক - 'সুমিত্রা' মা ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী! শোনা যায় ছোটবেলায় নাটোরে ঘোড়ার গাড়ি করে ইস্কুলে যাবার সময়ে এক সতর্ক দারোগা ইংরেজ বালিকা অপহরণ সন্দেহে গাড়ি থামিয়ে জেরা করেছিল। সঙ্গের লোকটি ইস্কুলের খাতাপত্র, ইস্কুলের নাম, মেয়ের নাম দেখিয়ে তবে রেহাই পান।

দুই - এ বাড়িতে বউ হয়ে আসার পর অনেক দিন পর্যন্ত চালে-চলনে, আচার-আচরণে, কথায়-বার্তায় তিনি বুঝিয়ে দিতেন এ পরিবারে বড়ো বৌ করে এনে চৌধুরী পরিবার তাঁকে ধন্য করেনি। কেননা, কোনো অংশে তিনি এ বাড়ির কারও চেয়ে কম ছিলেন না।

কিন্তু অপরপক্ষে তাঁর কোনও সন্তান না হওয়ায় যেমন ধিক্কৃতা হয়েছিলেন তেমনি অকাল বৈধব্যের অপরাধ বিনা দোষে তাঁকেই মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছিল। আবার বিধবা হবার পর তিনি যখন দুঃখে, লজ্জায়, বাড়ির সকলের নিদারুণ নিপীড়নে একঘরে হয়ে পড়েছিলেন তখন না ডাকতেই তাঁর এক খুড়তুতো দাদার ছেলে এসে হাজির হয়েছিল। তারই পরামর্শে সুমিত্রা তাঁর নগদ টাকা, গয়না ইত্যাদি নিয়ে ভাইপোর কাছে চলে যান। কারও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। তখন তাঁর বয়েস তিরিশ ঘেঁষা।

ভাইপো পরামর্শ দিয়েছিল টাকা না খাটালে সঞ্চিত অর্থ নাশ হয়ে যায়। আর বুদ্ধি করে খাটালে টাকা বেড়ে যায়। তবে বুদ্ধি তো সবার থাকে না। শংকরনাথ হেসে বলেছিল — পিসি, আমার কি সেরকম বুদ্ধি নেই? তুমি কী বলো।

এই সময়ে এখানকার অনেকেই এহা ভাবে বড়োই হতাশ হয়েছিল। রাগও হয়েছিল। উট্‌কো কোনও এক ভাইপোর সঙ্গে চলে যাওয়া — এই যাওয়াটার পরিণতি তাঁর জীবনে একটা মস্ত ভুল। অনেক কিছুই হারাতে হয়েছিল। তবে তার জন্য তাঁকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না।

যাই হোক, ও কথা পরে।

বিয়ের পর কয়েক বছর মনে পরিপূর্ণ তৃপ্তি না থাকলেও এই যৌথ পরিবারের 'উপল ব্যথিত' কন্টকাকীর্ণ পথে তিনি স্বর্ণধবজ রথ ছুটিয়েছেন দিনের পর দিন। তারপর একদিন হুমড়ি খেয়ে পড়লেন যেদিন তাঁর রথচক্র বিরূপ ভাগ্যের কোপে মেদিনীগ্রাস করল।

এখানে তাঁর স্বামীর কথা বলে নেওয়া যাক। স্বামীর নাম দেবকুমার। এই পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ। তাই বড়ো তরফ। দেখতে ছিলেন রূপবান। তাঁর এই রূপেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেদিনের নাটোর তনয়া সুমিত্রা। কিন্তু তখনও তিনি অনেক কিছুই জানতেন না। জানা সম্ভবও ছিল না।

এ বাড়িতে বউ হয়ে এসে সুমিত্রা দেখে অবাক হয়েছিলেন যে তাঁর তরুণ স্বামীটি কখনও প্রকাশ্যে খালিগা হন না। এমন কি প্রচণ্ড গরমেও বিছানায় শোবেন অন্তত একটা গেঞ্জি চড়িয়ে। আরও আশ্চর্যের কথা সারা দিন বাড়িতে বসে থাকবেন শান্তিপুরী ধুতি আর ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে।

সুমিত্রা কতদিন বলেছেন — অন্তত বিকেলে একটু বেরোও। দেবকুমার হেসে বলেছেন — কোথায় যাব?

সুমিত্রা বলেছেন — যেখানে ইচ্ছে। কিছু না হোক গঙ্গার ধারে। দেবকুমার বলেছেন — বেশ তুমিও চলো।

সুমিত্রা মৃদু ধমক দিয়ে বলেছেন — পাগল! চৌধুরী বাড়ির বউ। এমন মুখখানি রাস্তার লোক দেখে ফেলবে তা আবার হয় নাকি?

— তবে তুমি এই জানলার ধারে এসে বোসো। পুরুষের এ রকম ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় থাকে না। লুব্ধ মনে সেই পড়ন্ত বেলায় জানলার কপাটে নিজেকে রাস্তার লোকের চাউনি থেকে আড়াল করে সুমিত্রা বসেছেন স্বামীর গা ঘেঁসে। সুমিত্রা অতি ধীরে আর সংকোচে তাঁর হাত খানি নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিয়েছিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। পিছনের বাগানে শেয়াল ডেকে ওঠে। এই সময়ে দোতলার এই কোনের ঘরে তৃতীয় কোনো জনের আসার সম্ভাবনা নেই। নিশ্চিন্ত অবকাশ, দুজনের করতল নিঃশব্দেই ঘেমে ওঠে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

শেষে এক বুক বিরক্তি আর ক্ষোভ নিয়ে সুমিত্রা স্বামীর হাতটা সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

— চলে যাচ্ছ?

— হ্যাঁ, এখানে বেকার বসে থেকে কী করব? সন্ধ্যে দিতে হবে। যাই।

বলেই বাইরের বারান্দায় পা রাখলেন। দেবকুমার বললেন — খুব অন্ধকার। সাবধানে নেমো। নাকি নীচে পৌঁছে দেব?

অন্ধকারে ভয় দেখাচ্ছ? অন্ধকারের দাম তুমি কি কখনও বুঝতে পেরেছ?

সুমিত্রা সেদিন নিজের বিড়ম্বিত ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে মনে মনে বলেছিলেন হায়রে কপাল! জীবনে এমন নিশ্চিন্ত অন্ধকার কত দিন পাওয়া যায়?

— তুমি যেতে পারবে তো? বিছানায় আধ শোওয়া হয়েই দেবকুমার জিজ্ঞেস করেছিল।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব পারব। তোমাকে আর কষ্ট করে বিছানা থেকে অন্ধকারে নামতে হবে না।

ইচ্ছে করেই 'অন্ধকার' কথাটায় জোর দিয়েছিলেন সুমিত্রা।

তাঁর বিবাহিত জীবনের একদম প্রথম দিকে তরুণ স্বামীর এইরকম ছিল ভূমিকা।

এর দু বছরের মধ্যেই দেবকুমার আক্রান্ত হলেন দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে। তখনকার দিনে এই রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না। এই রোগ ধরলেই মৃত্যু অনিবার্য। এ রোগ যেমন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসত তেমনি ছিল সাংঘাতিক সংক্রামক। বাড়ির লোকে বড়ো একটা রুগীর সেবা শুশ্রূষা করতে এগিয়ে আসত না। এরকম রুগীকে পত্রপাঠ বাড়ির বাইরে আলাদা কোথাও রাখতে হত।

স্বামীর শরীরে এই মারণ রোগের একে একে সব লক্ষণগুলি দেখা দিলে সুমিত্রা দেওয়ালে মাথা কুটলেন। বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে গৃহদেবতা হরপার্বতীর মন্দিরে গিয়ে হত্যে দিলেন। কিন্তু কিছুতেই রোগের কথা চেপে রাখা গেল না। অন্য তরফের শরিকরা তাড়া করে এল। অভিভাবকহীন সুমিত্রাকে তাড়াবার যেন একটা শক্তপোক্ত উপলক্ষ পেল। তারা বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেবকুমারকে বাড়ি থেকে সরাও। এক জনের জন্য বাড়িসুদ্ধ সকলে মরতে পারে না।

সুমিত্রা যখন জানতে চাইলো কোথায় সরাবে, যেখানেই সরানো হোক, এইরকম রুগীকে নিয়ে নতুন জায়গায় একা থাকা সম্ভব নয়। তখন বাড়ির লোকে পরামর্শ দিল বাড়ির গোয়াল ঘরের পাশে। একটা পুরনো খামার বাড়ি আছে। সেখানেই রাখা হোক।

প্রস্তাবটা শুনে আঁৎকে ওঠার মতো অবস্থা হলেও এই রকম ব্যবস্থাই তখন প্রচলিত ছিল। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেই বাড়ির কাছাকাছি কোনো পরিত্যক্ত জায়গায় চিরনির্বাসন।

সেখানে প্রতিদিনের জন্য একজন জমাদারের ব্যবস্থা রাখা হত। ডাক্তারের করার কিছুই ছিল না। তবু সপ্তাহে একদিন মোটা টাকা ভিজিটে শুধু চোখের দেখা দেখে যেতেন। ছাগলের গন্ধ এই রোগের নাকি প্রতিষেধক, তাই রুগীর ঘরে দু-তিনটে ছাগল বেঁধে রাখা হত।

সুমিত্রা এ সবই জানতেন। জানতেন বলেই এ প্রস্তাবে রাজি হননি। এই নিয়ে চরম অশান্তির মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। বাড়ির অন্যেরা বলেছিল — খামার বাড়িতে না পাঠালে এই দূষিত রুগীকে দেখবে কে?

সুমিত্রা বলেছিলেন — স্বামীর রোগশয্যায় স্ত্রী ছাড়া দেখবার কে থাকতে পারে?

মেজো তরফ, ছোটো তরফ বলেছিল — কিন্তু তুমি এই রুগীর পরিচর্যা করতে পারবে?

সুমিত্রা বলেছিল — স্ত্রী ছাড়া বেশি যত্নে কে সেবা করতে পারবে? এটা আমার ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হোক।

তাঁরা সাবধান করে দিয়ে বললেন — জান তো এটা সংক্রামক ব্যাধি। এ রোগ তোমাকেও ধরতে পারে। ধরতে পারে কেন ধরবেই।

সুমিত্রা ধীর গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন — স্বামীই যদি চলে যায় তা হলে অখণ্ড পরমায়ু পেয়েই বা স্ত্রীর কী লাভ?

ওরা হার মেনে চলে গিয়েছিলেন। এরপর সুমিত্রা তাঁর রোগজীর্ণ মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীকে নিয়ে আরও কঠোরভাবে আলাদা হয়ে থাকতে লাগলেন। একতলার বা দোতলার অন্য কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেন না। জমাদারের আসা-যাওয়ার জন্যে আলাদা করে লোহার সিঁড়ি বানিয়ে দিলেন।

এদিকে সুমিত্রার বন্ধ দরজার বাইরে কান পেতে রইল তাঁর দেওররা। কখন এ ঘরের মানুষটির কাশির শব্দ আর শুনতে পাওয়া যাবে না। দেবকুমার চোখ বুজলেই অসহায় সুমিত্রার সম্পত্তি তারাই গ্রাস করে নেবে।

দু বছর ভোগান্তির পর সুমিত্রার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়ে দেবকুমার প্রস্থান করলেন। এ মৃত্যুর জন্যে সুমিত্রা প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ভাবনা ছিল তাঁর একদল হিংস্র স্বার্থসর্বস্ব ভয়ানক শ্বাপদ সংকুল সংসারে একা নিজেকে নিয়ে। সেই পূর্ণ যৌবনকালে তাঁকে লক্ষ্য করে এই বিরাট পরিবারের অলিগলি থেকে অনেকগুলো কুৎসিত হাত তাঁকে চেপে ধরার জন্যে এগিয়ে আসছিল। যথেষ্ট সতর্কভাবে তাঁকে চলতে হচ্ছিল। কিন্তু এভাবে কত দিন পারবেন?

একমাত্র উপায় এ সংসার থেকে চলে যাওয়ার কিন্তু কোথায় যাবেন? নিজের বলতে তেমন কেউ নেই।

তাঁর বৈধব্যের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে প্রথম যে সান্ত্বনার চিঠিটি এসে পৌঁছেছিল সেটি পেয়ে তিনি পরম তৃপ্তি পেয়েছিলেন। চিঠিটি লিখেছিল তাঁর এক বাল্যবন্ধু রঘু। এতদিন পর তাঁকে মনে করে রঘু যে এই দুঃসময়ে সান্ত্বনাপত্র পাঠাতে পারে সুমিত্রা তা ভাবতে

পারেননি। রঘু তা হলে এখনও তাঁকে ভোলেনি। রঘু দুটি কথাই লিখেছিল, "সুমি বৈধব্য ভগবানের বিধান। সেটা মেনে নিতেই হয়। কিন্তু এরপর তোকে নিয়ে তোর স্বপ্নের 'বিরাট' পরিবারের মধ্যেই যা ঘটবে তা ভেবে শিউরে উঠছি। তোর মনে আছে বোধ হয় এইসব সেকেলে জমিদারি 'বিরাট' পরিবারে বিয়ে করলে ফল যে ভালো হয় না — তা বলে সাবধান করে দিয়েছিলাম। তুই শুনিসনি। বুদ্ধিমতীর মতো এখন সাবধানে সব রকম বিপদ কাটিয়ে ওঠ্ এই কামনা করি।"

সে আমলের বড়ো বড়ো অয়েলপেন্টিংগুলো সবই বেচে দিতে চেয়েছিল দেওরের ছেলেরা। সুমিত্রা আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন — এসব জিনিসের দাম অনেক। টাকা দিয়ে তা মাপা যায় না। কিন্তু ইন্দ্ররা এসব বুঝতে চায়নি। তাদের মোটা রকম ক্যাশ টাকা দরকার। কিন্তু বাধা দিল ঐ সুমিত্রা ভদ্রমহিলাটি। তবু যখন তারা সুমিত্রাকে প্রস্তাব দিয়েছিল যে কোনো একখানি ছবি বেছে নাও। দাম দিতে হবে না। বাকিগুলো নিয়ে আমরা যা হয় করব।

সুমিত্রা আর ঘাঁটাতে চাননি।

তিনি শুধু শ্বশুরমশাই-এর ছবিখানি চেয়ে বাকি ছবিগুলোর অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ছবিখানি তিনি তেতলার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। শ্বশুড়বাড়িতে একমাত্র এই মানুষটিই ছিল তাঁর প্রকৃত আপনার জন। নিজের বাবার অভাব বুঝতে দেননি।

স্বামীর মৃত্যুর পর যখন একাকীত্ব তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠত তখন উঠে যেতেন তেতলার ঘরে। গিয়ে দাঁড়াতেন ছবিখানির নীচে। তখন তাঁর কত কথাই না মনে পড়ত।

মনে পড়ত দিনের আলোর মতো কী রোশনাই আর ইংরিজি ব্যাণ্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে চৌধুরী বাড়ির সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকেছিল হুডখোলা গাড়িখানা! সেই গাড়িতে সোনার মুকুট পরে রাজরাণীর মতো ঢুলুঢুলু চোখে বসেছিলেন তিনি। পাশে দেবতুল্য দেবকুমার। শোভাযাত্রার প্রথমেই ছিল গ্যাস বাতির গেট। দু'ধারে ছিল গ্যাসবাতির মই। সারা পথ বাজি পোড়ানো হয়েছিল। মনে আছে একটা তুবড়ির ঝাড় এত উঁচুতে উঠেছিল যে তিনতলার ছাদের শামিয়ানায় আগুন ধরে গিয়েছিল। সে এক কাণ্ড। বাড়ির ছোটো তরফের মুখভার হয়ে গিয়েছিল। ঠোঁট মুচড়ে বলাবলি করেছিল এ কোন্ অপয়া বউ এল সংসার জ্বালাতে!

দুঃসময়ের সেই শুরু। তখনই বুকের অফুরন্ত স্নেহ দিয়ে আগলে রেখেছিলেন শ্বশুরমশাই মৃগাঙ্কমৌলী চৌধুরী। এরপর শুধুই গ্লানি — শুধুই নিন্দা। এই সংসারে এমন বড়ো বউ এল যে বাঁজা। বিয়ে হয়ে আসতেই বাবা মা দুজনকেই হারালো। এমন বউ এল যে বাড়ির বড়ো ছেলেটাকেই খেল! তবু বড়লোকের বেটির দেমাক যায় না! কথায় কথায় টাকা দেখানো! দেখা যাবে টাকা কোথায় থাকে! সেই হল শত্রুতার শুরু।

তিন তলার ঘরে শ্বশুর মশাইয়ের ছবির নীচে দাঁড়িয়ে এইসব কথা খুব মনে পড়ে সুমিত্রামার। দু চোখ জলে ভরে ওঠে। এরপর স্বামীও চলে গেল। আপন বলতে কেউ আর রইল না।

তবু এখনও নীচের মহলে যেতেন। একা একা ঘরে কতক্ষণ ভালো লাগে! দোতলায় ফুলের টব সাজানো টানা বারান্দা দিয়ে যেতেন পর্দা ফেলা ঘরগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে। যদি কেউ তাঁকে দেখতে পেয়ে ডাকে। কিন্তু ডাকত না। তারা হয় তো মনে করত অশুভ ছায়া নিয়ে হিংস্র দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে চলেছে এ বাড়ির অপদার্থ বড় বউ। এমন কী তাঁর পায়ের শব্দ পেলে ঘরের ভেতরে যারা গুনগুন করে শলাপরামর্শ করছিল তারা চুপ করে যেত। বড়ো দুঃখ পেতেন সুমিত্রা মা। চুপচাপ ফিরে আসতেন নিজের ঘরে।

একদিন জয়া এসে চুপিচুপি বলল, আমি কিন্তু ভালো বুঝছি না বউদিদি। সুমিত্রা সরল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন।

— এ বাড়ির সকলে এক জোট হয়ে তোমাকে পথে বসাবার শলাপরামর্শ করছে।

— পথে বসাবে আমাকে! কি করে? এ কি মগের মুলুক!

জয়া বলল — তা জানিনা। তবে আমি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছি।

অবিশ্বাসের সুরে সুমিত্রা বলেছিলেন — তা তুই কী করতে বলিস?

— তুমি এখান থেকে পালাও। অবাক হয়ে সুমিত্রা বলেছিলেন - স্বামী শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে কোথায় পালাব? কেনই বা পালব? তাছাড়া মনে রাখিস আমি এ বাড়ির পর্দানসীন বউ।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জয়া বলেছিল — সবই বুঝি বৌদি। এও জানি চৌধুরী বাড়ির বড় বউ তুমি। রাস্তার লোক তোমার মুখ দেখেনি। তুমিও দেখনি। তবু বলছি। না পালালে ওরা তোমাকে প্রাণেও মারতে পারে।

কথাটা শুনে সুমিত্রা যদিও মুখে হেসেছিলেন কিন্তু কপালের ভাঁজ লুকোতে পারেননি।

হয়তো অহেতুক ভয়। তবু এই সংশয়ের মুহূর্তে এমন একজনও নির্ভরযোগ্য কেউ নেই যার সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। তাঁর আবার মনে হল তিনি এখন বড়োই একা।

কয়েকদিন পর একদিন নির্জন দুপুরে সুমিত্রা মা রাস্তার দিকের জানলার খড়খড়ি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। দেখলেন একটা ঘোড়ার গাড়ি ঘন্টা বাজিয়ে সিংদরজা থেকে বেরিয়ে গেল।

এই অসময়ে কার গাড়ি এসেছিল? কার কাছে এসেছিল? কেন এসেছিল? কেমন যেন ভয় পেয়েছিলেন।

তিনি তখনই পাশের ঘর থেকে জয়াকে ডেকে আনলেন। বললেন - ঘোড়ার গাড়ি করে কে এসেছিল জানিস?

জয়া বলল — জানি না তো। আমি শুয়েছিলাম।

— তা হলে? সুমিত্রা যেন নিজের মনেই প্রশ্ন করলেন।

— দাঁড়াও। খবর নিচ্ছি। বলেই জয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আধঘন্টা পরে ফিরে এসে বলল — ভালো বুঝছি না বৌদিদি।

— কেন?

— উকিল এসেছিল ছোটো কর্তার কাছে।

— উকিল! চমকে উঠেছিলেন সুমিত্রা।

— হ্যাঁ ছোটো কর্তা না কি বাড়ির কাগজপত্র দেখাচ্ছিলেন।

— সে কী! কেন? আমায় তো কেউ কোনো কথা বলেনি।

— বললে তো চুকেই যেত। তবে একটা কথা বলে রাখছি। কেউ কোনো কাগজে সই করাতে এলেই খসখস করে সই দিয়ে দিও না।

— তুই আমায় এতই বোকা পেয়েছিস নাকি? জানিস আমিও বড় বাড়ির মেয়ে। দলিল পর্চা অনেক কিছুই জানি। বলে হাসতে লাগলেন।

জয়াও হেসেছিল। তবে মনে মনে। মনে মনেই বলেছিল হ্যাঁ গো বৌদিদি, তুমি যে খুব সেয়ানা তা জানি। সেয়ানা না হলে ক'দিন আগে ছোটো তরফের রাণী বৌদির মুখের কথাতেই বাড়ি ভাগাভাগির ব্যাপারে সাদা কাগজে তুমিই আগ বাড়িয়ে সই করতে গিয়েছিল? ভাগ্যি সে সময়ে তোমার দেশের সেই ছেলেটা এসে পড়েছিল!

সেও এক কাণ্ড!

বেলা তখন দুটো কি আড়াইটে। হঠাৎ নীচে গোলমাল। দারোয়ান চেঁচামেচি করছে-চোর-চোর। ডাকু-পাকড়াও।

কিন্তু পাকড়াবে কাকে? চোরই হোক আর ডাকাতই হোক সে তো ছুটতে ছুটতে সোজা ওপরে।

— ও পিসি! কোথায় তুমি? বাঁচাও! আর পিসি! নির্জন দুপুরে ভদ্রলোকের বেশে। এক ভয়ংকর ডাকাত ঢুকে পড়েছে। বিপদ বুঝে এখন পিসি মাসি করছে। এ বাড়িতে অনেক মহিলা আছেন। কিন্তু কোনো 'মাসি' 'পিসি' নেই।

চেঁচামেচিতে তখন মেজো তরফ, সেজো তরফ সকলেই দুপুরের আরামের ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। এত বড়ো সাহস — দিন দুপুরে চৌধুরী বাড়িতে ডাকাতি। হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল — লাঠি, বল্লম, সড়কি-

লাঠি, বল্লম না হয় বোঝা গেলো। কিন্তু সড়কি চালাবে কে? তবু বিপদে পড়ে ডাকাতদের ভয় দেখাবার জন্যে হাঁকড়াতে হয়।

'সুমিত্রা-মা' বিছানায় শুয়ে শুয়ে মাসিক বসুমতীতে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাসটি মন দিয়ে পড়ছিলেন। এ পরিবারে কোনো মাসিক সাহিত্যপত্র ঢোকে না। বসুমতীর নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন দেবকুমার। তাঁরই সংগ্রহে ছিল বসুমতীর এই সংখ্যাটি।

এমন সময়ে দোতলার বারান্দায় 'পিসি' 'পিসি' বলে আর্তস্বরে ডাক শুনে বললেন, জয়া, দ্যাখ তো কী হয়েছে।

জয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে উঠতে বলল — বোধ হয় চোর-ডাকাত ঢুকেছে।

সুমিত্রা ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন — দিন-দুপুরে চোর-ডাকাত! তুই উঠে গিয়ে দেখবি কিনা বল্। আচ্ছা, চল আমিও যাচ্ছি।

দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ল চবিবশ-পঁচিশ বছরের একটি ছোকরা। তার চুলের মুঠি ধরে আছে ইন্দ্র। হাঁকড়ালো — "বল কে তোর পিসি! কেমন পিসি!"

"পিসি গো, বাঁচাও!" ছোকরাটি 'সুমিত্রা'-মার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

সুমিত্রা চিনতে পারলেন তাঁরই দূর সম্পর্কের ভাইপোকে। বললেন — শংকর, ওঠো! এ কী কাণ্ড করেছ! তুমি হঠাৎ এখানে।

শংকরনাথ বলতে লাগল - তোমার বউমা বললে, "পিসির বাড়ি যাও। দু-দিন ঘুরে এসো। পিসেমশাই গত হওয়ার পর তো একবারও খবর নেওয়া হয়নি। আমরা তো আর পর নই। দরকার হলে কিছুদিনের জন্যে পিসিকে নিয়ে আসবে"। এখন ভাবছি না এলেই হতো। শেষ পর্যন্ত মার খেতে হল।

সুমিত্রা বলেছিলেন — দোষ তো তোমারই। বলা নেই কওয়া নেই হুট্ করে এসে পড়লেই হল! ভুলে গেছ নাকি এটা চৌধুরীবাড়ি। এ বাড়ির মেয়েরা এ যুগেও কেউ বেরোতে পারে না। বাইরের লোক তো চট করে ঢুকতেই পারে না।

— আমি তো এতটা ভাবিনি পিসি।

— তোমার উচিত ছিল চিঠি দিয়ে আসা। তা হলেই দেখতে তোমার খাতিরের ঘটা। বাড়িতে তিনটে ঘোড়ার গাড়ি। মিঞাজানকে বলে দিতাম সে স্টেশনে গাড়ি নিয়ে যেত। সঙ্গে যেত চাপরাশি।

— ও তা হলে এতটা পথ হেঁটে আসতে হত না।

— তুমি কি হেঁটে এসেছ?

— তা নয়তো কী। ঘোড়ার গাড়ি এক টাকা ভাড়া চেয়ে বসত।

— একটাকা ভাড়ার জন্য তুমি এই দুপুরে এক পা ধুলো নিয়ে হেঁটে চৌধুরী বাড়িতে পিসির কাছে এলে? ছিঃ। তাও শুধু হাতে!

— সরি ভেরি সরি পিসি। এ বারের মতো মাপ করে দাও।

— বড়ো গিন্নির বাপের বাড়ির কুটুম। নাও এখন যত্ন-আত্তি করে পুরো বাড়ির মুখ রক্ষা করো বলে যারা ধাওয়া করে ওপরে উঠে এসেছিল — ঠোঁট মুচড়ে হেসে তারা নেমে গেল। এক-একটি মুখ আছে যা দেখলেই কেমন একটা রাগ-বিদ্বেষ জেগে ওঠে। তাদের যেন কিছুতেই সহ্য করা যায় না। শংকরনাথ এই রকমের মানুষ। বয়েস বছর পঁচিশ। চনমনে চেহারা। সরু গোঁফ কটা রঙের। চোখের মণি কটা। দৃষ্টি যেন ছোটাছুটি করছে।

এ বাড়িতে এসে পর্যন্ত ঠোঁটদুটো ছুঁচোর মতো করে দোতলা-একতলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সর্বত্র যেন ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে।

শেষে একদিন বলল — পিসি, তোমার সামনে এখন সমূহ বিপদ, সব তরফই ষড়যন্ত্র করেছে তোমাকে এখান থেকে 'হুটআউট' করে তোমার বাড়ির অংশ দখল করে নেবার।

এ ধরনের কথা সুমিত্রা আগেই শুনেছেন। তাই বিশেষ বিচলিত হলেন না। শুধু বললেন — এতই সহজ? দেশে আইনকানুন নেই?

শংকরনাথ বাঁকা হাসি হেসে বলল, সবই আছে। কিন্তু তা যারা আইনের প্যাঁচ-পয়জার বোঝে তাদের জন্যে। তোমার মতো সাদা সরল ভালোমানুষ 'গার্জেনলেস' অনাথদের বাঁচাবার জন্য নয়।

সুমিত্রার ভুরু দুটো বেঁকে উঠেছিল। বলেছিলেন 'গার্জেনলেস' মানে?

— মানে খুবই সোজা। শুনেছি তোমার শ্বশুরমশাই তোমায় আগলে রাখতেন। তাছাড়া তোমার স্বামী যতদিন ছিলেন ততদিন কেউ 'ট্যাফু' করতে পারেনি। এখন সেই অভিভাবকরা নেই। তুমি প্র্যাক্‌টিকালি একা। অথচ প্রচুর বিষয়সম্পত্তি — সেটা তোমায় এরা নিশ্চিন্তে ভোগ করতে দেবে ভেবেছ?

একটু থেমে বলল — তুমি জান না, কিন্তু ক'দিন এসেই আমি জেনে ফেলেছি কত রকমের চক্রান্ত চলছে তোমার বিরুদ্ধে। তোমার বিষয় সম্পত্তি কিভাবে হাতানো যায় তার পরামর্শ দেবার জন্যে বাড়িতে উকিল পর্যন্ত এসেছিল। তাকে পঞ্চাশ টাকা ফি গুনে গুনে দেওয়া হয়েছে।

জয়া ঘরে ছিল। সেও শুনল সব কথা। আশ্চর্য, এরই মধ্যে ছোঁড়াটা উকিলকে কত টাকা ফি দেওয়া হয়েছে তাও জেনে নিয়েছে!

একটু থেমে শংকরনাথ বলল — সেদিন সাদা কাগজে তোমাকে সই করাবার জন্য মেজো তরফের ছোটো গিন্নি হাসি মুখে এসেছিল, কিন্তু পারেনি। সই করে ফেললে তোমার সর্বনাশ এক লাফে অনেকটা এগিয়ে আসত। ভাগ্যি সেই সময়েই আমি এসে পড়েছিলাম। হু। যাক ঠাকুরের দয়ায় খুব বেঁচে গেছ। কিন্তু ওরা থেমে নাই। এবার সই নকল করার এক্সপার্ট আনছে।

সুমিত্রা চমকে উঠলেন। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললেন না। শুধু তাকালেন জয়ার দিকে। দেখলেন জয়াও তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

— তা হলে কী করতে বলছ তুমি? শান্ত গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন সুমিত্রা।

— এখান থেকে পালাতে হবে।

— পালাতে হবে! কোথায় যাব? আজ মা-বাবা কেউ নেই। দাদারা দেশান্তরী। কার কাছে আশ্রয় নেব?

শংকরনাথ বলল — কেন আমরা কি মরে গেছি? আমরা কি তোমার আপনজন নই? তোমার বৌমা বলে দিয়েছে তোমাকে মাথায় করে নিয়ে যেতে। কি যাচ্ছো তো?

— ভেবে দেখি।

— ভাববার সময় নেই। শুধু বিষয়সম্পত্তি নয়, তোমার প্রাণ নিয়েও টানাটানি হবে। তাঁর আগে ইজ্জৎও খোয়াতে হতে পারে। বুঝেছ সুন্দরী পিসি?

এই শেষের কথায় স্প্রিং টেপা ছুরির ফলার মতো লাফিয়ে উঠলেন সুমিত্রা।

— ইতরের মতো কথা বলবে না। তা ছাড়া আমি ওদের সবার চেয়ে বড়ো। ওরা মায়ের মতো আমাকে দেখে। বিয়ে করে এসে প্রণাম করে। শংকরনাথ এতটুকু ঘাবড়ে না গিয়ে বলল। জানি এ সবই সত্যি কিন্তু পিসি তুমি জান না দেহের কামনা-বাসনা প্রবল হলে সম্পর্কও ভুলে যেতে হয়।

— তুমি চুপ করবে কি না? বলতে বলতে সুমিত্রার মুখ লাল হয়ে উঠল।

শংকরনাথ বলল — চুপ তো করে যেতেই পারি। কিন্তু তাতে সমস্যা মিটবে না। তুমি না গেলে আমাকে একাই ফিরে যেতে হবে। তখন তুমি একা কী করে নিজেকে রক্ষে করবে তা কী ভেবে দেখেছ? ঐ ইন্দ্রটা তো একটা চরিত্রহীন, লম্পট, গুণ্ডা। সেই বদমাসের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতে পারবে? দরজা ভেঙে যদি ঢোকে তাহলেও কেউ বাঁচাতে আসবে না। দারোয়ানরা সব ছোট তরফের হাতের পুতুল হয়ে আছে।

সুমিত্রা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বললেন, ক'দিন এসেই আমার দেওরদের বিষয় এত জেনে গেছ?

— সব জানতে পারিনি হয়তো। তবে এটুকু জেনেছি তোমার চটকদার চেহারা ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

সুমিত্রা ছুটে গিয়ে শংকরের গালে একটা চড় মারলেন।

তারপর কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে আবেগ তাড়িত স্বরে বললেন শংকর, আমি চৌধুরীবাড়ির বিধবা বড় বউ। এসব কথা শোনাও যেমন পাপ তেমনি যে শোনায় সেও পাপের অংশীদার। বলেই ছুটে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। শংকরনাথ ডাকল — শোনো পিসি। এক মিনিট দাঁড়াও। এইসব কথা তোমাকে শোনানো খুব খারাপ জানি। কিন্তু শুনিয়ে রাখলাম তোমার ভালর জন্যেই। আমি যে মিথ্যা বলছি না। তার প্রমাণ দেখো। বলে একটা খাতার মধ্যে থেকে একটা কাগজ বের করল। কাগজে পেন্সিল দিয়ে একটা যুবতী মেয়ের ছবি স্কেচ করা। অর্ধনগ্ন ছবিটা এগিয়ে দিল সুমিত্রা পিসিকে।

— দ্যাখো তো পিসি, ছবিটা কার।

সুমিত্রা এক নজর দেখেই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন কে এঁকেছে? শংকর কিছুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে থুতনি চুলকোতে চুলকোতে বলল — তোমারই রূপগ্রাহী কেউ একজন।

— কে সে?

— তা জানি না। তবে ইন্দ্রর ঘরের সামনে টবের মধ্যে এটা পড়েছিল।

সুমিত্রা গুম হয়ে গেলেন।

এর কয়েক দিনের মধ্যে এমন কতকগুলো উৎপাত শুরু হল যে সুমিত্রাকে ঠিক করতেই হল, অন্তত কিছুকালের জন্য তাকে চলে যেতেই হবে।

— কিন্তু আমার কী ব্যবস্থা? ভেবেছ কিছু? দাঁড়াও, তোমার ভাইপো রত্নটি এদিকে আসছে। ওর সামনে কোনো কথা নয়।

শংকর একবার উঁকি দিয়ে বলল — পিসি, কত টাকা তুলবে আজকালের মধ্যে ঠিক করে ফেলো। আমার মনে হয় যা আছে সব টাকাই তুলে নেওয়া ভালো। এখানে আর কার ভরসায় রাখবে?

— ঠিক আছে, ভেবে দেখছি।

শংকরনাথ চলে গেলে জয়া বললো, আমার সম্বন্ধে কী ভাবছ?

— তুইও চলনা আমার সঙ্গে। এখানে কেই বা আছে তোর।

— এইজন্যই বলি এখনও তুমি ছেলে মানুষটিই হয়ে রইলে। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে যেতে বলছ। কিন্তু যেখানে যাচ্ছ সেটা কি তোমার নিজের জায়গা? তোমার টাকার গরম আছে, তাই তোমাকে তোমার ভাইপো আদর করে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমাকে নেবে কেন? ও সব কথা ছাড়ো। তুমি এখন ব্যবস্থা করে যাও যাতে আমি এখানেই থাকতে পারি। কেউ না থাকলে এ ঘর দখল হয়ে যাবে। আমি থাকব যত দিন না ফিরে আস।

সুমিত্রা খুশি হলেন। নিশ্চিন্ত হলেন, বললেন — বেশ তাই হবে।

— আর শোনো বৌদিদি, সব টাকা, গহনা, সঙ্গে নিয়ে যেও না। যতটুকু না নিলে নয় ততটুকুই নিও। একা মানুষের কত আর খরচ?

— তাই নেব! হেসে বললেন ..... জয়া, আর জন্মে তুই আমার কে ছিলি বল্ তো!

যাবার আগের দিন সুমিত্রার মনে পড়ল রঘুর চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি ইস্! কী ভাবছে ছোঁড়াটা!

তখনই পোস্টকার্ড নিয়ে বসল ঃ—

ভাই রঘু,

তোর কাছে আমার অপরাধের শেষ নেই। আমার চরম দুর্ঘটনার পর একমাত্র তুইই সমবেদনা জানিয়েছিলিস। তুই আমার নিজের কেউ নয়। তবু যে কতখানি তা লিখে বোঝাতে পারব না। তুই যা ভয় পেয়েছিলি তাই ঘটল। সময় থাকতে থাকতে তাই এ তল্লাট ছেড়ে চললাম। আমার এক ভাইপো নিয়ে যেতে এসেছে। নাম শংকরনাথ। সে কার্তিক মজুমদারের ছেলে। চিনবি হয় তো। একই তো জায়গা। আমার বাড়িতে কেউ নেই। তালাবন্ধ, তাই বাধ্য হয়ে শংকরনাথের বাড়িতেই থাকব এখন। কতদিন থাকতে হবে জানিনা। যদি পারিস ওখানেই দেখা করিস। অনেক গল্প হবে। — তোর 'সুমি'। চিঠি লিখে জয়ার হাতে দিয়ে সুমিত্রা বলল - চিঠিটা তুই নিজের হাতে ডাক-বাক্সে দিবি।

তারপর বিদায়ের পালা।

চৌকাঠের বাইরে পা দিতেই সুমিত্রা যেন অথৈ জলে পড়লেন। সব অচেনা, অজানা। বাড়ির সামনেই যে এক বড়ো আমবাগান তা তো কোনো দিন চোখে পড়েনি। পড়বেই বা কী করে? দক্ষিণ দিকের জানলার ফাঁক দিয়ে শুধু গাছের মাথাগুলোই তো দেখে এসেছেন এত দিন!

— এত বড়ো আমবাগান কাদের জান? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সুমি।

— জানি। তোমাদের।

— আমাদের।

হ্যাঁ, হয়তো বা তোমার ভাগেই পড়বে শুধু আমবাগান কেন, ঐ দিকে তাকিয়ে দ্যাখো।

বিস্মিত চোখে সুমিত্রা বলল — কী ওটা?

— ইঁটভাঁটা। ইঁট তৈরি হয়।

— ইঁট! মানে যে ইঁটে বাড়ি তৈরি হয়?

শংকর হেসে বলল — হ্যাঁগো, যে ইঁটে বাড়ি তৈরি হয়।

— এটা কার?

— তা বলতে পারছি না। তবে তোমারই প্রাপ্য হতে পারে। একগলা ঘোমটা টেনে চোরা চাউনিতে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে চৌধুরীবাড়ির বড়ো-বৌ ভোরবেলা রাস্তায় নেমে ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন। মনে এক ধরনের মুক্তির আনন্দ।

উঠেই বিপত্তি — কিছুতেই টানা দরজা খুলে রাখতে দেবেন না। শংকরনাথ যতই বলে — খুলে রাখো হাওয়া আসবে। সুমিত্রা মাথা নাড়েন।

— আমার হাওয়ার দরকার নেই। রাজ্যের লোক প্যাট্ প্যাট্ করে দেখবে। ছিঃ।

শংকরনাথ হেসে হলল — তা দেখলেই বা। অমন মুখ — অমন রঙ তা তো দেখবার জন্যেই। সুমিত্রা গায়ের কাপড় সংযত করে ধমকে দিলেন — আবার আজে-বাজে কথা! তুমি ও দিকে গিয়ে বসো তো।

শংকরনাথ মুখ লাল করে হাসতে লাগল। স্টেশনে পৌঁছে আর এক হাঙ্গামা। শংকর থার্ডক্লাসের টিকিট কেটেছিল। দেখেই সুমিত্রা আগুন।

— থার্ডক্লাসের টিকিট কেটেছ! চৌধুরীবাড়ির বড়-বৌ যাবে এক গাদা লোকের গায়ে গা লাগিয়ে! তুমি কি পাগল! যাও ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে আনো।

মুখ কাঁচু মাচু করে শংকর বলল — সে যে অনেক টাকা!

— টাকা আমি দেব। বলেই ব্যাগ খুলে এক মুঠো নোটের মধ্যে থেকে একটা একশো টাকার কড়কড়ে নোট বের করে দিলেন।

শংকর চকচকে নোটটার ভাঁজ ঠিক করতে করতে বলল — আমারটাও কাটব তো?

সুমিত্রা — বোকার মতো কথা। আমি কি একা একা ফার্স্ট ক্লাসে যাব? তারপর কী হতে কী হবে। কত কাল বাড়ি থেকে বেরোইনি।

জান?

শংকর তখনই দুখানা টিকিট কেটে আনল। কিন্তু ব্যালেন্স ফেরত দিল না। সুমিত্রাও জানতে চাইলেন না কত ভাড়া লাগল। কত ফেরত হল। মনে মনে বললেন — মরুকগে যাক।

শংকর ভাবল — বাঃ! এ তো বেশ। ট্রেনে জানলার ধারে বসে সুমিত্রার অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল। তাঁর পিতৃতুল্য স্নেহময় শ্বশুর, তাঁর স্বামী — তাঁর ঘরের জনালাগুলি যেখান দিয়ে দুচোখ ভরে নীল আকাশ দেখতেন। মনে পড়তে লাগল জয়ার কথা। আবার কতদিন পর ফিরবেন কে জানে?

আচ্ছা, তাঁর এই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পরাটা উচিত হল তো? শুধু লোক নিন্দাই নয় নিরাপত্তার ব্যাপারটাও খোঁচাতে লাগল। হঠাৎ মনে হল তাঁর ছবিটা এঁকেছিল নাকি ইন্দ্র! কী আস্পর্ধা! ও কি পশু হয়ে গ্যাছে? ওখানে থাকলে যে কোনো দিন ও তো অনেক কিছুই করতে পারত। তা ঠিক। তবু মনের মধ্যে খচ্‌খচ্ করতে লাগল এভাবে কাউকে কিছু না বলে কোন্ এক ভাইপোর সঙ্গে বেরিয়ে আসাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি, যাক গে মরুক গে। আর ভাবা যায়না একটু পর ঘোড়ার গাড়িটা এসে দাঁড়ালে শংকরের বাড়ির সামনে। শংকর এসে দাঁড়িয়েছে। সুমিত্রা শংকরের বৌ এর হাতে ব্যাগটা দিয়ে বললেন — এটা ভালো করে আলমারিতে রেখে দাও তো বউমা! শংকরের ক্ষুদে বউ আড়ালে গিয়ে ব্যাগ খুলে দেখতেই চক্ষু চড়কগাছ।

— এই যে শুনছ! ডাকল শংকরকে। ফিসফিস করে বলল — এতে তো অনেক টাকা — গোছা গোছা নোট।

শংকর ঠোঁটে আঙুল চেপে বলল — চুপ। একেবারে চুপ! তোমাকে রাখতে দিয়েছে রেখে দাও। তুমি যেন ব্যাগ খুলে দেখইনি।

বলেই পিসির ঘরে এসে ফিসফিস করে বলল — পিসি, ঐ ব্যাগে কি টাকা আছে?

— হ্যাঁ, কেন? টাকা লাগবে?

— না অত টাকা। বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয়। চোর-ডাকাতের ভয় তো আছেই।

— কি করবে তা হলে?

— কাল সকালেই ব্যবস্থা করতে হবে। টাকা খাটাতে হবে।

— সে যা ভালো বোঝ তাই করো।

দিন সাতেক পর একদিন বেলা দশটা নাগাদ আচমকা সুমিত্রার ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল শংকর। সুমিত্রা তখন স্নান করে এসে কাপড় ছাড়ছিল। কোনোরকমে কাপড় সামলে নিয়ে ভিজে গায়েই বিছানায় বসে পড়ে রুক্ষ গলায় বললেন — কী ব্যাপার? কোনোরকম জানান না দিয়ে আমার ঘরে ঢুকছ! শিষ্টাচার জান না?

শংকরনাথ ফ্যাক করে হেসে বলল — সরি! আর হবে না।

— কী বলতে এসেছ বলে নাও।

— তাড়াহুড়ো নেই। তুমি কাপড় বদলে নাও। আমি না হয় বসছি।

— না, তোমায় বসতে হবে না। বলো।

শংকরনাথ বিছানার ওপর পা তুলে হেসে একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল — আজ সকালেই একশো বস্তা ধান কিনলাম। বাঁদি করার ব্যবস্থা করেছি। বর্ষাকালে বিক্রি করলে অনেক টাকা লাভ হবে।

সুমিত্রা শুধু বললেন — আচ্ছা!

— ধানটা এখন সস্তাতেই পেলাম। কত করে তা বলছি। বাধা দিয়ে সুমিত্রা বললেন - সে হিসেব তুমি রেখো।

— বাঃ তোমার টাকা। তোমায় মনে রাখতে হবে না? এই যেমন তালুকদার মশাইয়ের গুদামঘর ভাড়া করলাম।

—গুদাম কেন?

— বাঃ রে! অত ধান বাঁদি করব কোথায়? তারও তো একটা মোটা খরচ আছে। ধরো চার মাস যদি রাখা যায়

— আচ্ছা, সে হিসেব পরে হবে। ভিজে কাপড় তুমি এখন যাও। তারপরই ধমকে উঠলেন — যাও বলছি! মায়ের তুল্য যাঁরা তাদের দিকে কীভাবে তাকাতে হয় শেখো। যাও!

শংকর মোটেই লজ্জা পেল না। হাসতে হাসতে বলল — তোমাকে দেখে মোটেই মায়ের মতো মনে হয় না। বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

ক্রমে সুমিত্রার মনে হল এখানে এসে থাকাটা ঠিক হল না। ওখানে ছিল ইন্দ্রর থাবা, এখানে শংকরের হাঁ! বাঁচবার উপায় নেই। টাকা পয়সাগুলোই বা কী করছে — মুখে হিসেব দিয়েছে অনেক কিন্তু বাস্তবে কী ঘটছে তা ভগবানই জানেন।

একদিন বাড়ির পিছনের একটা ঘরে ঢুকে দেখলেন টেবিলে ছবি আঁকার সরঞ্জাম। এ বাড়িতে কে ছবি আঁকে? শংকরের বউকে জিজ্ঞেস করতেই সে গর্বের সঙ্গে বলে উঠল — ওমা পিসি, তুমি তাও জান না? পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমার হুবহু ছবি এঁকে দেবে। আচ্ছা, ও আসুক। তোমার একটা ছবি এঁকে দিতে বলব।

সব কথা সুমিত্রার কানে গেল না, তা হলে সেদিন শংকর তার যে পেন্সিল স্কেচটা ইন্দ্রর বলে চালিয়ে ছিল সেটা কি শংকরেরই কীর্তি?

সুমিত্রা বুঝল — এখানে আর একদিন থাকাও নিরাপদ নয়। কিন্তু কোথায় যাবে? টাকা পয়সাগুলো প্রায় সবই শংকরের কাছে। চাওয়া যাবে না। উত্তর কী দেবে তা জানাই আছে।

সেদিন আবার আরও মুসকিলে পড়লেন সুমিত্রা। শংকরের বউ তার এক মাসতুতো বোনের বিয়েতে যাবে। রাতে ফিরবে না। তার মানে

গোটা দিন গোটা রাত্তির থাকতে হবে এই বাড়ির ছাদের নীচে শংকরের সঙ্গে। ওর তো আবার 'মা-মাসি' জ্ঞান নেই।

এসব চিন্তা করে সুমিত্রা সারা দিন ঘরের মধ্যে খিল বন্ধ করে রইলেন। দিনটা কাটলো। রাত্রের জন্যে ভাবনা নেই। দরজা তো বন্ধ থাকবেই। সেদিনই গভীর রাত্রে ঝড় উঠল। সেই সঙ্গে বৃষ্টি। সুমিত্রা ভয়ে কাঠ হয়ে রইলেন। এমন রাত্রেই তো চোর-ডাকাতের শুভাগমন ঘটে। কোনো রকমে ঘরে ঢুকে গলা টিপে ধরলে —

চোর কিম্বা ডাকাত এল। এল পুরনো বাড়ির জানলায় গরাদ ঠেঁকিয়ে। ধুপ্ করে একটু শব্দ। সুমিত্রা নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলেন। হ্যাঁ, তার ঘরেই। আগন্তুক এগিয়ে এল কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে। তারপর বিছানার কাছে এসে সটান শুয়ে পড়ল সুমিত্রার শরীরের ওপরে। বিভ্রান্ত সুমিত্রা একবার ভয়ে সংকোচে কেঁপে উঠলেন। তারপরই স্থির হয়ে গেলেন। দুষ্কৃতী তখন দুহাতে মাটির নীচ থেকে রত্ন উদ্ধার করতে লেগেছে।

বিহ্বলভাব কাটতে সুমিত্রা এক ঝটকায় ছুঁড়ে ফেলে দিল লোকটাকে। মাতাল হয়ে এসেছিল। টাল সামলাতে পারেনি। পড়ল গিয়ে লোহার সিন্দুরের ওপর। তারপর কোনো রকমে উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

সে যে চোর-ডাকাত নয়, অন্য কেউ তা যখন সুমিত্রা বুঝতে পারলেন তখন আত্মরক্ষা করার আর উপায় ছিল না। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার অবস্থাও ছিল না। তবু গায়ের জোরে—

তারপরে রাত ভোর হল।

সকালবেলায় শংকরের বউ বাড়ি ফিরতেই উল্টোপুরাণ। শংকর ঝাঁপিয়ে পড়ল বউ-এর উপর।

— বলো আর কোনোদিন তুমি আমায় একা ফেলে কোথাও যাবে না।

— কেন কি হয়েছে? হঠাৎ এরকম আদিখ্যেতা!

— আমার 'সর্বনাশ' হয়ে গেছে। পিসি আমায় একা পেয়ে ওর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমিও সরল বিশ্বাসে গিয়েছিলাম। তারপর — ইস! কল্পনাও করতে পারিনি মাতৃতুল্য পিসি আমায় এভাবে — শংকরের স্ত্রীর আর শোনবার ধৈর্য ছিল না। চিৎকার করে উঠল - তাড়াও তাড়াও ঐ সববনাশী পিসিকে।

তাড়াতে হবে না। আমিই যাচ্ছি। এখানে থাকা যে কতখানি বিপদজনক তা কাল ঝড়ের রাতে টের পেয়েছি। গম্ভীর গলায় বললেন সুমিত্রা। আমার টাকা পয়সা যা আছে তা দেওয়া হোক। শংকর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল — সে সব হিসেব না করে দেওয়া যাবে না।

— তা হলে?

— পরে সময়মতো দেখব।

সুমিত্রা কোনো দিকে না তাকিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। শংকর বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞেস করল— কোথায় যাওয়া হচ্ছে? রাস্তা চিনতে পারবে তা?

ভাড়ার টাকা আছে তো?

সুমিত্রা কোনো কথার উত্তর দিলেন না।

চিন্তা সুমিত্রারও ছিল। কিন্তু ভেবে লাভ নেই। শংকর যে টাকা হজম করেছে তা আর উগরে দেবে না। যেমন করে হোক তার শ্বশুরের ভিটেতে পৌঁছতেই হবে। সেখানে আর কেউ না থাক একজন বিশ্বস্ত সঙ্গিনী আছে — জয়া।

দরজা খুলতেই সুমিত্রা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। — এ কী তুই!

রঘু হেসে বলল - আসতে বলে নিজেই বেরিয়ে যাচ্ছিস?

— হ্যাঁ, আবার শ্বশুড়বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছি।

— একা!

সুমিত্রা স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে বললেন — কেন তুই তো এসে পড়েছিস! পারবি না আমায় পৌঁছে দিতে?

— খুব পারবো।

— তবে আমার কাছে টাকা-পয়সা কিছু নেই। রঘু বলল — তাতে কি। আমার আছে। দরজায় দাঁড়িয়ে শংকর জিজ্ঞেস করল — এটি কে গো পিসি?

সুমিত্রা উত্তর দিল না। বাল্যবন্ধুর হাতটি নিজের হাতের মুঠোয় ধরে নির্ভয়ে হাঁটতে লাগলেন। এও একটা মুক্তি। গতকালের অতবড়ো গ্লানি স্বচ্ছন্দে মুছে গেল মন থেকে।

কী লাভ হল এমনিভাবে শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে— নিজেকে প্রশ্ন করলেন সুমিত্রা। উত্তরও পেলেন। — লাভ? চার দেওয়ালের বাইরে নতুন একটা জগৎ দেখতে পেলেন কিছুটা। যা চৌধুরীবাড়ির অন্য কোনো বধূ পায়নি। পাবেও না।

বিপ্লবী বীর সাভারকর আজ উপেক্ষিত কেন?

নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য

গত ২৮ মে (ইং ২০০৮) ছিল বীর সাভারকরের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী। দুঃখের বিষয়, এই উপলক্ষে সারা দেশে কোনও সাড়া বা আলোড়ন দেখা গেল না। দেশ উৎসবে মেতে উঠল না। যা হল তা নগণ্য বললেই চলে। সংবাদ মাধ্যম ছিল প্রায় নীরব। সারা দেশ মেতে থাকল আই পি এল-এর ক্রিকেট নিয়ে। আজ এই সভ্যতার সঙ্কটকালে যিনি হতে পারতেন প্রকৃত 'রোল মডেল' তিনি হলেন উপেক্ষিত। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সংবাদমাধ্যম এক প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আদর্শ চরিত্রকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হল।

এই বীর বিপ্লবী সম্বন্ধে ১৩৭২ (বাংলা) ১৬ ফাল্গুন-এর দৈনিক সংখ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছিল,— "সংগ্রামে ভীরুতা ছিল তখনকার কালের নিস্তরঙ্গ জাতির জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। এই অভিশাপ ঘুচাইতে সাভারকরের 'অভিনব ভারত' লণ্ডনেও পুনরায় বজ্র নির্ঘোষে যে চমক লাগাইয়াছিল, আধুনিক ভারতের জন্মকথায় তাহার মূল্য অবিস্মরণীয়, সশস্ত্র বৃটিশ প্রহরায় লৌহশৃঙ্খলে বন্দী সাভারকরের সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরে আশ্রয়লাভের চেষ্টাও নিতান্ত একটি রোমাঞ্চ কর ঘটনামাত্র নয়; শিবাজীর আদর্শ অনুসারী বীর সন্তানের অসামান্য সাহসিকতার নিদর্শন। বিদেশী শাসকের বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, আন্দামানে চরম নিগ্রহ— কিছুই এই দৃঢ়চরিত্র বীরশ্রেষ্ঠকে ভাঙ্গিতে বা নোয়াইতে পারে নাই। কেবল সংগ্রামে নয়, স্পষ্ট কথনে স্বচ্ছ স্বাধীন চিন্তাতেও বীর সাভারকর অনন্যসাধারণ। পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী প্রচারে ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধনে তিনিই অগ্রগণ্য। তাঁহার রচনাবলীও সেদিক দিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সম্পদ। পেশাদার রাজনীতি, সুবিধাবাদী আপোস মনোবৃত্তি অথবা শৌখিন প্রগতিবাদ বীর সাভারকরের জীবনে ও মরণে স্থান পায় নাই। তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত অদ্বিতীয়, নিঃসঙ্গচারী তবু ভারতের গগনে ধ্রুব নক্ষত্রের মতোই তাঁহার দীপ্তি।" প্রবন্ধের প্রারম্ভে জাতীয় কংগ্রেসের দুর্বল নেতৃত্বকে কটাক্ষ করেছেন প্রতিবেদক সম্পাদক। তাঁর দৃষ্টিতে ও লেখনীতে প্রাধান্য পেয়েছে বীর সাভারকরের উজ্জ্বল চরিত্র এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট নেতা অধ্যাপক হীরেন মুখার্জীর মতে, "সাভারকর ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক এবং আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ। আধুনিক ভারতের তিনিও একজন নির্মাতা। সাভারকরকে শুধুমাত্র হিন্দু মহাসভার নেতা বললে ঠিক বিচার হয় না। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী। তিনি ভারতীয় যুব মানসে বীর্যবত্তার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সাভারকরের যে আদর্শ, সে আদর্শ অনুসারে সরকার পরিচালিত হলে তার অধীনে থাকতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।"

১৯৪৩ সালের সাইগন থেকে বক্তৃতায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বীর সাভারকরের নিকট আবেদন রেখেছিলেন— "যখন ভ্রান্ত রাজনৈতিক আদর্শের মোহে গান্ধীজী এবং অন্যান্য কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ভারতীয় যুবকদের যুদ্ধে যোগ দিতে নিষেধ করেছেন, তখন আমি আনন্দিত হচ্ছি যে, একমাত্র ভারতীয় নেতা বীর সাভারকর নির্ভীক ভাবে যুবকদের সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবার আহ্বান জানাচ্ছেন। বৃটিশ ট্রেনিংপ্রাপ্ত এই যুবকদের থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক পেয়ে যাচ্ছি।.... আপনি আমাদের ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দীপনাময় পুস্তক দিয়েছিলেন এবং আপনার যৌবনে উদ্দীপনাময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এই সঙ্কটকালে দেশকে আপনি সঠিক নেতৃত্ব দিন।"

এহেন দেশপ্রেমিক বীর বিপ্লবীর প্রতি আজ দেশবাসীর ও বর্তমান সরকারের এত উপেক্ষা কেন? এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে তাঁর মহান জীবনের বহুমুখী কর্মধারার আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে শুধু লেখকের নিজস্ব চিন্তা ও অভিমত উপস্থাপিত হয়েছে যে, কেন ও কীভাবে

সাভারকর প্রায় বিস্মৃত হচ্ছেন। আপাতত মনে হয়, এ যেন সত্যের পরাজয়। তবে ভবিষ্যতের ইতিহাস সত্যের জয়পতাকা উড়াবে কিনা কে জানে!

এই উপেক্ষার বিষয় আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে আসে ভারতের স্বাধীনতা লাভের এক স্বল্প অঘোষিত পটভূমিকার কথা। যে বৃটিশ শক্তি ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার কথা বারবার উড়িয়ে দিয়েছে, মাত্র ৭ বছরের ব্যবধানে তড়িঘড়ি করে তারা ভারত ছেড়ে গেল কেন? ১৯৪০ সালে চার্চিল প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সদর্পে বলেছিলেন, "I have not been employed by His Majesty's Government to preside over the liquidation of British Empire"। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের স্বাধীন ভারত শাসন করার যোগ্যতা সম্বন্ধে বলেছিলেন, "these rascals have no ability to administer a nation"। গান্ধীজী তাঁর ভাষায় ছিলেন "a half naked fakir"। এত বিরূপ মনোভাব পোষণ করেও তাদেরই হাতে স্বাধীনতা দিলেন বৃটিশ সরকার, যদিও ১৯৪৭ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন অ্যাটলী (Atlee)। কিন্তু leader of the opposition ছিলেন চার্চিল। উভয়ে একমত হয়ে পার্লামেন্টে বিল পাশের পরই স্বাধীনতা হস্তান্তর হয়। ভাববার বিষয়, কী এমন ঘটনা ঘটল যার জন্য ভারতকে স্বাধীনতা দিতে একরকম বাধ্য হয়েছিল বৃটিশ সরকার।

১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্রোত অহিংসা ও হিংসা ইত্যাদি অনেক পথেই প্রবাহিত হয়েছে। যদিও মনে হয়েছে কোনও কোনও সময় শাসক শক্তি বিচলিত হয়েছে, কিন্তু দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব কখনই হয়নি। এরূপ অবস্থায় ভাবতে হয়, শাসক গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ শক্তি সামর্থের উত্থান পতনের কাহিনী। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বৃটিশ শক্তি অত্যন্ত নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য যদি এককভাবে কোনও ঘটনাকে দায়ী করা যায় তাহল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই বিশ্বযুদ্ধ না হলে ভারত যে কবে স্বাধীনতা লাভ করত কে জানে!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের প্রায় সব দেশগুলির মতো বৃটেনের অর্থবল ও লোকবল বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ শেষে বৃটেনের মধ্যে লোকজন অভাব ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল। যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই ১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে চার্চিলের রক্ষণশীল দলের ভরাডুবি হয়। শ্রমিক দল নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে। রক্ষণশীল দল উপনিবেশগুলি রাখার পক্ষে ছিল। উভয় দলের নেতৃবৃন্দ আলাপ আলোচনা করে দেখলেন যে অর্থ ভাণ্ডার শূন্য এবং শীঘ্র অর্থভাণ্ডার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। আমেরিকার মার্শাল প্ল্যানে পশ্চিমী দেশগুলিকে সাহায্য করলেও বৃটেনের প্রয়োজনের তুলনায় তা পর্যাপ্ত ছিল না। আর যুদ্ধে বহু মানুষ হতাহত। যারা মোটামুটি সুস্থ শরীরে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের পর ঘরে ফিরেছে তারা আর দেশের বাইরে যেতে অনিচ্ছুক। অর্থাৎ Jewel in the Crown ভারতকে পরিচালনা করার জন্য বৃটেন থেকে সরাসরি অর্থশক্তি বা লোকশক্তি প্রয়োগ করা সহজসাধ্য ছিল না। একমাত্র ভরসা ছিল বৃটিশের প্রাচীন নীতি 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' প্রয়োগ করে ভারতের একাংশকে নিজেদের পদানত করে বা অনুগত রেখে তাদের দিয়ে ভারত শাসন করা। এরূপ শাসন ব্যবস্থায় বৃটিশ শক্তির মেরুদণ্ড ছিল 'বৃটিশ ইণ্ডিয়া আর্মি'। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় নৌ-সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে। তার প্রভাব দেখা দিল বাকি ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে। তাতে বৃটিশ শক্তির টনক নড়ে উঠল। তখনই তারা ভালয় ভালয় ভারত ছাড়ার কথা ভাবতে বাধ্য হয়। বৃটিশ দেখল যে, এই বিদ্রোহী শক্তির পশ্চাদপটে যাদের অবদান যেমন বীর সাভারকর এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র, তাঁরা সশরীরে বর্তমান। তাঁদের হাতে যদি ক্ষমতা হস্তান্তর হয়, বৃটিশ স্বার্থ চিরদিনের মতো বিনষ্ট হয়ে যাবে। ১৯৪৬ সালে বৃটিশ বাণিজ্য ছিল সারা ভারতজুড়ে। এই অর্থ শক্তিকে দুর্বল করার মতো কোনও ঝুঁকি নেওয়া বৃটিশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ছিল ভবিষ্যৎ বাণিজ্যের সম্ভাবনা। স্বাধীনতা দিয়েও যদি দেশটাকে তাঁবেদার করে রাখা যায়, তাহলে বাণিজ্য ছাড়াও অন্যান্য স্বার্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। এ অবস্থায় বিদ্রোহী শক্তিকে কোনও মতে আস্কারা দেওয়া বৃটিশরা যুক্তিযুক্ত মনে করেনি। আজ মুখার্জী কমিশন এবং কোনও কোনও গবেষক জেনেছেন যে, বৃটিশ গোয়েন্দা শক্তি ১৯৪৬ সালে ভালভাবেই জানত যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি। তিনি ওই সময় সোভিয়েত রাশিয়াতে স্ট্যালিনের নজরবন্দী হয়েছিলেন। বৃটিশের সঙ্গে একসঙ্গে যুদ্ধ করলেও স্ট্যালিন কখনওই বৃটেনের বন্ধু ছিলেন না। চার্চিল স্ট্যালিনকে Monster নামে অভিহিত করেছিলেন। বৃটেনের স্বাভাবিক ভয় ছিল যে, স্ট্যালিন সুযোগ বুঝে নেতাজীকে বৃটিশের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেবেন। আর বৃটিশ শক্তির এও অজানা ছিল না যে, Militarize Hindus" ভারতীয়রা যুদ্ধে যোগদান করুক— এই উদাত্ত আহ্বান ছিল বীর সাভারকরের এবং তা যুদ্ধের আগে হতেই। জাতীয় কংগ্রেস যুদ্ধের আগে এর বিরোধিতা করেছিল। বীর সাভারকরের উদাত্ত আহ্বান, সাইগন থেকে নেতাজীর সৈন্যপ্রাপ্তি নিয়ে সাভারকরকে অভিনন্দন এবং ভারতে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ— এসবের মধ্যে যে একটি মূল সূত্র আছ এবং তার উৎস যে বীর সাভারকরের দূরদৃষ্টি ও বিপ্লবী সত্ত্বা, তা বুঝতে বৃটিশের কোনও অসুবিধা হয়নি।

ফলে বৃটিশ শক্তির কোনও ইচ্ছাই ছিল না যে, স্বাধীনতা হস্তান্তরের আলাপ আলোচনায় কোনও বিপ্লবীশক্তি অংশগ্রহণ করুক। তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা যা ছিল তা মোটেই সুখকর ছিল না। আমেরিকান উপনিবেশ ১৭৭৭ সালে প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছিল তাদের বিপ্লবী শক্তি বৃটেনের হাত থেকে। ফলে সেখানে বৃটিশ স্বার্থ সমূলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং আমেরিকানরা অতি দ্রুতই পৃথিবীর মধ্যে এক শক্তিশালী জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাদের সংবিধান রচনার সময় এই বিপ্লবীদের বক্তব্য ছিল যে, যে ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা আমরা অত্যাচারিত হয়েছি তার মোকাবিলা করার মতো তাদের মতবাদের বিপরীত ভাবধারার মধ্যে দিয়েই আমাদের সংবিধান রচনা করতে হবে, যাতে আমাদের স্বাধীনতা অমর ও অম্লান হয়ে থাকে এবং দেশ একটি আত্মনির্ভরশীল শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। বৃটিশ তা ভোলেনি।

তাই ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে বৃটিশ শক্তির প্রয়োজন ছিল একটি দুর্বল ভারতীয় প্রতিনিধি দল, যাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ থাকবে কিন্তু অবদান হবে minimal। ক্ষমতা পেলে প্রতিদ্বন্দ্বী দল বা শক্তিগুলিকে দাবিয়ে রাখবে, কিন্তু বৃটেনের চির অনুগত হয়ে থাকবে। তাই তাদের প্রয়োজন ছিল বৃটেনে শিক্ষাপ্রাপ্ত, বৃটেনের মোহে অন্ধ অনুরাগী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের একটি দল। এইরূপ একটি দুর্বল চির অনুগত ও অনুরাগী বিরোধী দল রচনা করার উদ্দেশ্যে দূরদ্রষ্টা বৃটিশ শক্তি ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে একজন ইংরেজ Alan Octavian Hume -কে সামনে রেখে উদ্বোধন করেছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের। পরবর্তীকালে ওই দলের শিরোমণি হলেন মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত

নেহরুর মতো দিকপালেরা। এঁদের এবং এঁদের সতীর্থ নেতাদের বৃটিশদের প্রতি মোহ এবং আনুগত্য সর্বজনবিদিত। সাধারণত আশা করা যায় যে, স্বাধীনতা হস্তান্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য রাজশক্তি আহ্বান জানাবে দলমত নির্বিশেষে আন্দোলনকারী সব দলেরই প্রধান নেতৃবৃন্দকে। প্রায় সর্বত্র এই ভাবধারা দেখা গেলেও ভারতের ক্ষেত্রে তা হয়নি। ১৯৪৫ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে এই মর্মে পত্র দেন যে জিন্না মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করছেন সব আলোচনায়, কংগ্রেসী নেতারা প্রকাশ্যে বলছেন তাঁরা হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করছেন না। এ অবস্থায় হিন্দু মহাসভা ও তার সভাপতি বীর সাভারকরকে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আহ্বান জানানো হোক। বৃটিশ শক্তি সে পত্রের কোনও উত্তর না দিয়ে জিন্না ও কংগ্রেসের দুর্বল প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপোষ করে ভারত ভাগ করল এবং বহু রক্তের বিনিময়ে দ্বিখণ্ডিত ভারত স্বাধীনতা লাভ করল।

যে কংগ্রেস দলকে সামনে রেখে বৃটিশ ভারতকে স্বাধীনতা দিল তারই প্রধান মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা অর্জনে অবদান সম্বন্ধে বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লর্ড অ্যাটলীর মন্তব্য লক্ষ্য করার মতো। পরবর্তীকালে ভারত সফরে এসে পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি যে মন্তব্য করেন তা প্রকাশিত হয় শ্রীচক্রবর্তীর একটি স্বহস্ত লিখিত পত্রে। ওই পত্রটি ডঃ রমেশ মজুমদার তাঁর 'হিস্ট্রি অফ মডার্ন বেঙ্গল পার্ট-২' বইতে প্রকাশ করেছেন এবং বিশদ আলোচনা করেছেন। পত্রাংশটির অনুলিপি এইরূপ— "আমি তাঁহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, গান্ধীর 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন তো ১৯৪৭-এর বহু পূর্বেই মিয়াইয়া গিয়াছিল। ১৯৪৭ সালে এমন কোনও পরিস্থিতি বর্তমান ছিল না যাহাতে ইংরেজদের তাড়াহুড়া করিয়া এদেশ ছাড়িয়া যাওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। তবে তাহারা গেল কেন? উত্তরে এ্যাটলী কয়েকটি কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নেতাজী সুভাষ বসু কর্তৃক ভারতের স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীতে যুক্ত দেশীয় সেনানীদের ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দেওয়া। আলোচনার শেষের দিকে আমি লর্ড এ্যাটলীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইংরেজদের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তে গান্ধীর কার্যকলাপের প্রভাব কতটা ছিল? এই প্রশ্ন শুনিবার পর এ্যাটলীর ওষ্ঠদ্বয় একটা অবজ্ঞাসূচক হাস্যে বিস্তৃত হইল এবং তিনি চিবাইয়া চিবাইয়া বলিয়াছিলেন "M-i-ni-mal"।

ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার সময় বৃটেনের পরিস্থিতি কেমন ছিল এই প্রসঙ্গে Lory Collins এবং Dominique Lapiere প্রণীত "Mountbatten and Independent India" বইটির সূচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি বিবেচনা করার মতো। উদ্ধৃতিটির পটভূমিকা হচ্ছে— প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলীর সঙ্গে মাউন্ট- ব্যাটেনের বাক্যালাপ। এই আলোচনায় ইঙ্গিত আছে, কেন বৃটিশ ভারত ছেড়েছিল। যেমন, ..."England's imperial power structure in India was, he knew, a hollow structure. Its governing elites, the Indian civil service and the Indian Police had been allowed to run down during the war. The British army in India was undermanned and prepared to fight for only one thing, a passage home. The men of the Indian army, the triumphant conquerors of the Japanese in the jungles of Burma, the Germans on the slopes of Monte Cassino, were not going to be employed as instruments of imperial power against their own people. One determined shore and the edeifice, Mountbatten knew, would crumble" ।

এখানেও সেই এ্যাটলীর একই চিন্তার প্রতিধ্বনি— বৃটেনের শক্তি বিশ্বযুদ্ধ শেষে প্রায় নিঃশেষ। এখনও বৃটিশকে ভারত শাসন চালিয়ে যেতে হলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর একান্ত আনুগত্য প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে গভীর সন্দেহ ও বিপদের আশঙ্কা। সে বিপদ কী? বিপ্লবী শক্তির দখলে যদি ভারত চলে যায় তাহলে বৃটিশ স্বার্থ চিরতরে বিঘ্নিত হবে। অতএব এমন একটি দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করো, যারা বৃটিশদের সংস্পর্শে থাকা ও তাদের স্বার্থ রক্ষা করাকে প্রাধান্য দেবে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং বিশেষত গান্ধীজী বহু সময় বৃটিশ স্বার্থবিরোধী হতে চাননি। বৃটিশ তা ভোলেনি। অতএব স্বাধীনতা হস্তান্তরের সময় বৃটিশ শক্তির প্রয়োজন ছিল জাতীয় কংগ্রেসকে তাদের নিজেদের স্বার্থে।

বৃটিশ শক্তি ভালোভাবেই জানতো, ভারতীয়দের সমর বাহিনীতে যোগদানের জন্য সাভারকর বিশ্বযুদ্ধের বহু আগে থাকতেই নানা স্থানে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছিলেন। রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাভারকরের নিয়মিত যোগাযোগ, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে সাভারকরের অনুপ্রেরণা, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং সাভারকরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বৃটিশ বিদ্বেষ— এসবই ছিল বৃটিশের কাছে ভয়ের বিষয়। ভারতে সাভারকর সক্রিয় এবং সে সময় স্ট্যালিন যদি বৃটিশের বিরুদ্ধে আক্রোশবশত নেতাজীকে ভারতে পাঠিয়ে দেন তাহলে সারা ভারত উত্তাল হয়ে উঠবে— এই রকম সাতপাঁচ ভেবে বৃটিশ তড়িঘড়ি ভারত ছাড়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। স্বাধীনতা হস্তান্তরের সময় ঠিক হয়েছিল ১৯৪৮, কিন্তু প্রায় ১১ মাস আগে বিপ্লবী শক্তির ভয়ে বৃটিশ ভারত ছেড়ে চলে গেল।

কংগ্রেসী নেতারা কতখানি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন বা দৃঢ় চরিত্রের ছিলেন তার দু-একটি নমুনা থেকে কিছু আভাস পাওয়া যায়। Collins এবং Lapiere -এর 'মাউন্টব্যাটেন অ্যাণ্ড ইণ্ডিপেন্ডেন্ট ইণ্ডিয়া' পার্ট-১ বইতে ইন্টারভিউ অধ্যায়ে মাউন্টব্যাটেন বর্ণনা করছেন, যখন প্যাটেল এবং নেহরু গিয়ে মাউন্টব্যাটেনকে আবেদন-নিবেদন জানাচ্ছেন যে স্বাধীন ভারতের গভর্ণর জেনারেল রূপে শাসনভার চালিয়ে যাওয়ার জন্য— "And Nehru said, 'while you were exercising the highest command in the war, we were in prison. You are a professional, a high level administrator.We are not amaturs, we just know nothing. You can't just turn over the country to us, having stayed with us all our lives with all your knowledge and experience, then leave us, without any experience or knowledge of how to do it. Will you run the country? .... You must understand, Nehru said, You have got to take it. We pledge ourselves. We'll do whatever you say. We will be far more obedient than when you were Viceroy. Please take over the country"।

কংগ্রেসী নেতাদের এইরূপ কাতর আবেদন-নিবেদন একদিকে যেমন তাদের দুর্বলতার পরিচায়ক, অন্যদিকে কল্পনা করা যায় কী এইরূপ আত্মসমর্পণ বীর সাভারকর বা অন্য বিপ্লবী শক্তির কাছে বৃটিশ আশা করতে পারতো? কংগ্রেসী নেতাদের দূরদৃষ্টির প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁদের রচিত বৃটিশ অনুপ্রেরিত ভারতীয় সংবিধান। অন্য কূটকচালির মধ্যে না গিয়ে এটি লক্ষ্য করার মতো যে এই ঐতিহাসিক দলিলটি এত দুর্বল যে প্রতিবছরে গড়ে একবার বা দুবার করে এটির সংশোধন হয়েছে। গত ৫৮ বছরে ৯৭ বার, এটি নিশ্চয়ই একটি সুদৃঢ় সুচিন্তিত দলিলের পরিচয় হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকান সংবিধান গত ২৩০ বছরের ইতিহাসে সংশোধন হয়েছে মাত্র ২৬ বার। অর্থাৎ গড়ে দশ বছরে একবার।

কংগ্রেসের আন্দোলন ধারার সঙ্গে বৃটিশের ভাল পরিচয়ই ছিল। গান্ধীজীর একটিও আন্দোলন কোনওদিন সফল হয়নি। তাঁর হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য প্রাণান্তকর প্রয়াস, খিলাফৎ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন— এই সবগুলি হয় নিজে থেকে ব্যর্থ হয়েছিল অথবা গান্ধীজী নিজে থেকে আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। কিন্তু বীর বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে গান্ধীজী বরাবরই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, যা পরোক্ষভাবে বৃটিশ শক্তির সমর্থন বলা চলে। অতএব কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এবং নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য বৃটিশ শক্তি স্বাধীনতা হস্তান্তরের জন্য গান্ধীজী ও তাঁর কংগ্রেসী অনুগামীদেরই নির্বাচিত করল এবং স্বাভাবিকভাবে বীর বিপ্লবী সাভারকরকে এড়িয়ে গেল। সাভারকরজী নিজেও ক্ষমতালিপ্সু না হওয়ার জন্য বৃটিশদের এই কীর্তির প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করলেন না। ফলে গান্ধী নির্বাচিত বৃটিশবন্ধু দুর্বল চরিত্র জওহরলাল নেহরুর হল রাজ্যাভিষেক এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিক বিপ্লবী শক্তির শুরু হল নির্বাসনে যাওয়ার পালা।

স্বাধীন ভারত পরম বৈভবের দিকে এগিয়ে চলুক— এই ছিল সাভারকরের স্বপ্ন। সেজন্য তিনি সুদৃঢ় সমাজ ব্যবস্থা গঠনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার সময় অখণ্ড ভারতে হিন্দুরা আপাতদৃষ্টিতে সংখ্যাগুরু হলেও তারা ছিল শতধা বিভক্ত। সাভারকর চাইতেন যে, দেশের সংখ্যাগুরুরা অর্থাৎ শতকরা ৮০ ভাগ হিন্দুই যদি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয় তাতে যে শুধু হিন্দুদের কল্যাণ হবে তাই নয়, অন্যান্য সংখ্যালঘুরাও তাদের অনুসরণ করবে এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সারা দেশেরই কল্যাণ হবে। পশ্চিমী দুনিয়ায় বিশেষত, আমেরিকাতে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সব রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের বলতে শোনা যায় যে, "bed rock of our culture is christianity"। তেমনি ভারতবর্ষে এটা সত্য যে, "bed rock of our culture is Hindu Dharma"। কিন্তু আমাদের সেকুলার রাজনীতিবিদরা একথা বলার সাহস রাখেন না। হিন্দু ধর্ম সব ধর্মীয় মতবাদ, সকল জীব ও সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার কথা শেখায় বলেই এদেশে দেশভাগের পরও অহিন্দুরা সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে জীবনযাপন করছে। হিন্দু সভ্যতার মূল চেতনায় যে নৈতিকতা, আদর্শ ও মূল্যবোধ আছে যা হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের প্রাণশক্তি যুগিয়ে এসেছে এবং বারবার বিভিন্ন বর্বর শক্তির আক্রমণের মোকাবিলা করেছে তারই ওপর ভিত্তি করে নতুন ভারত নির্মিত হোক— এই ছিল সাভারকরের সুচিন্তিত অভিমত। তাঁর দৃষ্টিতে শুধু হিন্দুর ঘরে জন্মালেই কেউ হিন্দু হয় না। যারা ভারতে জন্মেছে, এদেশকে ভালবেসেছে, যারা সিন্ধু থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এই ভূমিকে মাতৃভূমি বলে মনে করে, যারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আপন বলে মনে করে, তারা সবাই হিন্দু। তাঁর এইরূপ স্বচ্ছ ও ব্যাপক দৃষ্টির আঙ্গিকে যদি সংবিধান রচিত হতো, স্বাধীন দেশের নেতাদের আলাপচারিতায় থাকত ও দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করত, তাহলে দেশ আজকের মতো এত শতধা বিচ্ছিন্ন আন্দোলন ও ষড়যন্ত্রের শিকার হত না। আজকের সংখ্যালঘু তোষণ নীতি, জাতপাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণ, অন্তর্কলহ বা প্রাদেশিকতা ইত্যাদি নীতি, যা দেশকে বিভাজনের পথে নিয়ে যাচ্ছে এবং সমস্যা জর্জরিত করছে নিত্য-নিয়মিত তা থেকে দেশ রক্ষা পেত। এবং দেশ সমৃদ্ধির পথে এগোবার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে সাহস করত।

দেশে শাসন ব্যবস্থার আজ এমন দুরবস্থা যে সংখ্যালঘুদের ভোট হারানোর ভয়ে সরকার সন্ত্রাসবাদীদের উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ আনতে দ্বিধাবোধ করছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের দণ্ড দিতে ভয় পাচ্ছে। দেশের সুরক্ষার ব্যাপারে এর চাইতে দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা আর কী হতে পারে!

সাভারকর হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত নীতির জন্য স্বাধীনতার সময় থেকে বরাবরই কংগ্রেসী শাসকরা তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখলেন এবং সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালালেন। ফলে দেশ কংগ্রেসের হিন্দু বিরোধী নীতির শিকার হয়ে দুর্বল হল এবং এই বিপ্লবী বীর ধীরে ধীরে চলে গেলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সংবাদ মাধ্যম এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও কংগ্রেসী শাসকদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে রইল। এছাড়া গান্ধীজীর সম্বন্ধে বৃটিশের কৌশলী প্রচার এবং পরিশেষে তাঁর আততায়ীর হাতে জীবনহানির জন্য কিছু লোক সাভারকর-বিরোধী হয়েছিল। গান্ধীজী পরিণত বয়সে ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে ফিরে আসেন। জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদানের পর সহজ অনাড়ম্বর জীবনের নামে তিনি প্রায় এক সন্ন্যাসীর বেশভূষা এবং ভাবধারা গ্রহণ করেন। যেমন নিয়মিত উপবাস, প্রাত্যহিক প্রার্থনাসভা, রামনাম, রামরাজ্যের আদর্শ আলোচনা ইত্যাদি। ভারত বিশেষত, হিন্দু ভারত ধর্মপিপাসুর দেশ। এদেশে সন্ন্যাসী তো দূরের কথা, সন্ন্যাসীর ভেকও সাধারণ মানুষের কাছে অতি সম্মানের। ভারতীয় সমাজ গান্ধীজীর সন্ন্যাসীর বহিরাবরণকে সাদরে গ্রহণ করে। হিন্দু মুসলিম ঐক্য আন্দোলনের আড়ালে তিনি চাইলেন উভয় সমাজের নেতা হতে। তাঁর এই প্রয়াস শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। এজন্য তিনি চরমভাবে মুসলিম তোষণ নীতির উপর নির্ভর করেন। আর সবার জন্য ছিল তাঁর অহিংস ও সত্যাগ্রহ— যেটা মোটামুটি হিন্দুদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল মনে হয়। হিন্দুদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয় বরং মনে হয় রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ আসনের কর্তা হওয়াই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। বহু ঘটনার মাধ্যমে সন্দেহ হয়, তাঁর অহিংসা বা সত্যাগ্রহ নীতি দেশের স্বাধীনতার জন্য কতটুকু সাহায্য করেছে। বৃটিশের স্বার্থের কোনও ক্ষতি হয়েছিল কী? তিনি যে মর্যাদা পুরুষোত্তমের নাম গান করতেন, সেই বিখ্যাত বীর ভগবান শ্রীরাম রাবণের দুর্দ্ধর্ষ আসুরিক শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য অহিংসা ও সত্যাগ্রহ নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন? এই নীতির সার্থকতা আছে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতির জন্য। দেশ রক্ষার জন্য বা সমাজ রক্ষার জন্য কি এই নীতি সার্থক? ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই

দুই যুগনায়ক কি আততায়ীর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াননি বা অস্ত্র প্রয়োগ করেননি? গান্ধীজীর মুসলিম তোষণনীতি সম্বন্ধে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'হিস্ট্রি অফ মডার্ন বেঙ্গল, পার্ট-২' বইতে 'খিলাফৎ মুভমেন্ট' অধ্যায় লিখেছেন, "The policy of appeasement of Muslims that the country took up under the spell of Gandhiji's irresistible personality, struck such deep roots in India's national life that they ultimately cracked the edifice of national life and razed it to the ground"। এই মনীষীর উক্তিই প্রমাণ করে গান্ধীজী মুসলিম তোষণের দ্বারা কীভাবে সারা সমাজ জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। সহজভাবে বলতে গেলে সামাজিক চিন্তাধারার বিকৃতি হয়েছে, যার ফলে আজকালের Pseudo Secularism এবং তার অনুগামীদের আবির্ভাব হয়েছে। বীর সাভারকরের হিন্দুত্ব ও হিন্দু সংস্কৃতির ব্যাপকতা এবং স্বচ্ছ দৃষ্টি, গান্ধীজী সৃষ্ট Pseudo Secularism-এর পরিপন্থী। এখানে দুই ভাবধারার বিরোধিতা।

জাতির নেতা হিসাবে হিন্দুদের প্রতি তিনি কতটা সংবেদনশীল ছিলেন তার উদাহরণ পাওয়া যায় ১৯২০ সালে খিলাফৎ আন্দোলনের পরবর্তীকালে কেরালাতে ও ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে হিন্দু নিধনকালে। মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর গণআক্রমণ, নিধন ও নারী ধর্ষণ করেছিল ওই সময়গুলিতে। প্রতিবারই হিন্দুরা যখন গান্ধীজীর কাছে গিয়ে আবেদন নিবেদন জানিয়েছে ও প্রতিকার চেয়েছে, তিনি উত্তর দিয়েছেন, স্ত্রীলোকেদের উচিত নীরবে ওই ধর্ষণ সহ্য করা এবং হিন্দু পুরুষদের উচিত নীরবে আত্মবলিদান। কারণ তাঁর মতে, এই সহ্যশক্তি দেখালে অত্যাচারীরা এক সময় ক্লান্ত হয়ে সব অত্যাচার বন্ধ করে দেবে। এই দর্শন হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও আছে কী? এরকম হাস্যাস্পদ absurd theory ছিল তাঁর হিন্দুদের জন্য। এখানেই দেখা যায় একদিকে বীর সাভারকরের হিন্দুত্ব ও হিন্দু সংগঠনের জন্য বলিষ্ঠ নীতি আর অন্যদিকে গান্ধীজীর হিন্দুদের জন্য আত্মঘাতী দুর্বল নীতি। সেজন্য সন্দেহ নেই, বৃটিশ ভালভাবে বুঝেছিল কাকে ক্ষমতায় আনলে তাদের স্বার্থ রক্ষা হবে। তবুও ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এবং জনসাধারণ তাঁর সন্ন্যাসীর বহিরাবরণ দেখে এবং শান্তির বাণী শুনে গান্ধীজীকেই বরণ করে নিয়েছিল এবং বৃটিশ শক্তি তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাঁকেই নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে রেখেছিল। গান্ধীজী বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বিশেষত ভগৎ সিং, সাভারকর ও নেতাজী সম্বন্ধে যে অবস্থান নিয়েছিলেন তা বৃটিশের পক্ষে কাম্য ছিল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে বিপ্লবী শক্তির প্রধান নেতারা দূরে চলে গেলেও সাভারকরজী দেশে সুস্থ শরীরে গান্ধী নীতির মূর্তিমান প্রতিবাদ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বৃটিশের পক্ষে তা মোটেই সুখকর ছিল না। বৃটিশের কাছে স্বাধীনতা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য সাভারকর ছিলেন ব্রাত্য। তাই কংগ্রেসী নেতারা গান্ধীজীর শিষ্য হিসাবে বৃটিশ স্বার্থের প্রতিভূ হয়ে স্বাধীনতার পর মাউন্টব্যাটেনের অধীনে দেশ শাসন আরম্ভ করলেন। এই সঙ্কট মুহূর্তে গড্‌সে করলেন একটি ঐতিহাসিক ভুল ও অন্যায়। গান্ধীজী নিহত হলেন গড্‌সের বুলেটে। তখন গান্ধীজীর বয়স ৭৯ বছর। এই ঘটনার অল্পকাল আগেই গান্ধীজী অসুস্থ ছিলেন। তখন চার্চিল ভাইসরয়ের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, "Why Gandhi has not died yet?"। বয়স ও শরীরের তাৎক্ষণিক অবস্থা যা ছিল, তিনি হয়ত আর অল্পকালই বাঁচতেন। কিন্তু আততায়ীর বুলেট শুধু তাঁর জীবন নিল না, তাঁকে তুলে দিল এক larger than life অবস্থায়। আর নেহরুর কংগ্রেস দল সুযোগ বুঝে নেমে গেল সব প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে বিনষ্ট করতে। সাভারকর বন্দী হলেন স্বাধীন ভারতে। এক বছর বাদে আদালতের বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে জেল থেকে ছাড়া পেলেন। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেল। হিন্দু বিরোধীরা ও তাদের অনুগত ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষবাদী বুদ্ধিজীবীরা তখন সুযোগ পেয়ে গেল সাভারকরজী বা তাঁর অনুগামীদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে। সেই ভাবধারা আজও চলছে।

সব শেষে মনে হয় যে সাভারকরের চিন্তাভাবনা ছিল তার সময়ের চেয়ে নিঃসন্দেহে বহু অগ্রগামী অবস্থায়। তাই আজও মানুষ তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করে উঠতে পারেনি। হাজার বছরের পরাধীনতার গ্লানি এবং বহু অত্যাচার সহ্য করে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা পরাধীনতার সময় থেকে আজ পর্যন্ত হীনমন্যতায় ভুগছে। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' হয়ে আছে তাদের অধিকাংশের জীবনের মূলমন্ত্র। কোনও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বা কোনও বিশেষ ঝুঁকির প্রতি তাদের অনীহা। যেখানে কোনও ঝামেলা নেই, ঝুঁকি নেই, অশান্তি নেই, জাতভাই বা স্বধর্মাবলম্বীদের প্রতি কোনও দরদ নেই, স্বার্থত্যাগের প্রতি কোনও আগ্রহ নেই। তারা চায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তির সঙ্গে নিরুপদ্রব জীবন। মুষ্টিমেয় বীর যুবক ছাড়া অধিকাংশের কাছে বীর সাভারকরের দুঃসাহসিক কার্যাবলী, আদর্শ ও অগ্নিগর্ভ বাণী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তার চাইতে ঢের সহজ ও নিরুপদ্রব ছিল গান্ধীজীর শান্তি ও অহিংসার আন্দোলন, যেখানে জীবনের ঝুঁকি ছিল খুবই কম। ফলে দেশবাসী সাভারকরজীর অগ্নিগর্ভ জীবন ও আদর্শকে সম্মান জানিয়েছে দূর থেকে, কাছে আসতে দ্বিধাবোধ করেছে। কংগ্রেসী শাসক দলেরও গান্ধীজীর বিভাজন নীতি ও মুসলিম তোষণ নীতির কুফল অনুধাবন করার মতো সামর্থ্য আজও খুব বেশি দেশবাসীর হয়ে ওঠেনি। তারপর সংবিধানের সুন্দর মোড়কে ওই বিভাজন, সংরক্ষণ, সংখ্যালঘু তোষণ ইত্যাদি নীতির নামে দুর্নীতিগুলি দেশবাসীকে গেলানো হয়েছে বা আজও হচ্ছে।

তাই আজও দেখি, কংগ্রেসী ও কমিউনিস্ট নেতারা যারা হিন্দু বিভাজননীতি ও সংখ্যালঘু তোষণ নীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁরা হিন্দু সংগঠক দেশপ্রেমী বীর বিপ্লবী সাভারকরকে যথার্থ সম্মান দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। আরও দুঃখের বিষয়, বৃটিশ ও কংগ্রেসী শাসকদের দীর্ঘ পরিচালিত এই নীতি বা দুর্নীতিগুলি যেভাবে আমাদের বৃহত্তর সমাজকে ও দেশকে ক্রমশ ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ার বা জনগণকে সংগঠিত করার কোনও প্রয়াস দেশের বুদ্ধিজীবীদের বা প্রধান সংবাদমাধ্যমের মধ্যে প্রায় নেই বললেই চলে। তাই আজ বিশেষ প্রয়োজন, সাভারকরের ও তাঁর অনুগামীদের জীবন ও দর্শন জনমানসে তুলে ধরা এবং তিনি আজ উপেক্ষিত কেন এবং কাদের স্বার্থে, তার বহুল আলোচনা এবং গবেষণা।

চতুর্থ পরিসর ও গণতন্ত্রে বিকৃতি

তথাগত রায়

গত জুলাই মাসে ভারতের সংসদে যে কুনাট্য হয়ে গেল তার যথেষ্ট নিন্দা হয়নি। হয়নি, তার প্রধান কারণ এই নিন্দা করবার ভার প্রধানত মিডিয়া বা সংবাদমাধ্যমের উপরে। এবং কোনও অজ্ঞাত কারণে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর পরিবেশন মারাত্মক রকম একপেশে। এটা প্রিন্ট মিডিয়া, অর্থাৎ খবরের কাগজ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া, অর্থাৎ রেডিও-টেলিভিশন দুইয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবেই প্রযোজ্য।

সংবাদমাধ্যমের একপেশেমি বা সাধু ভাষায় পক্ষপাতিত্ব, খবরের কাগজে বেশি পরিস্ফুট। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এই পশ্চিমবাংলায় একটি বহুল প্রচারিত সাহিত্য পাক্ষিক আছে, তবে তারা রাজনীতির বিশ্লেষণও পরিবেশন করে থাকে। কোনও সাময়িকপত্রের একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকতেই পারে, কিন্তু সেটা যখন চাটুকারিতার স্তরে পৌঁছে যায় তখন অসহ্য লাগে — বিশেষ করে যদি সেই সাময়িকপত্রের মান অন্যভাবে উঁচু হয়। এখন, এই পাক্ষিকটি পরপর দুটি সংখ্যার মলাটে সোনিয়া গান্ধী ও মনমোহন সিং-এর ছবি ছাপল। কারণ কি — না এঁদের দুজনের রাজনৈতিক কুশলতার ফলেই নাকি ইউ পি এ সরকার সঙ্কট উৎরে গেছে। শুধু তাই নয়, এঁদের প্রশংসা করে প্রবন্ধও লেখা হয়েছে।

সত্যিই কি তাই? ইউ পি এ সরকার তো সঙ্কট উৎরেছে অমর সিং-এর কুশলতার ফলে। এবং এই কুশলতাটা ঘোড়া কেনা-বেচার কুশলতা, জুয়াচুরির কুশলতা, ঘুষ দেবার কুশলতা। এটা কি একটা গর্ব করার মত জিনিস? কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখছি, কংগ্রেসীরা এই নিয়ে বগল বাজাচ্ছেন। আর কমরেডরা মুহ্যমান — বলছেন না পর্যন্ত যে কংগ্রেস জুয়াচুরি করে জিতেছে। সম্ভবতঃ কমরেডরাও চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। এবং তারা হরকিষেণ সিং সুরজিত-এর অনুপস্থিতি প্রবলভাবে অনুভব করেছেন, উপলব্ধি করেছেন উনি থাকলে এ-বৈতরণী পার করে দিতেন। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের বেশিরভাগ কেন কংগ্রেসীদের মতনই বগল বাজাচ্ছে?

ঠিক আছে, ঘোড়া কেনা-বেচাই হোক্ আর জুয়াচুরি হোক, কংগ্রেসীরা খেলায় সফল হয়েছেন, তাই তাদের পেটোয়া সংবাদ মাধ্যম বগল বাজাচ্ছে, মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু এর আগে আগেই সোনিয়া এবং মনমোহনের রেকর্ড কি রকম? প্রথমে মনমোহনকে ধরি। এই ভদ্রলোক নিপাট ভালমানুষ। অসম্ভব ভদ্র; দক্ষ অর্থনীতিবিদ বলে পরিচিত ছিলেন। এবং নববইয়ের দশকের গোড়ার দিকে নেহরু জমানার মুখপোড়া অর্থনীতিকে বিদায় করে, লাইসেন্স-পারমিট-ইন্সপেক্টর রাজের অবসান ঘটিয়ে 'সংস্কার'-এর সূচনা ইনিই করেছিলেন। সংস্কার বলতে সাধারণত নতুন কিছুতে উত্তরণ বোঝায় — কিন্তু এই সংস্কার মানে হচ্ছে, সোভিয়েত-ধরনের, কংগ্রেস আবিষ্কৃত "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ" থেকে পুরনো, মূলত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া। এই কাজে কংগ্রেসের নরসিমা রাও সরকার পুরোপুরি সফল না হলেও, মনমোহন সিং মোটামুটি রকম দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে? সিপিএম-এর খপ্পর থেকে মুক্তি পাবার পরে বলেছিলেন, ক্রীতদাসের মতো জীবনযাপন করতে হয়েছে—প্রধানমন্ত্রী যখন নিজেই নিজেকে ক্রীতদাস বলেন তখন আর আমাদের বলবার কি থাকতে পারে? কিন্তু এর ওপরেও এই অর্থনীতির পন্ডিতের আমলে মুদ্রাস্ফীতি দুই অঙ্কে পৌঁছে গেল, বারো শতাংশ ধরে ফেলল? বলা হচ্ছে, বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়েছে, তাই মুদ্রাস্ফীতি। এখন তো তেলের দাম কমছে। ব্যারেল-প্রতি দাম একশো পঁয়তাল্লিশ ডলার থেকে একশো পঁচিশের কাছাকাছি নেমেছে। তা সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী কেন? আরো আছে। সন্ত্রাস দমনে এই প্রধানমন্ত্রী এক হাজার শতাংশ ব্যর্থ, মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের লোভে এঁর সরকার ন্যূনতম পদক্ষেপও এ ব্যাপারে নিতে পারেনি। তবুও মলাটে ছবি ছাপাতে হবে? আর সোনিয়া গান্ধী? একজন রাজনীতিকের একটা প্রকাশ্য ভাবমূর্তি থাকে। লোকে জানতে পারে ইনি কি নীতিতে বিশ্বাস করেন। কারণ রাজনৈতিক নেতার উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত নিজের নীতির জন্য জনসমর্থন চাওয়া এবং সরকারে এলে সেই নীতিকে কাজে রূপায়িত করা। এখন সোনিয়া গান্ধীর

রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিশ্বাস কী, কেউ জানেন? ইনি মূলত দক্ষিণপন্থী না বামপন্থী, সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থার বিশ্বাস করেন না বাজার নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থায়, পাকিস্তানের "লো-ইনটেনসিটি ওয়ার" নামক নষ্টামি কি করে মোকাবিলা করতে হবে — এই সব বিষয়ে ওঁর মতামত কেউ জানেন? উনি কখনো একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেন। একটা পলিসি স্টেটমেন্ট করেছেন? প্রতিটির উত্তর, না। এঁর মতামত কেউ জানে না। কখনো কোনও পলিসি স্টেটমেন্ট করেননি। কিন্তু কোনও কংগ্রেসীকে জিজ্ঞাসা করুন — বলবে, "দেখেছোও, কিইই ইন্টেলিজেন্ট, স-অ-অ-ব শুনে যাচ্ছেন, কি-ই-ই-চ্ছু বলছেন না"! মৌনব্রত কোনও সাধুর পক্ষে প্রশংসার যোগ্য হতে পারে। কিন্তু রাজনীতিকের পক্ষে? এ তো সেই কবি কালিদাসের প্রথম জীবনের গল্পের মতো। যখন পন্ডিতরা বলেছিলেন উনি শুধু মাথা নাড়বেন আর আমরা বুঝে নিয়ে উত্তর দেব। নাকি উনি চাণক্যের সেই বাণী মেনে চলেন, "তাবৎ চ শোভতে মূর্খং যাবৎ কিঞ্চি ৎ ন ভাষতে"। বস্তুতঃ সোনিয়ার একটামাত্র উদ্দেশ্য পরিষ্কার। নিজের সন্তানটিকে মসনদে বসাতে হবেই।

গত কয়েক বছরের এই দুজনের রাজনৈতিক ইতিহাস নৈরাশ্যজনক বললে বাড়িয়ে বলা হয়। এই বিশাল ভারতভূমিতে শুধু অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং অসম রাজ্য তাঁর দলের দখলে আছে। ২০০৪ সালে সিপিএম-এর দয়ায় ক্ষমতা পাবার পর নির্বাচন লড়িয়েছেন হিমাচল, উত্তরাখণ্ড, কর্ণাটক, গুজরাত এবং উত্তরপ্রদেশে। প্রতিটিতে তাঁর দল গোহারা হেরেছে। প্রথম চারটিতে বিজেপি-র কাছে শেষেরটিতে মায়াবতীর কাছে। এর মধ্যে গুজরাতে হারার 'কৃতিত্ব' তো ওঁর ব্যক্তিগত — "মৌত কি সওদাগর" নামে নরেন্দ্রভাইকে ভূষিত করার একটা বিশাল ভূমিকা গুজরাতের নির্বাচনে কাজ করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই — এবং কাজ করেছে পুরো সোনিয়ার বিপক্ষে। উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসের ভরাডুবির যে অন্যতম কারণ এই নির্বাচন পরিচালনার ভার অপোগন্ড যুবরাজ রাহুলের হাতে দেওয়া তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এই অবস্থা অন্য কোনও রাজনীতিকের হলে সাংবাদিককুল তার রাজনৈতিক শ্রাদ্ধের বাজার করতে বেরিয়ে পড়তেন।

কিন্তু কোনও সংবাদপত্রে পড়েছেন, সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দিশাহারা, হেরে ভূত ইত্যাদি? পড়বেন না। অপরপক্ষে, সোনিয়া যদি নিজের দপ্তরে একটা ছিঁচকে চোর ধরেন তা হলে তা হবে সোনিয়ার 'মোক্ষম চাল', 'মাষ্টার স্ট্রোক'! কারণ সোনিয়া গান্ধী কখনো ভুল করতে পারেন না। ভুল করেছে নরসিমা রাও, মনমোহন সিং, চিদম্বরম্, শিবরাজ পাটিল ইত্যাদি। অবশ্যই এরা ভুল করেছে। কিন্তু ভুল চালনার ফলে জাহাজ যদি ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায় তবে দোষ কি শুধু খালাসীদের? ক্যাপটেনের সাত খুন মাপ, এটা কেমন যুক্তি?

এবং তার চেয়ে বড় কথা, কেন এমন যুক্তি? এমন তো হতে পারে না যে দেশশুদ্ধ সাংবাদিক সোনিয়ার প্রেমে ডগমগ বা রাহুলকে দেখলে তাদের বাৎসল্যরস উথলে আসে? এমন তো হতে পারে না যে তারা সবাই বোকা, সোনিয়া অপূর্ব কৌশলে তাদের বোকা বানাচ্ছেন! তাহলে কেন এই ধরনের রিপোর্টিং? হিন্দিতে প্রশ্ন করতে হয়, ক্যা, দালমে কুছ কালা হ্যায়?

এই প্রশ্নটাই আমার কাছে আছে। উত্তর আমার কাছে নেই। উত্তর খুঁজে বার করতেই হবে। কারণ, সংবাদমাধ্যম হচ্ছে গণতন্ত্রের 'চতুর্থ পরিসর', ফোর্থ এস্টেট — বলেছিলেন ভুবন বিখ্যাত ইংরেজ (আসলে আইরিশ) সাংসদ ও বাগ্মী এডমন্ড বার্ক (Edmund Burke), যিনি ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বিচার চেয়ে, এবং মার্কিনদের সঙ্গে সমঝোতার কথা বলে যে বক্তৃতামালা করেছিলেন, পৃথিবীর বক্তৃতার ইতিহাসে তা অমর হয়ে আছে।

বার্ক বলেছিলেন গণতন্ত্রের তিনটি পরিসর আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই — লর্ডস স্পিরিচুয়াল (বৃটিশ হাউস অফ লর্ডস-এর উচ্চপদস্থ পাদ্রী সদস্যগণ, যেমন আর্চ বিশপ অফ ক্যান্টারবেরি), লর্ডস টেমপোরাল (হাউস অফ লর্ডস-এর অন্যান্য সদস্য) এবং কমন্স্ (হাউস অফ কমন্স্-এর সদস্যবৃন্দ)। তারপর পার্লামেন্টের সাংবাদিক গ্যালারির দিকে হাত দেখিয়ে বার্ক বলেছিলেন, কিন্তু ওখানে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নন। কারণ তাঁরা হলেন চতুর্থ পরিসর, ফোর্থ এস্টেট। আমাদের কাজকর্ম ও কাজকর্মের সমালোচনা দেখে সমালোচনা করার ভার ওঁদেরই উপর ন্যস্ত।

এই উক্তির তাৎপর্য কি? এর তাৎপর্য হচ্ছে, সংবাদমাধ্যম (বার্কের সময় শুধু সংবাদপত্রই ছিল) ছাড়া গণতন্ত্র কাজই করতে পারে না। এর প্রতিধ্বনি একবার করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন মোরারজি দেশাই, বলেছিলেন "প্রেস যতক্ষণ না গালাগালি দেবার, এবং প্রাণ ভরে গালাগালি দেবার স্বাধীনতা পাচ্ছে ততক্ষণ প্রেসকে স্বাধীন বলা যাবে না"। কেন গালাগালি দেবার স্বাধীনতা? কারণ সংবাদমাধ্যমই রাজনৈতিক নেতৃত্বকে চোখে চোখে রাখে, এবং প্রয়োজনে গালাগালি দেয়।

কিন্তু সংবাদমাধ্যমকে কে চোখে চোখে রাখবে? সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বও জন্মায়। সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন হচ্ছে কি না তা কে দেখবে? আর যদি না হয় তা হলে গণতন্ত্রে যে বিকৃতি প্রবেশ করছে তাকে কে শোধরাবে?

অথ-সোনিয়া-ঘটিত কান্ড দেখে মনে তো হচ্ছে না সেটা কেউ দেখছে!

মুক্তিপণ

শেখর বসু

প্রতিদিনই রাত আটটা নাগাদ বাড়ি ফেরেন সুদেষ্ণা মৈত্র। যারা নিয়মিত এখানে ফোন করে তারা এই সময়টার কথা জানে। সুতরাং আটটার পর থেকেই এবাড়িতে ফোন আসা শুরু হয়। আজ বাড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ফোন। হাতের ব্যাগ সোফার ওপর নামিয়ে রেখে টেলিফোন ধরলেন সুদেষ্ণা।

'হ্যালো' বলার পরেও কোনও কথা ভেসে এলো না। আরও দু-তিনবার হ্যালো-হ্যালো করার পরে একটা কর্কশ গলা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সুদেষ্ণা মৈত্র বলছেন?'

'হ্যাঁ, বলুন।

বলতে বলার পরেও কোনও কথা নেই। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে কর্কশ গলা বলল, 'আপনার ছেলে রনিকে আমরা কিডন্যাপ করেছি। পাঁচিশ লাখ টাকা মুক্তিপণ না দিলে ওকে আমরা মেরে ফেলব। টাকাটা তিন দিনের মধ্যে চাই।'

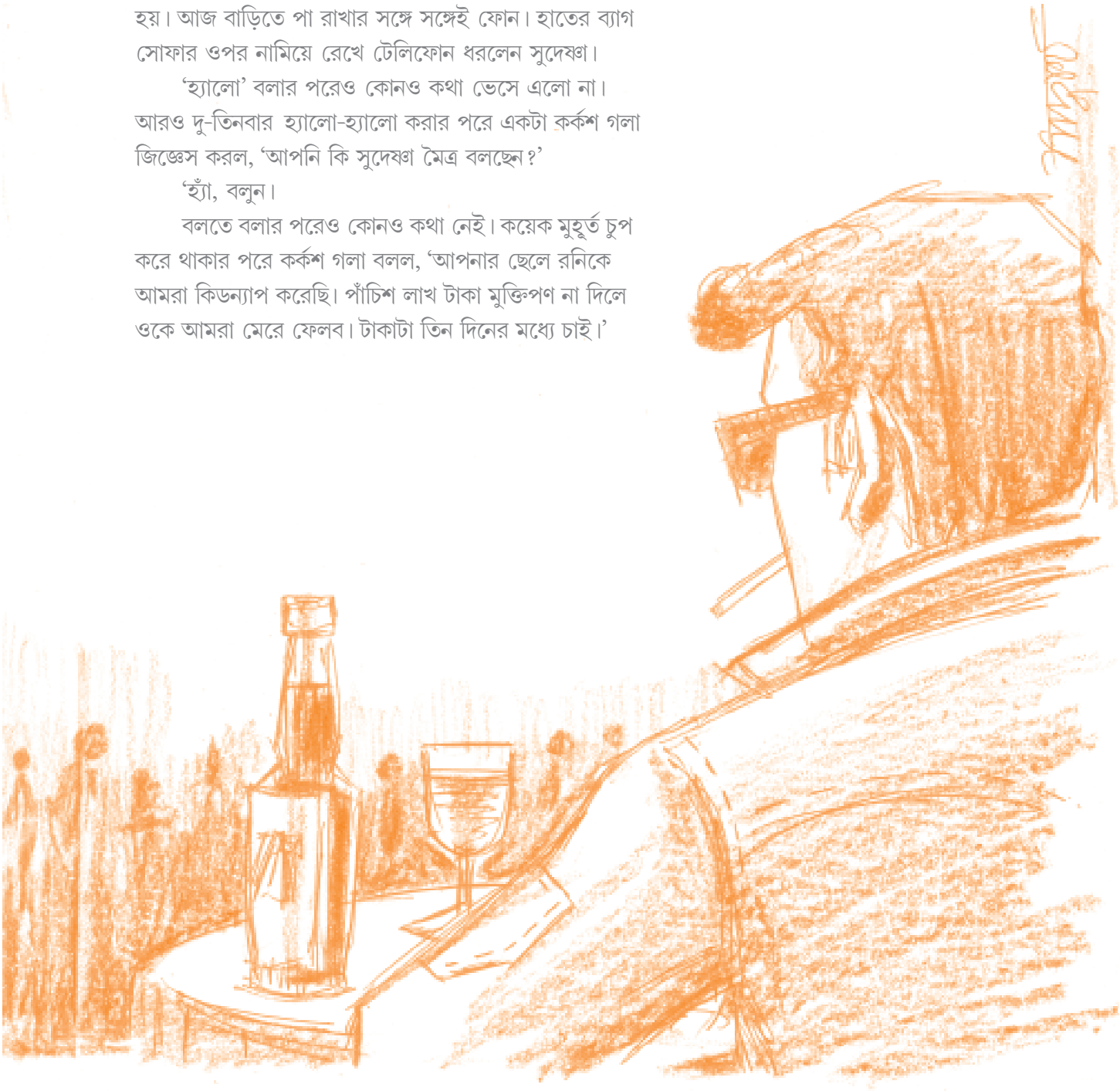

কথাগুলো শোনার পরেই কেমন যেন মাথা ঘুরে গিয়েছিল সুদেষ্ণার। টেলিফোনটা একটা উঁচু টেবিলের ওপরে থাকে। টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে নিজেকে একটু সামলে নিয়েছিলেন। কিন্তু বলার মতো কোনও কথা খুঁজে পেলেন না। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

টেলিফোনের ওদিকের লোকটা বোধহয় এই ধরনের একটা প্রতিক্রিয়ার কথা আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে আগের ভঙ্গিতেই বলল, 'টাকাটা কিন্তু তিনদিনের মধ্যেই চাই। কোথায়, কখন, কী ভাবে দিতে হবে — পরে জানাচ্ছি। আর একটা কথা, এই ব্যাপারে পুলিশকে কিন্তু কিছু জানাবেন না। জানালে ছেলেকে আর কখনোই ফিরে পাবেন না। কথাটা মাথায় ঢুকেছে?

সুদেষ্ণা মৈত্র গত পাঁচ-সাত বছর ধরে নানা ধরনের ঝড়ঝাপটার মধ্যে পড়েছেন। এত ঝড়ঝাপটা প্রকৃতিকে বোধ হয় কিছুটা কঠিন করে তোলে। সুদেষ্ণার মাথা ঘোরা, গা-হাত-পায়ের কাঁপুনি এই মুহূর্তে নেই। গলা অবশ্য এখনও শুকনোই। একটু কষ্ট করেই বললেন, 'আপনারা ভুল লোককে কিডন্যাপ করেছেন —।'

এই ধরনের একটা কথা ছেলের মায়ের মুখ থেকে আশা করেনি অপহরণকারী। একটু থমকে গিয়ে টেলিফোনের ওদিকের লোকটা বলল, 'ভুল লোক! মানে?'

'আপনারা কি জানেন না রনির সংসারে ওর মা ছাড়া আর কেউ নেই -। মা একটা স্কুলে পড়ায়। সেই টাকায় সংসার চলে। আমার পক্ষে পঁচিশ লাখ টাকা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না'। ওপাশ থেকে এবার একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি ভেসে এলো। 'আপনাদের ফ্যামিলির সব কিছুই আমাদের জানা আছে আন্টি। আমাদের উলটোপাল্টা বোঝাবার কোনও চান্স নেই। টাকাটা আপনাকে বার করতে কে বলছে?'

'তার মানে!'

'মানে তো খুব সিধে। টাকাটা দেবে রনির দাদু — বিমল মৈত্র। বিরাট ব্যবসায়ী। ওর কাছে পঁচিশ লাখ টাকা হাতের ময়লা। এখুনি গিয়ে সব বলুন। একমাত্র নাতি। বুড়ো ঠিক দিয়ে দেবে টাকাটা'। মুহূর্তের জন্যে হলেও শরীরে সেই কাঁপুনিটা আবার খেলে গিয়েছিল সুদেষ্ণার। একটু থেমে থেমে বললেন, 'রনির দাদুর সঙ্গে কয়েক বছর হল আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। রনির জন্যেই নেই। রনি যে ভাবে এখন জীবন কাটায় সেটা মা হয়ে আমিই মেনে নিতে পারি না, ওর দাদু কী ভাবে নেবেন!

হঠাৎই অমার্জিত হয়ে উঠল টেলিফোনের ওদিকের কণ্ঠস্বর, 'বাতেল্লা ছাড়ো আন্টি। টাকা আমাদের হাতে না এলে রনি জান-এ বাঁচবে না। টাকাটা তিনদিনের মধ্যে চাই। কাল আবার ফোন করব। মনে রেখো — তিনদিন মাত্র সময়।'

ওপাশের টেলিফোনটা শব্দ করে নামিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সুদেষ্ণা টেলিফোন নামাতে পারলেন না। হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা রিসিভার। শরীরে বিচ্ছিরি অস্বস্তি। একটু এগিয়ে গেলেই পাখার সুইচটা অন করা যায়, কিন্তু ইচ্ছে আর শরীরের মধ্যে যেন কোনও সংযোগ ছিল না। সাড়হীন মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থেকে দরদর করে ঘামছিলেন।

এইভাবে কতক্ষণ কে জানে — হঠাৎই ডোরবেল বেজে উঠতে কিছুটা ধাতস্থ হলেন। দরজা ভেজানো, ছিটকিনি দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। কাজের মাসি এসেছে হয়তো, কিন্তু দরজা খোলা আছে — এই কথাটা বলার মতোও জোর পাচ্ছিলেন না সুদেষ্ণা। আরও বার-তিনেক ডোরবেলের শব্দ শোনার পরে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

কাজের মাসি নয়, পাড়ার মেয়ে হৈমন্তী এসেছে। বৌদির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠেছিল মেয়েটি। 'কী হয়েছে তোমার! শরীর খারাপ লাগছে?'

এগিয়ে এসে বৌদির হাত ধরেছিল হৈমন্তী। ঘামে ভেজা ঠান্ডা হাত। ধরে ধরে ওঁকে সোফায় বসিয়ে দিয়ে ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে দিয়েছিল। এ বাড়িতে হৈমন্তীর অনেক দিনের যাতায়াত, ও ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে ঠান্ডা জলের একটা বোতল আর গ্লাস নিয়ে এসেছিল। আস্তে আস্তে খানিকটা জল খাওয়ার পড়ে কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছিলেন সুদেষ্ণা। পাশেই হ্যান্ডব্যাগ ছিল, ব্যাগ থেকে একটা তোয়ালে-রুমাল বার করে মুখ-চোখ-হাতের ঘাম মুছলেন।

বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল হৈমন্তীকে। বৌদিকে খুঁটিয়ে দেখে নেওয়ার পরে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি একটু ভাল বোধ করছ?'

হাসার চেষ্টা করলেন সুদেষ্ণা। মাথা একদিকে সামান্য ঝাঁকাবার পরে মৃদু গলায় জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ'।

'কী অসুবিধা হচ্ছিল? মাথা ঘুরে গিয়েছিল? বুক ধড়ফড় করছিল?

দুদিকে লম্বা করে মাথা নাড়লেন সুদেষ্ণা।

'না-না, এগুলো আপনি একদম নেগলেক্ট করবেন না। ডাক্তারকে একটা কল দিই। সুশান্তদা বোধ হয় এখন চেম্বারে আছেন। ফোন করব?'

হৈমন্তীকে থামাবার জন্যে আবার একটু উঁচু গলাতেই বললেন সুদেষ্ণা, 'না-না, কিছুই হয়নি আমার। জাস্ট একটু — তুমি ব্যস্ত হয়ো না তো।'

হৈমন্তী নানা ধরনের কাজ করে, যার একটা হল সমাজসেবা। ওই কাজের সুবাদে ও অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করে। অনেকের দুঃখকষ্টের খবর রাখে। সেই জন্যে পাঁচটা বিষয়ে পাঁচজনের চাইতে ও বোধ হয় একটু বেশিই জানে।

বৌদির আপত্তিকে তাই বুঝি খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে হৈমন্তী বলল, 'তোমার কথা মেনে নিচ্ছি আমি — কিছুই হয়নি তোমার। কিন্তু একটা চেক-আপ করিয়ে নিতে তো দোষ নেই।'

হৈমন্তীকে থামাবার জন্যে আবার একটু হাসার চেষ্টা করলেন বৌদি। 'ঠিক আছে।'

কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু জবাব পেয়েই থামার পাত্রী নয় তরুণী সমাজসেবিকা। একটু তেড়েফুঁড়ে উঠে বলল, 'চৌরাস্তার মোড়ে নতুন একটা ডায়গনস্টিক সেন্টার হয়েছে, ওখানকার ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তুমি একটা চেক-আপ করিয়ে নাও। সব নতুন মেশিনপত্তর, ভাল টেকনিশিয়ানও আছে শুনেছি। সামনের রোববারই তোমার জন্যে আমি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলছি।

ওকে থামাবার জন্যে সামান্য একটু গলা তুলে সুদেষ্ণা বললেন, 'আমার সত্যিই কিছু হয়নি হৈমন্তী। শরীর খুব ভাল আছে।'

তর্কের মেজাজ এসে গিয়েছিল হৈমন্তীর। 'এই তো তোমার ভাল থাকার নমুনা! আমি হঠাৎ হাজির না হলে এতক্ষণ হয়তো মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে। আসলে তোমার ওভারওয়ার্ক হয়ে যাচ্ছে। স্কুলে প্রচন্ড খাটুনি। তারপর স্কুল থেকে বেরিয়ে টুইশনি। তুমি এবার কিছুদিন বিশ্রাম নাও বৌদি।'

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলেন সুদেষ্ণা। 'তুমি আমার জন্যে কত ভাব হৈমন্তী। বাড়ির কেউ যদি তোমার ভাবনার একশো ভাগের এক ভাগ ভাবত, আমি বর্তে যেতাম!'

কথার জবাবে হৈমন্তী কিছু বলতে পারল না। পুরনো পাড়া, এখানে সবাই সবাইকে চেনে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের খবর রাখে। পাড়ার সবাই জানে সুদেষ্ণা মৈত্রর সেই সুখের সংসার এখন একদম নষ্ট হয়ে দিয়েছে।

ওঁর স্বামী রূপকদা খুব হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ ছিলেন। গল্প করতেন সবার সঙ্গে। পাড়ার ফাংশানে সব চাইতে উদ্যোগী ছিলেন রূপকদাই। মাইক হাতে গোটা অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করতেন দাপটের সঙ্গে। টলটলে সেই মানুষটা হঠাৎই একদিন চলে গেলেন দুর্ঘটনায়।

সেই থেকে দুর্বিপাক সুদেষ্ণা বৌদির পিছু ছাড়েনি। একমাত্র সন্তান রনি দেখতে দেখতে বখে গেল। বিরক্ত হয়ে ওর ধনী এবং প্রভাবশালী দাদু এ বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এ বাড়িতে এখন সুদেষ্ণা বৌদির জন্য ভাববার মানুষ একজনই। কিন্তু সেই একজন রনি তো মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন বাড়ি ফেরে না। মুহূর্তের মধ্যে অনেক কথাই ছড়িয়ে পড়েছিল হৈমন্তীর মাথায়, কিন্তু ও বৌদির ওই কথার জবাবে কিছুই বলতে পারল না।

বৌদি চোখের জল আরও একবার মুছলেন, তারপর হঠাৎই হৈমন্তীর হাতদুটো চেপে ধরে কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, 'আমি কী করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না হৈমন্তী। আমার ভীষণ ভয় করছে।'

'ভয়! কেন?'

বৌদি আঁচল দিয়ে আরও একবার চোখের জল মুছলেন, তারপর উঠে গিয়ে দরজার ছিটকিনিটা দিয়ে ফিরে এলেন আগের জায়গায়।

বৌদির চেহারার মধ্যেও ভয়ের ছাপ ধরে গিয়েছিল। অবাক চোখে বৌদিকে একবার দেখে হৈমন্তী বললেন, 'কী হয়েছে তোমার বৌদি? সব বলো তো আমাকে।'

বৌদি আরও একবার হৈমন্তীর হাত চেপে ধরে বললেন, 'বলতে তো হবেই। এ কথা কাউকে না বলে চুপ করে থাকা যায় না—।'

একটু দম নিলেন বৌদি, বুকের কাঁপুনি সহজ করার চেষ্টা করলেন, তারপর খানিকক্ষণ আগে টেলিফোনে যা-যা শুনেছিলেন সব বলে গেলেন গড়গড় করে।

এমন একটা ভয়ংকর বৃত্তান্ত শোনার জন্যে বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি ছিল না হৈমন্তীর। সব শুনে ও কেমন যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওর বয়সী আর পাঁচটা মেয়ের চাইতে হৈমন্তী অনেক বেশি বুঝদার, আর একটু শক্ত ধাঁচে গড়া। কিছুক্ষণ বাদে বলল, 'বৌদি, পুরো ব্যাপারটা আমাদের ঠান্ডা মাথায় সামলাতে হবে। একটুও ঘাবড়ে গেলে চলবে না। ভয় পেলে কিছুই সামাল দেওয়া যায় না। উটকো একটা টেলিফোন কল্‌কে তুমি এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন?'

'নেব না! কী বলছ তুমি!'

বৌদির বিস্ময়কে একটুও গুরুত্ব দিল না হৈমন্তী। 'টেলিফোনে অনেক উলটোপালটা কল্‌ আসে। আমাদের দেশে বদ-রসিকতা করার লোকের অভাব নেই। এই তো কালকেই একটা খবর পড়ছিলাম কাগজে। কে যেন ফোন করে এয়ারপোর্ট অথরিটিকে জানিয়েছিল — অমুক ফ্লাইটে বোমা আছে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ওই প্লেনটার সার্ভিস সাসপেন্ডেড। বম্ব্‌-স্কোয়াডের লোক গিয়ে ওই প্লেনে তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি চালাল, কিন্তু কোথাও কোনও বোমার সন্ধান পায়নি। নেহাতই একটা বোগাস টেলিফোন কল্‌।'

বৌদি হৈমন্তীর সব কথাকে প্রাণপণে বিশ্বাস করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মন থেকে একটুও সায় পেলেন না। বাধো-বাধো গলায় বললেন, 'টেলিফোনের ওই কথাগুলোকে একবারও তো রসিকতা বলে মনে হল না। রীতিমত শাসানি। এখানকার সব খবরাখবরও রাখে —'।

'কীরকম?'

'ওই তো, ওর দাদুর কথা বলল না—। আমি যখন বললাম — আমি সামান্য একটা স্কুলে পড়াই, ওই টাকায় আমাদের সংসার চলে, আমার পক্ষে পঁচিশ লাখ টাকা বার করা অসম্ভব। তখন অদ্ভুত ভাবে হেসে বলল, টাকাটা আপনাকে বার করতে কে বলেছে! টাকা দেবে রনির দাদু। বিমল মৈত্র বিরাট ব্যবসায়ী। পঁচিশ লাখ ওর হাতের ময়লা। রনি ওর একমাত্র নাতি। ওকে বাঁচাবার জন্যে বুড়ো ওই টাকাটা বার করে দেবে ঠিক। আমি তখন বললাম — সত্যি কথাই বললাম। বললাম, রনির দাদুর সঙ্গে কয়েক বছর আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। রনির জন্যেই নেই। নেশা-ভাঙ করে যা সব কান্ড করে বেড়ায়! দাদু মানী মানুষ, সমাজের পাঁচজন ওঁকে মেনে চলে। রনিকে উনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরাবার অনেক চেষ্টা করেছেন। বারদুয়েক নার্সিংহোমেও ভর্তি করেছিলেন চিকিৎসার জন্যে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। নার্সিংহোম থেকে বেরুবার পরে আবার সেই নেশা। দাদু তাই আর ওর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেন না। আমি যেহেতু রনির মা। দোষের ভার আমাকেও তাই নিতে হয়েছে। হয়তো ভেবেছেন, ছেলের বখে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রশ্রয় আছে। শ্বশুরমশাই আমার সঙ্গেও তাই আর কোনও যোগাযোগ রাখেন না।' বৌদি থামতেই হৈমন্তী বলল, 'এত সব কথা বলে দিয়েছ!' দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে জবাব দিলেন বৌদি। 'এত সব বলেছি কি না মনে পড়ছে না। রনির অনেকগুলো দোষের একটা দোষ হল দাদুর নাম ভাঙানো। এমন একজন বিখ্যাত লোক, এমন একজন পয়সাওয়ালা মানুষ যে ওর দাদু — এই কথাটা ও নানা জায়গায় বলে বেড়ায় তার ফলে কোথাও কোথাও ও হয়তো কিছু বাড়তি সুবিধে পেয়ে থাকে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে — ওর ওই চালবাজিটাই এত বড় একটা বিপদ ডেকে এনেছে।'

'চালবাজি!'

'তা নয়তো কী? মিথ্যেকে সত্যি বলে নিজের স্বার্থে চালাবার চেষ্টা করলে তাকে চালবাজি ছাড়া আর কী বলা যায়?'

হৈমন্তী এখনও বোধহয়, ধাঁধার মধ্যে খানিকটা জড়িয়ে ছিল। একটু ইতস্তত করে বলল, 'কোন্ মিথ্যেকে সত্যি বলে চালাবার চেষ্টা করছে রনি! বিমল মৈত্র তো সত্যিই ওর দাদু। আর, ও তো একমাত্র নাতি'।

'ঠিকই। কিন্তু লোককে আগ বাড়িয়ে শুধু এইটুকু বললেই তো সব বলা হয় না। ওর তো সেই সঙ্গে বলা উচিত — দাদু কয়েক বছর ধরে ওর মুখদর্শন করেন না, কথা বলেন না। এমনকী, ওই কথাটাও প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছেন —।'

'কোন্ কথাটা?'

'দাদু ওঁর স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির কোনও কিছুই ওড়াবার জন্যে নাতিকে দিয়ে যাবেন না। ওঁর যা আছে তার পুরোটাই মিশন এবং বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে দান করবেন। পাঁচজনের কাছে দাদুর নাম শোনাবার সঙ্গে সঙ্গে এগুলোও শোনানো উচিত ছিল ওর। তাহলে আজ ওকে আর এই বিপদে পড়তে হত না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিপদে ওকে পড়তেই হত — হয়তো অন্য ধরনের বিপদ! কী ভয়ংকর এক পথে চলে গিয়েছে ছেলেটা!'

মাথা নিচু করে দুহাতে আঁচল চেপে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন সুদেষ্ণা।

একটু অসহায় বোধ করছিল হৈমন্তী। সুদেষ্ণাবৌদিকে ও খুব পছন্দ করে। এই মানুষটিকে ও কখনও এ ভাবে ভেঙে পড়তে দেখেনি। বরং বিভিন্ন ব্যাপারে ও বৌদির কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকবার। বৌদি লেখাপড়া জানা মানুষ। অনেক বিষয়ই তলিয়ে বুঝবার ক্ষমতা ধরেন। যে সব পরামর্শ ওকে দিয়েছিলেন তাতে ওর সমস্যার সমাধানও হয়েছে অনেকখানি। কিন্তু ওই যে বলে না — নিজের বিপদে জ্ঞানী মানুষরাও মাঝেমধ্যে হতবুদ্ধি হয়ে যান! বৌদির এখন নির্ঘাত সেই অবস্থা।

বেশ কিছুদিন ধরে সমাজসেবা করছে হৈমন্তী। কিছু সমাজসেবী, এমনকী কয়েকজন মনস্তাত্ত্বিকের সঙ্গেও ওর ভাল পরিচয় আছে। সমাজের আজেবাজে ব্যবস্থার শিকার কিছু মানুষকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে ওর। দেখেশুনে এটুকু বুঝেছে — অবস্থার শিকার কাউকে দেখে নাক সিঁটকে চলে যাওয়া উচিত নয়। বরং চেষ্টা করলে গোল্লায় যাওয়া কিছু মানুষকে সুস্থ করে তুলে ঠিক পথে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে আবার। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হৈমন্তীর মাথার মধ্যে এইসব কথা আর কিছু উদাহরণ ভেসে উঠেছিল।

বৌদির পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে হৈমন্তী নরম গলায় বলল, 'কেঁদো না বৌদি। তোমাকে তো শক্ত হতেই হবে। আমার মন বলছে — এ বিপদ শিগ্‌গিরই কেটে যাবে। টেলিফোনের ওই শাসানিকে সত্যি বলে ধরলে আমাদের তো এখন কিছু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।'

আঁচল দিয়ে চোখ ভাল করে মুছে সোজা হয়ে বসেছিলেন বৌদি। 'কী ব্যবস্থা?'

'আমার মনে হয় পুলিশকে এক্ষুনি আমাদের খবর দেওয়া দরকার।'

আঁতকে উঠেছিলেন বৌদি। 'টেলিফোনে আমাকে ওই লোকটা রীতিমত শাসিয়েছে। বলেছে — পুলিশে খবর দিলে ফল খুব খারাপ হবে।'

'সে তো সব কিডন্যাপারই বলে থাকে। ওরা তো ভয় দেখিয়ে, কাজ উদ্ধার করতে চায়। টেলিফোনে শাসানি দেবে, হুমকি দেবে;আর পার্টি সুড়সুড় করে নিয়ে গিয়ে ওদের হাত মুক্তিপণ তুলে দিয়ে অপহরণ করা মানুষটাকে ফিরিয়ে আনবে। এটাই যদি দস্তুর হত, তাহলে আমাদের কেউই স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকতে পারতাম না। বহু কিডন্যাপারকে মুক্তিপণের টোপ দিয়ে পুলিশ তো হাতেনাতে ধরেছে।'

হৈমন্তীর কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে বেশ একটা জোর ছিল। কিন্তু সেই জোর ওর বৌদিকে একেবারেই স্পর্শ করতে পারেনি। কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন সুদেষ্ণা। একটু পরে সামান্য থেমে থেমে বললেন, 'না-না, পুলিশকে খবর দেওয়ার দরকার নেই। খবর দিলে অনেক সময় অঘটনও ঘটে যায়। কাগজে ওই সব রিপোর্টও তো দেখেছি। তাছাড়া থানায় জানালে সে খবর লিক্‌ও হয়ে যেতে পারে। শুনেছি, থানায় ওদের লোক ফিট করা থাকে।'

আশ্বস্ত করার গলায় হৈমন্তী বলল, 'আমরা তো লোকাল থানাকে জানাব না। জানাব লালবাজারকে। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে আমার চেনা একজনের খুব জানাশোনা আছে। আমি তাকে দিয়েই বলাব।'

কিন্তু এই সোর্সটাও সুদেষ্ণা বৌদিকে পুরোপুরি সাহস জোগাতে পারল না। একটা ঢোক গিলে চাপা গলায় বললেন, 'পুলিশকে জানাবার ব্যাপারটা পরে না হয় ভাবা যাবে। তোমার মাথায় অন্য কোনও বুদ্ধি আসছে না—।

আবছা একচিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল হৈমন্তীর ঠোঁটে। 'এ ব্যাপারে আর কী বুদ্ধি হতে পারে!'

'না, বলছিলাম কী, তোমার সঙ্গে তো অনেকের সঙ্গে জানাশোনা, অন্য কাউকে দিয়ে ওদের পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রনিকে উদ্ধার করা যায় না।'

হৈমন্তী বুঝল, বৌদির মাথা এই মুহূর্তে একেবারেই কাজ করছে না। না করাই স্বাভাবিক। বিধবা মানুষ সংসারে আর কেউ নেই, একমাত্র সন্তানের ভয়ংকর এই বিপদে ঠান্ডা মাথায় কিছু ভাবা সম্ভব নয়।

বৌদির পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে হৈমন্তী আস্তে আস্তে বলল, 'কিডন্যাপাররা সব সময় তো আড়ালে থেকে অপারেশন চালায়। লুকিয়ে থাকা কাউকে কিছু বোঝানোর সুযোগ নেই। আর যারা ক্রিমিন্যাল, তাদের বোঝানো, না-বোঝানো দুই-ই সমান। তবু আমি বলব।'

আশার কথা শোনার জন্য মুখিয়ে ছিলেন বৌদি। 'কী বলবে?'

'না-না, আমি নয়, তুমি বলবে। হয় আজ রাত্তিরে, নয় কাল সকালে ওরা আবার তোমাকে ফোন করবে। তুমি পুরো অবস্থাটা ওদের তখন বুঝিয়ে বোলো —।'

'কী বলব?'

'এই যে, যা বলছিলে এতক্ষণ -। বলবে, রনির সঙ্গে ওর দাদুর কোনওরকম সম্পর্ক নেই। দাদু ওর ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট। মুক্তিপণ হিসেবে কিছুই দেবেন না।'

ঢোক গিললেন বৌদি। 'হ্যাঁ, সে সব তো আমি বলবই। কিন্তু —।'

'কিন্তু কী?'

'ওরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?'

'সেটা পরের ব্যাপার। তুমি এদিকের পুরো ব্যাপারটা জানিয়ে দেবে। কিছু রাখঢাক করবে না। সব শুনে যদি ওদের মনে হয় — ভুল লোককে অপহরণ করেছে — অযথা ঝুঁকির মধ্যে না গিয়ে রনিকে ওরা ছেড়েও দিতে পারে।'

আশার কথায় একটুও আলো ফুটল না বৌদির থমথমে মুখে।

আরও কিছুক্ষণ থাকার পরে হৈমন্তী বলল, 'আমি তাহলে এখন উঠছি বৌদি। একদম মন খারাপ করবে না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা কথা, কোনও দরকার পড়লেই আমাকে ফোন কোরো — তা সে যখনই হোক না কেন। তুমি সবে স্কুল থেকে ফিরেছ, হাতমুখ ধুয়ে এখন খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নাও।'

অনেকক্ষণ বাদে বৌদিকে একটু বুঝি স্বাভাবিক দেখাল। হৈমন্তী ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী জন্যে এখন এসেছিলে বললে না তো?'

হাসল হৈমন্তী। 'ও তেমন কিছু না। পরে বলব একদিন।'

।। দুই ।।

পরদিন সকাল আটটার সময় হৈমন্তীর কাছে সুদেষ্ণা বৌদির ফোন গিয়েছিল। 'তুমি এখন একবার আসতে পারবে ভাই?'

বৌদির গলা আর আর্তস্বরের মধ্যে বোধহয় কোনও তফাত ছিল না। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি আসছি।'

পাড়ার মধ্যেই বাড়ি, দশ মিনিটের মধ্যে বৌদির বাড়িতে চলে এসেছিল হৈমন্তী।

ফ্ল্যাটের দরজা খোলাই ছিল, হৈমন্তী ঢুকতেই দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়েছিলেন সুদেষ্ণা। হৈমন্তী লক্ষ্য করল, এক রাতের মধ্যেই বৌদির চেহারা শুকিয়ে প্রায় আধখানা হয়ে গিয়েছে। মুখে কালচে ছাপ। বৌদি কেমন যেন খাপছাড়া ভঙ্গিতে বললেন, 'ফোন এসেছিল, একটু আগেই।'

ওদিকে চারজনের খাবার টেবিল। ধরতে গেলে বৌদিকে প্রায় ধরে ধরে ওই টেবিলে বসিয়ে পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়েছিল হৈমন্তী। 'সকালে চা-টা খেয়েছ তো বৌদি?'

বৌদির উত্তরটা ছিল হ্যাঁ-না'র মাঝখানে।

'স্কুলে যাবে না আজ?'

'স্পোর্টসের জন্যে আজ ছুটি।'

'বাঁচা গেছে। কাল রোববার। পারলে আরও দুটো দিন ছুটি নিয়ে নিও। তোমার একটু বিশ্রাম দরকার।'

থমথমে পরিবেশ একটু হালকা করতে চেয়েছিল হৈমন্তী। কিন্তু আবহাওয়ার গুমোট ভাব একেবারেই কাটল না। অবসন্ন মানুষের ভঙ্গি তে কয়েক মুহূর্ত বসে থাকার পরে বৌদি বললেন, 'কাল থেকে যতবার ফোন বেজেছে, ততবারই বুক কেঁপে উঠেছে। রাত্রে ঘুমোতে পারিনি একটুও। খালি ছটফট করেছি —'

'স্বাভাবিক।' হৈমন্তীর গলায় সহানুভূতির সুর।

মাথার ওপরে পাখা ঘুরছিল। হাওয়া আসছিল জানলা দিয়েও, তবু কেমন যেন দমবন্ধ অবস্থা। একটু ইতস্তত করার পর স্পষ্ট গলাতেই হৈমন্তী জিজ্ঞেস করল, 'ফোন কে করেছিল? কালকের সেই লোকটা?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলল?'

'প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, 'টাকার জোগাড় হয়ে গিয়েছে?'

'তুমি কী বললে?'

'সব কথা গুছিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু লোকটার কথা বলার ভঙ্গি এমন রাফ্ যে, প্রথম দিকে সবই গুলিয়ে গিয়েছিল —।'

'পরে বলেছ তো সব?'

'হ্যাঁ, সবই। বললাম — রনির সঙ্গে ওর দাদুর সম্পর্ক খুব খারাপ, উনি নাতিকে ছাড়াবার জন্যে একটা পয়সাও দেবেন না। তাই শুনে লোকটা বিচ্ছিরি ভাবে আমাকে ধমকে উঠে বলল : আপনি গিয়েছিলেন ওর দাদুর কাছে? বললাম — যাওয়া অর্থহীন। উনি কী উত্তর দেবেন আমার জানা। তাছাড়া, রনির জন্যে ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কও খারাপ হয়ে গেছে। বেশ কিছু দিন ওঁর সঙ্গে আমার কোনও কথাবার্তাই নেই।'

'কী বলল তার জবাবে?'

'খুব খারাপ একটা গাল দিল। তারপর আর আপনি-টাপনির মধ্যে যায়নি। ভাষাটাও জঘন্য।'

হৈমন্তীর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। 'নোংরা লোকরা তো নোংরা কথাই বলবে। কী বলল তোমাকে শেষ পর্যন্ত?'

'বলল - এখনই তুমি রনির দাদুর কাছে মুক্তিপণের কথা বলবে। নাতি-দাদুর মধ্যে অনেক সময় মান-অভিমান হয়, আবার সেটা মিটেও

যায়। এখন না মিটে উপায় নেই। দাদুকে বলবে — পরশুর মধ্যে টাকা আমাদের হাতে না পৌঁছলে রনির লাশ রাস্তায় পড়ে থাকবে। আমরা ফালতু চমকাচ্ছি না। শেষকালে ফের একটা নোংরা গাল দিয়ে বলল — পরে ফোন করছি আবার।'

কথাগুলো কোনওমতে বলার পরে বৌদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তারপর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললেন, 'আমি এখন কী করব কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না!'

হৈমন্তীর গলায় এবার একটু কর্তৃত্বের সুর ফুটল। 'বৌদি, তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে। ভেঙে পড়লে চলবে না। আমাদের সামনে বিরাট একটা সমস্যা, আর আমাদের হাতে কিন্তু একেবারেই সময় নেই।'

হৈমন্তীর কথায় বোধহয়, সামান্য কাজ হল। একটু নড়েচড়ে বসলেন সুদেষ্ণা। জানলা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছিল টেবিলের ওপর প্রান্তে। রোদের ওই ফালিটার দিকে তাকিয়ে হৈমন্তী বলল, 'আমার মনে হয় বৌদি, তোমার একবার রনির দাদুর কাছে যাওয়া উচিত।'

কেমন যেন হতভম্ব দেখালো সুদেষ্ণাকে। 'অ্যাদ্দিন ওঁর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। এখন আমি কোন্ মুখে ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াব। ওঁর প্রকৃতি তো আমি খুব ভাল ভাবে জানি। একবার কারও ওপর চটে গেলে, কোনও অবস্থাতেই তাকে আর সহজ ভাবে নিতে পারেন না। রনির ওপর ওঁর অসন্তুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। বারকয়েক রনির জন্যে ওঁর মানসম্মান নষ্ট হয়েছে। এসব ওঁর পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়।'

'আমি তোমার সব কথা মেনে নিলাম বৌদি। কিন্তু এই রকম বিরাট বিপদের দিনে তোমার তো ওঁর কাছে যাওয়া উচিত। সম্পর্ক ইদানীং খারাপ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একবার খারাপ হওয়া মানে তো বরাবরের জন্যে খারাপ হওয়া নয়। কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গিয়েছে, তুমি একবার গেলেই মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কেমন যেন কঠোর মতো হয়ে গিয়েছিলেন সুদেষ্ণা। একটু বাদে বললেন, 'আমি আমার শ্বশুরমশাইকে খুব ভালভাবে চিনি হৈমন্তী। অসম্ভব গোঁ। ছেলেকে খুবই ভালবাসতেন, কিন্তু সেই ছেলেও কখনও তাঁর জেদ ভাঙতে পারেনি। নাতির ওপর এখন ক্ষেপে আছেন, ওর মুক্তিপণের ব্যাপারে উনি কিছুই দেবেন না।'

'না দিক। বিপদের কথা তোমার তাঁকে জানানো কর্তব্য, তুমি জানিয়ে দিলে — ব্যস —। না হলে পরে উনি কখনও বলতে পারেন — বৌমা, তোমরা এত বড় একটা বিপদের মধ্যে পড়েছিলে, অথচ আমাকে একবার জানাবার প্রয়োজনও বোধ করলে না!'

শেষ যুক্তিটার কাছে একটু কাবু হয়ে পড়েছিলেন সুদেষ্ণা। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'আমার গা-হাত-পা ঝিমঝিম করছে, এই অবস্থায় কী করে যাব আমি ওখানে!

'তোমার শ্বশুরমশাইয়ের বাড়ি আমি চিনি। বেশি দূরে নয়, এখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিলে মিনিট-পনেরোর মধ্যেই পৌঁছে যাবে।'

'না-না, আমি পারব না। আমার শরীর ভাল নেই।' 'ঠিক আছে, আমি যাব তোমার সঙ্গে'।

কথাটা শুনে হৈমন্তীর হাত চেপে ধরেছিলেন ওর সুদেষ্ণাবৌদি। কিছুক্ষণ ওঁর মুখে আর কোনও কথা ছিল না।

একটু বাদে হৈমন্তী বলল, 'বৌদি, শুধুশুধু আর দেরি করে কী লাভ! হাতে তো আমাদের একেবারেই সময় নেই। চলো, আমরা এখনই চলে যাই। এই সময়ে কি ওঁকে বাড়িতে পাওয়া যাবে?'

'পাওয়া তো উচিত। সকালের দিকে উনি সাধারণত বেরোন না।'

'একটা কি ফোন করবে?'

প্রস্তাবটা দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সংশোধন করেছিল হৈমন্তী 'না-না, ফোন করে যাওয়ার দরকার নেই।'

সুদেষ্ণা মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু ওঁর চোখের মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল। সেই প্রশ্নের উত্তর দিল হৈমন্তী। 'তোমার সঙ্গে ওঁর যা সম্পর্ক, তাতে ফোন করে যাওয়াটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তাছাড়া— । এবারও সুদেষ্ণার চোখে আর একটা প্রশ্ন।

সেই প্রশ্নেরও উত্তর দিল হৈমন্তী। "যদি উনি টেলিফোনে জানতে চান — কী দরকার? তোমাকে বলতেই হবে। টেলিফোনে বলাটলাগুলো আধখ্যাঁচড়া গোছের হয়ে যায়। বুঝিয়ে বলার সুযোগ থাকে না। দু-চার কথা শোনার পরেই উনি আবার 'আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়' বলে টেলিফোন নামিয়ে রাখতে পারেন। চলো, আমরা সোজাসুজিই চলে যাই। এখন না পেলে কখন পাওয়া যাবে জেনে ফিরে আসব। তুমি চটপট তৈরি হয়ে নাও বৌদি, আমি বাড়িতে গিয়ে শাড়িটা পালটে আসছি।'

সুদেষ্ণার কিছু হয়তো বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু উনি তা আর বলার সুযোগ পেলেন না। কথাটা শেষ করার পরেই হৈমন্তী দ্রুত গতিতে বেরিয়ে গিয়েছিল ফ্ল্যাট থেকে।

সওয়া নটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল ওরা দু'জন। মোড়ের মাথায় আসতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিল। ট্যাক্সিতে উঠে কোথায় যেতে হবে হৈমন্তীই বলে দিয়েছিল ট্যাক্সিওয়ালাকে। সকালের রাস্তা ফাঁকা, ট্যাক্সি বেশ জোরে ছুটতে শুরু করেছিল।

সুদেষ্ণার মুখে অনেকক্ষণ ধরে একটাও কথা নেই। বৌদিকে সহজ করার জন্য হৈমন্তী বলল, 'টেলিফোনে যা-যা শুনেছ সব বলবে তোমার শ্বশুরমশাইকে। উনি বয়স্ক, বিচক্ষণ মানুষ — ঠিক একটা উপায় বার করে দেবেন।'

হতাশ মানুষের গলায় সুদেষ্ণা বললেন, 'এর তো একটাই উপায়, কিন্তু উনি কিছুতেই তাতে রাজি হবেন না।'

এবার সামান্য শাসনের সুর ফুটে উঠেছিল হৈমন্তীর গলায়। 'উনি কি বলবেন, তা নিয়ে তোমার এখন ভাবার দরকার নেই। তুমি শুধু তোমার কথাগুলো গুছিয়ে রাখো। আর, এসব কথা বলার আগে একটু কুশলসংবাদ নিও। প্রণাম কোরো। তোমাকে এগুলোর বলার অবশ্য কোনও মানে হয় না জানি। আদবকায়দা আমার চাইতে ঢের বেশি জানা আছে তোমার। কিন্তু যেহেতু তুমি এখন ভয়ংকর একটা বিপদের মধ্যে আছ, কথাগুলো তোমাকে একটু শুধু মনে করিয়ে দিলাম।'

অভিজাত পাড়ায় বিশাল এক অট্টালিকার সামনে এসে ট্যাক্সি দাঁড়াল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে নামলেন সুদেষ্ণা।

ওর পেছনে হৈমন্তী।

এ রাস্তার দুদিকের ফুটপাথ বেশ চওড়া। একটু দূরে দূরে মস্ত ঝাঁকড়া গাছ। বিয়ের পরে এই বাড়িতেই উঠেছিলেন সুদেষ্ণা। কিন্তু নতুন বউ কয়েক বছরের পুরনো হওয়ার পরে বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। তবে বাড়ি ছাড়ার তেমন কোনও কারণই ছিল না। যাকে বলে অহংয়ের লড়াই। ছেলে তো বাবারই ছেলে, দুজনেই অসম্ভব জেদি। সামান্য মতান্তরই বাড়ি ছাড়ার কারণ।

এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার বছর কয়েক পর থেকে সম্পর্ক একটু-একটু করে আবার ভাল হতে শুরু করেছিল। ভাল হওয়ার পেছনের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল নাতি। কিন্তু সম্পর্ক আবার খারাপ হওয়ার পেছনেও ওই নাতি।

ফুটপাথে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে অনেক কথা মনে পড়ে গিয়েছিল সুদেষ্ণার।

ওদিকের ওই গাছটা কৃষ্ণচূড়া। ফুলের সময় গোটা গাছ লাল ফুলে ছেয়ে যায়। এখন ফুলের চিহ্ন নেই, কালচে-সবুজ পাতা গাছের ডালে-ডালে। গাছটার বোধহয় অনেক বয়েস হয়ে গিয়েছে!

স্মৃতির চাপে কেমন যেন স্থবির হয়ে গিয়েছিলেন সুদেষ্ণা। হৈমন্তীরও চোখ ঘুরছিল চারদিকে, তবে বেশিক্ষণ দৃষ্টি আটকে ছিল বিশাল ওই বাড়িটার ওপর। বাড়ির গেটে পাথরের নামফলকে বিমল মৈত্রের নাম। খুব বড় এই ব্যবসায়ীকে শহরের অনেকেই একডাকে চেনে। বিত্তবান মানেই কমবেশি প্রভাবশালী। হৈমন্তী শুনেছে, মন্ত্রিমহল এবং প্রশাসনের সঙ্গে বিমল মৈত্রের সম্পর্ক খুব কাছের।

রাস্তা দিয়ে পরের পর কয়েকটা গাড়ি গিয়েছিল বলে রাস্তা পেরুতে ওদের একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। বৌদির হাত ধরে একটা টান মারার পরেই সচল হয়েছিল বৌদি।

দরজার বেল টেপার একটু পরেই দরজা খোলা হয়েছিল। বড় বাড়িতে কাজের লোকের সংখ্যা বেশি। এতকাল বাদে এ বাড়িতে বৌদিকে দেখে ভৃত্যমহলে বেশ একটু সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

মৈত্রসাহেব তাঁর দোতলার স্টাডিতে, সুদেষ্ণাদের আসার খবর খাসবেয়ারা মারফত আগেই পৌঁছে গিয়েছিল ওঁর কাছে। সুদেষ্ণাদের দেখে তাই তিনি একটুও চমকালেন না।

বৌমা ঝুঁকে পড়ে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন, উনি শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন 'থাক-থাক'। কিন্তু বৌমা মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও প্রণাম করেছিলেন। বাড়ির বউ একটু সরতেই হৈমন্তীও টুক করে একটা প্রণাম সেরে ফেলেছিল।

চোখে প্রশ্ন ফুটিয়ে ওর দিকে তাকাতেই বৌমা বলল, 'আমাদের ওই পাড়ায় থাকে। খুব ভাল মেয়ে।'

কথার জবাবে কিছুই বললেন না বিমল মৈত্র। একটু বাদে মৃদু গলায় বললেন, 'বোসো।'

এদিকের টেবিলটা কাজের টেবিল। টেবিলের ওপর বেশ কয়েকটা খবরের কাগজ, একটা ট্রে, চায়ের কাপ। এখানে বসে কাগজ পড়তে পড়তে কিছু নোট নিচ্ছিলেন উনি। আগন্তুকদের দেখেই উঠে পড়েছিলেন। আগের চেয়ারে আর বসলেন না। 'বোসো বলার পরেই ওদিকের সোফার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

মস্ত ঘরের একপাশে তিন সারি সোফাসেট। মধ্যিখানে কার্পেট, কার্পেটের মধ্যিখানে টেবিল। টেবিলের ওপরে চিনেমাটির পাত্রে একরাশ ফুল।

দেয়াল ঘেঁষা সোফায় বসেছিলেন মৈত্রসাহেব। উলটোদিকের সোফায় জড়সড় হয়ে বসল ওঁর বৌমা আর হৈমন্তী। মুখে কোনও কথা ছিল না। অস্বস্তিকর নীরবতা।

হৈমন্তী আড়াচোখে সামনে মানুষটিকে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিল। বয়েস সত্তরের আশেপাশে। লম্বা চেহারা, মাথার চুল কাঁচায়-পাকায় মেশানো। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। দৃষ্টি বেশ ধারালো।

একটু বাদে বৌমা সামান্য বাধো-বাধো গলায় বললেন, 'আপনার শরীর ভাল আছে তো বাবা?'

'হ্যাঁ।' ওইটুকু বলার পরেই উনি থেমে গিয়েছিলেন, পালটা কুশলসংবাদ নেওয়ার মধ্যে গেলেন না।

সাজানো কথাগুলো বৌমার বোধহয় গুলিয়ে গিয়েছিল। নিজেকে একটু সামলে নেওয়ার পরে মুখ খুলেছিল আবার। খুব একটা গুছিয়ে বলা গেল না, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল বারবার; তবু একটু-একটু করে দু-দফা টেলিফোনের সব কথাই বলে ফেললেন। টেলিফোনের শাসানির কথা, মুক্তিপণের অঙ্কের কথা — সব। বৌমা এ-কথাও জানাল — তার আর্থিক অক্ষমতার কথা অপহরণকারীদের সে জানিয়েছে। কিন্তু ওরা এদিককার সব খবরই রাখে। ওরাই বলল — রনির দাদুকে সব জানাও, তিনিই সব টাকা দিয়ে দেবেন। তিনদিনের মধ্যে পঁচিশ লাখ টাকা ওদের হাতে না পৌঁছলে রনিকে ওরা শেষ করে ফেলবে।

কথাগুলো যখন সুদেষ্ণাবৌদি বলছিলেন, হৈমন্তী তীক্ষ্ণ চোখে বিমল মৈত্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু ওঁর প্রতিক্রিয়া বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেনি। মানুষটির চোখমুখ আগের মতোই অভিব্যক্তিহীন।

বৌমার সব কথা বলা শেষ হল এক সময়। কিছু কিছু কথা একবারের জায়গায় দুবারও বলা হয়ে গিয়েছিল। এক সময় থেমে গেল বৌমা, কিন্তু শ্বশুরমশাইয়ের মুখে কোনও কথা নেই। ঘরের মধ্যে একটু আগের সেই অস্বস্তিকর নীরবতা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এসেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে কেমন যেন আর্তস্বরে বৌমা বলে উঠল, 'আমি এবার কী করব বাবা?'

গম্ভীর গলায় শ্বশুরমশাই বলে উঠলেন, 'তুমি কী করবে আমি জানি না। তবে আমি কী করব, আমি জানি।'

'কী?'

'রনি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না।'

'মানে?'

'রনির ফুর্তি করার জন্যে পঁচিশ লাখ টাকা ওর হাতে আমি তুলে দিতে পারব না।'

আঁতকে উঠেছিল বৌমা। 'রনিকে তো অপহরণ করা হয়েছে বাবা। টাকাটা চাইছে অপহরণকারীরা। এখন তো রীতিমত শাসানি দিচ্ছে। বলছে — ওদের দাবি না মানলে রনিকে ওরা মেরে ফেলবে।'

ঠাট্টার একটা হাসি ফুটে উঠেছিল বিমল মৈত্রের চোখেমুখে। 'তাই!'

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল বৌমা। একটু বাদে থেমে থেমে বলল, 'আপনি কি আমার কথাগুলো বিশ্বাস করছেন না বাবা?'

'কেন করব না? তোমার প্রতিটি কথাই সত্যি। যা শুনেছ, তাই বলেছ।'

'তাহলে!'

'আমি রনির কথা বিশ্বাস করছি না।'

'কিন্তু বাবা, রনি তো —।'

হাত তুলে বৌমাকে থামিয়ে দিয়ে ধনী এবং প্রভাবশালী শ্বশুরমশাই বললেন, ' এ গপ্পো একেবারে ছেঁদো গপ্পো। টেলিফোনে যে কথাগুলো তোমাকে বলা হয়েছে তা নির্ঘাত রনির নির্দেশেই বলা হয়েছে। যে তোমাকে টেলিফোন করেছিল, রনি হয়তো তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। নেশা-ভাঙ-ফুর্তি করার জন্যে বিভিন্ন সময়ে নানান পথ নিয়েছে তোমার ওই গুণধর ছেলে। পুলিশের হাতেও ধরা পড়েছে কয়েকবার। এবারের পথটা নতুন। অবশ্য ওর কাছে নতুন। আসলে ছেঁদো। ছোটখাটো অপরাধীরা এমন কান্ড অনেকদিন ধরেই করে আসছে।'

প্রবীণ, বিচক্ষণ শ্বশুরমশাইয়ের কথা শুনে দ্বিধা সঙ্কোচের জালে জড়িয়ে গিয়েছিল বৌমা। শেষের দিকে একটু অপমানিতও বোধ করেছিল। সামান্য ইতস্তত করার পরে বলল, 'কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তো সত্যিও হতে পারে। বানানো ঘটনা বলে আমরা যদি চুপ করে থাকি, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেও তো যেতে পারে।'

বৌমার সংশয়কে এক ধাক্কায় উড়িয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় শ্বশুরমশাই বললেন, 'আমার হাতে যদি কোনও প্রমাণ না থাকত, যে কথাগুলো তোমাকে যে ভাবে বলেছি, হয়তো ঠিক সেই ভাবেই বলতাম —।'

একটু বুঝি কেঁপে উঠেছিল বৌমা। 'কোন্ প্রমাণের কথা বলছেন আপনি?'

বিমল মৈত্রের পরনে ধপধপে সাদা হাফহাতা পাঞ্জাবি আর পাজামা। উনি চোখের চশমা খুলে পাঞ্জাবির এক প্রান্ত দিয়ে, চশমার কাচ মুছলেন, তারপর চশমাটা আবার পরে নিয়ে বললেন, 'ব্যবসা বাণিজ্যের সুবাদে নানা স্তরের বহু লোকের সঙ্গে আমার মেলামেশা, তার ফলে অনেক আগেই অনেক খবর আমার কানে চলে আসে। রনি কাল রাতে পার্ক স্ট্রিটের একটা বারে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছিল। আজ সকালেই সেই খবরটা আমার কানে এসে গেছে। কাল অনেক রাতে ফুর্তিফার্তা করে যে মারামারি করে, তার মুক্তির জন্যে মুক্তিপণ চেয়ে তোমার কাছে ভর-সন্ধেয় ফোন যায় কী করে?'

শ্বশুরমশাইয়ের কথা শুনে চমকে উঠেছিল বৌমা। পাশে বসা হৈমন্তীরও একই দশা। বৌমার মুখ থেকে একটিমাত্র শব্দই শুধু বেরিয়ে এল, 'তাই!'

বিমল মৈত্রের মুখচোখের ভঙ্গি একই রকম। এই ধরনের চালাকি উঠতি অপরাধীরা করে থাকে। অপরাধ জগতে রনি তো এখন আর একেবারে আনকোরা নয়, ওর বুদ্ধি তো আর একটু পাকার কথা ছিল!'

শ্বশুরমশাইয়ের কথার মধ্যে পরিষ্কার একটা খোঁচা ছিল, কিন্তু খোঁচাটা ওর বৌমা একেবারেই গায়ে মাখল না। ছেলের প্রাণসংশয়ের কোনও আশঙ্কা নেই — এই খবরটাই মাকে ভীষণ ভাবে স্বস্তি দিয়েছিল। স্বস্তির চিহ্ন ওর কণ্ঠস্বরের মধ্যেও ফুটে উঠেছিল। 'রনি তাহলে সত্যি-সত্যি কোনও বিপদের মধ্যে পড়েনি!'

একজনের স্বস্তি আর একজনের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। বিমল মৈত্র একটু কর্কশ গলায় বললেন, 'না, ও নিজে তো বিপদের মধ্যে পড়েইনি, অন্য যাদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিল — তারাও পড়েনি।'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলেন মৈত্রসাহেব, ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। বৌমা আর কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, 'আমি তাহলে এবার উঠি।'

'ঠিক আছে, আমাকেও বেরুতে হবে এক্ষুণি।'

উঠে পড়েছিল সুদেষ্ণা আর হৈমন্তী।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরে সটান কিছুটা হেঁটে গিয়েছিল দুজনে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। হৈমন্তী এই বয়েসেই অনেক কিছু দেখেছে, জেনেছে; কিন্তু সম্পর্কের এমন শীতলতা আর কখনও দেখেনি। হাঁটতে হাঁটতে বিচিত্র এই সম্পর্কের বিশ্লেষণ নিজের মতো করে করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু খুব একটা থৈ পাচ্ছিল না।

ফুটপাথ ধরে সোজা কিছুটা যাওয়ার পরে পথ বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে, সেই দিকেই ঘুরে গিয়েছিল ওরা। আসলে দুজনেরই মনে হচ্ছিল, কিছু অদৃশ্য চোখ পেছন থেকে ওদের দেখছে। দৃষ্টিতে বুঝি জ্বালা আছে। অবজ্ঞা আছে, ঠাট্টা আছে। বাঁক ঘোরার পরে অস্বস্তিকর ওই অভিজ্ঞতা থেকে দুজনেই খানিকটা মুক্তি পেয়েছিল।

একটু বাদে সুদেষ্ণা পেছন দিকে একবার তাকালেন। হাঁটার গতি শ্লথ হল, তারপর কেমন যেন বিপর্যস্ত মানুষের ভঙ্গিতে বললেন, 'এই জন্যেই আমি এখানে আসতে চাইছিলাম না, ভীষণ অপমানিত বোধ হচ্ছে —।'

বৌদিকে সামলাবার সব দায়িত্ব বুঝি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল হৈমন্তী। একটু জোর গলাতেই বলল, 'কেউ কাউকে অপমান করতে চাইলেও করতে পারে না। তোমাকে বৌদি আজকে আশ্চর্য ডিগনিফায়েড দেখাচ্ছিল। এত বড় একটা সমস্যা নিয়ে গিয়েছিলে তুমি, কিন্তু তোমাকে একবারের জন্যেও কৃপাপ্রার্থী বলে মনে হয়নি। ঘটনাটা জানানো তোমার কর্তব্য ছিল, সেটা তুমি সুন্দর ভাবে জানিয়ে দিয়েছ। ব্যস।'

হৈমন্তীর কথার কোনও উত্তর দিলেন না সুদেষ্ণা। সোজা যেমন হাঁটছিলেন, তেমনি হাঁটতে লাগলেন। এই এলাকাটা কলকাতার

পুরনো আমলের একটি অভিজাত এলাকা। বহুতলের নজর পড়েনি এখনও এদিকে। অধিকাংশ বাড়িই দোতলা বা আড়াইতলা, সামনে পেছনের ফাঁকা জমিতে গাছগাছালি। বাড়িতে লোকের সংখ্যাও কম।

রাস্তার সাইডওয়াক বেশ চওড়া। রাস্তায় লোকজনও তেমন নেই। বাড়ির দেওয়াল বা পাঁচিল ঘেঁষে চা আর সিগারেটের ঝুপড়ি গজায়নি। দু-পাশের গাছের মাথায় বেশ কিছু পাখি। এমন রাস্তায় লম্বা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সুদেষ্ণা বোধ হয় এতক্ষণ ধরে জমে-থাকা ওঁর উদ্বেগ-উত্তেজনা আর অস্থিরতা বেশ কিছুটা কমিয়ে ফেলেছিলেন।

হৈমন্তী হঠাৎ বলল, 'একটা খবর পেয়ে কিন্তু বেশ লাগছে বৌদি।'

'কী খবর?'

'রনি কোনও বিপদের মধ্যে পড়েনি।'

'কী করে বুঝলে?'

'বাহ্! তোমার শ্বশুরমশাই বললেন না — কাল রাতের দিকে রনিকে পার্ক স্ট্রিটে দেখা গেছে। তবে ওই মারামারির ব্যাপারটা সত্যি নাও হতে পারে।'

সায় দেওয়ার গলায় বৌদি বললেন, 'হ্যাঁ, ওঁর ওই কথাটা শুনে তখন আমিও কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলাম। ছেলে তো বখে গেছে। ওকে নিয়ে কোথাও কিছু বলার মতো মুখ নেই আমার। তবু মন্দের ভাল-বেঁচে আছে। যে-কোনও মা-ই এই অবস্থায় কিছুটা স্বস্তি পেত, আমিও পেয়েছি। কিন্তু —।'

'কিন্তু কী?'

'ওই যে উনি বললেন না — টেলিফোনের কথাগুলো তো রনির নির্দেশেই বলা হয়েছে। যে লোকটা টেলিফোনে ওই সব কথা বলেছে, রনি হয়তো তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। কথাটা আমি বিশ্বাস করি না।'

অবিশ্বাসকর কথাটা সুদেষ্ণার গলার স্বরে এত স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছিল যে, হৈমন্তী বেশ একটু অবাকই হয়েছিল। মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'ওই লোকটা টেলিফোনে যে ভাষায় আমাকে গালাগাল দিয়েছে। রনি পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে তা কিছুতেই সম্ভব হত না। বাবা মারা যাওয়ার পরে রনি একটু একটু করে মিসগাইডেড হয়েছে। কারণ কী আমি জানি না। হয়তো লুকনো কোনও অভিমান, হয়তো সঙ্গদোষ কিন্তু যতই ও খারাপ হোক না কেন একটা লোক ওই ভাষায় ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলবে, আর ও পাশে দাঁড়িয়ে সেটা মেনে নেবে — এটা কিছুতেই হতে পারে না।'

কথাটায় সায় দিল হৈমন্তী। বৌদি যা বলেছে, তার মধ্যে যুক্তি আছে। তার পাশাপাশি এক সমাজতাত্ত্বিকের কথাও মনে পড়ে গিয়েছিল ওর। এই তো সেদিন উনি বলছিলেন — নামতে নামতে মানুষ এমন একটা জায়গায় নেমে যায় — যখন ন্যায়-নীতি-বিবেচনা আর একেবারেই কাজ করে না।

সাইডওয়াক এদিকের বড় রাস্তায় এসে ঠেকেছিল। ওদিকে একটা ফাঁকা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। 'ট্যাক্সিটা ডাকব বৌদি?'

বৌদি একপাশে মাথা সামান্য ঝাঁকাতে হাত তুলেছিল হৈমন্তী। ট্যাক্সিওয়ালা এদিকেই তাকিয়েছিল। হাত তুলতেই এগিয়ে এসেছিল। ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছিল ওরা।

কোথায় যেতে হবে বলার পরেই ট্যাক্সি মুখ ঘুরিয়ে ছুট লাগিয়েছিল বড় রাস্তায়। জানলার বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন সুদেষ্ণা। ঠিক এই মুহূর্তে বলার মতো কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছিল না হৈমন্তী। রাস্তার ভিড় একটু-একটু করে বাড়ছিল। অফিসযাত্রীদের বড় ঝাঁকটা নির্ঘাত বেরিয়ে গেছে, চলার মধ্যে এখন যাদের একটু বেশি মাত্রায় ব্যস্ততা, তারা বোধহয় লেটলতিফ।

সূর্যের আলো এখন বেশ ঝকঝকে, তবে রোদ্দুরে জ্বালা নেই। ট্যাক্সির জানলা দিয়ে হাওয়া ঢুকছিল হু-হু করে। হঠাৎই হৈমন্তী বলে উঠল, 'রনির একটা খোঁজ নিলে হয় না বৌদি—।'

বৌদির মুখ এখনও জানলার বাইরের দিকেই, মুখ না ঘুরিয়েই বললেন, 'কী করে নেব! কোথায় ওর আড্ডা, কাদের সঙ্গে এখন ও মেশে — কিছুই তো জানি না।'

'ওর কোনও বন্ধুবান্ধবের ফোন নাম্বার নেই বাড়িতে?'

'যাদের আছে তাদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছে বহুদিন। হালে যাদের সঙ্গে মেশে বলে শুনেছি তাদের কাউকেই আমি চিনি না। রনির এখন বাড়িতে থাকা না-থাকা দুইই সমান। আগে মাঝেমধ্যে রাত্তিরে বাড়ি ফিরত না, এখন তো প্রায়ই ফেরে না। বাড়িতে যখন থাকে তখন আবার কথা বলার পরিস্থিতিও বিশেষ থাকে না। তোমরা তো সবই জানো হৈমন্তী। তোমাদের কাছে গোপন করা অর্থহীন। মাঝরাত্তিরে যখন ফেরে তখন তো ও আর নিজের মধ্যে থাকে না। ওর সঙ্গে তখন কথা বলা আর না-বলা দুই সমান। সকালে যখন আমি স্কুলে বেরুই। তখন ও অঘোরে ঘুমোয়। দুপুর-বিকেলে বেরিয়ে যায়, চাবি রেখে দেয় কেয়ারটেকারের কাছে। এই তো আমাদের মা-ছেলের সংসার।'

হৈমন্তী একটু নড়েচড়ে উঠে বলল, 'মাধুরীর সঙ্গে রনির এখন আর কোনও সম্পর্ক নেই?'

'কোন্ মাধুরী?'

'তিন নম্বর বাড়ির মাধুরী, মজুমদারদের বাড়ি।'

হৈমন্তীর দিকে ঘুরে বসলেন সুদেষ্ণা। 'কেন থাকবে বলো তো?'

এ কথার কী উত্তর হয় — জানা নেই হৈমন্তীর।

কয়েক মুহূর্ত বাদে আবার মুখ খুললেন সুদেষ্ণা। 'মাধুরী শুধুমাত্র ভদ্র আর শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে নয়, নিজেও যথেষ্ট সভ্য। লেখাপড়াই ওর ধ্যানজ্ঞান। রেজাল্টও করে সেই রকম। হ্যাঁ, একটা সময় রনির সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। কিন্তু বন্ধুত্ব হয় সমানে-সমানে। তাই না?'

'এখন আর কোনও সম্পর্ক নেই?'

'না, অনেক দিন নেই। এক-দেড় বছর আগেও বাড়িতে প্রায়ই ফোন করত মাধুরী। বেশির ভাগ সময়ই রনিকে পেত না। পেলেও দু-একটার বেশি কথা বাড়াত না। ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যেত রনি। ভাল মেয়েটার সঙ্গে ওই রকম বাজে ব্যবহার একেবারেই ভাল লাগত না আমার। কিন্তু কী আর করব! চুপ করে থাকতাম। একদিন ফোন করেছিল মাধুরী — রনি তখন বাড়ি ছিল না। আমি ওকে একটু বাজাতেই কেঁদে ফেলে বলেছিল — রনি অনেক দিন ধরে ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে। জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন? বলেছিল — পুরনো বন্ধুদের কারও সঙ্গেই ওর এখন কোনও সম্পর্ক নেই। ও কতগুলো আজেবাজে ছেলের সঙ্গে মেশে। সে কথা একদিন বলতেই রনি চটে গিয়ে ওকেই এড়িয়ে চলছে।'

গভীর মনোযোগের সঙ্গে কথাগুলো শুনছিল হৈমন্তী, বৌদি থামতেই জিজ্ঞেস করল, 'এই কথাগুলো মাধুরীর সঙ্গে তোমার ঠিক কদিন আগে হয়েছে?'

'তা প্রায় বছর দেড়েক হবে।'

'তারপর ও আর ফোনটোন করেনি?'

'করেছিল দু-একবার, কিন্তু রনির ওই ধরনের ব্যবহার পেলে ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কী দায় পড়েছে মাধুরীর!'

বৌদির কথার পিঠে হৈমন্তী কিছু আর বলল না, কিন্তু একটু বাদে কেমন যেন নিজের মনে বলে উঠেছিল, 'ওই সব আজেবাজে ছেলেদের খোঁজখবর মাধুরীর কাছে থাকলেও থাকতে পারে!'

একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন সুদেষ্ণা, হৈমন্তীর চাপা গলার কথা কানে যেতেই বললেন, 'কিছু বলছ?'

'না, কী আর বলব! আমার কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই ভাল ঠেকছে না। তোমার কাছে আবার টেলিফোন আসবে। টেলিফোনের ভাষা আরও খারাপ হবে। শাসানির মাত্রা আরও বাড়বে। আর, বিমল মৈত্রের ওই কথাটা যদি সত্যি না হয়, রনি সত্যি সত্যি বড় কোনও বিপদের মধ্যে পড়ে যেতে পারে।'

ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল মায়ের মুখ। 'কী করব আমি — কিছুই আমার মাথায় আসছে না হৈমন্তী।'

'আসার কথাও নয়। উপস্থিত আমাকে একটু চিন্তাভাবনা করতে দাও।'

'তুমি!'

আত্মবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠেছিল হৈমন্তীর চোখেমুখে। 'আমি তো আর একা নই। শোনো, এখন আর তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি না, পরে আসব।'

ট্যাক্সি পাড়ায় ঢোকার একটু আগে মোড়ের মাথায় নেমে পড়েছিল হৈমন্তী।

।। তিন ।।

বেলা সাড়ে তিনটে। বিখ্যাত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্রের ছোট্ট অফিসে মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছে হৈমন্তী। পৌনে তিনটেয় এসেছিল, এখন সাড়ে তিনটে। মিনিট চল্লিশ ধরে কৌশিকদাকে রনির বৃত্তান্ত পুরোপুরি শোনানো হয়েগিয়েছিল হৈমন্তীর।

শুনতে শুনতে বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিল শখের গোয়েন্দা। কিছু কিছু উত্তর ওর কালো ডায়েরিতে খুব ছোট ছোট হরফে নোটও করে নিয়েছে। নোট করেছে সুদেষ্ণা মৈত্রর বাড়ির ঠিকানা ও কনট্যাক্ট নাম্বারও। এসব লেখার পরে মনোযোগের সঙ্গে আরও কিছু লিখছিল গোয়েন্দা ওর ডায়েরিতে।

টেবিলের উলটো দিকে বসে থাকা সত্ত্বেও ডায়েরির লেখাগুলোর একটা শব্দও স্পষ্ট হয়নি হৈমন্তীর কাছে। লেখার মধ্যে রহস্য সমাধানের কোনও সূত্রের ঝিলিক আছে কি না কে জানে?

কৌশিক মিত্রের বয়স বেশি নয়, কিন্তু এই বয়েসেই গোয়েন্দা হিসেবে ওর খুব নাম হয়েছে। চাঞ্চল্যকর বেশ কয়েকটা অপরাধের কিনারা করেছে ও। বছর তিন-চারেক আগে সমাজসেবার একটি অনুষ্ঠানে কৌশিককে নিয়ে গিয়েছিল হৈমন্তী। সেই পরিচয়কে হৈমন্তী আর ঝাপসা হতে দেয়নি। আসলে রহস্যকাহিনীর খুব ভক্ত এই মেয়েটি, জলজ্যান্ত গোয়েন্দাকে মাঝেমধ্যেই ও বিরক্ত করে থাকে। তবে কৌশিক সত্যি-সত্যি বিরক্ত হয় না। হাতে কাজের চাপ না থাকলে টেলিফোনে কিছুক্ষণ গল্পও করে থাকে। রহস্যসন্ধানীরা রহস্যানুরাগীদের একটু বুঝি পছন্দই করে থাকে।

লেখা শেষ হলে মৃদু হেসে গোয়েন্দা বলল, 'তুমি কিন্তু কাজ কিছুটা এগিয়েই রেখেছ হৈমন্তী।'

'এগিয়ে রেখেছি!'

'হ্যাঁ, তা নয়তো কী—। ওই যে মিসেস মৈত্রর ট্যাক্সি থেকে নামার পরে তুমি সোজা গিয়ে মাধুরীদের বাড়িতে হাজির হয়েছিলে — ওর সঙ্গে তুমি আলাদাভাবে কথা বলেছ, এটা তো অনেকখানি।'

'কিন্তু লাভ তো কিছুই হল না। ও তো হালের খবর কিছুই জানে না। অনেকদিন রনির সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই।'

'তা হোক না, ওদের দলের দুজনের নাম আর একটা ডিসকোথেকের ঠিকানা তো দিতে পেরেছে —?'

'তাতে কি কোনও কাজ হবে?'

'হবে কি না জানি না, তবে খোঁজাখুঁজির কাজটা শুরু করা যেতে পারে।'

হঠাৎই খানিকটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল হৈমন্তীর চোখেমুখে। ওর গলার স্বরেও তার ছাপ পড়েছিল। 'আপনার কী মনে হয় কৌশিকদা, রনিকে কি সত্যি-সত্যি অপহরণ করা হয়েছে?'

'হতে পার।'

'নাকি ও নিজেই ওই অপহরণের গল্পটা চালু করেছে দাদুর কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করার জন্যে?'

'তাও হতে পারে।'

উত্তেজনা এবার একটু থিতিয়ে গেল হৈমন্তীর। 'দুটো ব্যাপারই কী করে হতে পারে একসঙ্গে?'

গোয়েন্দার ঠোঁটে রহস্যময় একচিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল, 'তদন্ত ভালভাবে শুরু করার আগে পর্যন্ত সব সম্ভাবনার দরজাই তো খোলা থাকে।'

একটু লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল হৈমন্তী। 'সুদেষ্ণা বৌদিকে আপনি তো দেখেননি— এক্কেবারে ভেঙে পড়েছে। ওর ওই ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলে আমি ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ি। মনে হয়, এক্ষুণি রনির সব বিপদ কেটে যাক, আর অপরাধীরা ধরা পড়ুক।'

ওকে সমর্থন করল গোয়েন্দা। 'ঠিক, সমস্ত সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষই তোমার মতো ভেবে থাকে। মনের ইচ্ছে জোরালো হলে তাতে কাজও বোধহয় হয়ে থাকে খানিকটা। তোমাকে এখন কিন্তু ওই সুদেষ্ণাবৌদিকে কিছুটা সঙ্গ দিতে হবে রোজ। তোমাকে দেখলে, তোমার কথা শুনলে, উনি মনে জোর পাবেন। একা মানুষ, ওঁর মনের জোর থাকাটা এখন খুব জরুরি।'

'আমি তাহলে বৌদিকে কিন্তু জানিয়ে দিচ্ছি—আপনি কেসটা হাতে নিয়েছেন।'

'সেই সঙ্গে এটাও বোলো, উনি যেন এই ব্যাপারটা কাউকে না জানান।'

'পুলিশের কাছে কি কোনও কমপ্লেন করতে হবে এখন?'

'পুলিশকে কিছুই তো জানানো হয়নি এব্যাপারে?'

'না।'

'কখন জানাতে হবে, আমিই জানিয়ে দেব।'

'আপনি তাহলে তদন্তের কাজটা এখনই শুরু করে দিচ্ছেন তো?'

রহস্যময় আর একটুকরো হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল গোয়েন্দার ঠোঁটে। 'একদিক থেকে দেখতে গেলে কাজ তো শুরুই করে দিয়েছি। অপহরণের কাহিনী যখন শোনাতে শুরু করেছিলে তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে আমার কাজ। কাজ এবার আরও বাড়বে। তুমি ওই মাধুরীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখো, মনে হয় ওখান থেকে আরও কিছু তথ্য জানা যাবে। আর ওই বৌদির সঙ্গে যোগাযোগ আর একটু বেশি করে রেখো। ওদিকে আরও কয়েক দফা টেলিফোন আসবে। শাসানিও বাড়বে। কী বলল, না বলল, সব সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে। আমার মোবাইল নম্বর আছে তো তোমার কাছে?'

'আছে।'

হৈমন্তীর কপালে দু-একটা ভাঁজ পড়েছিল। কী যেন চিন্তা করার পরেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বৌদির সঙ্গে দেখা করবেন না এখন?'

'না। যা জানার তোমার কাছ থেকেই জানব। দরকার পড়লে তোমার বৌদিকেও ফোন করতে পারি।'

'আমি বলে রাখব ওকে। কিন্তু আপনি একবার ওর কাছে গেলে ভাল হত না? সামনাসামনি কথা বললে আরও কিছু হয়তো জানতে পারতেন।'

'তা হয়তো পারতাম। কিন্তু আমি চাই না কিডন্যাপাররা এখনই জেনে ফেলুক আমি এর মধ্যে ঢুকে পড়েছি।'

অবাক হল হৈমন্তী। 'ওরা কী করে জানবে?'

'তোমার বৌদির বাড়ির ওপর নির্ঘাত নজর রেখেছে ওরা। বাড়িতে কারা আসছে, বাড়ির লোকই বা কোথায় যাচ্ছে, যতদূর সম্ভব— এই খবরগুলো এখন ওরা রাখার চেষ্টা করবে।'

আরও একবার অবাক হল হৈমন্তী। 'তাই! আচ্ছা, আমি আর বৌদি যে বিমল মৈত্রের কাছে গিয়েছিলাম, ওরা কি তা জেনে গিয়েছে?'

'খুব সম্ভবত জানে। তোমার চলাফেরার ওপরেও নজর রাখতে পারে কিছুদিন। এই যে তুমি এখানে এসেছ, সেটাও হয়তো ওদের নজরদারির মধ্যে আছে।'

কথাটা শুনে হৈমন্তীর মুখ একটু ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

মুখের চেহারা দেখে ওকে আশ্বস্ত করল গোয়েন্দা। 'অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চলাফেরার পথে এখন মাঝেমাঝেই একটু পেছন ফিরে তাকাবে। একই লোককে যদি বারবার দেখ, একটু চিনে রাখার চেষ্টা করো, আর খবরটা আমাকে জানিয়ে দিও সঙ্গে সঙ্গে।'

কথাবার্তা এখনকার মতো শেষ। 'চলি' বলে গোয়েন্দার অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিল হৈমন্তী। চলাফেরায় এখনও বেশ সতর্ক। মাঝেমধ্যেই পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল। না, সন্দেহজনক কাউকেই ওর চোখে পড়েনি।

অফিসপাড়ার এদিকের রাস্তাগুলো একটু পর-পরই বাঁক নিয়েছে। কোথাও দু-মুখো, কোথাও আবার বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। হৈমন্তী এখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত, কেউ ওর পিছু নেয়নি। যে মিনিবাসে উঠেছিল। সেই বাসে ওই স্টপ থেকে আর কেউ ওঠেনি।

নিজের বাড়িতে নয়, ওখান থেকে সোজা বৌদির বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল হৈমন্তী। দরজা খোলার পরে যে বৌদিকে দেখল হৈমন্তী, তার বয়স যেন একদিনের মধ্যে পাঁচ বছর বেড়ে গিয়েছে। ওকে দেখেই কেমন যেন কাঁপা-কাঁপা গলায় বৌদি বলেছিলেন, 'একটু

আগেই আবার ফোন এসেছিল ওদের।'

যা বলেছে, তা যে অত্যন্ত খারাপ, বৌদির চোখমুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিল হৈমন্তী। ঘরে ঢুকে ছিটকিনি দিয়ে দিল ও। তারপর ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে দিয়ে বৌদিকে নিয়ে সোফায় বসেছিল।

ফুল স্পিডের পাখায় একটা ঝোড়ো শব্দ উঠেছিল ঘরের মধ্যে। আর কোথাও কোনও শব্দ নেই। পাখার হাওয়াতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল বৌদির মুখে। আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিয়ে বৌদি বললেন, 'একটু আগেই ফোন এসেছিল। সেই গলা! হুমকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল— টাকার জোগাড় হয়েছে? আমি বললাম, না, আমার নিজের তো সঞ্চয় বলে কিছুই নেই। লোকটা তখন ধমকানির গলায় বলল— তুমি তো রনির দাদুর কাছে গিয়েছিলে— বুড়োকে টাকা দেওয়ার কথা বলেছ? বললাম— বলেছি, কিন্তু উনি টাকা দিতে রাজি নন। শুনে লোকটা কেমন যেন ক্ষেপে গিয়ে বলল— কেন রাজি নয়? একমাত্র নাতি, তার প্রাণের কোনও দাম নেই ওর কাছে?'

উদ্বিগ্ন হয়ে কথাগুলো শুনছিল হৈমন্তী। বৌদি একটু থামতেই প্রশ্ন করল, 'কী বললে তুমি তখন?'

'উনি যা বলেছেন, তাই বললাম। বললাম— উনি রনির অপহরণের ঘটনাটাই বিশ্বাস করেন না। বললেন— রনিকে আগের দিন রাতেই পার্ক স্ট্রীটে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা গেছে। অপহরণের ব্যাপারটা সাজানো। রনির বুদ্ধিতেই ওর দলের লোকেরা ফোন করছে তোমাকে।'

বৌদির কথার ধাক্কায় হৈমন্তীর উদ্বেগ-উত্তেজনা আরও অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। 'বললে! কী বলল তার জবাবে?'

বৌদির মুখ আর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিল আবার। আঁচল দিকে আর একবার ঘাম মুছে নিয়ে বলল, 'আমার কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর লোকটা কুৎসিত একটা গাল পেড়ে বলল— বুড়ো খুব সেয়ানা হয়ে গিয়েছে না! শোনো, তোমাদের আরও তিনদিন সময় দিচ্ছি, তার মধ্যে টাকা আমাদের হাতে না পৌঁছলে রনিকে সত্যি-সত্যি অপহরণ করা হয়েছে কিনা তার একটা ছোট্ট প্রমাণ পাঠাব তোমার কাছে। তুমি নিজে সেটা দেখো, রনির বুড়ো ভাম দাদুকেও দেখিও। তারপরেও টাকা যদি আমাদের হাতে না আসে, রনির লাশ পড়ে থাকবে রাস্তায়।'

কথাগুলো কোনওমতে শেষ করেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলেন বৌদি। চাপা কান্না। কান্নার দমকে কাঁপুনি উঠছিল শরীরে।

বৌদির পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে হৈমন্তী বলল, 'শান্ত হও বৌদি। এই অবস্থায় কোনও মতেই তোমার ভেঙে পড়া চলবে না। ভেঙে পড়লে আমাদের মাথা কাজ করবে না। অবস্থাটাকে তখন আর সামাল দিতে পারব না। ওই বদ লোকগুলো যে আমাদের ওপর নজর রাখছে— একটু আগেই সেকথা কৌশিকদা আমাকে বলেছিল।'

লালচে চোখমুখ আঁচল থেকে বার করে বৌদি জিজ্ঞেস করল, 'কৌশিক কে?'

'বিখ্যাত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্র। নাম শুনেছ তো?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বৌদি বলল, 'চেনা-চেনা লাগছে। কাগজে মাঝেমধ্যে দেখি নামটা। আচ্ছা, কয়েক মাস আগে ভয়ঙ্কর সেই জোড়া খুনের কিনারাটা কি ওরই করা?'

ঝলমল করে উঠেছিল হৈমন্তীর চোখমুখ। 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। শুধু ওটা নয়, আরও অনেক জবরদস্ত রহস্যের সমাধান ওর হাত দিয়েই হয়েছে। কৌশিকদার সঙ্গে আমার খুব ভাল চেনাশোনা। একটু আগে ওখানেই ছুটেছিলাম আমি। এদিককার সব কথাই খুলে বললাম। উনি আমাদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন। দরকার পড়লে তোমাকে ফোন করবে। তোমার ফোন নম্বরও দিয়ে এসেছি। কেসটা উনি হাতে নিয়েছেন একথা তুমি যেন কাউকে জানিও না— আমাকে বারবার বলে দিয়েছেন। কৌশিকদাই বলছিলেন— ওরা তোমাদের ওপর এখন আড়াল থেকে নজর রাখছে, তোমরা সাবধানে থেকো।'

বৌদি চোখের জল মুছে নিয়েছেন ভাল করে, তবে মুখের লালচে ভাবটা রয়ে গিয়েছে পুরোমাত্রায়। স্বগতোক্তি করার ভঙ্গিতে বললেন, 'কী যে হবে— কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

আশ্বস্ত করল হৈমন্তী। 'সব ঠিক হয়ে যাবে বৌদি। কৌশিকদার ওপর আমার অগাধ আস্থা। একটাই ভয় ছিল— ওঁকে এখন এখানে পাওয়া যাবে কিনা। হালে ওঁর চাহিদা খুব বেড়ে গিয়েছে, তার ফলে প্রায়ই এরাজ্যে সেরাজ্যে ছুটোছুটি করতে হয়। যাক, কপাল ভাল, পাওয়া গিয়েছে ওঁকে।'

হৈমন্তীর কথার মধ্যে সাহস জোগাবার রসদ ছিল অনেকখানি। কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হয়নি। হতাশ মানুষের গলায় বৌদি বললেন, 'আর আমি টেলিফোন ধরছি না।'

'না, না, ধরবে। আমি তোমার কথাটাই বলেছিলাম কৌশিকদাকে। উনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নাকচ করে দিয়ে বললেন, না, না, এটা কক্ষনো করো না। তোমার বৌদিকেও বলে দিও। অপরাধীরা কখন কী মতলব আঁটছে সেটা আমাদের জানা দরকার। না জানলে সেই হিসেবে ব্যবস্থা নেব কী করে? সুতরাং টেলিফোন এলে তোমরা অবশ্যই কথা বলবে। যাই বলুক না কেন, শেষ পর্যন্ত শুনবে।'

এই কথাগুলো শোনার পরেও বৌদির কোনও ভাবান্তর হল না। থমথমে মুখে জানলার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে বললেন, 'আমার মন বলছে রনি ভয়ঙ্কর কোনও একটা বিপদের মধ্যে পড়েছে। ওর দাদু যা বলেছেন, তা ঠিক নয়। অপহরণের এই ব্যাপারটা রনি কিছুতেই সাজায়নি। তাই যদি হত, তাহলে আমাকে যে ফোন করছে, সে কিছুতেই ওইরকম নোংরা গালাগাল দিত না।'

শেষের দিকে গলা ধরে এসেছিল বৌদির। হৈমন্তী তক্ষুনি তক্ষুনি বলার মতো কোনও কথা খুঁজে পেল না।

আরও কিছুক্ষণ ওই বাড়িতে থেকে বৌদিকে খানিকটা অন্যমনস্ক করার জন্য পাঁচটা বিষয় নিয়ে গল্প জুড়েছিল হৈমন্তী। নামেই গল্প, বৌদি তেমন কোনও কথাই বলেননি, বকবক করে গিয়েছিল হৈমন্তী একাই।

তারপর এক সময় উঠে পড়ে বাড়িতে গিয়েছিল। বাড়িতে কিছুক্ষণ থাকার পরে সন্ধের মুখে গিয়েছিল মাধুরীদের বাড়িতে।

ওদিকে, সেই সন্ধেয় গোয়েন্দা কৌশিক ছদ্মবেশে হাজির হয়েছিল পার্ক স্ট্রীটের একটা ডিস্কোথেকে।

এই ডিস্কোথেকের ঠিকানা গোয়েন্দা পেয়েছে হৈমন্তীর কাছ থেকে। হৈমন্তীর পাওয়ার সূত্র মাধুরী। একসময় আজেবাজে বন্ধুদের সঙ্গে রনি নাকি ওখানে প্রায়ই যেত। সেই সব বন্ধুর কয়েকটা নামও গোয়েন্দার কাছে পৌঁছে গিয়েছে মাধুরীর সূত্রে।

ডিস্কোথেকে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা ছদ্মবেশ নিয়েছিল গোয়েন্দা। পরনে গোলগলা থ্রি-কোয়ার্টার জামা আর ব্যাগি ট্রাউজার্স। ট্রাউজার্সে একগাদা পকেট। বাঁ হাতের কব্জিতে চেন, ঢোলা বালার মতো ঝুলছে। ডান হাতে খুব বড় ডায়ালের রিস্টওয়াচ। থুতনির নীচে এক ইঞ্চি দাড়ি। মাথার চুলে হালকা লালচে রং। চোখে টিন্টেড গ্লাসের চশমা।

সন্ধের মুখে পার্ক স্ট্রীটের এই ডিস্কোথেকে অল্পবয়সীদের একটা ঝাঁক ঢুকছিল। ওই ঝাঁকের মধ্যে গোয়েন্দাকে দেখে যে কারও মনে হবে এক পালকের পাখি।

এ দেশে ডিস্কোথেকের বয়স খুব বেশি নয়, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে এটির জনপ্রিয়তা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোআঁধারি নাচঘর, একদিকে বার কাউন্টার। উদ্দাম বাজনা চলে ডিস্কোথেকে। সেই সঙ্গে ঘরের সর্বত্র ছুটে চলে নানা বর্ণের আলোর ফালি। দ্রুত ধাবমান ওই আলোর ফালি কয়েক ঝাঁক তরুণ-তরুণীর নাচের মধ্যে অস্বাভাবিক এক গতির মায়া সঞ্চার করে থাকে। নাচঘরে ওই উদ্দামতা প্রথম এবং শেষ সত্য।

দ্রুত তালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বডিশেক আর হাত ধরাধরি করে নাচ। এই নাচের মধ্যে কারও মাথায় কোনও ভাবনা স্থায়ী হতে পারে না। অস্বাভাবিক জোরালো গতির তাল আর দ্রুত পরিবর্তিত আলোছায়ার মধ্যে ভেসে যাওয়াটাই যেন সব।

মাঝেমাঝেই ব্রেক। তখন বাজনা থামে, স্বাভাবিক আলো জ্বলে ওঠে। নাচের মানুষজনরা সেইসময় ক্লান্তি দূর করার জন্য ডান্সফ্লোর ছেড়ে বার-কাউন্টারে চলে আসে। বারটেন্ডাররা দ্রুত হাতে হার্ড ড্রিংকসের গ্লাস বিলি করে। তৃষ্ণার্ত, উদ্দীপ্ত তরুণ-তরুণীদের হাতে হাতে ঘোরে সেই সব গ্লাস। গ্লাস শেষ হয় চটপট। তরল আগুন আবার ভরে ওঠে গ্লাসে।

সঙ্গিনীদের সঙ্গে প্রাণের কথা বলার এটাই সময়। কেউ কেউ একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। আবেগের মাত্রা বেশি হওয়ার দরুণ কারও কারও কণ্ঠস্বর একটু উঁচু পর্দায় উঠে আসে।

গোয়েন্দার হাতেও পানীয়র গ্লাস। কিন্তু ওর কোনও সঙ্গিনী নেই। এই ঝাঁকের মধ্যে ওই অভাবটা কারও চোখে পড়ার কথা নয়, পড়েওনি। ভিড়ের মধ্যে হাতে গ্লাস নিয়ে গোয়েন্দা ক্রমাগত সরে সরে যাচ্ছিল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। কত কথা, কত উচ্ছ্বাস, কত নাম কানে ঢুকছিল ওর।

এলোমেলো ভাবে ঘুরতে ঘুরতে একসময় সঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল গোয়েন্দা। জনাতিনেক গলা সামান্য নামিয়ে একটু যেন অন্য ধরনের কথা বলছিল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাতের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ওই সব কথায় কান রেখেছিল গোয়েন্দা। শুধু কান দেওয়াই নয়, কিছু কথা মাথার মধ্যে গেঁথেও রাখছিল।

আবার শুরু হল নাচ। আলোছায়া, বাজনা একই ধরনের। তবে তরল আগুন শরীরে ছড়িয়ে পড়ার জন্য নাচের উদ্দামতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। মোট চার দফা বিরতি। বিরতিতে পানীয় বোধহয় একটু দ্রুতগতিতেই গলার মধ্যে নেমে যাচ্ছিল।

অনুষ্ঠান শেষ হল রাত সাড়ে এগারোটায়। এবার বাড়ি ফেরার পালা। ক্লান্ত, উদ্দীপ্ত এবং সামান্য টলমলে ডিস্কো ডান্সাররা ঘনিষ্ঠ হয়ে, হাত ধরে এবং না ধরে বেরিয়ে আসছিল ডিস্কোথেক থেকে। রাস্তায় সন্ধের সেই ভিড় নেই। ট্যাক্সি, গাড়ি আর মোটর বাইকে তরুণ তরুণীদের ঝাঁক। এক এক করে চলতে শুরু করেছিল যানগুলো। কোনও কোনও গাড়ি স্টার্ট দিয়েই প্রচণ্ড গতিতে একটা বাঁক নিয়েই ছুট লাগাচ্ছিল সোজা রাস্তায়। কিছু কিছু মোটর বাইক ওড়ার ভঙ্গিতে ছুটতে শুরু করেছিল। কিছু গাড়ি এবং ট্যাক্সিগুলোর চলার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না। একটা ইণ্ডিকায় গিয়ে উঠেছিল ডিস্কোথেকের সেই তিনজন, যাদের পেছনে ছদ্মবেশী গোয়েন্দা লেগে আছে বেশ কিছুক্ষণ থেকে।

ইণ্ডিকা ছুটছিল। তার পেছনে গোয়েন্দার মারুতি। গোয়েন্দা চার দফায় চারটে হার্ড ড্রিংকসের গ্লাস নিয়েছিল হাতে। নামমাত্র খাওয়া, বাকিটা সবার আড়ালে ঢেলে দিয়েছিল ঝাউগাছের গোড়ায়।

চলাফেরার মাতালের ভঙ্গিটা অবশ্য বজায় রেখেছিল আগাগোড়া। কিন্তু সামনের ওই ইন্ডিকার তিন আরোহী মোটামুটি মাতালই। যে গাড়ি চালাচ্ছিল সে মনঃসংযোগ একটি বিন্দুতে ধরে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সব সময় পেরে উঠছিল না।

গাড়ি মাঝেমাঝেই একটু ডানদিকে বা বাঁদিকে ঘুরে যাচ্ছিল লক্ষ্যহীন ভাবে। রাস্তায় খুব বেশি গাড়ি ছিল না, তাই কোনও বিপদ হয়নি।

পার্ক সার্কাস হয়ে তিলজলার দিকে ঘুরে গিয়েছিল ইণ্ডিকা। রাস্তা আর আগের মতো চওড়া ও পরিচ্ছন্ন নয়। খানাখন্দে ভরা অপরিসর রাস্তায় গোটাতিনেক বাঁক নেওয়ার পরে একটা গোডাউনের সামনে এসে হর্ন দিতেই সেটার দরজা খুলে গিয়েছিল। ভেতরে গোটাতিনেক ট্রাক দাঁড়িয়েছিল, আর একপাশে টিন-অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া কয়েকটা ঘর। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

মারুতি ধীর গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল কিছুটা। যেতে যেতেই গাড়ির চালক পেছনের ওই গোডাউনের বিশাল দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিল। আরও কিছুটা সোজা যাওয়ার পরে মারুতি মুখ ফিরিয়ে ফেরার পথ ধরেছিল।

।। চার ।।

ঘটনা গড়িয়ে চলে প্রতি মুহূর্তেই। কোথাও-কোথাও আপাতদৃষ্টিতে তা বোঝা যায় না। মনে হয় — সব কিছু স্থির, সব কিছু ঠিক আগের মতোই। কিন্তু আড়ালে ঘটনা ঘটেই চলে। অপহরণের এই ঘটনাটাও গত তিন দিনে বেশ কিছুটা গড়িয়ে গিয়েছে।

প্রতিদিনই মুক্তিপণ চেয়ে একাধিকবার ফোন এসেছে সুদেষ্ণার কাছে। টেলিফোনে হুমকি, শাসানি, গালাগাল। মুক্তিপণের চরম সীমা আরও দুটো দিন বাড়ানো হয়েছে। না হলে রাস্তায় লাশ পড়ে থাকবে রনির।

সুদেষ্ণা নিরুপায় হয়ে গতকালই টেলিফোনে শ্বশুরমশাইকে ওই শাসানির কথা জানিয়েছিল, কিন্তু বিমল মৈত্রের কণ্ঠস্বর আশ্চর্য রকমের ঠান্ডা। হুমকির একটা কথাও উনি বিশ্বাস করেননি। আরও একবার স্পষ্ট ভাষায় জানালেন — অপহরণের এই নাটকটা একেবারেই সাজানো। ঘুঁটি সাজিয়েছে রনিই। এই ব্যাপারে একটা পয়সাও ওঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। শেষে আরও একটা স্পষ্ট কথা জানিয়ে দিয়েছেন — উনি কাজের মানুষ, এই ধরনের আজেবাজে বিষয়ে ওঁকে ফোন করে যেন বিরক্ত করা না হয়।

প্রতিটি কথাই গোয়েন্দার কাছে পৌঁছে দিয়েছে হৈমন্তী। শুধু বৌদির কথাই নয়, মাধুরীর কথাও। মাধুরীর কাছ থেকে ইতিমধ্যে রনির বিষয়ে আরও অনেক কথা জেনে নিয়েছে হৈমন্তী। রনি ড্রাগ অ্যাডিক্ট, কিন্তু নেশাগ্রস্ত না হলে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। মাধুরীর ওপর ওর বেশ টান ছিল; ও সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চেয়েছিল আবার। কিন্তু ফিরতে পারেনি ওই নেশা আর কুসঙ্গের জন্যে। আজও ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে মাধুরী।

এ সব কথা এখন অর্থহীন। কিন্তু কৌশিকদার স্পষ্ট নির্দেশ — এ ব্যাপারে যা জানবে, প্রয়োজনীয় হোক অপ্রয়োজনীয় হোক — সব জানাবে। হৈমন্তী তাই সবই জানিয়েছে, গোয়েন্দা মনোযোগের সঙ্গে সমস্ত শুনেছে। শুধু শোনাই নয়, ডায়েরিতে কিছু কথা নোটও করে নিয়েছে।

প্রতিদিনই গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে হৈমন্তীর প্রথম প্রশ্ন থাকে — কাজ কতটা এগলো কৌশিকদা? গোয়েন্দার উত্তর মোটামুটি একই রকম : বলে, বেশ কিছুটা এগিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। আসলে সময় এখন এত কম যে, দ্রুত গতিতে না এগিয়ে উপায় নেই।

সেদিন সকালে ভয়ংকর একটা ঘটনার ধাক্কায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল সুদেষ্ণার। কেন যে হয়নি — তার কোনও ব্যাখ্যা নেই ওর কাছে। চেয়ারের হাতল ধরে পাথরের মতো বসেছিল বেশ কিছুক্ষণ। গলা অসম্ভব শুকিয়ে গিয়েছে। কোনও মতে উঠে দাঁড়িয়ে ঢকঢক করে জল খেয়েছিল এক গ্লাস। তার পরেই কাঁপা-কাঁপা গলায় হৈমন্তীকে ফোন শিগ্‌গির একবার আমাদের বাড়িতে চলে এসো।

আতঙ্কগ্রস্ত বৌদির গলা শুনে সারা শরীর শিরশির করে উঠেছিল হৈমন্তীর। কী ব্যাপারে, কী বৃত্তান্ত ইত্যাদি প্রশ্ন করার মতো মনের জোর ছিল না ওর। টেলিফোন নামিয়ে রেখে পায়ে চটি গলিয়ে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে।

বৌদির বাড়িতে যখন ঢুকল তখন পাথরের মতো চেয়ারে বসেছিল বৌদি। হৈমন্তীর দিকে একবার তাকাল, কিন্তু সে চোখও যেন পাথরের।

এগোতে এগোতে প্রশ্ন করেছিল হৈমন্তী — 'কী হয়েছে বৌদি?'

বৌদির মুখে কোনও উত্তর ছিল না।

একই প্রশ্ন আরও কয়েকবার করার পরে মুখ খুলেছিল বৌদি। ভাঙা ভাঙা গলায় বলেছিল, 'সকালে ক্যুরিয়ার সার্ভিসের একটা লোক এসেছিল। একটা চিঠি দিল। ভেবেছিলাম স্কুলের কোনও চিঠি। কিন্তু খুলে দেখি —।'

'কী?'

বৌদি কেঁপে উঠেছিল ভীষণভাবে। প্রশ্নের জবাবে সেন্ট্রাল টেবিলের ওপরে রাখা একটা খামের দিকে আঙুল তুলেছিল কোনওমতে।

আর পাঁচটা অফিস-খামের মতো একটি খাম। খামের মধ্যে ভাঁজ করা মোটা একটা কাগজ। কাগজের ওই ভাঁজটা খুলতেই আঁতকে উঠেছিল হৈমন্তী। ওর মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল। পাশের চেয়ারটায় বসে পড়েছিল কোনওমতে।

বেশ কয়েকটা মুহূর্ত এ ঘরে কোনও শব্দ ছিল না। কিছুক্ষণ বাদে কেমন যেন পাথরচাপা গলায় বৌদি বলেছিল 'কাটা ওই আঙুলটার সঙ্গে তিন লাইনের চিঠিও আছে একটা। চিঠিতে লেখা আছে — এটা রনির আঙুল। এবার আমাদের কথা বিশ্বাস হয়েছে তো? কাল সন্ধের মধ্যে টাকা যদি আমাদের হাতে না পৌঁছয়, রনির লাশ রাস্তায় পড়ে থাকবে।'

বিকৃত গলায় কথাটা কোনও মতে শেষ করার পরে চেয়ারের হাতলের ওপর বৌদির মাথাটা গড়িয়ে পড়েছিল।

কী করবে না করবে — কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না হৈমন্তী। অদ্ভুত এক আতঙ্ক গ্রাস করেছিল ওকে। অনেক কিছু বোঝে ও। বুঝতে পারছিল, এই মুহূর্তে হাতেমুখে জল ছিটিয়ে বৌদিকে একটু চাঙ্গা করা দরকার। কিন্তু হাতে-পায়ে জোর পাচ্ছিল না একটুও।

একই ভাবে ওখানে কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে হৈমন্তী লক্ষ্য করল, চেয়ারের হাতল থেকে মাথা তুলে বৌদি আবার সোজা হয়ে বসেছে। তবে মুখ ঘোরাল না। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে একটু থেমে থেমে বলল, 'তোমার কৌশিকদাকে খবরটা দিয়ে দাও হৈমন্তী।'

এই একটা কথাতেই স্বাভাবিক তৎপরতা আবার ফিরে এসেছিল হৈমন্তীর মধ্যে। ও উঠে গিয়ে ফোন করল কৌশিকদাকে। সব শোনার পরে গোয়েন্দা শান্ত গলায় বলল, 'খামের মধ্যে যা যেমন ভাবে ছিল ঠিক তেমনি ভাবে রেখে ওটা নিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা চলে এসো আমার কাছে।'

কৌশিকদার কথাগুলো বৌদিকে জানাল হৈমন্তী। বৌদি বলল, 'এক্ষুণি যাও।'

'কিন্তু একবার বাড়ি যেতে হবে যে।' আরও একবার ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল হৈমন্তীর মুখ।

'কেন?'

‘ওটা নেওয়ার জন্যে একটু বড় একটা হ্যান্ডব্যাগ নিতে হবে।’

পাথরের মতো চোখমুখ নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল বৌদি। তারপর একটা মাঝারি সাইজের হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

খামের মধ্যে যা যেমন ভাবে ছিল ঠিক সেই ভাবেই ঢুকে গেল আবার। খাম ঢুকল হ্যান্ডব্যাগে। বৌদি হ্যান্ডব্যাগ আর তিনশো টাকা এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘এক্ষুনি চলে যাও। ট্যাক্সি করে যাবে, ট্যাক্সি করেই ফিরে আসবে। আমি এই ঘরেই থাকব। তোমার কৌশিকদা কিছু যদি জানতে চান, আমাকে ফোন কোরো।’

বৌদিকে অচেনা একজন মানুষের মতো দেখাচ্ছিল। কিন্তু হৈমন্তী কোনও কথাবার্তার মধ্যে গেল না। হাত বাড়িয়ে ব্যাগ আর টাকা নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়েছিল।

গোয়েন্দা আজ একটু সকাল-সকালই ওর অফিসে পৌঁছে গিয়েছিল। পৌঁছবার একটু বাদেই ওখানে হাজির হয়েছিল হৈমন্তী। গোয়েন্দা বলল, ‘বোসো’।

কৌশিকদার সঙ্গে দেখা হলেই ঝলমলে মুখে কুশল সংবাদ নিয়ে থাকে হৈমন্তী, কিন্তু আজ আর ও সে-সবের মধ্যে গেল না। শুকনো মুখে কাঠ হয়ে বসল সামনের চেয়ারে। ওকে দেখে যা বোঝার বুঝে গিয়েছিল গোয়েন্দা। মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘এনেছ?’

অসাড় মানুষের ভঙ্গিতে হ্যান্ডব্যাগ খুলে দু-আঙুল দিয়ে লম্বা খামের একটা কোনা ধরে টেবিলের ওপর ওটা রেখে দিয়ে ঘুরে বসল ও। ঘুরে বসার একটাই উদ্দেশ্য যাতে খামের ভেতরের বস্তুটা দ্বিতীয়বার ওকে দেখতে না হয়!

গোয়েন্দা আস্তে আস্তে খাম থেকে ভাঁজ করা কাগজটা বার করল, কাগজের ভাঁজ খুলতেই বেরিয়ে পড়ল শিউরে ওঠার মতো একটা দৃশ্য। কিন্তু গোয়েন্দা অবিচল, শুধু ওর চৌকো মুখের চোয়ালের হাড় কঠিন হয়ে উঠেছিল খানিকটা।

কাগজ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানা দিক থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওটা দেখার পরে ড্রয়ার থেকে আতস কাচ বার করল গোয়েন্দা।

পরীক্ষা আর এক দফা করার পরে কাগজ ভাঁজ করে খামে ঢুকিয়ে টেবিলের একপাশে সরিয়ে রেখে হৈমন্তীকে বলল, ‘এবার তুমি ঘুরে বসতে পারো।’

হৈমন্তী ঘুরে বসতেই গোয়েন্দা টেলিফোন এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘তোমার বৌদির সঙ্গে একটু কথা বলব, আমাকে একটা লাইন করে দাও।’

টেলিফোনে বৌদিকে ধরে হৈমন্তী বলল, ‘আমি মিনিট পনের হল কৌশিকদার অফিসে পৌঁছে গিয়েছি। কৌশিকদা তোমার সঙ্গে কথা বলবে।’

রিসিভার গোয়েন্দার হাতে তুলে দিয়েছিল হৈমন্তী।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে গোয়েন্দা বলল, ‘যা ঘটে গিয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখের। কিন্তু আরও বড় বিপদ যাতে না হয় তার জন্য আমাদের একটু শক্ত হতেই হবে।’

অফিসপাড়ায় ব্যস্ততা এখনও শুরু হয়নি। গোয়েন্দার ছোট্ট অফিসঘর একটু বেশি রকমের নিরিবিলি। ছোট টেবিলের উলটো দিকে বসে বৌদির সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল হৈমন্তী। ভেঙে-পড়া গলায় বৌদি বলল, ‘ভয়ঙ্কর ওই ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পরে আমি কিছুতেই নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছি না। রনিকে বাঁচানো যাবে তো কৌশিকবাবু?’

‘সেই চেষ্টাই তো করে যাচ্ছি ক’দিন ধরে। এদিকের কাজ কিছুটা এগিয়েছে। আশা করছি সুফল পাওয়া যাবে। তবে কমবেশি কাজ আমাদের প্রত্যেককেই করতে হবে। কাউকেই দুর্বল হলে চলবে না। কয়েকটা প্রশ্ন করব আপনাকে, একটু ভেবেচিন্তে উত্তর দেবেন। করব?’

‘করুন।’

‘আঙুলটা আপনি ভাল ভাবে দেখেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আঙুলে একটা আংটি আছে। আংটিটা রনির?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওটা কি আপনার উপহার দেওয়া আংটি?’

‘না, তবে শুধু ওই আংটিটাই ও পরত।’

‘কত দিন ধরে পরছিল?’

‘তা প্রায় বছরদেড়েক হবে।’

‘আংটিটা কেউ কি উপহার দিয়েছিল ওকে।’

‘হতে পারে।’

‘আপনি জিজ্ঞেস করেননি?’

‘করেছিলাম কয়েকবার, কিন্তু কখনোই ও কোনও স্পষ্ট উত্তর দেয়নি।’

‘আংটিতে দুটো ইংরেজি হরফ লেখা আছে— আর এম— দেখেছেন?’

‘দেখেছি।’

‘ওই হরফদুটো কারও নাম, পদবির আদ্যক্ষর হতে পারে— অমন নামের কারও কথা মনে পড়ছে কি আপনার?’

প্রশ্নের জবাবে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন বৌদি, তারপর বললেন, 'না'।

এবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল গোয়েন্দা। তারপর একটু থেমে থেমে খুব স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করল, 'আঙুলটা যে রনিরই— এব্যাপারে আপনি কি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ।'

'আঙুলে যদি আংটি না থাকত, তাহলেও কি ওটা আপনার ছেলের বলে বুঝতে পারতেন?'

অনেকক্ষণ থমথমে গলায় কথা বলার পরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন রনির মা। তারপর কোনও মতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। ছোটবেলায় ওই আঙুলটা ওর জানলার কাঁচে বিচ্ছিরি ভাবে কেটে গিয়েছিল। আঙুলে সেই কাটার দাগটা রয়ে গেছে।'

'এবার আপনাকে খুব দরকারি একটা কথা বলছি— মন দিয়ে শুনুন।'

'বলুন।'

'ওরা আবার আপনাকে ফোন করবে, হয়তো খুব শিগ্‌গিরই। রনি সত্যি-সত্যি অপহরণ হয়েছে কিনা তা নিয়ে আমাদের একটু সংশয় ছিল। ওর দাদু তো কিডন্যাপিংয়ের ব্যাপারটা বিশ্বাসই করেননি। ওরা তাই ভয়ঙ্কর ওই প্রমাণটা পাঠিয়েছে। ফোনে এবার আরও জোরের সঙ্গে মুক্তিপণ চাইবে। আরও জোরালো শাসানি দেবে। আপনি কিন্তু মুক্তিপণ দিতে এক কথায় রাজি হয়ে যাবেন।'

বিপর্যস্ত মানুষটির গলায় বিস্ময়ের সুর শোনা গেল। 'কিন্তু আমি দেব কী করে! ওই টাকার সামান্য একটা অংশও তো আমার কাছে নেই— আপনি তো জানেন।'

'সত্যি সত্যি দিতে হবে না। শুধু রাজি হয়ে যাবেন।'

কথার জবাবে কিছুই বলতে পারল না বিধবস্ত মহিলা।

গোয়েন্দা কথা শুরু করল আবার। 'হয়তো আজকেই টাকা দেওয়ার কথা বলবে। আপনি রাজি হয়ে যাবেন। খুব সম্ভবত নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় টাকাটা আপনাকে নিয়ে যেতে বলবে— একাই। যে শর্তই দিক না কেন, আপনি রাজি হয়ে যাবেন।'

'কিন্তু—।'

'আমি পরে সব বুঝিয়ে বলব। এখন যা বলছি প্লিজ শুনুন। রনিকে উদ্ধার করার জন্যই এসব করতে বলছি আপনাকে। আর একটা কথা, ওরা ফোন করে কী বলল না বলল সব জানাবেন আমাকে। আমার মোবাইলের নম্বর হৈমন্তী দিয়েছে তো আপনাকে।'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, রাখছি এখন। পরে কোনও দরকার হলে ফোন করব আবার।'

টেলিফোন নামিয়ে রাখার পরে গম্ভীর মুখে গোয়েন্দা বলল, 'শোনো হৈমন্তী, আমাদের হাতে কিন্তু একেবারেই সময় নেই আর। তোমাকে চটপট কয়েকটা কাজ সেরে ফেলতে হবে। প্রথম কাজ হল — এক্ষুণি মাধুরীর কাছে যেতে হবে একবার। এই আংটির বর্ণনাটা দেওয়ার পরে জিজ্ঞেস করবে— এ সম্পর্কে ও কিছু জানে কিনা। পরের কাজ— আজকের দিনটা তুমি তোমার বৌদির সঙ্গে কাটাও। কিন্তু ও বাড়ির কোনও ফোনই তুমি রিসিভ করবে না। আরও দু-তিনটে করণীয় কাজ আছে তোমার, সেগুলো পরে তোমাকে জানিয়ে দেব আমি।'

।।পাঁচ।।

কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঘটনা খুব দ্রুত কয়েকটা বাঁক নিয়ে নিয়েছিল। গোয়েন্দার সঙ্গে সুদেষ্ণা আর হৈমন্তীর টেলিফোনে বেশ কয়েকবার কথাবার্তা হয়েছে। এই সব টেলিফোনের মাঝখানেই কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান মৃণাল ধরের সঙ্গে খুব জরুরি একটা বিষয় নিয়ে শখের গোয়েন্দার কথা হয়ে গিয়েছে।

কৌশিকের মৃণালদা কৌশিককে খুব ভালবাসেন। কারণ চাঞ্চল্যকর জটিল অপরাধের জট খোলার ব্যাপারে কৌশিক তুলনাহীন। ঝামেলায় পড়লেই মৃণালদা প্রতিভাবান এই গোয়েন্দাটির সাহায্য নিয়ে থাকেন।

গোয়েন্দা প্রধান প্রায়ই মজা করে কৌশিককে বলে থাকেন, তোমার কোনও অনুরোধ মানেই আমার কাছে আদেশ। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওই আদেশটা পালন করে থাকি। এবারও একটা অনুরোধ ছিল কৌশিকের এবং ওর মৃণালদা সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছেন।

টেলিফোনে হৈমন্তীকেও একটা নির্দেশ দিয়েছিল গোয়েন্দা। সেই হিসেবে ও সওয়া-চারটের সময় গোয়েন্দার অফিসঘরে হাজির হয়ে গিয়েছে। এই অফিসে এই নিয়ে আজ ওর দ্বিতীয়বার আসা।

কৌশিকদার চেহারা এখন বেশ গম্ভীর। মৃদু গলায় হৈমন্তীকে বসতে বলে কালো ডায়েরিতে কী যেন লিখল। লেখা না অঙ্ক! অঙ্কই হবে বোধহয়। ওপর-নীচে বেশ কয়েকটা সংখ্যা। জটিল চেহারার ওই অঙ্কের কিছুই বুঝতে পারল না হৈমন্তী। শুধু এটা বুঝতে পেরেছিল— ওর ভেতরে জমে ওঠা প্রশ্নগুলোর একটাও এখন করা চলবে না।

মিনিট দশেক পরে ডায়েরি চটপট ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে গোয়েন্দা বলল, 'তোমাকে একটু বসতে হবে হৈমন্তী।' বলার পরেই অফিসঘরের লাগোয়া ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে পড়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছিল।

মিনিট কুড়ি বাদে ছোট্ট ঘরের দরজা ঠেলে যে মানুষটি বেরিয়ে এসেছিল তাকে দেখে চমকে উঠেছিল হৈমন্তী। কে এ? অচেনা মানুষটি

মৃদু হেসে কথা বলতেই ঘোর কেটেছিল ওর। গোয়েন্দাদের ছদ্মবেশ ধরার কথা জানে ও, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা মানুষ এভাবে চেহারা পালটে ফেলতে পারে!

ছদ্মবেশী গোয়েন্দার চুল উসকোখুসকো, নাকের নীচে মোটা গোঁফ। পরনে নীলচে রংয়ের আধময়লা একটা উর্দি। গোয়েন্দা চাপা গলায় বলল, 'কয়েক ঘন্টার জন্য আমি এখন একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। অফিসের কাছে একটা ট্যাক্সি আছে, ওটাই আমি চালাব। আসল ড্রাইভারের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে এখন আমরা বেরুব। তুমি যাত্রী সেজে পেছনের সিটে বসবে। তারপর আমাকে তোমার সুদেষ্ণা বৌদির বাড়িতে নিয়ে যাবে। পথে খুব বেশি কথা বোলো না। আর একটা কথা— বৌদির বাড়িতে ঢুকেই বৌদিকে ট্যাক্সি-ড্রাইভারের আসল পরিচয়টা দিয়ে দেবে। দিলে ওর ভয়, দুর্ভাবনা কিছুটা কমতে পারে। চলো তাহলে এবার বেরিয়ে পড়ি।'

প্রবীণ সহকারী মুখার্জীবাবুকে একটা কাজে পাঠিয়েছিল গোয়েন্দা। উনি ফিরতেই অফিস ঘরের দুজন বেরিয়ে পড়ল। একটু দূরে ফাঁকা একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। মিটারের ফ্ল্যাগ ডাউন করে ড্রাইভার নিজের সিটে বসতেই হৈমন্তী ট্যাক্সির পেছনের সিটে উঠে বসেছিল। ট্যাক্সি ছুটতে শুরু করেছিল সামনের দিকে।

ট্যাক্সি বড় রাস্তা থেকে সরু রাস্তায় ঢোকার পরে পেছনের যাত্রী মাঝেমাঝেই নির্দেশ দিচ্ছিল ট্যাক্সিওয়ালাকে— এবার সোজা, এবার বাঁদিকে, এবার ডানদিকে ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ বাদে একটা তিনতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি। এই বাড়িরই দোতলায় থাকেন সুদেষ্ণা মৈত্র। ট্যাক্সি রওনা হওয়ার পরেই মোবাইল থেকে বৌদিকে ফোন করেছিল হৈমন্তী। বৌদি তৈরি হয়েই বসেছিলেন, কিন্তু চোখেমুখে ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব। ট্যাক্সিওয়ালার আসল পরিচয় নিচু গলায় বৌদিকে জানিয়ে দিয়েছিল হৈমন্তী। কিন্তু বৌদির দুর্ভাবনা তাতে খুব একটা কেটেছে বলে মনে হল না।

মিনিট তিনেকের মধ্যে হাতে একটা বড় ব্যাগ নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছিলেন বৌদি। দোতলার জানলায় দাঁড়িয়েছিল হৈমন্তী। ট্যাক্সি চোখের বাইরে চলে যেতেই সোফায় বসে মোবাইলে ধরল মাধুরীকে। বাড়িতেই ছিল মাধুরী। হৈমন্তী বলল, 'সুদেষ্ণা বৌদির বাড়িতে চলে এসো না একবার। তোমার সঙ্গে কথা আছে কয়েকটা। বৌদি বাড়িতে নেই, ফিরতে দেরি হবে। আমি এখন এখানে, একাই। আসবে?'

এক সময় এ বাড়িতে মাধুরীর নিয়মিত যাওয়া-আসা ছিল। বছরদেড়েক তা একেবারেই বন্ধ। অন্য সময় হলে এই ধরনের প্রস্তাবে কিছুতেই ও রাজি হত না, কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম। একটু ইতস্তত করার পরে মাধুরী বলেছিল, 'ঠিক আছে, আমি আসছি।'

ওদিকে সরু রাস্তায় দু-তিনটে বাঁক নেওয়ার পরে বড় রাস্তায় উঠে পড়েছিল ওই ট্যাক্সিটা। ট্যাক্সির গতি বাড়ছিল একটু একটু করে। পেছনে একজন মাত্র যাত্রী। সিটের মধ্যিখানে কোলের ওপর হ্যাণ্ডব্যাগ রেখে কেমন যেন টানটান হয়ে বসেছিল মহিলা যাত্রীটি।

মোটামুটি ফাঁকা রাস্তায় ট্যাক্সি আরও কিছুটা ছোটার পরে ট্যাক্সিওয়ালা সামনের দিকে তাকিয়ে থেকেই প্রশ্ন করল, 'আপনাকে তো বাইপাসের কাছে স্বভূমিতে যেতে বলেছে? তাই না?'

'হ্যাঁ। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে স্বভূমির টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়াতে বলেছে। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে সবুজ জামা পরা একটা লোক এসে আমাকে জিজ্ঞেস করবে— প্যাকেটটা এনেছেন? আমি তখন হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে প্যাকেটটা ওকে দিয়ে দেব। কিন্তু....।'

এই পর্যন্ত বলার পরেই গলা কেঁপে গিয়েছিল সুদেষ্ণার। 'কিন্তু ও যখন দেখবে প্যাকেটে কাগজ ছাড়া আর কিছু নেই, তখন—'।

আগের মতো শান্ত গলায় সামনের দিকে তাকিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল,— 'প্যাকেটের মধ্যে কী আছে লোকটা ওখানে দাঁড়িয়ে দেখতে যাবে না। প্যাকেটটা ও কাঁধের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে সরে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে।'

সুদেষ্ণার গলার কাঁপুনি এবার আর একটু বাড়ল। 'কিন্তু পরে তো দেখবে।'

'পরের ব্যাপারটা আমরা দেখব।'

'কিন্তু।'

সুদেষ্ণাকে থামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলল, 'কটার সময় দাঁড়াতে বলেছে টিকেট কাউন্টারে? ছটা?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, ভয় পাবেন না। প্যাকেট দেওয়ার পরে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন। অন্য একটা গাড়ি আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে।'

'অন্য গাড়ি!'

'হ্যাঁ, একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার। আমার বলা আছে। আপনার কাছে এসে ওই গাড়ির ড্রাইভার আমার নাম করে বলবে— আমার কাছ থেকে এসেছে। আপনি নিশ্চিন্তে এই গাড়িতে উঠে পড়বেন। গাড়ি আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে।'

'কিন্তু ড্রাইভার আমাকে চিনবে কী করে?'

'গাড়িটা এতক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে ওখানে। ড্রাইভার এই ট্যাক্সির নাম্বার জানে। ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখলেই আপনাকে চিনে নেবে। তাছাড়া কিছুক্ষণ আমাকেও থাকতে হবে ওখানে। আপনার কোনও অসুবিধা হবে না।'

কথার পিঠে সুদেষ্ণা কী যেন বলতে গিয়েও চুপ করে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ বাদে ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, 'ট্যাক্সি থেকে নেমে আপনি সামান্য কিছু টাকা-পয়সা আমার হাতে তুলে দেবেন। ওদের লোকজন ওখানে থাকবে, ওরা ভাববে— আপনি ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছেন।'

'ঠিক আছে।'

ছটা বাজতে দশে স্বভূমির সামনে এসে ট্যাক্সি দাঁড়াল।

ব্যাগ থেকে কিছু টাকা-পয়সা বার করে রেখেছিল সুদেষ্ণা। ট্যাক্সি থেকে নেমেই সেগুলো ট্যাক্সিওয়ালার হাতে তুলে দিয়েছিল। ট্যাক্সি একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তার একটা ধারে দাঁড়াল।

সুদেষ্ণার বুকের ভেতরটা অসম্ভব ঢিবঢিব করছিল। মনে হচ্ছিল, সবাই যেন ওর দিকেই চেয়ে আছে। জোর করে কয়েক পা হেঁটে গিয়ে

টিকিট কাউন্টারের সামনে যে লোহার রেলিংটা আছে সেটা ধরে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পরে হঠাৎই যেন মাটি ফুঁড়ে ওর সামনে হাজির হয়েছিল সবুজ জামাপরা একটা লোক। লোকটার গালে লম্বা কাটা দাগ। এদিক ওদিক দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে নেওয়ার পরে ও আর একটু কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'প্যাকেটটা এনেছেন?'

কর্কশ গলার সেই লোকটা টেলিফোনে বলেছিল— সবুজ জামাপরা আমাদের লোক কাছে এসে ওই কথাটা বললেই আপনি টাকার প্যাকেটটা ওর হাতে তুলে দেবেন।

নির্দেশ ভোলার নয়। প্রতিটি কথাই সুদেষ্ণার মাথার মধ্যে ভালভাবে গেঁথে আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে শোনা আর বোঝার মধ্যে বুঝি কোনও মিল ছিল না। কথাটা শোনার পরেও সুদেষ্ণা দাঁড়িয়ে ছিল পাথরের মতো।

লোকটা চঞ্চল হয়ে আরও একবার চারদিক দেখে নিল। তারপর একই কথা বলল আরও একবার। এবার গলার স্বর আগের চাইতেও চড়া। কণ্ঠস্বরের ওই ধাক্কাতেই বুঝি সুদেষ্ণার হাত হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল।

প্যাকেট বার করতেই লোকটা সেটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল দ্রুত।

মিনিট দশেক বাদে গাড়ির চালকের উর্দিপরা একটা লোক এসে সুদেষ্ণাকে বলল, 'কৌশিকবাবু আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে বলেছেন, আসুন আমার গাড়িতে।'

কথাটা বুঝে উঠতে সুদেষ্ণার কয়েক মুহূর্ত বুঝি সময় লেগে গিয়েছিল, তারপরেই ধীরে ধীরে লোকটার পিছু নিয়েছিলেন। কিছুটা এগোবার পরে লোকটা একটা সাদা অ্যাম্বাসাডারের দরজা খুলে দিয়েছিল। সুদেষ্ণা ওঠার পরে চালক গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসল। ফেরার পথ ধরেছিল গাড়ি।

সুদেষ্ণার প্রায় অসাড় শরীরে সাড় ফিরে আসছিল একটু একটু করে। তারপরেই পুরনো সেই আতঙ্ক নতুন করে শুরু হল। কিডন্যাপাররা টাকার বদলে কাগজ পেয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষেপে যাবে। তখন?' রনির ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা ভেবে শিউরে উঠেছিলেন সুদেষ্ণা।

বাড়ির দরজায় ড্রাইভার নামিয়ে দিয়েছিল ওঁকে। কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো হেঁটে এসেছিলেন নিজের ফ্ল্যাটের দরজায়। ডোরবেলে আঙুল রাখতেই দরজা খুলে দিয়েছিল হৈমন্তী। ওর পেছনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাধুরী। এক সময়ে এ বাড়িতে ওর খুব যাতায়াত ছিল। বছর দেড়েক হল সব সম্পর্ক ছিন্ন। কদাচিৎ কথা বলার উৎসাহ পেতেন না। কী আর বলবেন! এ বাড়িটাই তো ওর নিজের বাড়ি হওয়ার কথা ছিল।

মাধুরীকে হঠাৎ এখন এখানে দেখে আবেগতাড়িত হয়ে উঠেছিলেন সুদেষ্ণা। আবেগের পেছনে ছিল আবার অস্থিরতা আর চাপা ভয়। মাধুরী দ্রুত পায়ে ওই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে ওর হাত চেপে ধরেছিলেন সুদেষ্ণা, তারপরেই ওকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বুকের মধ্যে। বুকের ভেতর কান্না অনেকক্ষণ ধরে জমাট হয়ে ছিল, এখন তা ফেটে পড়ল।

ওদিকের ছবিটা অন্যরকম। একটার পর একটা ঘটনা ঘটেই চলেছিল। মাত্র দু-ঘন্টার মধ্যে সব অপারেশন শেষ। ছদ্মবেশী গোয়েন্দা আর সাদা পোশাকের পুলিশের তরফ থেকে তিন রাউন্ড গুলি ছুটেছে, তবে কেউ আহত হয়নি। ধরা পড়েছে চার দুষ্কৃতী। তিলজলার বিশাল এবং অপরিচ্ছন্ন গোডাউনের লুকোনো একটা ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অসুস্থ রনিকে। পুলিশ এসকর্ট দিয়ে ওকে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে হাসপাতালে।

গোডাউন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বেশ কিছুটা হেরোইন, যার আনুমানিক মূল্য পাঁচ কোটি টাকা। দুষ্প্রাপ্য জন্তু-জানোয়ারের কিছু চামড়াও পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে আছে তিনটে পূর্ণবয়স্ক বাঘের ছাল। পুলিশের ধারণা, চোরাশিকারিদের একজন যখন ধরা পড়েছে, বাকিদের ধরা কঠিন হবে না।

কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মৃণাল ধর অপারেশন শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হয়েছিলেন ওখানে। তারপর ছদ্মবেশী গোয়েন্দাকে প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে এলেন লালবাজারে। এই মুহূর্তে ওর ঘরে আর কারও ঢোকা বারণ।

তরুণ এই শখের গোয়েন্দাকে ওর মৃণালদা খুব ভালবাসেন। আরও একবার তারিফ জানাবার পরে ডেপুটি কমিশনার বললেন, 'অসাধ্যসাধন কী ভাবে করলে এবার একটু খুলে বলো কৌশিক।'

তরুণ এই গোয়েন্দার স্নায়ু বোধ হয় ইস্পাতের মতো কোনও পদার্থ দিয়ে তৈরি, কিন্তু প্রকৃতির দিক থেকে মানুষটি লাজুক, কখনও কখনও একটু বেশি মাত্রায়। এখন যেমন। একটু চাপা গলায় উত্তর দিল, 'কিছু অসাধ্যসাধন করিনি। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা আমাদের দিকে ঘুরে গিয়েছে— এই যা।'

'আরে বাবা, এ তো আর হাওয়া মোরগ নয় যে, এমনি-এমনি ঘুরে যাবে। তিলজলার ওই গোডাউনটার সন্ধান পেলে কী করে?'

'মাধুরীর কথা তো আপনাকে বলেছি মৃণালদা, ওর কয়েকটা টিপ্‌স আমার খুব কাজে লেগে গিয়েছিল। এককালে রনির সঙ্গী ছিল এমন কয়েকজনের নাম জানতে পারি। ওরা প্রায়ই যায়— এমন একটা ডিস্কোথেকের নামও জানতে পেরেছিলাম মাধুরীর কাছ থেকে। একদিন সন্ধেবেলায় হাজিরা দিই ওখানে। ডিস্কোথেকের জমজমাট আসর। নাচের ফাঁকে ফাঁকে সন্দেহজনকদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছিলাম। একসময় এই চারজনের তিনজনকে পেয়ে যাই একধারে। নিজেদের মধ্যে কিছু কিছু কথা কোডে বলছিল। সব না হলেও সাঙ্কেতিক কথাবার্তার কিছু কিছু অর্থ আমি বার করতে পেরেছিলাম। ঠিক করি, ডিস্কো থেকে ওরা বেরুবার পরেই ওদের পিছু নেব। নিয়েওছিলাম। তখনই তিলজলার ওই গোডাউনটার সন্ধান পাই। তারপর আমাদের ইনফর্মার মধুর সাহায্য নিই। ওকে বললাম, আমার যত দূর মনে হচ্ছে, ওই গোডাউনে কাউকে আটকে রাখা হয়েছে। তুমি খবর বার করার চেষ্টা করো তো। ওই পাড়ায় মধুর নিজস্ব একটা নেটওয়ার্ক আছে। ও পরদিনই আমাকে খবর এনে দিল— আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। ওই গোডাউনে পাঁচিলের দিকের একটা ছোট ঘরে একজনকে আটকে রাখা হয়েছে। তখনই ভেবেছিলাম আপনাকে বলে ওখানে একটা রেড করাই। কিন্তু দলটাকে মালপত্তর সমেত ধরার জন্য এই দেরিটা হল।'

আর এক দফা তারিফ করলেন ডেপুটি কমিশনার। 'একেবারে কারেক্ট ডিসিশন। এই জন্যই তোমাকে আমি এত পছন্দ করি। অন্য কেউ হলে তাড়াহুড়ো করে রেড করে বসত। তাতে রনিকে উদ্ধার করা যেত ঠিকই, কিন্তু এই হেরোইন আর বুনো জন্তুর চামড়া সমেত দলটাকে ধরা যেত না।'

একটু আফসোসের গলায় কৌশিক বলল, 'একটাই দুঃখ, ওই রনি ছেলেটাকে হাতের একটা আঙুল খোয়াতে হল।'

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'ছোকরা তো জানটাই খোয়াতে বসেছিল। ওর ভাগ্য ভাল যে, তুমি কেসটা হাতে নিয়েছিলে। কিন্তু একটা ব্যাপার মাথায় আসছে না, ভয়ঙ্কর ওই চার দুষ্কৃতী আজ সন্ধেয় ওই গোডাউনে হাজির হয়েছিল কেন?'

লাজুক একটা হাসি আবার ফুটে উঠেছিল কৌশিকের মুখে। 'ওই কথাটাই বলা হয়নি আপনাকে। আজ সন্ধেয় ওদের মুক্তিপণ পঁচিশ লাখ টাকা হাতে পাওয়ার কথা। সন্ধে ছ'টায় স্বভূমির কাউন্টারের সামনে সুদেষ্ণা মৈত্র ওদের পাঠানো লোকের হাতে পঁচিশ লাখ টাকার প্যাকেট তুলে দিয়েছিলেন। টাকাটা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার জন্য চারজনেই হাজির হয়েছিল গোডাউনে। তখন তো বুঝতে পারেনি কারেন্সি নোটের বদলে সাদা কাগজের তাড়া থাকবে প্যাকেটে।'

চড়া গলায় হেসে উঠে গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'সাবাশ!'

খবরের গন্ধ বাতাসে ভাসে। মিডিয়ার লোকজন গোয়েন্দাপ্রধানের সঙ্গে দেখা করার জন্য জড় হয়েছিল ওঁর ঘরের বাইরে। কৌশিক বেরুতেই গোয়েন্দাপ্রধান ওদের ডাকলেন।

ছোটখাটো একটা প্রেস কনফারেন্সই হয়ে গিয়েছিল ওই ঘরে।

পরদিন সকালে শহরের প্রতিটি দৈনিকের প্রথম পাতার প্রধান খবর ছিল রোমাঞ্চ কর অপহরণ ও উদ্ধারের বৃত্তান্ত। সঙ্গে ছিল দুষ্প্রাপ্য বুনো জন্তুর চামড়া পাচারের কাহিনী। উদ্ধার করা চামড়া ও হেরোইনের ছবিও ছাপা হয়েছিল কাগজে। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া খবরের সম্প্রচার শুরু করেছিল আগের রাত থেকে। পরের দিনের সংবাদেও ওই খবরটাই জায়গা পেয়েছিল নানা দিক থেকে।

নিঃশব্দে এত বড় একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলার জন্য বিস্তর প্রশংসা পেয়েছিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতর আর তরুণ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্র। কৌশিক অবশ্য একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিল, না, না, আমি বিশেষ কিছুই করিনি। যা করার সব করেছেন ডেপুটি কমিশনার মৃণাল ধর।

প্রতিটি রোমাঞ্চ কর অপরাধ কাহিনী সমাধানের পরে স্বভাব-লাজুক গোয়েন্দা এই ধরনের একটা মন্তব্য করার পরেই গা-ঢাকা দেয়। এবারও দিয়েছিল। চলে গিয়েছিল ওর বিশ্রামের প্রিয় জায়গা সুন্দরবন এলাকায়।

যখন ফিরে এসেছিল তখন মিডিয়া অন্য খবরে মন দিয়েছে। তবে সুদেষ্ণারা গোয়েন্দাকে একদিনের জন্যও ভোলেনি। তিন মাস পরে রনির জন্মদিনে আমন্ত্রিত হয়ে ওই বাড়িতে আসতে হয়েছিল কৌশিককে। এসে তিনটে ভাল খবর পেয়েছিল। খবরের কাগজে ভয়ঙ্কর ওই ঘটনার বিবরণ বার হওয়ার পরে রনির দাদু বিমল মৈত্র লজ্জিত মুখে হাজির হয়েছিলেন ছেলের ফ্ল্যাটে। রনির ওপর ওর মান-অভিমান ধুয়েমুছে একেবারে সাফ হয়ে গিয়েছে। নিজের বিশাল ব্যবসায় নাতিকে টেনেও নিয়েছেন। দ্বিতীয় সুখবর হল, রনি নেশা এবং কুসঙ্গ দুটোই ছেড়ে দিয়েছে। সুখবরের তিন নম্বরটি হল, রনি আর মাধুরী আগের সেই মধুর সম্পর্কে ফিরে এসেছে।

জন্মদিনে মাধুরী রনিকে একটা আংটি উপহার দিয়েছে। এ আংটিটাও অনেকটা সেই আগেরটার মতো। আংটিতে ছোট্ট দুটি ইংরেজি হরফ— আর এবং এম। আর-এ রনি, এম-এ মাধুরী।

আগের সেই আংটিটা কে রনিকে উপহার দিয়েছিল সে খবর মাধুরীর কাছ থেকে বার করে কৌশিককে জানিয়ে দিয়েছিল হৈমন্তী। রহস্যটি সুদেষ্ণা এই প্রথম ধরতে পারলেন। তবে জন্মদিনের কেক খাওয়ার পরে সুদেষ্ণা নতুন একটা খবর জানালেন।

সুদেষ্ণার নতুন খবরটি হল— সব ঠিকঠাক থাকলে সামনের অঘ্রাণেই আর একটা বড় ভোজ।

রফা

সজল দাশগুপ্ত

ঘর থেকে রাখালের বেরোবার মুখে বিলাসী গলায় আঁচল দিয়ে হাতজোড় করে ঠাকুরের ছবির সামনে প্রণাম করল। চিড়বিড় করে কতগুলো কথা আউড়ে বলল— 'ঠাকুর, সবদিক দেখো। যা গেরো বেঁধেছে এর থেকে মুক্ত করো, ঠাকুর। গেরো ত বটেই। হাজার গেরো। এই গেরো একটার পর একটা খুলে খুলে সব পরিষ্কার করবে কার বাপের সাধ্যি! এতসব জানা ছিল না। কি করে জানবে? এ দেশে কি সম্পত্তি কেনাবেচার কাজ এই প্রথম হচ্ছে? কত কত লোক জমি কিনছে, বাড়ি বানাচ্ছে, থাকছে, সম্পত্তি বাড়াচ্ছে— কত কিছু করছে। করছে না? কার এমন হয়েছে? শোনেনি ত কোনদিন। অথচ এই মানুষটার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করার টাকা। সেই টাকায় কেনা জমি। কতগুলো ল্যাকপ্যাকে ছেলে জুটে গিয়ে বলতে শুরু করে দিল ও জমিতে ঘর করা যাবে না। কেনা জমি? তা কি হল? অমন ত কত লোকেই কেনে। কিনেলই তার হয়ে যাবে? দখল নিয়ে তারপর ত কথা। দখল না নিলে মাঠের জমি মাঠেই পড়ে থাকবে।

এ সব সৃষ্টিছাড়া কথা বিলাসী আগে শোনেনি। এই শুনল। কেনা সম্পত্তিরও মালিকানা হবে না!

ঠিক বেরোবার মুখে বিলাসী আবার একবার মনে করিয়ে দিল— 'শুনলে, নরম হয়ে কথা বলো। কথাতে সব হয়, আবার কথাতেই সব নষ্ট হয়। তুমি মাঝে মাঝে এমন খ্যা খ্যা করে কথা বলো—

মেজাজটা ঠিক নেই রাখালের। বারবার কেবল খারাপ খারাপ ভাবনা চিন্তাগুলোই ঘুরে ফিরে উঠে আসছে সকাল থেকে। মন বড্ড কু-ডাক ডাকে আজকাল। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ফতুর করে লোন তুলে জমিটুকু কেনা। আর কোথাও কিছু নেই। একটা ঘষা আধুলিও বেরোবে না আর। ত, সেই জমিও যাবে, টাকাটাও যাবে মনে হয়। ও জমির দখল পেতে হবে না তাকে। ঘর বানিয়ে সেখানে উঠে যাওয়া ত অনেক পরের কথা। তার মানে কি? সর্বস্বান্ত হওয়ার আর বাকি কী?

— এক কথা কতবার বলবে বলো ত? কাল রাতে শোনা ইস্তক তোমার এক কথা— 'নরম হয়ে কথা বলো।' নরম হয়ে বলব না ত কি তেড়েফুড়ে উঠব! আমার কি জ্ঞান নেই কোনও? ওখানে ট্যাঁ ফুঁ করলে যে কাজ হবে না সেটা কি তুমি বলে দেবে আমাকে?

এই এক দোষ মানুষটার।

কি কথা বলতে যাচ্ছিল বিলাসী আর কি বুঝল। তার বুকের মধ্যে যে খাবলা খাবলা রাগ সে ত বোঝাই যাচ্ছে। তা না হলে এ কথার পর কেউ কি অমন তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে? রাখালের মেজাজ দেখে চুপ করে গেল বিলাসী। এখন কিছু বললেই কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। চীৎকার করে বাড়ি মাথায় করবে। তাও ভয়ে ভয় জিজ্ঞেস না করে পারে না— 'যার কাছে যাচ্ছ সে ওদের মাথা। তাই না!'

রাখাল কিছু বলে না। চুপচাপ গায়ে জামাটি গলাল। আসলে সে নিজেও তেমন জানে না কে কার মাথা, কে কার লেজ। কোথাও

কোনও কাজে বেরোবার মুখে এত কথা, এত প্রশ্ন চালাচালি ভাল লাগে না। কাজে মন বসে না তাহলে। কিন্তু এখানে ত সব উল্টো। রাজ্যের কথা, প্রশ্ন সব বেরোবার মুখে। তাছাড়া এসব জেনেই বা কি হবে। রাখালের উত্তর না পেয়ে বিলাসী আরও মুষড়ে পড়ে।

— কি গো, একটু বলো না শুনি।

— কে কার মাথা জানি না। আমি একে চিনি না।

— তবে?

— তোমার ভাইকে জিজ্ঞেস করলেই ত পারো। এ মানুষের কথা ত সেই বলল। বলল খুব বড় নেতা নাকি। অনেক নাকি ক্ষমতা। যে তল্লাটে জমি কিনেছি সে তল্লাটটা নাকি ওর এক্তিয়ারে। সব কিছুতে নাকি এনার কথা। ইনি বললেই নাকি বৈকুণ্ঠপুরের ছেলেগুলো সব সমঝে যাবে।

বিলাসী চোখ গোল গোল করে গভীর উৎসাহে বৃত্তান্ত শোনে সব।

— রবি বলেছে!

— হ্যাঁ।

— তাহলে ঠিক আছে।

— কি ঠিক আছে?

— রবি এসব খবর রাখে। চারদিকে ঘোরে। কত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে।

— আর আমি?

বিলাসী আর কথা বলে না। অর্থাৎ তুমি যে কি তা ত তুমি নিজেই জানো। আমাকে বকানো কেন?

— কিছু একটা হবেই।

রাখাল বোঝে না ঠিক। ধরতে পারে না কথাগুলো।

— কিসের কি হবেই বলছ?

— কারো কোনওদিন এতটুকু ক্ষতি করিনি। কারো পাকা ধানে মই দিইনি। ভগবান আছেনই, দেখবে। আর মনে জোর রাখ।

এই এক মহা গুণ বিলাসীর। বড় অল্পেই ও অনেকটা বিশ্বাস করে ফেলতে পারে। আর বিশ্বাস এলেই মনের জোর বাড়ে। তাতে ও একেবারে সোজাসাপ্টা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারে। সে মানুষটাকে দেখল না, জানল না, চিনল না— অথচ অগাধ বিশ্বাসে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে।

রাখাল আর দেরি করে না।

।। দুই।।

এক কাঠা ছ'ছটাক জমি।

তেতাল্লিশ হাজার পড়ে গেল। তাও একটু নামোর দিকে। বর্ষাকালে জল একটু উঠলেও উঠতে পারে। তাতেই কাঠাপ্রতি পাঁচ ছ'হাজার টাকার সুবিধা একটু হলো বৈকি! তা, একটু নাবালে আছে ত থাকুক না। পরে সুবিধামতো সময়ে হাতে একটু পয়সাকড়ি জমিয়ে মাটি ফেলে উঁচু করে নিলেই হবে। নিজের জমি, নিজের ঘরবাড়ি। এও ত এক শান্তি। সারাটা জীবনই প্রায় বলতে গেলে কেটে গেল ভাড়া বাড়িতে। পাতিপুকুরের মদমাতালদের পাড়ায় এক ঘুপচি ঘরে। তারজন্যই গুণে গুণে বারোশ টাকা প্রত্যেক মাসে দিতে হত। গায়ে লাগত খুব। এই টাকাটা ঘরে থাকলে কত কাজ হত। মাসের মুদি-মশলা জ্বালানির খরচ উঠে আসত। কত সাশ্রয় হতো। ওটুকু করে জমালেও কত জমত! তা কি আর করা যাবে! যতদিন নিজের করে একটা আস্তানা না হয় তদ্দিন এ টাকা অন্যের ঘরেই যাবে। নিজের বাড়িঘরের আশা কোনওদিন করেনি রাখাল। সবার কপালে নিজের বাড়িঘর থাকে না। যাদের থাকে তাদের হয়। এমন এক বিশ্বাস অনেকদিন ছিল। তারপর হঠাৎই একদিন অভাবনীয় ভাবে সুযোগটা এসে গেল। নিজের শ্যালকের মাধ্যমে খোঁজখবর পেয়েছিল রাখাল। জলের দামে একটুকরো জমি বিক্রি হচ্ছে বৈকুণ্ঠপুরের নামোপাড়ায়। 'তুমি রাখালদা নেবে ত নাও, তোমার খুব দরকার। নিজের ঘরবাড়ি বানাও এবার। না হলে আমি নেব।' সেই উঠেপড়ে লাগা। হিসাবনিকাশ নিয়ে পড়া। পি-এফে কত আছে, আর কোথাও কিছু আছে কিনা, কুড়িয়ে বাড়িয়ে কিছু আরও হবে কিনা, সারাক্ষণ শুধু এক হিসাব। শেষে হল। যেখানে যা ছিল সব গুছিয়ে নিয়ে জমিটা কিনেই ফেলল। কিন্তু একটাই সমস্যা। ভাঁড়ে মা ভবানী হয়ে গেল যে সব। এরপর কি হবে? হঠাৎ যদি কারও কোনও অসুখ-বিসুখ হয়, বা হঠাৎ অন্য কোনও জরুরি প্রয়োজনে টাকার দরকার হয়ে পড়ল, তখন কি হবে?

বিলাসী খুব সাহস জুগিয়েছিল। 'কোনও রোগব্যাধি কারও হবে না। ও সব কাদের হয়? যাদের অনেক আছে। তাদের হাজার রোগ। আমাদের কিছু নেই। রোগব্যাধিও নেই। হবেও না।'

ওর ওই এক কথা। ভগবান দেখছেন, দেখবেন। সেই এক স্বপ্ন দেখা শুরু। বলা যায়, অভ্যাসের স্বপ্ন দেখা। নিজের ঘর হবে, বাড়ি হবে, ছোট একটা সব্জি ক্ষেত থাকবে, নিজের বাড়িতে নিজে হাত পা ছড়িয়ে থাকবে, এসব অভ্যাসের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নও একদিন দেখতে থাকল।

এখন ও দেখছে অন্যরকম। এ তো মহা ঝামেলা হয়ে গেল। এর মধ্যে না গেলেই হতো। টাকাটাও গেল, জমি নিয়েও নানা ক্যাচাল। বৈকুণ্ঠপুরের হাটতলায় ক্লাবের ছেলেগুলো চেপে ধরেছিল একদিন।

— 'ওই জমিটা আপনি কিনলেন শুনলাম। আপনার কি মাথা খারাপ নাকি! ওটা আমাদের ক্লাবের জমি।' আকাশ থেকে পড়ার দশা রাখালের। বলেটলে কি? ক্লাবের জমি!

— ক্লাবের জমি! মানে!

— মানে, সোজা কথা। জমিটা ক্লাবের। ও জমি পাবেন না।

— আমি ত দলিলমূলে কিনেছি।

— রাখুন আপনার দলিল। ওরকম দলিল আমরা রোজ বানাতে পারি। আবার রোজ নষ্ট করতেও পারি। আমাদের ক্লাবের নামে হাতপরচা আছে। আদালতও হাতপরচা মানে। ও জমি আপনি পাবেন না।

— আমি অত টাকা দিয়ে কিনলাম—

— কার কাছ থেকে কিনেছেন! আমরা বেচেছি?

— না, আপনারা বেচেননি। যে আসল মালিক সেই ত বেচেছে।

— আসল মালিক ত ক্লাব। আপনি যার কাছ থেকে দলিলমূলে কিনেছেন বলছেন— সে ত একটা জালি লোক।

আর একজন আবার অন্যদিক থেকে শুরু করে— 'কি করেন আপনি?' খুব ভীতত্রস্ত গলায় মিনমিন করে উত্তর করে রাখাল— চাকরি করি।

— চাকরি! আরিববাস! কোথায় কোন অফিসে?

— সল্ট লেকে। সরকারি অফিস।

— ইরিববাস! তাহলে ত একেবারে নবাবপুত্র। কাজ নেই, কাম নেই। মাইনে আছে। নিশ্চয়ই উপরিও আছে! তা কি পোস্ট আপনার?

— আর পোস্ট! সামান্য ছোটখাটো এক চাকরি। পিওন। খুব গরিব আমি। ওই জমিটুকু না পেলে ধনেপ্রাণে মরব। গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরব।

ছেলেপুলে ত্যারচা করে হেসে ওঠে।

— না, না, না। মরবেন না, মরবেন না। মরলে ত সব শেষ। পিওনের চাকরিটাই বা কম কিসে? তা, একটা পরামর্শ দিতে পারি। আপনি বলেছেন আপনি গরিব মানুষ। দুনিয়ার গরিব এক হও। পরামর্শটা শুনবেন?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।

— একটা রফায় আসতে হবে।

— রফা! কিসের রফা?

— আসুন এধারে।

রাস্তার পাশে জারুলের ছায়ায়, রাখালকে নিয়ে বসল ওরা। ওরা প্রথম দুজন ছিল। পরে আরও দুজন এল। শেষে যে দুজন এল তার একজন দিনদুপুরেই এক পাত্তর চড়িয়ে এসেছে। কোলাব্যাঙের মতো থপথপ্ করে এগিয়ে আসতে আসতে পড়ে পড়ে যাচ্ছিল। আবার উঠে হাঁটছিল।

— কি করবেন ও জমিতে? ব্যবসা, নাকি আর একখানা বাড়ি তুলে ভাড়া বসাবেন?

— ঘর করব। ভাড়া বাড়িতে আছি অনেক বছর। আর পারছি না। কুলোচ্ছে না।

— অ। কি রকম বাড়ি হবে?

— কোথায় আর হবে। এই বলছেন জমিটা আপনাদের। দখল পাব না। এই চিন্তায়ই এখন গেল সব।

— সে দেখব। যাবে না।

মাতালটা এবার তালে তাল দেয়।

— না যাবে না। লবা যখন একবার বলেছে যাবে না, যাবে নাই-ই। এই দুপুরবেলা বলছি— আমি অপা। লবার চ্যালা—। লবা রাম হলে আমি হনুমান।

— অপা থামবি!

মাতালটা জিভ কাটে।

— রফা করুন। ক্লাবের সঙ্গে।

মাতালটা আবার ফেউয়ের মতো কথা জোগায়।

— হ্যাঁ, ক্লাবের সঙ্গে রফা কর বাপ্। রফা তোকে কত্তেই হবে।

— তুই থামবি! অনেক হয়েছে।

— কিছু ভুল বললাম গুরু?

— ক'টা ঘর হবে?

— ক'টা আর, দুখানা।

— কিচেন বাথরুম ত হবেই!

— কিসের আবার কিচেন! বারান্দার একপাশে রান্না করবে বউ।

— হয়ে যাবে। সে অনেকেই করে। প্রথম এক দু'বছর একটু কষ্ট। তারপর হাতে পয়সা হলে আলাদা কিচেন করে নেয়। সেই করবেন আপনি। হয়ে যাবে। করে দেব।

— করে দেবেন? মানে?

— মানে বাড়িটা বানিয়ে দেব আমরা। ইঁট-বালি-সিমেন্ট-লোহা সব আমরা দেব। এখানে বাইরের মাল ঢুকবে না। মিস্ত্রিও আমরা দেব। রাজমিস্ত্রি, কাঠের মিস্ত্রি, রংয়ের মিস্ত্রি সব আমরা দেব। খুব ভাল কাজ করে ওরা। কোনও কমপ্লেন নেই।

অপা মাতাল আবার মাথা নাড়ে। তারপর বলে ওঠে— হ্যাঁ, ঠিক বলেছে। কোনও কমপ্লেন নেই। যে শালা কমপ্লেন করবে তাকে এমন রদ্দা মারব না। তুইও যদি কমপ্লেন মারাতে আসিস, রদ্দা খাবি।

এবার আর কথা নয়। সপাটে মাতালটার গালে চড় কষিয়ে দিল একজন। চড় খেয়ে কেদড়ে পড়ার দশা হল।

— গুরু মারলে!

— আবার মারব।

— আবার মারবে? কই, মার ত দেখি।

জোরে চড় কষাবার আগেই একজন ওর কব্জি চেপে ধরে।

— নব, ছেড়ে দে, এই মালখোরটাকে মেরে কি হবে? ওর কি জ্ঞান আছে?

— আমি কিন্তু সব বলে দেব গিরিশদাকে।

— কি বলবি?

— সব পয়সা ঝেপে দিচ্ছিস তোরা।

— এই চোপ্ শালা মাতাল। এমন লাথি কষাবো না তলপেটে।

— নবা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।

একজন নবাকে জাপ্টে ধরে।

— ওকে নিয়ে যাচ্ছি।

মাতালটাকে দু'জন মিলে টানতে টানতে যতই নিয়ে যাচ্ছে, ততই ওর চীৎকার বাড়ছে।

— আমি হলাম গিয়ে ইয়ে— মানে, এই ওর নাম কি কি?

— কার কথা বলছিস?

— ওই যে—

— ওর নাম নেই। কোনও নাম নেই।

— আমি যে নামে ডাকতাম, সেটা কি হল?

টানতে টানতে ওকে নিয়ে যায় ওরা।

— শালা রফাটার বারো বাজল। শুনুন, এদিকে মানে আমার দিকে মন দিন। আমি যা বলছি শুনুন। বাড়ি হয়ে যাবে। দু-কামরার বাড়ি। মাস তিনেক সময় দেবেন। গৃহপ্রবেশ করিয়ে দেব একেবারে।

— আমি দু-টো কাঁচা ঘর করব, মশাই। দরমার বেড়া, ওপরে টালি। একটুকু করারও পয়সা নেই আমার।

— কাঁচা ঘর! দরমার বেড়া! ইয়ার্কি পেয়েছেন নাকি?

— কেন? ইয়ার্কি কেন? আমার যা ক্ষমতা সেই অনুযায়ী বাড়ি হবে ত আমার।

— তাহলে জমির নামে জমি পড়ে থাকবে যেখানে আছে এখন। আপনিও যেখানে আছেন, ওই ভাড়া বাড়িতে। বাকি জীবনটা ওখানে কাটান। ও জমি ক্লাবের। ক্লাব যা করার করবে।

আর কথা না বাড়িয়ে হন্ হন্ করে হাঁটতে থাকে নবা। দাঁড়াল না আর।

এই ঝড়ঝাপ্টা গেছে আগের দিন। এতেই কাৎ হয়ে গিয়েছিল রাখাল। হওয়ারই কথা। দু'রাত চোখের পাতা এক করতে পারেনি। দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে শরীরের স্নায়ুতন্ত্রে প্রবল এক আলোড়নের টের পাচ্ছিল সে। কাল সকালে রবি মানে রাখালের শ্যালক এসে বুদ্ধি বাৎলাতে একটু যেন সুস্থিতি এসেছিল মনে।

— রাখালদা, রেলগেট পেরিয়ে নিমতলা বাজারের কাছে গিরিশদা থাকে। খোঁজ নিয়েছি। খুব উঁচু দরের প্রভাবশালী লোক। নিজে একবার আগাম গিয়ে বল না সব। আমি সঙ্গে যাব তোমার। বৈকুণ্ঠপুরে আর এখন যেতে হবে না। আগে ওখান থেকে ঘুরে আসি।

।। তিন ।।

উঠানের একধারে কদমগাছ একটা।

একেবারে টসটসে। ডালপালা ছড়িয়ে বাড়ছে। তার ছায়ায় তক্তপোষে আঁদুরগায়ে যে মানুষটা বসে তার চারদিকে এক দঙ্গল মানুষ। দেখলেই বোঝা যায় খুব ব্যস্ত-সমস্ত কেউকেটা ধরনের একজন। রাখালকে একটু দূর থেকে দেখাল রবি।

— ওই যে ওই দেখ বসে। চাদ্দিকে কত কত লোকজন দেখ। ভীমরুলের চাক যেন একটা। তাহলে কিছু বুঝতে পারছ রাখালদা?

বেশ সবজান্তা এক মুখ নিয়ে রবি রাখালকে প্রশ্নটা করে। এসবে রাখালের তেমন যে কোনও আগ্রহ আছে মনে হল না। তার উদাসীন মুখচোখ দেখে মনে হয় এত সব ব্যস্ত লোকজন দেখে দেখে হেজে গেছে সে। নতুন করে ব্যস্ত মানুষ আর দেখে কাজ নেই। কিন্তু এখন সে

রবির আওতায় এসে পড়েছে। রবিকে একটু তোয়াজে রাখতেই হয়।

— তুই কি ওনার ব্যস্ততার বিষয়ে বললি কিছু?

— হ্যাঁ, কত মানুষ দেখ। অথচ লোকটা এম পি ও নয়, এম এল এ-ও নয়।

— রাজনীতি ত করে। গাঁয়ে গঞ্জে যারা রাজনীতি করে আজকাল তাদের চারদিকে নানা কিসিমের লোকজন থাকে।

কথাটা পছন্দ হল না রবির। কোনও কিছুতেই মানুষটার হয় না। খালি ট্যাকোস ট্যাকোস কথা। দুনিয়ায় কেউই যেন আর ভাল নেই। সব ধান্ধাবাজ। ভিড় বাড়ানো পাবলিক। একগলা জলে দাঁড়িয়ে। চরিদিকে বিপদ। এসব বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে একটু তোয়াজ করতেই হয় কিছু মানুষকে। তা সে সব নেই।

— শোনো রাখালদা, একটা কথা বলে রাখি।

— বল।

— তুমি কিছু বলতে যাবে না। তুমি মানীলোকদের সঙ্গে কথা বলতে জানো না। আর একটা কথা। গিয়ে দাঁড়িয়েই হাতজোড় করে নমস্কার করবে।

— শুধু নমস্কার! হাতজোড় করে পায়ের নিচে পড়ে থাকব।

— ও গিরিশদা, কেমন আছেন? কতদিন আমাদের পাড়ায় যান না আপনি।

সেরেছে! গদগদ হয়ে গেল যে রবিটা। রাখাল অবাক হয়ে যায়। বেদম অবাক। হা করে তাকিয়ে রবিকে দেখে। জববর সেয়ানা হয়ে গেছে ত! এতসব কোথায় শিখল, কবে শিখল! একেবারে মাথা মোটা একটা গোঁয়ার গবেট ছিল। এখন যে তালে তাল মিলিয়ে কথা বলতে শিখেছে দারুন। যার উদ্দেশ্যে এত সব তোয়াজের কথা সেই গিরিশ পাত্রও এমন ধরনের কথা রোজ শোনে। হাজারবার করে শোনে। ধান্ধা না থাকলে কেউ তাকে তোয়াজ করে না সে জানে। অতএব চিড়ে যে খুব ভিজল মনে হল না রাখালের।

— ভাল আছি।

— আমাদের পাড়ায় একদিন আসুন না দাদা। কবে যাবেন বলুন। আমি এসে নিয়ে যাব।

কাকে কি যেন বলছিল গিরিশ। মাঝপথেই এই ভ্যানতারার গল্পে সব বাদ পড়ে গেল।

— তুই যা তাহলে এখন। পরশু সদানন্দকে নিয়ে তেলিয়াপাড়ায় চলে যাবি।

যাকে বলা সে মানুষ অতি উৎসাহে মাথা ঝাঁকাল বার কয়েক।

— গিরিশদা,

— হ্যাঁ, কি ব্যাপার!

— এই আমার ভগ্নীপতি।

— দাঁড়াও দাঁড়াও। বাচ্চু, এই বাচ্চু, মোপেডে তেল ভরেছিস? আর শোন, আমার ডায়েরিটা একটু এনে দে। হ্যাঁ বল কি ব্যাপার—

— আমার ভগ্নীপতি রাখালদা।

— হ্যাঁ, বাচ্চু, শোন। কাঁকনতলার মাঠে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হবে শুনেছি। কারা ক্যাম্পটা অর্গানাইজ করছে একটু খোঁজ নে ত। আর তুই নিজে কাঁকনতলায় যাবি। পার্সোন্যালি।

রবির পকেটে একটা চিঠি। মনেই ছিল না এতক্ষণ। হঠাৎ মনে পড়ল। পড়তেই বুকপকেটে হাত দিয়ে চিঠিটা বের করে।

— গিরিশদা একটা চিঠি।

— চিঠি? কার?

— আজ্ঞে, আপনার।

গিরিশ হাতে নিয়ে পড়ল। কিন্তু কোনও গুরুত্বই দিল না।

— এসব চিঠি কোনও দরকার নেই। তোমার কথা তুমি বলবে তোমার মতো করে। এতসব উমেদারির দরকার কি!

— একখণ্ড জমি কিনেছে রাখালদা বৈকুণ্ঠপুরে।

— ভাল। তা আমি কি করব?

— ক্লাবের ছেলেরা বলছে ও জমির দখল দেবে না। আরও বলছে ইঁট বালি সিমেন্ট সব ওদের কাছ থেকে নিতে হবে।

বুঝলাম। তা ওদের কথাও ত একটু ভাবতে হবে। তোমরা ত কাজে কম্মে আছ। যা হোক কিছু রোজগারপাতি করছ। ওরা ত বেকার। কাজকর্ম পাচ্ছে না, হবেও না। কয়েকজনা মিলে একসঙ্গে তাই ব্যবসা করছে। না হয় নিলেই কিছু মালপত্র ওদের কাছ থেকে।

— রাখালদা খুব গরিব মানুষ। দরমার বেড়া আর টালির ছউনির ঘর বানাবে। সেখানে থাকবে ছেলেমেয়ে নিয়ে।

— দরমার বেড়ার ঘর!

গিরিশ যেন ঠিক মেনে নিতে না পেরে অবাক হয়ে তাকায় রাখালের দিকে।

— হ্যাঁ। পয়সাকড়ি নেই। সরকারি অফিসে পিওনের চাকরি করে। চারজন পুষ্যি। বড় মেয়েটা এবার মাধ্যমিক দেবে। খরচটা ভাবুন একবার।

এতসব কথা চালাচালির মধ্যে দিয়ে ফাঁক খুঁজতে থাকে গিরিশ। গলে সটকে যাওয়া যায় কিনা।

— তা আমি কি করব? পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব গজিয়ে গেছে। এগুলো সবই যে খারাপ হয়েছে বলব না। কিছু ভালো ক্লাব আছে। কত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছে এরা সব। ক্লাব আমার কথা শুনবে কেন?

রবি আঁচ করেছিল আগেই। সট্‌কাবার ফিকির খুঁজছে গিরিশ। অলিগলির কোনও— যে পথে এসব ফালতু ঝামেলার হাত থেকে রক্ষা পেতে কেটে পড়তে পারবে। ক্লাবটাও হাতে রাখতে হবে। সেটাকে এসব উটকো ঝামেলার জন্য বাগী করে দেওয়া যায় না। রবি বুঝল। তাই আগেভাগেই সে পথ বন্ধ করে দেয়।

— ওরা বলছে গিরিশদা যা বলবে তাই হবে। খুব মানে আপনাকে, খুব। আপনারই ত লোকজন দাদা।

— কে যে কার লোক!

তারপরই গলা চড়াল— রশিদ, এই রশিদ...

ডাকের পরে যে লোকটা এল সে তালপাতার এক সিপাই। লিকলিকে প্যাকাটিমারা শরীরে একচিলতে মাংস নেই। বাতাসে উড়ে যাবে যেন এক্ষুনি।

— ক্লাবের সঙ্গে এদের কি একটা ব্যাপার হয়েছে। শুনে নে। দেখ ত ওদের বলেটলে এদের একটু সাহায্য করতে পারিস কিনা।

রশিদ চোখে ইঙ্গিত করে— আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।

পুকুরপারে জলশিরিষের ছায়ায় বসে সব শুনল রশিদ। বেশি কোনও কাহিনী ত নয়, দু লাইনের গপ্প। আর এ গপ্প যে ও শোনেনি আগে বিশ্বাস হয় না রাখালের। কতক্ষণ কথা বলেনি রাখাল। রবি বারণ করেছিল। এবার না বলে পারল না।

— গাঁটের পয়সা দিয়ে ধারদেনা করে একফালি জমি কিনলাম দুটো কাঁচা ঘর বানিয়ে থাকব, তাও হবে না!

— ক্লাবকে ডাকতে হবে। ওদের কথাও ত শুনতে হবে। ওদের কোনও কাগজপত্র আছে কিনা দেখতে হবে। বলছে হাতপরচা আছে। সেটা দেখতে হবে।

রবি গদগদ হয়েই আছে।

— সে না হয় দেখলেন আপনি। অবশ্যই দেখবেন। তবে গরিবের হক—

— ক্লাবকে সরে দাঁড়াতেই হবে। দলিল যখন আপনার।

— সরে ত দাঁড়াতে রাজি। পাকাবাড়ি বানাতে হবে। ইঁট বালি সিমেন্ট মিস্ত্রি কাঠ সব ওরা দেবে। মানে ওদের কাছ থেকে নিতে হবে। আমি কাঁচাঘর বানাবো। ইঁট বালি সিমেন্ট আমার ত কোনও কাজ নেই। অনেক আশা নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।

— একটা রফা করে নিলেই ত পারতেন। রফা একটা করতেই হবে।

— ওদের সঙ্গে রফা মানে ত সেই এক কথা— ইঁট-বালি-সিমেন্ট- মিস্ত্রী সব ওদের কাছ থেকে নিতে হবে। বলেছি ত—

— রফাটা ওদের সঙ্গে নয়, আমার সঙ্গে করুন।

রাখাল হা হয়ে বসে থাকে। ভাবেনি সে। আদপেই ভাবেনি। স্রেফ দুটো অক্ষরের একটা শব্দ— 'রফা'। কেমন ভারী হয়ে নামছে পদে পদে। এবারকারটা নিয়ে কতবার কতভাবে শব্দটা কানে এসেছে। ছোট বড় মাঝারি— সব মুখ থেকে ওই একটা শব্দ। রাখালের মনে হয়, এই একটা কৌশল কত নিখুঁত ভাবে জানা উচিত ছিল তার বেঁচে থাকার জন্য।

সন্ত্রাসদীর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চল

সুবীর ভৌমিক

১৯৬২ সালের চীন যুদ্ধ আর ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশেষতঃ মিজোরাম, মণিপুর তথা ত্রিপুরাতে সন্ত্রাসবাদ যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তার এক সাযুজ্য রয়েছে। এই অঞ্চলের সন্ত্রাসবাদ নাগা জঙ্গিদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়েই শুরু হয়েছিল।

শুরুতে উগ্রবাদীদের লক্ষ্যমাত্রা নগরকেন্দ্রিক ছিল না। কিন্তু যখন এই আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে শক্তি সঞ্চয় শুরু করলো তখন এদের অভিমুখ হল শহর। শুরু হল সন্ত্রাসবাদের দ্বিতীয় অধ্যায় — শহর সন্ত্রাসবাদ। প্রায়ই এদের লক্ষ্য হত ছোট ছোট শহরগুলি। এরই যোগসূত্রে ১৯৭৫ সালে মিজো জাতীয় ফ্রন্টের জঙ্গিরা রাজধানী আইজলের পুলিশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিন সিনিয়র পুলিশ আধিকারিককে খতম করে।

মণিপুরী পিপুলস লিবারেশন আর্মি এবং ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন— এই দুই সংস্থা শুরুতে গেরিলা গ্রুপ হিসেবে শহরাঞ্চলে তাদের কার্যকলাপ আরম্ভ করে এবং বর্তমানে এরা তাদের কাজের ক্ষেত্রের বিস্তার করেছে ইন্দো-বার্মা সীমান্ত অঞ্চলে। এদের কার্যকলাপ দমন করেছে বলে সামরিক বাহিনী দাবী করলেও কার্যত কিছুই হয়নি। অসমের উলফারও একই কায়দায় নিজেদের কাজের বিস্তার ঘটিয়েছে। গ্রাম থেকে শুরু করলেও আজ তা শহর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত — একথা আজ আর কারোরই অজানা নয়। সম্প্রতি এদের ছোট ছোট দল ভিন্নরাজ্য থেকে আসা হিন্দি ভাষীদের মতো সফ্‌ট টার্গেটকে লক্ষ্য করেছে এবং তাদের লক্ষ্য করে অস্ত্র শানিয়েছে। এইসব দলগুলিও সামরিক বাহিনীর লোকেদেরও হত্যা করেছে যখন তাদের 'ডিউটি' থাকতো না।

কিন্তু বিদেশী নিয়োগকর্তাদের নির্দেশে এদেরই বিশেষ দল অসমের তৈল শোধনাগারগুলিতে বোমা বর্ষণ করেছে এবং গ্যাস পাইপলাইন ধ্বংস করেছে। ১৯৯১ সালে উলফার জঙ্গি প্রধান পরেশ বড়ুয়া যখন পাকিস্তানে গেছিল তখন তাকে সামরিক বাহিনীর ওপর আক্রমণ বন্ধ করতে বলা হল এবং পরিবর্তে অন্তর্ঘাত চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হল। পরেশ বড়ুয়া অবশ্য এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। এই ভাবনায় যে উলফা যদি অন্তর্ঘাত চালিয়ে যায় তবে যেসব অসমিয়া এইসব সংস্থার উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পরে উলফারা যখন তাদের জনসমর্থন হারাতে শুরু করল তখন এইসব ভুলে গিয়ে বিভিন্নস্থানে এলোপাথাড়ি বোমা বর্ষণ চালালো। কিন্তু এই ধ্বংসাত্মক কাজের ফলে উলফারা জনগণ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হতে লাগালো। যেমন গুয়াহাটির ফ্যান্সী বাজারে বোমা মারলে হয়তো কিছু বিহারী শ্রমিক বা মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী মরবে, কিন্তু সেই সঙ্গে মারা যাবে বহু অসমিয়া মানুষ যারা সেই সময় কেনাকাটা করছিল। এইভাবে শহর কেন্দ্রিক সন্ত্রাসবাদ ধাক্কা খেল এবং এইসব প্ল্যান যাদের মস্তিষ্ক প্রসূত তাদের শিরঃপীড়া শুরু হল।

নিরীহ মানুষদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বোমা মেরে হত্যা করে যে সন্ত্রাসবাদের শুরু, সেইসব সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিরা ধীরে ধীরে জোর করে মানুষদের থেকে তোলা আদায় করতে আরম্ভ করল।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজনই উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের জন্ম দেয়। বিভাজনের আগে এই অঞ্চলের পাহাড়ী মানুষজনের ব্যবসা, অর্থনৈতিক কাজ-কারবার, যাতায়াত এবং শিক্ষার প্রসারের বিষয়ে সংলগ্ন বাংলাদেশ, বার্মার সঙ্গে সুনিবিড় যোগসূত্র ছিল। খাসী,জয়ন্তিয়া, গারো পাহাড়ের মানুষজনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। মিজো পাহাড়বাসীদের যোগাযোগ ছিল চট্টগ্রাম পাহাড়বাসীদের সঙ্গে।

আবার ত্রিপুরীদের সম্পর্ক ছিল কুমিল্লা, নোয়াখালি, সিলেট অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে। মিজো পাহাড়ের কিয়দংশ, মণিপুর এবং নাগা

পাহাড়ের সরাসরি যোগাযোগ ছিল বার্মার সঙ্গে। কারণ এই অঞ্চ লের বাসিন্দাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন থাকত বার্মায়। পূর্বতন উত্তর-পূর্ব-সীমান্ত এজেন্সি — নেফা যা এখন অরুণাচল, যোগাযোগ ছিল তিববত, ভূটানের সঙ্গে। মোট কথা, এইসব উপজাতি অঞ্চ লের মানুষজনের সঙ্গে প্রতিবেশি বাংলা এবং বার্মার নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

দেশ বিভাগ ও চীনের তিববত দখল — এই দুটি ঘটনা নতুন করে আন্তর্জাতিক সীমাকে ওলট্-পালট করে দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সীমানা নিয়ে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিল। স্বাধীনোত্তর ভারত দেখল যে, ২ লক্ষ২৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার সীমানা যার মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চ লের সঙ্গে তিববত, বার্মা, বাংলাদে শের যে যোগাযোগ ছিল তা কমে গিয়ে এই অঞ্চ লে প্রবেশদ্বার হিসেবে পড়ে রইল মাত্র ২১ কি. মি. প্রশস্ত শিলিগুড়ি করিডর।

স্বাধীনতার প্রথম কয়েকবছরের মধ্যে কয়েকটি ঘটনা প্রবাহ দেশের নীতি, দেশের সীমান্ত-সমস্যার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। যেমন—

১। চীনের তিববত দখল ভারতীয় সীমানার যে নিরাপদ রেখা ছিল তা কার্যত মুছে দিয়েছে। নেহেরুর নীতি ভারতের সীমা বরাবর চীনা সেনা সমাবেশ বন্ধ করতে পারেনি।

২। দেশের প্রথম জাতিগত সন্ত্রাস নাগা জঙ্গি আন্দোলন যা পাকিস্তানের প্রচ্ছন্ন মদত পুষ্ট ছিল, নেহেরু সরকার তা দমন করতে পারেনি।

৩। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাতাবরণের পরিবর্তন এবং পাকিস্তানের সেই দেশবিভাজনের সাম্প্রদায়িক নীতি ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা আন্দোলনের জন্ম দেয় এবং তা ক্রমে ক্রমে পাকিস্তানের শাসকদের চ্যালেঞ্জ জানায়। পরিণামে ভাষার উপর ভিত্তি করে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা পুষ্ট বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানকে দু'টুকরো করতে ভারত সক্রিয় ভূমিকা নিলেও ভ্রান্ত নীতির ফলে আজও বাংলাদেশ আমাদের চিন্তার কারণ।

নিরাপত্তা

ভারতীয় সীমান্তে চীনা সৈন্য সমাবেশ এবং নাগাদের (এবং পরে মিজো, মণিপুরী, ত্রিপুরী সন্ত্রাসবাদীদের) পাকিস্তানের প্রচ্ছন্ন ইন্ধন ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অশনি সংকেত যা নতুন দিল্লীর ঘুম কেড়ে নিয়েছে। পরে পূর্ব পাকিস্তানে উত্তেজনা অবশ্য একপ্রকার সুবিধা করে দেয়। মার্চ ১৯৭১-এ বাংলাদেশীদের ওপর পাকিস্তানি হামলার পর এক গোয়েন্দা অফিসার পি এন ব্যানার্জী তাঁর সহকর্মীদের বলেছিলেন যে, পাকিস্তানকে দু-টুকরো করে দেওয়ায় চীন-পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চ লের সমঝোতাকে খর্ব করা গেল এবং তা ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চ লকে রক্ষা করেছে।

'৬২ সালে চীনের হামলা আমাদের নেতাদের চোখ খুলে দিয়েছে। এই হামলা প্রমাণ করেছে যে, স্থল বাহিনীর শক্তি চীনের অনেক বেশী এবং এই বাহিনী আমাদের হিমালয় অঞ্চ লের যাবতীয় প্রতিরক্ষাকে খড়-কুটোর মতো উড়িয়ে দিতে পারে। এই জয় চীনকে দক্ষিণমুখী করে বঙ্গোপসাগরে তার নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করতে উৎসাহ দেয় এবং তা নতুন দিল্লীর কর্তাদের চীন-পাকিস্তানের অশুভ আঁতাত সম্পর্কে টনক নড়িয়ে দেয়। ৬২-র চীন যুদ্ধ এবং তৎপরব র্তী '৬৫-তেপাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে র সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চ লে জাতিগত সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দেয়। নাগা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক মিজো, মণিপুরী ও ত্রিপুরী সন্ত্রাসবাদ শুরু হয়ে যায়। ১৯৫৬ সাল থেকে বিদ্রোহী নাগারা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত অস্ত্র প্রশিক্ষণ পেতে শুরু করে। ওই বছরেই নাগা বিদ্রোহের নেতা এ জেড ফিজো ঢাকায় পালিয়ে যান এবং পাকিস্তানের জাল পাশপোর্ট নিয়ে লন্ডনে উড়ে যান। ১৯৫৬ থেকে ৬৬ এই এক দশকে আটটি দলে সর্বমোট ১৭০০ জন নাগা বিদ্রোহী প্রশিক্ষণ পায় এবং এদের হাতে তুলে দেওয়া হয় অস্ত্র। ষাটের দশকের শেষভাগে পাকিস্তান ক্রমান্বয়ে মিজো জাতীয় ফ্রন্ট, মণিপুরী ও ত্রিপুরী বিদ্রোহীদের ট্রেনিং দেয় ও অস্ত্র সরবরাহ করে। এরপর ১৯৬৬ সালে নাগা বিদ্রোহীরা চীনে গিয়ে গেরিলা যুদ্ধ শিক্ষা নেয়।

উত্তর পূর্ব ভারতে বিদ্রোহের আগুন এবং এই বিদ্রোহে চীন-পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদত নতুন দিল্লীকে সতর্ক করে দেয়। এই বিদ্রোহকে দমন করতে নতুন দিল্লী সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি নাগা সহ অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করে। এক সময় দিল্লী ভেবেছিল নাগাল্যান্ডকে উপদ্রুত অঞ্চ ল ঘোষণা করতে, কিন্তু ১৯৭১ -এর যুদ্ধ উত্তর-পূর্বের সমস্যাকে ধামাচাপা দিতে এক সুযোগ এনে দিল। যদিও দেশের পরিকল্পনা কর্তাদের মনে হয়েছিল এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা ঠিক পথ নয়, কিন্তু অচিরেই তাঁরা বুঝলেন এছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চ লের বিদ্রোহ দমনের আর কোনও রাস্তা খোলা নেই।

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চ লের উপর নিয়ন্ত্রণ চলে যাবার পর বন্ধু বাংলাদেশকে পাশে পেয়ে ভাবা হয়েছিল যে, উত্তর-পূর্ব ভারতে চীন-পাকিস্তানের কার্যকলাপ এবং ভারতের সংহতিকে বানচাল করার প্রয়াসকে খর্ব করা গেল।

বাংলাদেশের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর-পূর্ব-ভারতের পরিস্থিতি আমূল বদলাতে শুরু করে। বাংলাদেশ সৃষ্টির চার বছরের মধ্যে এক বিতর্কিত পরিস্থিতিতে সিকিম ভারতের সঙ্গে যুক্ত হল। সেই বছরেই নাগা বিদ্রোহীদের সাথে শিলং চুক্তি হয়। ফিজো এই চুক্তি মানলেন না এবং নাগা জাতীয় পর্ষদের এক বিদ্রোহী দল আবার অস্ত্র ধারণ করলো। এই গোষ্ঠীতে মূলতঃ অংশ নিল চীনে ট্রেনিং প্রাপ্ত নাগা গেরিলারা। ১৯৭৬-এ মিজো জাতীয় ফ্রন্ট কলকাতায় সরকারের সঙ্গে এক চুক্তি করল। এই চুক্তি রূপায়ণে দশ বছর লাগলেও সাতের দশকের শেষভাগে মিজো বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়েছিল। চাইনিজ কম্যুনিস্ট পার্টিতে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে কট্টরপন্থীদের পরাজয়ের পর গ্যাং অব ফোর, যাঁরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমর্থক এবং চীনের অভ্যন্তরে যারা অত্যাচারী বলে চিহ্নিত হয়েছিল, তারা সরে যাবার পর ধীরে ধীরে গেরিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বার্মা ও ভারতে গোলমাল পাকাবার বন্দোবস্তের বিষয়টা হ্রাস পায়। ১৯৮১ সাল থেকেই চীন তাদের বিপ্লব রপ্তানি বন্ধ করে দেয় এবং সেইসঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতে বিদ্রোহীদের সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতে নিরাপত্তার বাতাবরণ ষাটের দশকে অনেক শিথিল মনে হলেও সাতের দশকে তার অনেক উন্নতি হয়েছে বলে মনে

করল নতুন দিল্লী। বাংলাদেশের উৎপত্তি, চীনের নীতির পরিবর্তন এবং নাগা-মিজো সমস্যার আংশিক সমাধান ও সেইসঙ্গে বিদ্রোহ দমনে সামরিক তৎপরতায় দিল্লী আরও দৃঢ়ভাবে উত্তর-পূর্ব সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আনলো। কিন্তু এই স্বস্তি বেশিদিন টিকলো না। সাতের দশকের শেষ ভাগে বাংলাদেশে বন্ধু মুজিব নিহত হওয়ার পর সেই দেশের সামরিক প্রশাসক আর সেভাবে ভারত-বন্ধুর মতো আচরণ করলো না। বাস্তবিকভাবে মুজিব হত্যার পর ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিক্রিয়া ছিল চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চ লে শান্তি বাহিনীকে মদত দেওয়া। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের নতুন শাসক জিয়াউর-রহমান পুনরায় উত্তর-পূর্ব ভারত অশান্ত করার কাজ শুরু করে দিলেন। গেরিলা তৎপরতা পুনরায় নতুন উদ্যমে শুরু হল। তারা সংখ্যায় বাড়লো, বাড়লো তাদের উৎপাতও।

ভারতীয় নীতি পরিবর্তন

১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি এই অঞ্চ ল নিয়ে জাতীয় নীতি নতুন করে রচনা করলেন। পরবর্তী তিন বছরে তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীদের সঙ্গে চুক্তি করলেন। এই চুক্তি অসমে ভয়াবহ বিদেশী ইস্যু নিয়ে আন্দোলন শেষ করলো। শুধু তাই নয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা সমেত গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনও দমে গেল। চেষ্টা শুরু হল এন এস সি এনের সঙ্গে সমঝোতা। মনে হল রাজীব গান্ধী যেন শান্তির কবুতর হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং অন্যান্য অঞ্চ লের চেয়ে এই অঞ্চ লের প্রতি গুরুত্ব বাড়লো। সামরিক অভিযানের বদলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালাবার প্রয়াস কিছুটা ফলপ্রসূ হল। তবে তা সাময়িক।

আটের দশকের শেষে অভিযোগ উঠল যে রাজ্য সরকারকে অপদস্থ করতে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বোড়ো আন্দোলনকে মদত দিচ্ছে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মোহান্ত অভিযোগ করলেন যে, তাঁর সরকারকে হেনস্থা করতে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে অপারেশন জুম জুম চালু করেছে। তাঁর আরও অভিযোগ যে, এই উদ্দেশ্য সফল করতে বোড়ো উগ্রবাদীদের কাজে লাগিয়েছে কেন্দ্র সরকার। ১৯৮৭-র ডিসেম্বরে সারা ভারত বোড়ো ছাত্র সংগঠন-এর বিংশতিতম সম্মেলন হল। উপেন্দ্র ব্রহ্মের নেতৃত্বে পৃথক বোড়ো রাজ্য গড়ার দাবিতে তারা আন্দোলন জোরদার করলো। এই আন্দোলন নিয়মিতভাবে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে পাবলিক যানবাহনের ওপর, রাস্তায় এবং রেল সেতুগুলি উড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে। এমনও অভিযোগ উঠেছে যে, এদের অর্থ জোগাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির বদান্যতায় তাদেরই ভর্তুকিপ্রাপ্ত বাড়িতে বোড়ো নেতারা থাকতো। অভিযোগ উঠেছে যে, এইসব ব্যুরোর সিনিয়র অফিসাররা প্রেস নোট লিখে দিতেন বেশিরভাগ সময়ে শিলং থেকে।

পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একই কায়দায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনে মদত জোগানোর অভিযোগ করতেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীও রাজীব সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। তাঁর অভিযোগ — কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি টি এন ভি বিদ্রোহীদের মদত দিয়েছে যাতে তারা বাঙালী নিধনে সামিল হয় এবং হতাশ হয়ে বাঙালীরা ত্রিপুরায় তাঁর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টকে ভোট না দেয়।

কিন্তু এক চুক্তির মাধ্যমে ১৯৮৮ সালে গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও বোড়ো আন্দোলন '৯৩ সাল অবধি চলেছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টাতে বোড়োদের নিয়ে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও তা রূপায়ণ করা যায়নি, পরিণামে আজও বোড়ো জঙ্গিরা অসমের পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চ লে সক্রিয়।

একটাই সরকার যারা প্রাথমিকভাবে এক বলিষ্ঠ নীতি প্রণয়ন করে পুরাতন জঙ্গি আন্দোলনের সমাধানের চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত বিচ্যুতি দেখা গেল। গোর্খা অধ্যুষিত এলাকা শিলিগুড়ি রয়েছে পশ্চিম করিডরে আর বোড়ো অধ্যুষিত এলাকা হল পূর্ব করিডর। এই দুই করিডর যুক্ত করেছে উত্তর-পূর্ব অঞ্চ লকে সারা ভারতের সঙ্গে। কোনও সচেতন সরকারই চাইবে না যে, এই দুই অঞ্চ ল উপদ্রুত থাক এবং ধবংসাত্মক কাজে লিপ্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে মদত দেওয়া হোক।

রাজীব গান্ধী সরকারের পতনের পর যে পালাবদল হয়েছিল তার প্রথমভাগে ছিল ভি পি সিং-এর সরকার এবং পরে চন্দ্রশেখরের সরকার। চন্দ্রশেখর সরকারই 'অপারেশন বজরং' নামে এক বড়সড় জঙ্গি দমনের উদ্দেশ্যে সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেয়। এই অভিযান চালানো হয়েছিল আলফা দমনে যারা আশির দশকের শেষভাগে এক ভয়াবহ জঙ্গি সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সময়েই এন এস সি এন উত্তর-পূর্ব অঞ্চ ল সহ অন্যত্র স্যাটেলাইট গ্রুপ তৈরি করেছিল। ত্রিপুরায় নতুন এক গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিল— অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স রূপে। আরেকটি উগ্রবাদী সংস্থা জন্ম নিল— ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা (এন এল এফ টি)। ইম্ফল উপত্যকায় জঙ্গি আন্দোলন শুরু হল বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাধ্যমে।

জঙ্গিদের বারবার হিংসাত্মক হামলার ফলে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে নিরাপত্তার বিষয়টা গুরুত্ব পেল। নাগা জাঙ্গিরা চেষ্টা চালাল, তাদের গুপ্ত সঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে। অন্যত্র এন এস সি এন-এর খাপলং গোষ্ঠী আলফা এবং ইউ এন এল এফ-এর সঙ্গে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করল। এন এস সি এন (আইজাক-মুইভা) -র আরেক গোষ্ঠী বোড়ো সিকিউরিটি ফোর্স এবং ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা সহ অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে অশুভ আঁতাত গড়ে তোলার চেষ্টা করলো।

নববই-এর আশঙ্কা

গোটা নববই-এর দশক জুড়ে উত্তর-পূর্ব অঞ্চ লে অন্য তিনটি ঘটনাপ্রবাহ সামরিক কর্তাদের কাছে প্রতিরক্ষা বিষয়ে অশুভ বার্তা নিয়ে এল।

এক, মায়নামারে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার।

দুই, উত্তর-পূর্ব ভারতে পাকিস্তানের আই এস আই মদতপুষ্ট জঙ্গি হামলার পুনরাবৃত্তি এবং অস্ত্র চোরাচালানের জন্য নতুন সমুদ্রপথ খুলে দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অস্ত্রের কালোবাজার থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে অস্ত্রের রপ্তানি।

তিন, বাংলাদেশের ভারতবৈরী শক্তির সাহায্যে এবং সেই দেশের মাটি থেকে জঙ্গি কার্যকলাপ পরিচালনা করা।

মায়নামার সামরিক জুন্টাকে সামরিক হার্ডওয়ার দিয়ে সাহায্য করতেচীনের ভূমিকা ও তৎপরতা বৃদ্ধি র প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। ১৯৮০ সাল থেকে চীন মায়নামারকে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি মূল্যের অস্ত্র সরবরাহ করেছে। চীন মায়নামারের তিনটি বন্দরে যেমন হাঙ্গাই, কোকো আয়ল্যাণ্ড এবং মারগুই-তে র‍্যাডার কেন্দ্র গড়েছে এবং সেই সঙ্গে সেখানে র‍্যাডারের মেরামত ও জ্বালানি ভরার ব্যবস্থাও গড়ে তুলেছে। ভারতবন্ধু আরাকান জঙ্গি গোষ্ঠীর নৌবাহিনী দ্য ন্যাশনাল ইউনিটি অব আরাকান পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে যে, চীন পর্যবেক্ষণের নামে আরাকান সমুদ্র সীমার মধ্যে বঙ্গোপসাগরে নিজেদের সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এতদিন ভাবা হত যে, চীন তাদের কার্যকলাপ স্থলসীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে, কিন্তু এখন তা জলসীমায় বিস্তার ও আগ্রাসনের চেষ্টা শুরু করেছে। অনেকে মনে করছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে চীনের এই ব্লু ওয়াটার নেভির মিশাইলের নিশানার আওতায় কলকাতা, মাদ্রাজ ও ভাইজাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলি চলে আসবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চ লে স্থল হামলার আশঙ্কা ছাড়াও নতুন দিল্লিকে নতুন করে ভাবাচ্ছে আন্দামান, নিকোবর দ্বীপসমূহের নিরাপত্তার বিষয়টিও।

১৯৯০-এর দশকে উলফা, এন এস সি এনের ধৃত জঙ্গিরা আই এস আইয়ের সঙ্গে যোগসাজসের কথা স্বীকার করেছে এবং এই স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আই এস আই কাশ্মীরের মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চ লে ও ধবংসাত্মক জঙ্গি হামলার এক দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলতে চাইছে।

সবচেয়ে বেশি চিন্তার কারণ হল, জঙ্গি গোষ্ঠীদের জন্য আরও নতুন নতুন অস্ত্র সরবরাহকারী সংস্থা এগিয়ে আসছে। এখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে, উলফা, এন এস সি এন এবং পি এল এ-র মতো সংগঠনগুলি তাদের অস্ত্র পেয়ে যাচ্ছে থাইল্যাণ্ডের কালোবাজারের মাধ্যমে। বিশেষত, খেমার রুজের তৈরি অস্ত্রগুলি সস্তায় ও সহজে পেয়ে যাচ্ছে তারা। কখনও কখনও এর দাম মেটাচ্ছে আই এস আই, আবার কখনও জঙ্গিরা তোলা আদায় থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়েও তা মেটাচ্ছে।

অস্ত্র কেনার পর ভুয়ো কাগজপত্রের মাধ্যমে এইসব চোরাচালান পৌঁছে যাচ্ছে বাংলাদেশ ও মায়নামার-এ বন্দরগুলিতে। আর এইসব কাগজপত্র বানিয়ে দিচ্ছে সেখানকারই নাগরিকরা। এই সব অস্ত্রশস্ত্র জাহাজে করে চলে আসছে বাংলাদেশের কক্সবাজরে আর মায়নামারের আরাকন প্রদেশে।

১৯৯৫ সালের এপ্রিল-মে মাসে ২০০ জন উলফা, পি এল এ এবং এন এস সি এন জঙ্গি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন জওয়ানদের হাতে ধরা পড়ে। এরা ওয়াইকং থেকে অস্ত্র নিয়ে আসছিল। এরা ধরা পড়ে বাংলাদেশ থেকে মিজোরামে প্রবেশ করার সময়। ৪০ জনেরও বেশি জঙ্গি সেইসময়ে সংঘর্ষে মারা যায় এবং এদের কাছ থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধা র করে জওয়ানরা। এই সামরিক অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন গোল্ডেন ডাক'। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের নৌ-সেনা এক জাহাজ ভর্তি বেআইনী অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে। এইসব অস্ত্র পাঠানো হচ্ছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চ লে জঙ্গি হামলার জন্য। ১৯৯৭ সালে থাইল্যাণ্ডের নৌসেনা বাজেয়াপ্ত করল একই ধরনের অস্ত্রের চোরাচালান। অসমর্থিত খবরে জানা যায় যে, ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে অপর একটা জাহাজকে অস্ত্র নিয়ে আসার সময় অজ্ঞাত কারণে মার্টিয়ান উপসাগরে উড়িয়ে দেওয়া হয়। জঙ্গি নেতারা যারা এই চালান গ্রহণের জন্য তৈরি ছিল তারা অভিযোগ করে যে, ওই জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেবার পিছনে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর হাত রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, উত্তর-পূর্ব ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমরাঞ্চ লের মধ্যে পড়ে বলে জঙ্গিদের পক্ষে এইসব অঞ্চ ল থেকে অস্ত্র সংগ্রহের সুবিধা।

এখন এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশের প্রাক্তন সামরিক প্রশাসন (এবং এমনকী বি এন পি সরকার) উত্তর-পূর্বাঞ্চ ল এলাকায় জঙ্গিদের আশ্রয়সহ নানান সাহায্য করে চলেছে। বেশিরভাগ ধৃত জঙ্গি নেতাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর পক্ষে তিনজন শীর্ষ মণিপুরী জঙ্গি নেতাকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং এটাকে গণ্য করা হয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ভারত সফরের সৌজন্য হিসাবে। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঢাকা প্রশাসন জঙ্গিদের দমন শুরু করে। সম্প্রতি বাংলাদেশ পুলিশ গোলাপ বড়ুয়া ওরফে অনুপ চেটিয়ার মতো এক উলফা শীর্ষ নেতাকে গ্রেপ্তার করে এবং তার বিরুদ্ধে সেই দেশে বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের করেছে। আওয়ামী লীগ কখনই বাংলাদেশের মাটি থেকে আই এস আই-এর কার্যকলাপ চলতে দেবে না বলে আশা করা যায় এবং ওই সরকার ভারতীয় জঙ্গিদের দমনে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, জামাত-ই-ইসলামের সহায়তায় বি এন পি সরকার জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে বর্ণনা করেছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে ভারত সরকার জঙ্গি দমন তৎপরতা আরও বাড়িয়ে দেয়। কিছু জঙ্গি গোষ্ঠী কোথা থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য পাচ্ছে তা নিয়ে অসম সরকার অনুসন্ধান শুরু করে। সেই সূত্রে সরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং এদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা বিষয়টা ছিল ভিন্ন ধরনের। নিরন্তর হামলায় ক্লান্ত জঙ্গিরা এবার শুরু করল জাতি বা সম্প্রদায়গত হামলা। যেমন নাগা-কুকিদের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ, কিংবা বোড়োদের হামলা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর। অনেক ছোটখাটো জঙ্গি গোষ্ঠী নতুন দিল্লীর সঙ্গে আলোচনায় বসল। এন এস সি এনের গোষ্ঠী ভারত সরকারের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু করেছে।

৫০ বছরের ওপর চলছে নাগা পাহাড়ে সন্ত্রাসবাদ। সন্ত্রাসবাদের চরিত্রগত কাঠামো অনেকটাই বদলেছে উত্তর-পূর্ব ভারতে। নাগারা, মিজোরা হল পাহাড়ি সন্ত্রাসবাদী। এরা কিছু অঞ্চ লে নিজেদের প্রশাসনিক অঞ্চ ল গড়ে তুলেছে। নিরাপত্তাবাহিনীর মোকাবিলা করে সেখানে চালাচ্ছে এক সমান্তরাল প্রশাসন। প্রথম দিকে এই সন্ত্রাসবাদীরা সফট্ টার্গেট এড়িয়ে চলত। কিন্তু অচিরেই নাগা, মিজো পাহাড়ি জঙ্গিরা নগরকেন্দ্রিক সন্ত্রাসবাদ শুরু করে। মণিপুরী পি এল এ এবং ইউ পি এন এল এফ গোষ্ঠী এবং অসমের উলফারাও তাদের অনুসরণ করল।

এদের বিশেষ দল সেনা আধিকারিকদের ওপর তখনই হামলা করত যখন তারা ইউনিফর্ম পরতেন না।

শহর কেন্দ্রিক সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে গুপ্ত হত্যা, সফট্ টার্গেট-এর ওপর হামলা, ব্যাপক আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার এবং সেইসঙ্গে অপহরণ ও জোরজুলুম করে টাকা তুলতে শুরু করল। সাতের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নাগা-মিজো জঙ্গিরা তাদের রাজ্য থেকে কর আদায় করত, এমনকী বহিরাগতদের কাছ থেকেও। এই কর আদায়ের মাধ্যমে তারা তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের আর্থিক বুনিয়াদ গঠনের চেষ্টার পাশাপাশি সরকারি প্রশাসনকে বোঝাতে চাইত যে, তারাও এক সমান্তরাল প্রশাসন চালাতে সক্ষম। অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণের সহায়তা পাকিস্তান থেকে আসত এবং সাতের দশকের শেষে তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর জঙ্গিরা জোরজুলুমের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ শুরু করল। উলফার সামরিক প্রধান পরেশ বড়ুয়া বি বি সি কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অকপটেই স্বীকার করেছেন যে, এইভাবে তাদের সংগৃহীত অর্থ কয়েকশো কোটি টাকা। একথাও তিনি স্বীকার করেছেন যে, টাটার মতো কোম্পানীগুলোও চাপের কাছে নতি স্বীকার করে যুদ্ধাস্ত্র কেনার জন্য অর্থ সাহায্য করেছে।

সরকার জঙ্গিদের এই অর্থ সংগ্রহ নিয়ন্ত্রণ করায় জঙ্গিদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। ত্রিপুরায় জঙ্গিরা জোরজুলুম করে তোলা আদায়ের ব্যাপারটাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এরা সেনা বা অন্য লক্ষ্যবস্তুর ওপর হামলা কমিয়ে দেয়। এরা তিন-চার জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অপহরণ করত বন্দুকের নলের মুখে। বাইরে থেকে সেনা অভিযান রুখতে জঙ্গিরা আসলে এইসব অপহৃত ব্যক্তিদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করত। জঙ্গিদের এইভাবে টাকা আমদানির রাস্তা বন্ধ করতে ত্রিপুরা সরকার কার্যত ব্যর্থ। বরং ত্রিপুরা সরকারের মাধ্যমে অপরহণের প্রাপ্ত অর্থ যাতে অবাধে ব্যবহৃত হতেপারে তার ব্যবস্থা দালালরাই করে দিত। রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রের নিন্দা না করে বরং জঙ্গি দমনে রাজ্য যেন তার পুলিশ বাহিনীকে কাজে লাগায়। কঠোরভাবে জঙ্গিদের মোকাবিলা করলে জঙ্গিরা আর অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে না এবং অর্থ সংগ্রহ না হলেই এদের আন্দোলন দমে যাবে।

আজকাল বেশিরভাগ জঙ্গি গোষ্ঠী জাতিগত আক্রমণ বেছে নিয়েছে। অন্য রাজ্য থেকে আসা মানুষদের এরা শত্রুর চোখে দেখছে। ত্রিপুরায় জঙ্গিরা নিয়মিতভাবে বাঙালি অধ্যুষিত গ্রামে হামলা চালায়। নাগারা কুকিদের ওপর এবং বোড়োরা হামলা চালাচ্ছে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর। উলফারা হামলা চালায় হিন্দিভাষীদের ওপর। অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের উৎখাত করে নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত অঞ্চ ল গড়ে নিজেদের জাতিগত রাজ্য গড়ে তোলা এদের লক্ষ্য।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চ লে বিচ্ছিন্নতাবাদের এক স্থায়ী সমাধান হল সামরিক অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া। সেই সঙ্গে চীন ও পাকিস্তানের সেনা তৎপরতার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা এবং অস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য বন্ধ করতে উত্তর-পূর্বাঞ্চ লের সঙ্গে যেসব রাষ্ট্রের সীমানা রয়েছে তা সীল করে দেওয়া। কূটনৈতিক স্তরে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়া, যাতে ওইসব রাষ্ট্র থেকে অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ বন্ধ করা যায়। সবশেষে আঞ্চ লিক উন্নয়নে ভারতীয় ও বিদেশী পুঁজির ব্যাপক বিনিয়োগ করা, যাতে এইসব অঞ্চ লে বেআইনী চোরাচালান নির্ভর অর্থনীতিকে প্রতিরোধ করা যায়।

হুঁকো বার

এক যৌন সুড়সুড়ির ব্যবসা

চণ্ডী লাহিড়ী

মাঝে মাঝেই কাগজে হুঁকো-বার-এর বিজ্ঞাপন বের হচ্ছে। সুন্দরী মহিলা লম্বাঝুল কামিজ আর চুস্ত পরে হুঁকো খাচ্ছেন। হাবভাবে বলা হচ্ছে, মুগল হারেমে এভাবেই নাকি সম্রাজ্ঞী ও তাঁর সহচরীরা হুঁকো খেতেন। যাঁরা বিজ্ঞাপনের কপি লেখেন তাঁরা হুঁকো আর গড়গড়ার তফাৎটা জানেন না। আর যে লম্বাঝুল কামিজ আর চুস্ত পরে সুন্দরীটি অন্যান্যদের হুঁকো খেতে প্রলুব্ধ করছেন, তিনিও জানেন না, পোষাকটা মুঘলদের নয়। অযোধ্যার নবাবের অন্তঃপুরিকাদের পোষাক। তারা ওই পোষাকের সঙ্গে পেশোয়াজও পরতেন। অযোধ্যায় নবাববাড়ির কত্থক নাচিয়ে এবং বাইজিরা ওই পোষাক পরতেন। নবাব গৃহিনী বা নবাব নন্দিনীরা সবাই সর্বাঙ্গ চাদরে ঘেরা পোষাক পরতেন। তার প্রচুর ছবিও আছে।

সমাজ তৈরি হয় একটি ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক নিয়মে। মোগলরা এদেশে বৌ-বাচ্চা নিয়ে আসেনি। আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে তারা এসেছিল পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কিছু ধনদৌলত লুঠ করে চলে যেতে। শেরশার তখন প্রবল প্রতাপ। শেরশাও আফগানিস্তান থেকে এসেছিলেন। তিনি সঙ্গে এনেছিলেন হিং পেস্তা আঙ্গুর কিসমিস। ভারতীয় রন্ধন ব্যবস্থায় এসব দ্রব্য পাঠানদের প্রবর্তন। কয়েক ধরনের ঢাক, তবলা, সারেঙ্গ ও পাগড়ীও তাঁদের আমদানী। ভারত আফগানিস্তানের মধ্যে নির্দিষ্ট সীমারেখাও ছিল না। মোগলরা ঘর সংসার পেতে বেগমদের দিয়ে যেসব রান্না তৈরি করাতেন তাতে পেস্তা হিং কিসমিস নিশ্চয়ই ব্যবহার করতেন। পাঠানদের রান্নাটাই তাঁরা খেতেন। বৌ নেই, রান্নাঘর নেই, সেজন্য মোগলদের সমাজও প্রথম দিকে গড়ে ওঠেনি। মোগলাই খানা, মোগলাই পোষাক— এসব নাম ব্যবহার করে এখনকার কিছু ব্যবসায়ী ব্যবসা করে চলেছেন। শেষ মোগল বাহাদুর শাহ বন্দী হয়ে রেঙ্গুনে ছিলেন। তাঁর বেগম ছাড়া হারেমে অন্য রমণী ক'জন ছিল জানা যায় না। কোন্ রান্না তাঁর ফেবারিট সেটাও জানা দুঃসাধ্য।

অথচ আমরা জেনে গেছি, ময়দায় দুটো ডিম ফেটিয়ে মেখে পরোটা বানালেই মোগলাই পরোটা হয়ে যায়। নিজেদের আমীর মনে করে মহানন্দে খেতে বসি। আচ্ছা, মোগলরা কি মোগলাই পরোটা খাবার জন্য কাঁটা চামচ ব্যবহার করতেন? এর জবাব ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব জানেন না। হোটেলের বেয়ারা জানে।

পার্ক স্ট্রীটের সম্ভ্রান্ত হোটেলে মাংস দিয়েছে। মেনুকার্ডে লেখা আছে মুঘল স্টাইল। তৎসহ রেসিপি দেওয়া আছে। তাতে প্রচুর ক্যাপসিকাম আর টমাটো উল্লেখ দেখি। সম্রাট আকবরের আমলে ক্যাপসিকাম কিভাবে লভ্য হল বুঝলাম না। গ্রেট মুগল দরবারে কোনও চৈনিক অতিথি দু-এক পিস ক্যাপসিকাম দিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু পেলেন বলেই সম্রাট খেলেন ব্যাপারটা এমন সহজ সরল নয়।

সম্রাটদের অনেকেই তাঁর জন্য রন্ধিত খাদ্য অন্য বিশ্বাসী কর্মচারীদের আগে খাওয়াতেন। খাদ্যে বিষ মেশানো আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে সম্রাট আহার্য মুখে দিতেন। খাদ্য ও পানীয়ে বিষ মেশানো কিনা বোঝার জন্য বিশেষ ধরনের পাত্র থাকত। রান্নার দ্রব্য এবং রাঁধুনি ছিল সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সেই চলমান প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের দিনে খাদ্যে বিষ মেশানোর ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটত। রাঁধুনি সম্রাটের খুব কাছের লোক। অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হওয়া তো একালের মতো সেকালেও আবশ্যিক ছিল।

একেবারে শুরুর দিকের মোগল সম্রাটরা দেশ থেকে আসার সময় সঙ্গে বৌ নিয়ে নিশ্চয়ই আসেননি। তাঁরা এসেছিলেন লুঠতরাজ করতে। ধনদৌলত ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দেশে নিয়ে যেতেন। বাবর তো জীবনের বেশিরভাগ সময় এক যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে অন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছুটে বেড়িয়েছেন। ভারতে যে তিনটি বড় যুদ্ধে তিনি জিতেছিলেন, তার কোনওটাই তাঁকে এদেশে সুস্থিত করতে পারেনি। তিনি প্রতিবারই

মোঙ্গলিয়ায় চলে গিয়েছেন। এদেশের মাটির প্রতি কোনও টানই তাঁর ছিল না। হুমায়ুন তো শেরশাহের ভয়ে প্রথম দিকে কেবল পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন। ভালমন্দ খাবার ইচ্ছা বা সুযোগ কোনওটাই কি পলায়মান মানুষের থাকে? ঠাট্টা করে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মজার কবিতা লিখেছিলেন। বাঙ্গালী যোদ্ধা যুদ্ধ করবে বলে যখন প্রতিজ্ঞা করল তখন তাঁর গৃহিনী স্বামীকে বলেছিল—

'নিতান্তই যাবে যদি নাথ,
আলুভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া।

হুমায়ুনের তো বাঙ্গালী বৌ ছিল না যে শেরশাহের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে যাবেন বলে আলুভাতে ভাত রান্না করে পতিসেবা দেখিয়েছিলেন।

মোগলাই শব্দটির প্রতি আমাদের প্রবল দুর্বলতা। লাথি ঝাঁটা খেয়ে যে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরা সারা ইংরেজ আমলটা কাটিয়েছে, তাঁদের পূর্বপুরুষদের মনের গোপনে একটা বিশ্বাস ছিল, ইংরেজদের শাসনের চেয়ে মোগলের শাসন অনেক ভাল ছিল। যা কিছু অতীতের সেটাই মহান। মোগল খানাও সেরকম বিশ্বাসের ফল। সাধারণ মুসলমান সে যুগে এখনকার গরীব মুসলমানের মতোই বেগুনপোড়া পান্তাভাত খেতেন। ঠাট্টা করে বলতেন— ঠাণ্ডি পোলাও আর বেগুনকা ভরতা।

এক ছোট মাপের সাহিত্যিকের রচনায় পেলাম, মোগল হারেমে সিবাজি পান চলছে। সিবাজ পারস্য দেশে। মোঙ্গলিয়ায় নয়। মোঙ্গলিয়ানদের নিজস্ব পানীয় ছিল যা সিবাজির চেয়ে অনেক বেশি লোভনীয়। এটা মজুতবা আলীর কাছে শুনেছি।

নিজেদের মূল্যবান পানীয় ফেলে মোগল সম্রাটরা সিবাজি নামক পানীয় খেতে যাবেন কেন?

এর ফলে হাবিব মোগল জীবনকে মহান করে দেখাবার একটা দায় ঘাড়ে নিয়েছেন। আওরঙ্গজেব ছিলেন খুব সংকীর্ণমনা। এরফান পড়লে মনে হবে, একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা— সামান্য হিন্দু বিদ্বেষও তাঁর ছিল না।

এরফান সাহেবের মোগল গবেষণার প্রধান সমস্যা হল নগর ছেড়ে গ্রামে বড় একটা তিনি অবতরণ করেননি। গ্রামে এলে তিনি দেখতে পেতেন, শতকরা আশি জন (কৃষক, ভদ্রলোক সবাই) হুঁকো খান এবং অতীতেও খেতেন। একমাত্র জমিদার (যদি খুব ধনী হন) নিজেদের খানদান দেখাতে গড়াগড়া সেবন করতেন। মুসলিম অন্তঃপুর সম্ভ্রান্তদের কাছে বড়ই সুরক্ষিত। পর্দাপ্রথা সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত এখনও অটুট। তাঁরা তামাকু সেবনের জন্য পরপুরুষকে সেক্স জাগিয়ে উন্মাদনায় অস্থির করে তুলে বিশেষ ঘরে আমন্ত্রণ করবেন, এটা গাঁজায় দম দিয়েও কি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়!

মোগলাই কথাটা কানে গেলেই আমরা আবেগে সম্ভ্রমে একেবারে বিগলিত হয়ে উঠি। হুঁকো বার বা গাঁজা বার নাম যাই দেওয়া হোক, আসলে সেটা সেক্স-বেচার রকমফের।

আর পড়াশুনা করে যেটুকু বুঝেছি, (অবশ্য আমার পরেও অনেকে পড়াশুনা করবে) তাতে মনে হয়, মোগলখানা খুব সামান্য বস্তু— তাতে প্রচুর ঘি আর ক্যাপসিকাম কোনওদিনই থাকত না। টমাটো সেকালে দিল্লীতে কেউ চোখেও দেখেনি।

বেঁচে থাকার অন্যমুখ

দীপঙ্কর দাস

বাড়ির ঠিক দক্ষিণ দিকে একটা কারখানার অবস্থান দেখে কার না মন দমে যায়! নতুন কেনা ফ্ল্যাট বাড়ির তৃতীয় তলের ফ্ল্যাটে নতুন করে সংসার পাতার মধ্যে যে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা এবং সুখবোধ লুকিয়ে থাকে, অঞ্জলি তা ষোলো আনা উপভোগ করতে করতেও কারখানাটার দিকে মাঝেমাঝেই নজর না চালিয়ে থাকতে পারছিল না। চারতলার এই ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনে একটা সরু রাস্তা। রাস্তার ওপারে একসারি বাড়ি। অধিকাংশই একতলা। পেছনে একটা জলাশয়। পানায় ঢাকা। তারপর কারখানার সীমানা প্রাচীর। প্রাচীরের গা ঘেঁষে উঠেছে কয়েকটা টিনের শেড। দুটো অনুচ্চ চিমনি। চিমনির মুখ দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

— তুমি আর ফ্ল্যাট কেনার জায়গা পেলে না! শহরে এত জায়গা থাকতে দেখেশুনে একটা কারখানার গা ঘেঁষে ফ্ল্যাট কিনলে! আশ্চর্য তোমার কাণ্ডজ্ঞান!.... অঞ্জলি ছোট টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বসার ঘরের দেওয়ালের হুকে ওয়ালক্লকটা ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে বলল।

অরিন্দম শুনল। টুলের ওপর দাঁড়িয়েও দেওয়ালের হুকটার ভাল করে নাগাল পাচ্ছিল না অঞ্জলি। তাই গোড়ালি উঁচিয়ে ঘড়িটাকে কোনওরকমে হুকে ঝুলিয়ে দিল। অরিন্দম দেখল দৃশ্যটাকে। কেবল গোড়ালি মাটি ছাড়ায়নি। সেই সঙ্গে শাড়ির নিম্নভাগ বেশ কিছুটা উঠে গিয়ে অনাবৃত করেছে অঞ্জলির পায়ের গোছ। অরিন্দম চোখ সরিয়ে নিল।

অঞ্জলি যদিও শহরের জায়গার প্রাচুর্যের কথা বলল। তবু অরিন্দম জানে এটা অঞ্জলির কথার কথা। কারণ অঞ্জলি ভালো করেই জানে যে শহরে ফ্ল্যাট কেনার মতো অনেক লোভনীয় এবং চিত্তাকর্ষক জায়গার কোনও অভাব না থাকলেও সেইসব এলাকায় ফ্ল্যাট কিনে বসবাস করা তো দূরের কথা, সামান্য একটা ভাড়ার ঘর কিনে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করার মতো আর্থিক সামর্থ অরিন্দমের নেই। নিজের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধ তাকে জেনেও অরিন্দম যে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর কিংবা বেহালায়, উত্তর কলকাতার সিঁথি কিংবা দমদম এলাকায় দু-চারটে ফ্ল্যাট

দেখার মতো কাজ সারেনি, এমনও নয়। দেখে যে পছন্দও হয়েছে তাও ঠিক। কিন্তু দাম শুনেই একরকম তড়িৎস্পৃষ্টের মতো ফিরে এসেছে। সব শুনে অঞ্জলিই তো আশ্বস্ত করেছিল অরিন্দমকে। বলেছিল— তুমি মিছিমিছি মন খারাপ করছ। শহরের সীমানার মধ্যে নাই বা হল, শহর ছাড়িয়ে শহরতলিতে— এই যেমন সাউথে রাজপুর, সোনারপুর, কিংবা নর্থে ব্যারাকপুর নৈহাটি— ফ্ল্যাট খোঁজ। ঠিক পেয়ে যাবে। ওখানে নিশ্চয় শহরের মতো গলাকাটা দাম চাইবে না প্রোমোটাররা।

নৈহাটির প্রান্ত ছোঁয়া প্রায় মৃত হয়ে পড়া— অথচ একদা বাংলার মানচেস্টার বলে পরিচিত এই শিল্প নগরীর পশ্চিমপ্রান্তে গজিয়ে ওঠা একটি বহুতল আবাসনের মধ্যে এই ফ্ল্যাটটিকে যখন প্রথম দেখতে এসেছিল অঞ্জলি আর অরিন্দম, তখন কিন্তু অরিন্দমই প্রথম আপত্তি জানিয়েছিল— না, না। এখানে তোমাকে নিয়ে থাকা সম্ভব নয়। চারদিকে কল-কারখানায় ভর্তি। এয়ার পলিউশন। সুস্থ থাকবে কেমন করে তুমি?

কি মুশকিল! এখন তো সব বন্ধ হয়ে গেছে। দেখছো না সব কারখানার শেডে মরচে পড়ে গেছে। অঞ্জলি অরিন্দমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সারিবাঁধা বন্ধ হয়ে যাওয়া একদা বাংলার অর্থনীতির প্রধান আর্টারি— কারখানার সারির দিকে। বিশাল বিশাল বাউণ্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘেরা এক একটা কারখানার চত্বর। ভেতরে শেডের পরে শেড। লাইন দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে চিমনিগুলি। কোনও একটি চিমনির মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। আগাছা গজিয়ে উঠেছে কারখানার ভেতরকার প্রশাসনিক ভবন ঘিরে। শেষ কবে রঙ চড়েছিল প্রশাসনিক ভবনের দেওয়ালে বোঝা দায়। একদিন কারখানার প্রশস্ত গেট ডিঙিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় প্রশাসনিক ভবন থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যেত কোনও বিদেশি কোম্পানির গাড়ি। হয়তো সেই গাড়িতেই দিনের মতো বেরিয়ে যেতেন কারখানার ম্যানেজার কিংবা ডাইরেক্টর। এখন গেট বন্ধ। লোহার পাল্লার গায়ে মরচে ধরেছে। গেটের মাথায় হয়তো এককালে শ্রমিক ইউনিয়নের লাল পতাকা উড়তো সগৌরবে। এখন সেই পতাকার লাল বর্ণ রোদে জলে ধুয়ে প্রায় ধূসর। ছিঁড়েও গেছে। এমনভাবে পতাকার লাঠির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ছেঁড়া পতাকা যে দেখে মনে হচ্ছে, সে লজ্জায় মুখ লুকোতে চাইছে।

এখন বন্ধ। কিন্তু চালু হতে কতক্ষণ! খুব দুর্বল স্বরে বলেছিল অরিন্দম।

রিক্সাটা হয়তো কোনও খানাখন্দে পড়েছিল, তাই বেশ জোরে একটা ঝাঁকুনি খেয়েছিল অরিন্দম। অঞ্জলির গায়ের ওপরেই হয়তো হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেত অরিন্দম। কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল সে— চালু হলেই তো সেই সাইরেন। সেই শ্রমিকদের হট্টগোল। ফার্নেসের আগুন, আর চিমনির মুখ ঠেলে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া। ব্যাস, হয়ে গেল।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! অঞ্জলি রিক্সার হুডের একটা পাশ শক্ত করে ধরে বলেছিল— এতসব কারখানা আর কোনওদিন খুলবে ভেবেছ! মালিকরা তো সবাই শ্রমিকদের পাওনা গণ্ডা হাতিয়ে পালিয়েছে। কাগজে পড়নি?

অঞ্জলির কথা হয়তো রিক্সা চালকের কানে গিয়েছিল। তাই সে বলে উঠেছিল— ঠিক কয়েছেন দিদিমণি। এইসব কারখানা আর কোনওদিন খুলবে না। মালিকরা জায়গা জমি সব প্রোমোটারদের কাছে বেচে দিয়ে দিল্লি বোম্বে পালাইছে। ইউনিয়নের নেতারা মোটা কমিশন পেয়ে সরে পড়েছে।

—তুমি জানলে কেমন করে? অরিন্দম জিজ্ঞেস করেছিল।

— আমি যে, এই যে দেখছেন এডওয়ার্ড জুট মিল— এখানে কাজ করতাম। গ্যান্ট্রি অপারেটার। কারখানা বন্ধ হলো প্রায় সাত বছর। তারপর থিকে রিক্সা চালাই। কি করবো! চুরি ডাকাতি তো করতে পারব না।

রিক্সাচালক সামনে দাঁড়ানো একটি ষাঁড়কে পথ ছেড়ে চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বারকয়েক প্যাঁক প্যাঁক শব্দে রিক্সার হর্ণ বাজিয়েছিল। সেই প্যাঁক ধ্বনি শুনে অরিন্দমের মনে হয়েছিল শব্দটা রাস্তার মহাদেবের বাহনটির উদ্দেশ্যে বাজাচ্ছে না রিক্সাওয়ালা। বাজাচ্ছে তার উদ্দেশ্যে, যারা এখনও বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্পাঞ্চলের আর্থিক মন্দার সুযোগে সুলভ মূল্যে আধুনিক ফ্ল্যাট কেনার মতো ভাগ্যবান।

ফ্ল্যাট পছন্দের পরে এগ্রিমেন্ট করার আগেও অরিন্দম একবার ফ্ল্যাটের দক্ষিণ দিকে এই কাঁচকলের অস্তিত্বের প্রতি অঞ্জলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বলেছিল— এই কাঁচ কলটা কিন্তু এখনও চালু আছে অঞ্জলি। তার ওপর আবার আমাদের ফ্ল্যাটের সাউথ ফেসিং ফ্রন্টের মুখোমুখি। কেবল শীতের দিন ক'টা ছাড়া সারা বছর দক্ষিণের বাতাসে চিমনির ধোঁয়ার কুচো, কার্বনের গুঁড়ো উড়ে এসে ঢুকবে তোমার ঘরদালানে। তখন থাকব কেমন করে?

তিন বছর ধরে তো সারা শহর চষে বেড়িয়েছো! পারলে একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করতে? অঞ্জলি অরিন্দমের অস্তিত্বকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল— আমাদের যা সামর্থ, এর চেয়ে ভালো কিছু জুটবে না কপালে। এখন আর দেরি করো না। তুমি এগ্রিমেন্টটা করে ফেল। তারপর তো লোনের জন্য ব্যাঙ্কে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে হবে। আমি আর বাড়িওয়ালার অত্যাচার সইতে পারছি না।

আজ নতুন ফ্ল্যাটে সংসার গোছাতে গোছাতে আপাত সুখী অঞ্জলির ফ্ল্যাট কেনার ব্যাপারে অরিন্দমের বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশের মধ্যে যে সামান্য একফোঁটা সত্যতা নেই, এই কথা স্বয়ং অঞ্জলিই অরিন্দমের চেয়ে ভালো জানে। তাই অরিন্দম অঞ্জলির কথার কোনও সাড়া দিল না।

দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট বাড়িটার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটা সম্ভবত এই ব্যালকনিটা। ব্যালকনির রেলিং-এর ওপর থেকে ব্যালকনির ছাদ পর্যন্ত খোলা জায়গাটাকে শক্ত গ্রিল দিয়ে আগেই ঢেকে দিয়েছিল অরিন্দম। কারণ, তার সাত বছরের একটি ছেলে আছে। নাম— রুবান। এখন ক্লাস থ্রি চলছে। অসম্ভব দুরন্ত। তিনতলার ব্যালকনির খোলা রেলিং-এর ওপর উঠে হাত বাড়িয়ে আকাশ ছোঁয়ার মতো দুঃসাহসিক ইচ্ছা যে রুবানের মাথায় কখনও চাপবে না, এবিষয়ে একেবারেই নিশ্চিত নয় অরিন্দম। অঞ্জলিও। ফলে সৌন্দর্যহানি হবে জেনেও গ্রিলের আবরণে ঢাকতে হয়েছে ব্যালকনি।

অরিন্দম অন্যমনস্ক হাতে একটা সিগারেট ধরাল। অঞ্জলির কারণেই অরিন্দম বাড়ির ভেতর সিগারেট ধরায় না। কোনও কোনও দিন

রাতের খাওয়ার পরে সিগারেটের পিপাসা একেবারে এড়াতে না পারলে অরিন্দম বাড়ির বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেটে টান দেয়। এতদিন যে বাড়িতে ভাড়া ছিল, তারা— সেটা গ্রাউন্ড ফ্লোর। দোতলায় থাকতেন বাড়িওয়ালা। ফলে ছাদের ওপর অধিকার কেবল বাড়িওয়ালারই ছিল। আর যেহেতু জলের ওভারহেড রিজার্ভারও ছিল দোতলার ছাদে, তাই কথায় কথায় ট্যাঙ্ক থেকে একতলায় সরবরাহকারী জলের পাইপের চাবি বন্ধ করার অধিকারীও ছিল ওই বাড়িওয়ালা। অরিন্দমরা অসহায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো পড়ে পড়ে মার খেয়েছে।

এক তলায় ভাড়া থাকার সূত্রে রাত বিরাতে সহজেই রাস্তায় বেরুনো যেত। এখন থেকে সেই রাস্তা বন্ধ। তিন তলার সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে সিগারেট খাওয়ার সুখ থাকে না। তার ওপর আবার রাত-বিরাতে। অরিন্দমকে ওই শখটা এবার ছাড়তে হবে।

ঘড়ি দেখল অরিন্দম। সাড়ে এগারো। বাড়ি বদলের জন্য আজ ছুটি নিয়েছে অরিন্দম। আজ এবেলায় আর রান্না-বান্নার ঝক্কি নেওয়া হবে না। বাইরে পেয়ারাতলায় ভালো হোটেল আছে। ওরা হাউস সাপ্লাইও দেয়। সকালেই বলে এসেছে অরিন্দম। বেলা একটা নাগাদ তিনটে মিল দিয়ে যাবে। ননভেজ।

দু'চোখের পাতায় নেমে আসা আলস্য সরিয়ে সামনের দিকে তাকালো অরিন্দম। বেলা সাড়ে এগারোটার অর্থই হল কাজের একেবারে পিক আওয়ার। ফলে কাঁচকল পূর্ণ গতিতে চলছে। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে গলগল করে। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশের বুকে কৃত্রিম মেঘের সৃষ্টি করেছে। সেই মেঘের ছায়া পড়ছে কারখানার পাশের পানাপুকুরের ওপর।

এখন সময় যেহেতু ডিসেম্বরের শেষ, ফলে বাতাসের গতি এখন উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী। ফলে বাতাসের টানে চিমনি উগলানো কালো ধোঁয়ার স্তূপগুলি ছাড়ানো সুতোর মতো আরও দক্ষিণের দিকে সরে যাচ্ছে। এদিকে অর্থাৎ দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে ভেসে আসতে পারছে না।

কিন্তু অরিন্দম তো জানে এই স্বস্তিটুকুর আয়ু কত দিনের। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকেই গাঙ্গেয় বাংলায় বাতাস দিক বদলে ফেলে। তখন তো বাতাস বইবে দক্ষিণ সাগর থেকে ছুটে এসে উত্তরের দিকে। সেই বাতাসের টানে ওই কালো ধোঁয়ার রাশি হই হই করে ছুটে আসবে এই ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে। অনুচ্চ চিমনির মুখ ঠেলে বেরুনো কালো ধোঁয়ার রাশি বাতাসের তাড়ায় তিনতলা, চারতলার ফ্ল্যাটের ওপরেই প্রথম ঝাপটা খাবে। ঝাপটা খেয়ে বিন বিন করে ঝরিয়ে দেবে কালো কার্বনকণা। অঞ্জলির সাধের ফ্ল্যাটের দালান, বিছানাপত্র, আসবাব ভরে যাবে কালো কয়লার গুঁড়োয়। অঞ্জলি সারা দিনে কতবার ঝাড়ু হাতে ঘর দালান পরিষ্কার করবে?

এটুকুও না হয় মানিয়ে নেওয়া যেত। অরিন্দমের উদ্বেগটা অন্যদিক থেকে জন্ম নিচ্ছে। অঞ্জলির পুরনো শ্বাসকষ্টের রোগ আছে। যদিও অরিন্দমের সাধ্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ভাবেই সীমিত। তবু সেই সাধ্যর সীমা অতিক্রম করেই অঞ্জলির রোগের চিকিৎসা করিয়েছে অরিন্দম। এমন কী একবার দক্ষিণ ভারতের নামি হাসপাতালেও নিয়ে গেছে অঞ্জলিকে। সবারই এক কথা, — না মশাই কোনও অর্গানিক কিংবা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন নয়, নিছক অ্যালার্জি। ধোঁয়া ধুলো, ফুলের রেণু— এসব এড়িয়ে চলতে পারলে পেসেন্ট ভাল থাকবে। না হলে সাফার করবে।

খোদ কলকাতা শহরে বাস করে ধোঁয়া ধুলোর সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলার ইচ্ছাটা যেমন অলীক, তেমনি ঠাট্টাও। তবু অঞ্জলি যতদূর সম্ভব সাবধানে থাকে। অনিবার্য কারণ না ঘটলে রাস্তায় বেরোয় না। বেরুতে হলে ফিল্টার মাস্ক পরে নেয় নাকে। ফলে অরিন্দম দেখছিল আজ দু-চার বছর ধরে অঞ্জলি অনেকটাই সুস্থ আছে। কালেভদ্রে অসুখটা চাগাড় দিয়ে উঠলেও তার তীব্রতা এতখানি হয় না যে, আগের মতো শয্যা নিতে হয়েছে। বলতে কি শরীর স্বাস্থ্যও ফিরেছে অনেকখানি। শরীর মনে ফূর্তিও জায়গা পেয়েছে। যে অরিন্দমকে বিয়ের বছর দুয়ের মাথাতেই স্ত্রীর শরীরের উত্তাপ গ্রহণের বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চি ত থাকতে হয়েছে, কারণ অঞ্জলি তখন রীতিমত অসুস্থ। বিশেষ করে রুবানের জন্মের পর থেকে তো অসুখের বাড়াবাড়িটা একরকম দুঃশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়ে ফেলেছিল। সেই অরিন্দম দেখে আসছে ইদানীং অরিন্দম নয়, অঞ্জলি স্বয়ং তার শরীর জুড়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে অরিন্দমকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে দাম্পত্যের অনুষ্ঠানে।

কিন্তু এখন যদি কাঁচকলের ধোঁয়ার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে অঞ্জলির রোগ আবার ফিরে আসে, তাহলে?

সারাদিন এই চিন্তাটা মাথায় নিয়েই কাটিয়ে দিল অরিন্দম।

মাঘের শেষ থেকেই বাতাসের দিক বদল ঘটল। ফাল্গুনের শুরু থেকে দক্ষিণের বাতাসের প্রবাহ শুরু হল। কাঁচকলের অনুচ্চ চিমনি দুটো থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ার রাশি দক্ষিণের বাতাসে উত্তরের দিকে উড়ে আসতে শুরু করল। সারাদিন ফ্ল্যাটের ব্যালকনি, ঘরবারান্দার মেঝে, খাট-বিছানা সোফা আলনা কয়লার গুঁড়োর আবরণে ঢাকা পড়ে যেতে শুরু করল। ফলে অঞ্জলিকে দফায় দফায় ঝাঁটা হাতে লেগে পড়তে হয় ঘরবাড়ি পরিষ্কার করার জন্য। যদিও অঞ্জলি জানে, তার এই পরিশ্রম অর্থহীন। একবার ঝাঁট দেওয়ার পরেই নতুন করে কয়লার গুঁড়ো উড়ে এসে ভরিয়ে দেয় মেঝে।

এভাবেই দিন গড়িয়ে মাস পেরুল।

চৈত্রের শুরু থেকে অরিন্দমের আশঙ্কা সত্যি হয়ে গেল। অঞ্জলির পুরনো শ্বাসকষ্টের অসুখটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ডাক্তার, ওষুধে সামান্য কমল বটে, অসুখের তীব্রতা, তবু স্বস্তি পেল না অরিন্দম। স্বস্তি পেল না অঞ্জলিও।

আমার কথা না হয় বাদ দিলাম। পুরনো অসুখ, সেটাই না হয় বেড়েছে। কিন্তু রুবানের কথা তো ভাবতে হবে। মাত্র সাত বছর বয়স থেকেই যদিও চবিবশ ঘন্টা এমন বিষাক্ত ধোঁয়ার মধ্যে শ্বাস নেয়। তাহলে ওর ফুসফুসের কী দশা হবে বল তো? অঞ্জলির ক্ষীণ গলার স্বর রাতের অন্ধকারকে আরও একটু ঘন করে তোলে। অসুখের পুনরাক্রমণের ফলে অঞ্জলি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে গেছে। শীর্ণ হয়ে গেছে

অঞ্জলির শরীর। ঝরে গেছে আকর্ষণীয় লাবণ্য। দুই চোখের নীচে ঘন কালি জমেছে। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে। পাঁজরাসর্বস্ব বুকের ওপর যে সুগঠিত স্তনদ্বয় এই সেদিনও অরিন্দমকে নিবিড় আশ্লেষে আশ্রয় দিয়েছে, সেই স্তনদুটি যেন ফুলের শুকিয়ে আসা পাঁপড়ি। বর্ণহীন। ঘ্রাণহীন। প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এই শরীর ঘেঁটে উত্তাপ তুলে নেওয়ার ইচ্ছে হয় না অরিন্দমের। হাজার হোক, সে তো পশু নয়।

এখন চৈত্র মাস পেরিয়ে বৈশাখ এসেছে শহরে। সারাদিন দক্ষিণের বাতাস বয়। তবু অঞ্জলিকে ফ্ল্যাটের দক্ষিণের দরজা জানলাগুলি বন্ধ রাখতে হয়। দিনের বেলাটা যেমন তেমন কেটে গেলেও সন্ধার পর থেকে ফ্ল্যাটে টেকাই দায় হয়ে পড়ে। কারণ কাঁচকলে চবিবশ ঘন্টা ফার্নেস জ্বলে। ফার্নেস যখন জ্বলে তখন চিমনি দিয়ে চবিবশ ঘন্টা ধোঁয়া বেরোয়। সেই ধোঁয়া উড়ে আসে জানলা দরজায়।

জ্যৈষ্ঠ মাস গড়িয়ে গেল। দক্ষিণ সাগর থেকে মেঘ উড়িয়ে আনল মৌসুমী বায়ু। বৃষ্টি হয় মাঝে মাঝে। সঙ্গে বাতাস। তবু তিনতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখার সৌভাগ্য হয় না অঞ্জলির।

এর মধ্যেই একদিন সকালে অরিন্দমের ঘুম ভাঙল অঞ্জলির হাঁকডাকে। চোখ মেলে অরিন্দম দেখল অঞ্জলি উত্তেজিত গলায় ডাকছে তাকে— ওগো, দেখো, একবার ব্যালকনিতে এসে দেখো। কাঁচকলের চিমনি দিয়ে আজ সকালে আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে না।

বিছানা ছেড়ে একরকম দৌড়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল অরিন্দম। গ্রীলের ত্রিভুজের ভেতর দিয়ে কাঁচকলটাকে দেখল অরিন্দম। দেখল কাঁচকলের দুটো চিমনিই নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। কেবল গোটা কয়েক পাখি ডানায় ভোরের আলো জড়িয়ে নিয়ে চিমনি দুটোকে ঘিরে পাক খাচ্ছে।

— কী ব্যাপার বলো তো! অরিন্দম বিমূঢ় হয়ে কাঁধ ফিরিয়ে তাকালো অঞ্জলির দিকে।— হঠাৎ করে ধোঁয়া বন্ধ হয়ে গেল কেন?

— দেখো গে, এই হাউসিং কমপ্লেক্সের কেউ কমপ্লেন করেছে পরিবেশ দপ্তরে। তাদের হস্তক্ষেপেই হয়তো কারখানা বন্ধ করতে হয়েছে মালিককে। অঞ্জলি আঁচলটাকে কাঁধের ওপর ফিরিয়ে রাখতে রাখতে বলল— সবাই তো আর তোমার মতো নিষ্কর্মা নয়। দেখ, এবার হয়তো অন্য কোথাও নিয়ে যাবে কারখানাটা।

বাজার থেকে একরকম হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ফিরল অরিন্দম। রান্নাঘরের দরজায় বাজারের থলি নামিয়ে রেখে শ্বাস টানতে টানতে অরিন্দম বলল অঞ্জলিকে— আরে পরিবেশ দপ্তর টপ্তর নয়। ওই কাঁচকলের মালিক কাল মাঝরাতেই কারখানা বন্ধের নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছিল কারখানার বন্ধ গেটে। সকালে লেবাররা ডিউটিতে রিপোর্ট করতে এসে দেখে নোটিস ঝুলছে। মালিক পালিয়েছে শহর ছেড়ে। এখন শ্রমিকরা কারখানার বন্ধ গেটে বিক্ষোভ সমাবেশ করছে। গামছা দিয়ে কপাল ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে অরিন্দম আবার বলল— আর এখন বিক্ষোভ দেখিয়ে কী হবে! পাখি পালানোর আগে সতর্ক হলি না কেন? এবার ফল ভোগ কর।

ওভেনে ভাত ফুটছিল। অঞ্জলি হাতায় করে হাঁড়ি থেকে দু-একটা চাল তুলে আঙুলে টিপে দেখল কতখানি সেদ্ধ হয়েছে। এখনও দু-তিনটে ফুট লাগবে। হাঁড়ির ঢাকনা চাপিয়ে দিতে দিতে বলল— তুমি কি একবার চা খাবে? বসাই তাহলে!

— নাহ্। অরিন্দম গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলতে খুলতে বলল। — কী ব্যাপার! তুমি যেন আমার কথা শুনতে পেলে না!

— শুনতে পাব না কেন? আমি কি কানে কালা?

— তাহলে চুপ করে রইলে যে!

— আনন্দও যে করতে পারছি না। এই এলাকার সবই তো গেছে। সবেধন নীলমণি ওই একটা কারখানাই চালু ছিল। সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। কথা শেষ করে একটা ঘন নিশ্বাস ছাড়ল অঞ্জলি।

— বন্ধ কি আর হবে! সেভ করার আয়োজন গোছাতে গোছাতে অরিন্দম বলল— সেই কপাল নিয়ে কি এসেছি!

সপ্তাহ গড়িয়ে মাস গেল। কাঁচকল আর চালু হল না। কারখানার গেটের সামনে আর শ্রমিকরাও জড়ো হয় না। স্লোগানও দেয় না কেউ। নেতাদের বক্তৃতা দেওয়ার জন্য গেটের একপাশে বাঁশের মাচা দিয়ে যে অস্থায়ী মঞ্চ টা তৈরি করেছিল শ্রমিকরা সেটাও উধাও হয়ে গেছে কবে যেন। কেবল অরিন্দম একা নয়। এলাকার শিশুরাও জেনে ফেলেছে, কাঁচকল আর খুলবে না। মালিক ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রোমোটারের কাছে কাঁচকল বিক্রি করে দিয়েছে। বর্ষার পরেই বিশাল বিলাসবহুল বহুতল হাউসিং কমপ্লেক্সের কাজ শুরু হয়ে যাবে। জগদ্দল রেল স্টেশনের কাছে উঁচু পোস্টের সঙ্গে বিশাল হোর্ডিং দিয়েছে প্রোমোটার। 'সিলভার সাইন' নামের হাউসিং কমপ্লেক্স। ফ্ল্যাট বুকিংও শুরু হয়ে গেছে। আড়াই হাজার টাকা পার স্কোয়ার ফুট। কারখানার শ'দেড়েক কর্মী যে কে কোথায় গেছে, কেউ জানে না। বেঁচে আছে না মরে গেছে— তারও কোনও খবর নেই।

বর্ষা নিস্তেজ হয়ে এল একদিন। গাঙ্গেয় বাংলার আকাশ থেকে কালো মেঘের দল সরে গেল। এখন সারাদিন উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করে। মাঝদুপুরে স্নান খাওয়া সেরে অঞ্জলি যখন তিনতলার দক্ষিণমুখী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায় তখন অঞ্জলির দৃষ্টি চলে যায় পূবদিকের রেল বাঁধের দিকে। দেখে রেলবাঁধের জলে, নয়ানজুলিতে সাদা কাশফুল ফুটে আছে। বাতাসের দোলায় ঢেউ ভাঙছে কাশফুলের দল। তার অর্থ পুজো এসে গেছে।

এখন অঞ্জলি যথেষ্ট সুস্থ। শরীর স্বাস্থ্যের শ্রীছাঁদ ফিরে এসেছে। কাঁধে, বুকে কোমরে অল্প বিস্তর মেদও জমেছে। ফলে কংকালসার শরীর জুড়ে এখন শরতের লাবণ্য। স্নানঘরে ঢুকে দেওয়ালে ঝোলানো আয়নায় অঞ্জলি নিজেকে দেখে। একেবারে অনাবৃত করে দেখে।

তেইশ বছর বয়সে ত্রিশের অরিন্দমের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। পঁচিশ বছরে পেটে রুবান এল। রুবানের জন্মের পরেই সেই ছেলেবেলায় ফেলে আসা, বিস্মৃত প্রায় শ্বাসের রোগটা ফিরে এসেছিল। এভাবেই গত সাত আটটা বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়টা যা যে কোনও দম্পতির জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান। শরীরের খিদে তৃষ্ণা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য সে সময়টা দুই নারী পুরুষের কাছেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়টাকে অঞ্জলি নিরবিচ্ছন্ন ভাবে উপভোগ করতে পারেনি। অরিন্দমকেও বঞ্চি ত করেছে। এক মাস সুস্থ থাকলে তিন মাসই কেটেছে অসুস্থতায়। এক মাস শরীর সহবাসের ইচ্ছা জাগলে তিন মাসই কেটেছে মৃত্যুর মতোই শীতলতা নিয়ে। কিন্তু ইদানীং কাঁচকল বন্ধ হওয়ার দৌলতে শহর ছাড়িয়ে শহরতলীর শান্ত পরিবেশ, মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে কয়েকমাস বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়ে বত্রিশের অঞ্জলি যেন নতুন প্রাণ খুঁজে পেয়েছে।

নির্জন দুপুরে স্নান সারার সময় স্নানঘরের আর্দ্র নৈঃশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেওয়াল আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে অঞ্জলি আজকাল সেই নতুন প্রাণের প্রকাশকেই খোঁজে। দুই বুকের শৈল্পিক গঠন, দুই বুকের নীচে সামান্য মেদ জমা পেটের ভাঁজ, ভাঁজের পরে নাভিকুণ্ড, নাভিকুণ্ডের পরে পাহাড়তলির উপত্যকার মতো ঢাল, দুই উরু— সব সব কিছু দেখতে দেখতে অঞ্জলি নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায়। মনে মনে ভাবে অরিন্দমকে রাজি করিয়ে সেকেণ্ড ইস্যুটা চেয়ে নিলে কেমন হয়!

দিন কয়েক হল কাঁচকলের সারি সারি শেডের ওপর টিনের ছাউনিগুলি সরানো শুরু করেছে প্রোমোটার। সেদিন সন্ধ্যারাতে অরিন্দম অফিস থেকে ফিরে অঞ্জলিকে সেই চূড়ান্ত আশ্বাসবাণীটি শুনিয়েছিল— দু-একদিনের মধ্যেই তোমার ওই কাঁচকল ভাঙার কাজ শুরু করবে প্রোমোটার। খুব বড় প্রোমোটার তো। তাই বুলড্রোজার, পে-লোডার, ডাম্পার এনে জড়ো করেছে। লেবার ক্যাম্পও বসে গেছে। ব্যাস, এবার নিশ্চি ৎ হলে তো যে ওই কাঁচকল আর কোনওদিন চালু হবে না। ধোঁয়া ছড়াবে না কোনও চিমনি। তুমিও অসুস্থ হবে না।

অরিন্দমের প্রতিটি কথাতেই ছিল অঞ্জলির জন্য নির্ভেজাল আশ্বাস। নির্ভরতাও। যে অসহনীয় শ্বাসের রোগ কেবল তার নিজের শরীরটাকেই নয়, অরিন্দম, রুবানকে নিয়ে যে সংসার গড়ে উঠেছে, সেই সংসারের ওপর অভিশাপের মতো ছেয়েছিল। সেই রোগ থেকে স্থায়ী মুক্তি পাওয়ার মতো সংবাদে অঞ্জলির শরীর মন যতখানি আনন্দে ভরে যাওয়ার কথা ছিল, অঞ্জলি দেখেছিল ঠিক এতখানি আনন্দের তরঙ্গ আছাড় পড়ল না। বুকের ভেতর কোনও গোপন শূন্য কুঠুরির ভেতর দিয়ে মাঝ চৈত্রের বাতাস বয়ে গেল হা-হা করে।

হৈ হৈ করে পুজো এল। অনেকদিন পরে শহরতলির পুজো দেখল অঞ্জলি। একদিন রুবান বায়না ধরেছিল কলকাতার প্রতিমা দেখবে বলে। অরিন্দম সাহস পায়নি। যদিও অঞ্জলি বলেছিল, আমি না হয় মাস্ক পরে নেব। একটা সন্ধ্যায় কী যাবে আসবে। তবু অরিন্দম রাজি হয়নি। রুবানকে বলেছিল— কলকাতার ভিড়, গাড়ি ঘোড়ার ধোঁয়া, তোমার, তোমার মার সইবে না বাবা। তার চেয়ে আমরা নৈহাটি কাঁচরাপাড়া কল্যাণীর ঠাকুর দেখব। কেমন!

আজ নবমীর রাত্রি। আজ সন্ধ্যায় আর বেরোয়নি অঞ্জলি। অরিন্দম রুবানকে নিয়ে স্থানীয় পুজোর প্যাণ্ডেলগুলো ঘুরে এসেছে। তারপর আবাসনের পুজো প্যাণ্ডেলে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে রাত দশটা নাগাদ ঘরে ফিরেছে। ফলে আজ রাতের খাবার সারতে সারতে একটু বেশি রাত হয়ে গেছিল। তাই রুবান তার ঘরে ঢুকে বিছানায় শোওয়া মাত্র ঘুমে তলিয়ে গেছে। অঞ্জলি রুবানের বেডের মশারি গুঁজে দিয়ে মাথার দিকে জানলাটা বন্ধ করে যখন ফিরে এসেছিল নিজেদের শোওয়ার ঘরে তখন অরিন্দমও ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বাভাবিক। পুজোর তিনটে দিন ছেলেকে নিয়ে কম তো দৌড়ঝাঁপ করতে হয়নি তাকে।

অঞ্জলির তখনই শুতে ইচ্ছে করল না। মুখে ক্রিম লাগিয়ে ঘুষতে ঘুষতে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। এবার কার্তিক মাসে পুজো পড়েছে। ফলে রাতের দিকে সামান্য হিম পড়া শুরু হয়েছে। মেঘহীন আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রের ছড়াছড়ি। তার মধ্যেই জেগে উঠেছে শুক্লা নবমীর চাঁদ। জ্যোৎস্না তখন উজ্জ্বল না হলেও যথেষ্ট স্পষ্ট।

পুজোর হুটোপুটিতে এই তিনদিন তেমন খেয়াল করেনি অঞ্জলি। আজ শুক্লা নবমীর শিরায় টান ধরা মাঝরাতের জ্যোৎস্নায় কাঁচকলের দিকে চোখ পড়তেই অঞ্জলির বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। পুজোর দিনকাল রেহাই দেয়নি প্রোমোটার। কারখানার চত্বর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা শেডের সারির চালাগুলিকে খুলে নিয়েছে এক এক করে। এখন কেবল শেডের কড়ি-বরগাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অঞ্জলির যেন মনে হল, ওগুলো নিছক কাঠের কিংবা লোহার কড়িবরগা নয়। ছাল চামড়া ছাড়ানো মানুষের বুকের পাঁজর। প্রায় শ'দেড়েক শ্রমিকের ছালচামড়া ছাড়ানো পাঁজরার হাড়গুলি শুক্লা নবমীর জ্যোৎস্নায় তার দিকেই যেন ধেয়ে আসছে। চিমনিগুলি তাদেরই কংকালসার হাত। ওই হাতজোড়া আকাশের দিকে মেলে ধরে ওরা যেন বিচার চাইছে। ঠিক কার কাছে চাইছে জানে না অঞ্জলি।

অঞ্জলির সমস্ত শরীর জুড়ে হিম স্রোত বয়ে গেল। পা-দুটো কেঁপে উঠল। হাত দুটো অসাড় হয়ে পড়ল।

আর একটু হলেই হয়তো অঞ্জলি ব্যালকনির মেঝেয় পড়েই যেত। পড়া হল না। তার আগেই অরিন্দম ধরে ফেলল অঞ্জলিকে। অরিন্দম ঘুমের মধ্যেই যখন দুই হাত বাড়িয়ে অঞ্জলির শরীর খুঁজছিল, তখন পাশে অঞ্জলির শরীরের স্পর্শ না পাওয়ায় ঘুম ভেঙে গেছিল তার। ঘুম থেকে উঠেই চোখ গেছিল ব্যালকনির দিকে। দেখেছিল পতনউন্মুখ অঞ্জলিকে। একরকম দৌড়ে এসে ধরে ফেলল অঞ্জলিকে।

— কী হল? এত রাতে এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছিলে? পড়েই বা যাচ্ছিলে কেন? গলায় উদ্বেগ জমিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল অরিন্দম।

— ওই দিকে দেখ। ওই কাঁচকলটাকে দেখ! বিড়বিড় করল অঞ্জলি।

— দেখল অরিন্দম। দৃশ্যটা দেখে তার মুখেও কথা হারিয়ে গেল। বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অরিন্দম।

— আমি জানি, আমি জানি। এখন সবাই আমাকেই দোষ দেবে। কিন্তু বিশ্বাস কর, তুমি অন্তত বিশ্বাস কর, আমি এটা মন থেকে চাইনি। .... অঞ্জলি অরিন্দমের বুকে মুখ গুঁজে গুমরে গুমরে কেঁদে চলল।

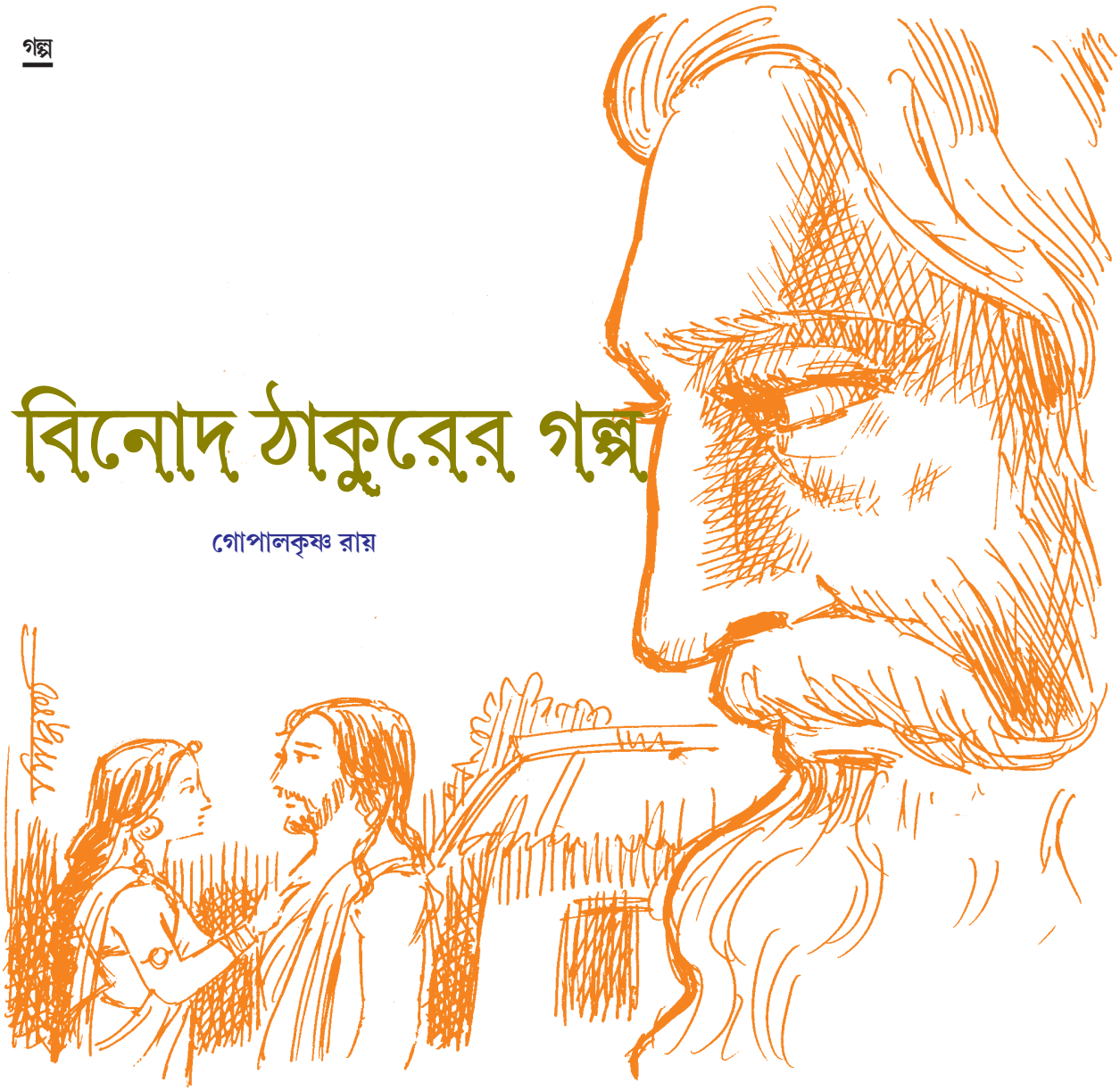

বিনোদ ঠাকুরের গল্প

গোপালকৃষ্ণ রায়

জীবনে একবারই ভুল করেছিলেন তিনি। মারাত্মক ভুল। সেই ভুলের জন্য আমৃত্যু মনে মনে অনুশোচনা করেছেন বিনোদ ঠাকুর। পুরো নাম বিনোদ বিহারী আচার্য। ভুলের জন্য গোপনে প্রায়শ্চিত্তও করেছেন। কিন্তু শান্তি পাননি। ভুলটি শুধু কাঁটার মতো খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধতো না, বুকের ভিতর আগুন জ্বালাতো।

কুমুদিনীর মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেই আগুনের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হয়েছিলেন কুমুদিনী।

বিনোদ ঠাকুরের জীবনপঞ্জির পাতা না ওল্টালে কুমুদিনীর জীবন যন্ত্রণা অজানাই থেকে যাবে।

বিনোদ ঠাকুর সেই মারাত্মক— বরং বলা ভাল মর্মান্তিক ভুলে কথা বলতেন না। বলতেন, ওই মারাত্মক ভুল না জানলে আমাকে নিয়ে গল্প লেখা সম্ভব নয়। বিনোদ ঠাকুরকে নিয়ে অনেকবার গল্প লেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনও গল্পই শেষ করা সম্ভব হয়নি। লেখাই এগোতো না। চিন্তায় বিঘ্ন ঘটতো। বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে কখনও গল্প লেখা যায় না। সে বিনোদ ঠাকুরের গল্পই হউক আর গাঁওয়াল কালিচরণের গল্পই হোক।

মানুষ ভাবতো বিনোদ ঠাকুর বাকসিদ্ধ। অন্ততঃ শ্যামপুর ও সংলগ্ন আরও পাঁচটি গাঁয়ের মানুষ তাই ভাবতো। তিনি কদাচিৎ কাউকে কিছু বলতেন। ভালই হউক আর মন্দই হউক সে বাক্যি কখনই মিথ্যা হতো না। তবে বিয়ে, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন যোটক বিচারের জন্য পাঁচ গাঁয়ের মানুষ বিনোদ ঠাকুরের দরজায় ঘন্টার পর ঘন্টা এমনকি দিনের পর দিন উপস্থিত হত।

প্রাক্ সন্ধ্যায় বিনোদ ঠাকুর বাড়ি থাকতেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে কিছুটা চড়াই ভেঙ্গে সুবর্ণ বিহারের একটি ঢিবির ওপরে গিয়ে বসতেন। ঢিবিটা বৌদ্ধ যুগের। প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশ দাশগুপ্ত সুবর্ণবিহার— শ্যামপুর এলাকা অনুসন্ধান করে বৌদ্ধ যুগের কিছু নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন।

বিনোদ ঠাকুর প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না। কিন্তু স্থান মাহাত্ম্যকে শ্রদ্ধা করতেন। নির্মল পরিবেশে তাঁর মন ভাল থাকে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ওই ঢিবির ওপর বসে বিনোদ ঠাকুর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কথা ভাবতেন কিনা, আমাদের জানা নেই। তবে অনেকেই দেখেছে, বিনোদ ঠাকুর ঢিবির উপর বসে চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ ধ্যান করতেন। কার ধ্যান করতেন, কেন ধ্যান করতেন, এসব কথা কোনওদিন আমাদের বলেননি— আমরাও জিজ্ঞাসা করিনি। জায়গাটা অবশ্যই ধ্যান করার উপযুক্ত। সুবর্ণবিহার-শ্যামপুরের প্রাচীন ব্যক্তিরা বলতেন, প্রত্যুষে ও প্রদ্যোতে ঢিবির আশেপাশে সমবেত কণ্ঠে বৌদ্ধ স্তোত্র পাঠের সুর শোনা যেত। স্তোত্র স্পষ্ট বোঝা না গেলেও সুর শুনে মনে হত 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।'

বিনোদ ঠাকুর বলে দিয়েছেন, তিনি কখনও স্তোত্র পাঠ শোনেননি। তবে ধ্যানের সময়, একটা অপার্থিব অনুভূতি অনুভব করতেন।

ঢিবি থেকে নেমে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে যেতেন বিনোদ ঠাকুর। ঘরে ফিরে দেখতেন, বারান্দার বেঞ্চে দু-চার জন মহিলা সহ আট-দশ জন বসে আছে।

বিনোদ ঠাকুরকে দেখে সেই বশিষ্ঠ মুনির চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পরনে ধুতি, আদুড় গা, মাথা ভর্তি শ্বেতশুভ্র কেশ। সাদা দাড়ি। ছ'ফুট লম্বা, ফর্সা, মেদহীন মানুষটিকে দেখলেই ভক্তি হয়।

বিনোদ ঠাকুর তামাক খান। বাড়িতে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে ধূমপান করেন। ধূমপানের সময় তাঁর চোখ নিমীলিত থাকে। মনে হয়, তিনি গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে আছেন।

একজন করে নাম ধরে ডাকতেন বিনোদ ঠাকুর।

— লোকনাথ সাহা।

লোকনাথ ঘরে ঢুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতো। পা-ছুঁয়ে কাউকে প্রণাম করতে দিতেন না বিনোদ ঠাকুর। তাঁর পিতৃদেব, পিতামহ আরও কঠোর ছিলেন। তাঁরা কোনও ঋতুমতী নারীর প্রণাম গ্রহণ করতেন না। ছুঁতেও দিতেন না। বিনোদ ঠাকুর অবশ্য অতটা কঠোর নন। ছোঁয়াছুঁয়ি বাছ-বিচার করতেন। বলতেন, চিত্তের শুদ্ধতা না থাকলে গণনা শুদ্ধ হয় না।

আবার আমাদের কাছে একেবারে অন্য মানুষ। হাসতেন, গল্প করতেন, অনেক সময় দু-চারটে মনের কথা বলতেন। আমরা তাঁর কাছে গল্পের প্লট চাইতাম। কত বিচিত্র মানুষ তো তাঁর কাছে আসেন। জীবনের কত কথাই না তারা জানতে চায়। তাঁদের জীবনের কত গোপন ও বিচিত্র কথাই না বিনোদ ঠাকুরের জানা। সেই সব মানুষ আমাদের কাছে গল্পের জীবন্ত প্লট।

বিনোদ ঠাকুর হাসেন। হাসলেই তাঁর ঝকঝকে দাঁতগুলো ঝলমল করে ওঠে। এমন সুন্দর দাঁত বড় একটা চোখে পড়ে না। উনি ছোটবেলা থেকেই নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজতেন। তাঁর বাবা কাঠ কয়লা ব্যবহার করতেন। নিমের দাঁতন দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে জিভ পরিষ্কার করতেন। তাঁর চুল-দাড়ি দাঁত সব কিছুর মধ্যেই একটা পরিপাটি লক্ষণীয় হয়ে উঠতো। লম্বা ফর্সা মেদহীন দেহ সাতাশি বছর বয়সেও উজ্জ্বল।

— আজ আপনার কাছে মহেশগঞ্জের দীনেশ অধিকারী এসেছিলেন। তাই না?

প্রশ্ন শুনে মুচকি হাসতেন বিনোদ ঠাকুর। বলেন, হ্যাঁ, এসেছিলেন। কিন্তু কেন এসেছিলেন, সেকথা তো বলতে পারবো না। বলেই গড়গড়ার নল মুখে পুরে টানতে থাকেন।

কারও কথা কারও কাছে বলেন না বিনোদ ঠাকুর। তিনি তাঁর প্রতিটি মক্কেলের কাছে বিশ্বস্ত। সম্ভবতঃ এই বিশ্বস্ততাই তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। বিনোদ ঠাকুর একটা উজ্জ্বল আলো হয়ে বসে থাকেন। কীট-পতঙ্গের মতো সকলেই তাঁর কাছে ছুটে আসে। লোকনাথ সাহা বলেন, তাহলে আমি কী এগোব, ঠাকুর মশাই?

একবার মাথায়, দুবার দাড়িতে হাত বুলিয়ে বিনোদ ঠাকুর বলেন, কাগজটায় সব লেখা আছে। বাড়ি গিয়ে ভাল করে পড়। সবুজ কালি দিয়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিয়েছি।

এখনও তিনি নানারকম ভেষজ দিয়ে কালি তৈরি করেন। বোতলের মধ্যে সেই কালি ভরে রাখেন। এখন রিফিল ডটের যুগ। পিতল বা টিনের সরু নিব পাওয়া যায় না। এখনও তিনি পুরনো আমলের দোয়াত ব্যবহার করেন। দেশ স্বাধীন হবার আগে ওই সব দোয়াত কলমের ব্যবহার ছিল। এক অদ্ভুত ধরনের কাঁচের দোয়াত ছিল। লোকে বলতো 'ম্যাজিক দোয়াত'। ওল্টালেও কালি পড়ত না। বিনোদ ঠাকুর এখনও সেই দোয়াত ব্যবহার করেন।

বিনোদ ঠাকুর বলেন, কী যুগ পড়েছে, পালক তো পাওয়াই যায় না— অনেক খোঁজাখুঁজি করলে দু-একটা যোগাড় মেলে। সারস তো নেই-ই, সাদা আর ছাই রংয়ের বকগুলো যে কোথায় হারিয়ে গেল, কে জানে! সজারুর কাঁটাও আর পাওয়া যায় না। জন্তুটি এখন সম্ভবত বিপন্ন প্রজাতি।

অথচ, বিনোদ ঠাকুর বলতেন, আমাদের ছোট বেলায়...। আশি বছর পূর্বে বিনোদ ঠাকুরের ছোট বেলা ছিল। বিনোদ ঠাকুর জন্মেছিলেন সেই ১৩২৮ বঙ্গাব্দে। সাতাশি বছর বয়সেও জন্ম-রাশিচক্র গণনা করেন। পাঁচটা গ্রামের মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বিচার করেন। সোজা হয়ে হাঁটেন। অবশ্য চুলদাড়ি সব সাদা হয়ে গেছে।

বছরের ন'মাস তিনি আদুর গায়েই থাকেন। কেউ কেউ গোপনে ঠাট্টা করে বলতো, উদলা জ্যোতিষ। শীতকালে, গায়ে একটা সাদা চাদর জড়িয়ে রাখতেন। লোকনাথের দিকে তাকিয়ে বিনোদ ঠাকুর বলতেন, তুমি এবার এস, লোকনাথ।

সকলেরই জানা, বিনোদ ঠাকুর হাতে হাতে প্রণামী নেন না। দরজার পাশে একটা প্রণামীর বাক্স রাখা আছে। কোষ্ঠী, ঠিকুজি, হস্তরেখা বিচারের রেটও লেখা আছে। কেউ কখনও ফাঁকি দিয়েছে বলে বিনোদ ঠাকুর মনে করেন না। বিনোদ ঠাকুর কখন ফাঁকা হবেন, এই আশা নিয়েই আমরা তাঁর বাড়ির চারপাশে ঘুরঘুর করতাম।

পাশে গিয়ে বসতেই বিনোদ ঠাকুর অন্য মানুষ হয়ে যান। জ্যোতিষ সুলভ গাম্ভীর্য কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। তিনি হাসতে

হাসতে বলেন, আবার এসেছিস! আমাকে নিয়ে তোরা গল্প লিখতে পারবি না। বারবার লিখবি আর ছিঁড়ে ফেলে দিবি। আমার জীবনের সেই মারাত্মক ভুলটা না জানা পর্যন্ত আমি গল্প হয়ে উঠবো না। অথচ বিনোদ ঠাকুর কিছুতেই সেই মারাত্মক ভুলের কথাটি বলেন না।

বৌদ্ধ যুগের ঢিবিতে নিরালা সন্ধ্যা কাটিয়ে ঘরে ফিরে আসেন বিনোদ ঠাকুর। ওই ঢিবির উপর বসলে, তাঁর মন শান্ত হয়। মনের অশান্তি দূর হয়। সাতাশি বছর বয়সেও বিনোদ ঠাকুর কাজকর্মে নূতন উদ্যম ফিরে পান।

মঙ্গলবার কোনও দর্শনার্থীর সঙ্গে কথা বলেন না তিনি। মঙ্গলবার তাঁর ছুটির দিন। সুবর্ণবিহার-শ্যামপুর থেকে শুরু করে, মহেশগঞ্জ-স্বরূপগঞ্জের মাঝি-মাল্লারাও জানে, দিনরাত ধর্ণা দিলেও বিনোদ ঠাকুর একটিও কথা বলবেন না। মঙ্গলবার তিনি মৌন থাকেন। বাপ ঠাকুরদার ধারা তিনি বজায় রেখেছেন।

বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও বিনোদ ঠাকুর বৈঠকখানায় রেড়ির তেলের পিদিম জ্বালান। একটা মালসার মতো মাটির প্রদীপ। পাকানো মোটা সলতে। লোকজনের ভিড় হলে চারদিকের সলতে জ্বালিয়ে দেন।

বিনোদ ঠাকুর বলেন, তোমাদের নিবু নিবু বিদ্যুতের আলোর চেয়ে আমার রেড়ির তেলের পিদিম অনেক বেশি আলো দেয়। বৈঠকখানায় আগে টানা পাখা ছিল। বিনোদ ঠাকুর সেটা তুলে দিয়েছেন। তিনি চাটাই দিয়ে তৈরি ব্যাজন ব্যবহার করেন।

বৌদ্ধ ঢিবি থেকে ফিরে দেখেন, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে বেঞ্চে পাশাপাশি বসে আছে। পরিচিত চার-পাঁচ জন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ছেলেমেয়ে দুজনেই অপরিচিত। চেহারা দেখে ভদ্র ঘরের বলেই মনে হয়। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বিনোদ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা? চোখের সামনে স্বয়ং বশিষ্ঠ মুনিকে দেখে ছেলেমেয়ে দুটি ভড়কে যায়। প্রণাম করার আগেই বিনোদ ঠাকুর বাধা দিয়ে বলেন, পা-ছুঁয়ে প্রণাম আমার পছন্দ নয়। তা তোমরা কোথা থেকে আসছো?

ছেলেটি বলে, মালঞ্চ পাড়া।

— নবদ্বীপের মালঞ্চ পাড়া!

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

মেয়েটি পাশে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে বিনোদ ঠাকুরকে দেখছিল। তার মনে হচ্ছিল, নৈমিষারণ্য থেকে কোনও তাপস আশ্রমে ফিরে এলেন। পরণে ধুতি, আদুড় গা, পায়ে খড়ম। ঠিক প্রাচীন মুনিদের মতোই পোষাক।

—মালঞ্চ পাড়া থেকে শ্যামপুর কেন, বাবা নবদ্বীপে তো অনেক বড় বড় পণ্ডিত আছেন। নামী জ্যোতিষী আছেন।

ছেলেটি বলে, আজ্ঞে তা আছে। আপনার নাম শুনে এলাম।

— ও, তা বাবা, তোমাদের তো ঘন্টাখানের অপেক্ষা করতে হবে।

— আমাদের অসুবিধা নেই। অপেক্ষা করছি।

বিনোদ ঠাকুর ঘরে ঢোকেন। নিজের তৃণাসনে বসেন। অনাথ তামাক সেজে কল্কেটা গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে দিয়ে যায়। তামাকের ধোঁয়ায় একটা মিষ্টি গন্ধ। কাশীর অম্বুরি তামাক। বউবাজার থেকে সুবর্ণ বিহারের অতনু এনে দেয়। সে কলকাতায় চাকরি করে। প্রতিদিন যাতায়াত করে। বিনোদ ঠাকুর বলেন, তোমার মেয়ের যোটক বিচার এখনও করে উঠতে পারিনি। একবার দেখে রেখেছি। ভালই হবে মনে হচ্ছে। পরশুদিন সকালে এসে নিয়ে যেও।

গোপেশ্বর জানে, একবারের বেশি দু'বার জিজ্ঞাসা করা বিনোদ ঠাকুর পছন্দ করেন না। কেউ পীড়াপীড়ি করলে তিনি তাদের সোজা রাস্তা দেখিয়ে দেন। বলেন, অন্য কারও কাছে যাও। আমাকে দিয়ে হবে না। জোরাজুরি করে কেউ নিজের পায়ে কুড়ুল মারে না।

ছেলেমেয়ে দুটি বাইরে থেকে বিনোদ ঠাকুরকে তাকিয়ে দেখছিল। বিনোদ ঠাকুর বলেন, অনন্ত তোমার পুত্রবধূর সাধভক্ষণ বারোই অগ্রহায়ণ কর। বেলা একটা গতে, তিন ঘটিকার মধ্যে সাধভক্ষণ প্রশস্ত।

কাগজটি হাতে নিয়ে অনন্ত বলে, কর্তা অনুগ্রহ করে ওইদিন যদি আমার বাড়িতে পায়ের ধূলো রাখেন....।

বিনোদ ঠাকুর বলেন, সবার বাড়ি গেলে, আমার তো আর নিজের বাড়িতে থাকা হয় না, অনন্ত।

বলেই আবার হাসেন বিনোদ ঠাকুর। ওষ্ঠের ফাঁকে দাঁতগুলো ঝকঝক করে।

বিনোদ ঠাকুর ডাকেন, সুরোবালা শোন। তোমার চার মাসের নাতনীর ঠিকুজি এখুনি করার দরকার নেই। ছ'মাস যাক, করে দেব। তোমার বাড়ির সবাই ভালো তো?

— হ্যাঁ, জেঠামশাই।

— এখন তো শ্রাবণ মাস। ভাদ্রমাস কাটুক, তোমার নাতনীর খুব বড় করে কোষ্ঠী করে দেব।

— সে আপনার দয়া, বলেই গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে যায় সুরোবালা।

বিনোদ ঠাকুরের ঘর খালি। এখন আর কেউ আসবে না। বিনোদ ঠাকুর গলা তুলে ডাকেন, অনাথ আর এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা।

বিনোদ ঠাকুর অম্বুরি তামাক খান। বউবাজার থেকে অতনু এনে দেয়। মূলত অম্বুরি তামাক আসে কাশী থেকে। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে তামাক ও জর্দার দোকান। দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে ভেসে আসে।

বিনোদ ঠাকুর ডাকেন, মা লক্ষ্মী, তোমরা দুজনেই ঘরে এসো।

ছেলে-মেয়ে দুজনেই সলজ্জ মুখে বিনোদ ঠাকুরের সামনে এসে বসে। দুজনেই অনুভব করে, এই মুহূর্তে তারা সত্যযুগের কোনও এক তাপসের সামনে বসে আছে।

অনাথ গড়গড়ার মাথায় অন্য একটা কল্কে বসিয়ে দিয়ে যায়। ঘরময় তামাকের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। নলটা মুখ থেকে নামিয়ে

বিনোদ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, বল, তোমাদের সমস্যা বল। তার আগে তোমাদের নাম বল।

ছেলেটির চেয়ে মেয়েটি চটপটে। মেয়েটি বলে, আমার নাম জয়িতা, জয়িতা চক্রবর্তী। ওর নাম পার্থজিৎ, পার্থজিৎ বিশ্বাস।

বিনোদ ঠাকুর অনেক আগেই বুঝেছিলেন দুটি অসবর্ণ হৃদয় পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

বিনোদ ঠাকুর বলেন, জন্ম তারিখ, সন, সময় ও স্থানের নাম বল।

জয়িতা ব্যাগ খুলে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দেয়। বিনোদ ঠাকুর কাগজটির ওপর ধীরে ধীরে চোখ বোলান। প্রায় মিনিট পাঁচেক চোখ বুঁজে কী যেন ভাবেন। চোখ খুলে একবার সরাসরি পার্থজিতের মুখের ওপর দৃষ্টি মেলে ধরেন। ওই দৃষ্টি দিয়ে বিনোদ ঠাকুর পার্থজিতের মুখের রেখা, চোখের দৃষ্টি, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কপালের ভাঁজ বার কয়েক নিরীক্ষণ করেন।

কাগজটি ভাঁজ করে পাঁজির মধ্যে রেখে একটু গলা চড়িয়ে ডাকেন, অনাথ কল্কেটা পাল্টে দিয়ে যা। অনাথ অন্য একটি কল্কে গড়গড়ায় বসিয়ে দিয়ে যায়। আবার অম্বুরির মিষ্টি গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে যায়।

গড়গড়ার নল মুখে নিয়েই জয়িতার মুখের দিকে তাকান বিনোদ ঠাকুর। পাঁজির মধ্যে থেকে কাগজটি আবার টেনে বার করেন তিনি। দুজনের জন্ম তারিখ, স্থান, সময় আবার পড়েন।

অনেকক্ষণ আগেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কৃষ্ণপক্ষের দশমীর রাত গভীর হয়। দলে দলে জোনাকিরা বেরিয়ে পড়েছে। তারা উড়ছে জ্বলছে নিভছে।

বিনোদ ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে গেলেন। গড়গড়ার নলটা দুই
আঙ্গুলের মাঝে ধরাই থাকে। একবার ভাবনার গভীরে প্রবেশ করলে তামাক টানতে ভুলে যান। বিনোদ ঠাকুর বলেন, আজ আর গণনা করা যাবে না, মা লক্ষ্মী। আমার মনটাও কেমন যেন বিচলিত। তোমরা আগামী সপ্তাহের বুধবার সকাল বেলায় আসতে পারবে?

পার্থজিৎ বলে, কোনও অসুবিধা নেই। সকাল আটটার মধ্যেই চলে আসব। বিনোদ ঠাকুর আবার ডাকেন, অনাথ...। আজ কৃষ্ণপক্ষের দশমী। আধার বেশ গভীর। হ্যারিকেন নিয়ে ওদের বড় রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে এস।

— সাবধানে যেও, মা লক্ষ্মী।

বিনোদ ঠাকুর যা করেন না, আজ তাই করলেন। পুরাতন ভৃত্য অনাথও অবাক হয়। দাওয়া থেকে উঠোন, উঠোন থেকে রাস্তায় নেমে আসেন বিনোদ ঠাকুর। কিছুটা পথ ছেলেমেয়েটির সঙ্গে হাঁটেন। অনাথকে আরও অবাক করে দিয়ে দুজনের মাথায় হাত রেখে বলেন, সর্বদা ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো।

ছেলেমেয়ে দুটি তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। অনাথ আরও অবাক হয়। আজ বিনোদ ঠাকুর পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে ছেলেমেয়ে দুটিকে তাঁর পা স্পর্শ করতে দিলেন।

অনাথের পিছু পিছু ছেলেমেয়ে দুজন এগিয়ে যায়। বিনোদ ঠাকুর একটু জোরেই বলেন, তোমরা সাবধানে থেকো।

চিন্তিত বিনোদ ঠাকুর ঘরে ফিরে আসেন।

একটা বছর শেষ হয়। বারোটা মাস পিছনে ফেলে নতুন বছরের শুভাগমন ঘটে। বছরের প্রথম দিন বিনোদ ঠাকুরের কাজ বেড়ে যায়। বছরের প্রথম দিন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন তিনি। দু'চারজন যজমানের বাড়ি গিয়ে নতুন বছরের শুভবার্তা শোনাতে হয়। তাঁর পিতা-পিতামহও এই কাজ করতেন। নতুন পঞ্জিকা হাতে নিয়ে, নতুন বছরের প্রথমদিন যজমানের বাড়ি যান। ওই একটা দিন আমরা বুঝতে পারি, বিনোদ ঠাকুর আমাদের পারিবারিক জ্যোতিষী। আমরা যজমান।

শুভ পয়লা বৈশাখে বিনোদ ঠাকুরকে অন্যরকম সম্মান জানানো হয়। অন্যদিনের সঙ্গে পয়লা বৈশাখের কোনও মিল নেই। ওইদিন উনি আমাদের পরিবারের সম্মানীয় অতিথি।

শ্যামপুর থেকে মহেশগঞ্জের দূরত্ব সামান্যই। অন্যান্য দিন বিনোদ ঠাকুর আসেন, সকলের সঙ্গে একাসনে বসেন। নানারকম গল্প করেন। কোনও কোনও দিন আমার পিতৃদেবের সঙ্গে একহাত দাবাও খেলতেন।

বাবাকে বলতে শুনেছি, বিনোদদা আপনার নৌকো সামলান। ছ'ইঞ্চি লম্বা একটা হুকো সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন বিনোদ ঠাকুর। বড় জ্যাঠামশাইয়ের গড়গড়ার নলে মুখ দিতেন না তিনি। কল্কে তাঁর ছ'ইঞ্চি হুকোর মাথায় বসিয়ে দেওয়া হত। হুকোয় সুখটান দিয়ে বিনোদ ঠাকুর বলতেন, কিস্তি মাত্।

পায়ে খড়ম গলিয়ে, ছাতা মাথায় দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বিনোদ ঠাকুর বাড়ি ফিরে যেতেন।

পয়লা বৈশাখের মর্যাদাই আলাদা। যজমানের বাড়ি আসতেন সম্মানীয় জ্যোতিষী। নতুন বছরে পৃথিবীর রাজা, মন্ত্রী, জলাধিপতি ও শস্যাধিপতি কারা হলেন, তা জানাতেন। কোন রাশিতে কোন গ্রহ সঞ্চার হল, আর কোন গ্রহই বা বক্রী হল, সেসব সবিস্তারে ব্যাখ্যা করতেন।

বছরটি খরায় অথবা ঝরায় যাবে, তা-ও জানাতেন। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কবে দৃশ্যমান হবে তা শ্রোতৃমণ্ডলীকে অবগত করাতেন। কোন রাশির জাতকের নতুন বছর কেমন যাবে, বিনোদ ঠাকুর সেসব কথা শুনিয়ে যেতেন। পাড়া প্রতিবেশীরাও ওইদিন উপস্থিত থাকতেন। কাজিপাড়া লেনের ইদ্রিশ আলি আসতেন। বন্যা-খরা ও চাষবাসের খবর নিতেন। একটা রুপোর টাকা বিনোদ ঠাকুরের আসনের পাশে রেখে, নমস্কার জানিয়ে ইদ্রিশ আলি চলে যেতেন।

পয়লা বৈশাখ বিনোদ ঠাকুর আমাদের বাড়ি হেঁটে আসতেন না। চৈত্র মাস শেষ হবার আগেই পুরনো পাল্কি ঝাড়পোঁছ করে রাখা হত। চার বেহারার পাল্কি চেপে বিনোদ ঠাকুর আসতেন। বাড়ির কর্তা হাত ধরে তাঁকে নামাতেন।

বড় একটা গামলায় জল রাখা হত। একটা জলচৌকির ওপর বসে গামলার মধ্যে পা ডুবিয়ে দিতেন বিনোদ ঠাকুর। প্রথমে বড়মা, তারপর মেজমা ও শেষে মা নিজেদের চুল ও পরে আঁচল দিয়ে ভাল করে মুছিয়ে দিতেন।

বিনোদ ঠাকুরের জন্য একটা নির্দিষ্ট আসন থাকতো। সামনে রাখা হত একটি ডেস্ক। নতুন বছরের পঞ্জিকা ডেস্কের ওপর রেখে প্রথমে সূর্যস্তব করতেন। 'ওঁ নমঃ শ্রী সূর্যায় নমঃ। শুভমস্তু।'

সকলের সঙ্গে আমরাও হাত জোড় করে বসে থাকতাম। তিনি পঞ্জিকার পাতা উল্টে বলতেন ঃ এবছর পৃথিবীর রাজা মঙ্গল, শুক্র মন্ত্রী। চন্দ্র জলাধিপতি ও বৃহস্পতি শস্যাধিপতি।

দেবী দুর্গা কিসে মর্তে আগমন করবেন, আর কোন বাহনে ফিরে যাবেন তা জানার জন্য সবাই উন্মুখ হয়ে থাকতেন।

বিনোদ ঠাকুর দেবী দুর্গার আগমনবার্তা পড়ে শোনাতেন। বিবাহবিধি, নববধূর আগমন, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশন ইত্যাদি কোন মাসে প্রশস্ত, মধুর ভঙ্গিমায় সেসব বর্ণনা করতেন। একটা বিষয় বারবার বলতেন, ভাদ্র মাসে কন্যা সম্প্রদান অতীব অনিষ্টকর। এই মাসে কন্যা পাত্রস্থ হলে সে কন্যা বহুবল্লভা হয়।

বিনোদ ঠাকুর সরাসরি বেশ্যা শব্দটি ব্যবহার করতেন না। বিনোদ ঠাকুর নৈসর্গিক গণনায় পারঙ্গম ছিলেন। মাস ধরে সৃষ্টি গণনা করতেন। সকাল সন্ধ্যায় আকাশের রং দেখে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিতেন।

সবশেষে হর-পার্বতীর সংবাদ জানিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করতেন।

পাল্কিতে ওঠার আগে বিনোদ ঠাকুর জানিয়ে যেতেন, এবছর দেবীর গজে আগমন, ফল শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা। দেবীর দোলায় গমন— ফল মড়ক।

ক'দিন থেকে বিনোদ ঠাকুর আনমনা। কিছুটা বিষণ্ণ ও বিমর্ষও বটে। অনাথকে বলে দিয়েছেন, ক'দিন আমি গণনায় বসব না। সবাইকে ফিরে যেতে বল।

আগে প্রাক্ সন্ধ্যায় প্রত্যহ বৌদ্ধ ঢিবির উপর বসতেন। আজকাল খুব ভোরেও যেতে শুরু করেছেন। রাতের আঁধার মিলিয়ে যাবার আগে ধীরে ধীরে ঢিবির ওপরে উঠতেন, পূব আকাশ রাঙা হবার আগেই ঘরে ফিরে আসতেন।

না জেনে যারা আসেন, অনাথ তাদের সবাইকে ফিরিয়ে দেয়। নিজে থেকে বলে দেয়, কর্তার শরীর জুৎ নেই। আপনারা হপ্তাখানেক পরে খোঁজ নেবেন।

বিনোদ ঠাকুরের সেই মর্মান্তিক মারাত্মক ভুলের কথা এখনও আমরা জানতে পারিনি। অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারিনি। হাসতে হাসতে বলতেন, যখন জানতে পারবি, তখন তো আমি পুরোপুরি গল্প হয়ে উঠব।

একবারের জায়গায় দু'বার জানতে চাইলে, বিনোদ ঠাকুর কথা বলা বন্ধ করে গড়গড়ার নল টানতেন। অম্বুরি তামাকের গন্ধে কেমন যেন একটা মাদকতা আছে। হা- করে নিঃশ্বাস নিয়ে তামাকের মিষ্টি গন্ধ ভেতরে নেবার চেষ্টা করতাম। নির্বাক বিনোদ ঠাকুর মারাত্মক ভুলটি ভুলেই থাকতেন।

বৌদ্ধ ঢিবি থেকে ফিরে যাবার পথে বিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। খুবই আনমনা, বিষণ্ণ ও নির্মম। কোনও বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন।

অনাথ বলে, একটা চিঠি পাবার পর থেকে কর্তাকে এমন চিন্তায় ধরেছে।

চিঠির লেখিকার নাম পড়ে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারেননি বিনোদ ঠাকুর। দীর্ঘ চিঠি পড়ার পর সব ঘটনাই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

চিঠি লিখেছে সেই মেয়েটি। মাস চারেক আগে একটি ছেলেকে সঙ্গে করে এসেছিল। দু'জনের জন্মতারিখ একটা কাগজে লিখে দিয়ে গিয়েছিল তারা।

ছেলেটির জন্ম তারিখের ওপর চোখ বুলিয়ে চমকে উঠেছিলেন বিনোদ ঠাকুর। এই মুহূর্তে সেদিনের ছবিটা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ছেলেটির শিয়রে মৃত্যু দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। তাই তাদের বিয়ের বিষয় গণনা করেননি। এক সপ্তাহ পরে আসতে বলেছিলেন।

গণনাটি ভ্রান্ত হলে খুব খুশি হতেন বিনোদ ঠাকুর। মেয়েটির নাম জয়িতা চক্রবর্তী। তার দীর্ঘ চিঠিতে একরাশ বেদনা আর হতাশা ঝরে পড়েছে।

সে লিখেছে, এক বুধবার আপনার কাছে গিয়েছিলাম। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রাচীন মায়াপুরে একটি মোটর বাইক দুর্ঘটনায় পার্থজিৎ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।

.... আমি বড় অসহায়। পার্থজিৎ আমাকে তার ভালবাসা দিয়ে আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। আমার প্রতিটি মুহূর্ত তার স্মৃতির মধ্যে ডুবে আছে। .... বাড়ি থেকে নতুন করে আমার বিয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি বড় অসহায় বোধ করছি। একটু শান্তি পেতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

জয়িতার চিঠি পড়েই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন বিনোদ ঠাকুর— তিনি আর যোটক বিচার করবেন না।

কয়েক বছর আগে একটা বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে যাবার পর, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, পাঁচ বছরের কম কোনও শিশুর জন্মপত্রিকা তৈরি করবেন না।

আমঘাটার কবিরাজ মশাই তাঁর ফুটফুটে নাতনী কোলে নিয়ে প্রায়ই আসতেন। বলতেন, কর্তা, আমার নাতনীর একটা জন্মপত্রিকা করে দেন।

বিনোদ ঠাকুর বলতেন, তারিখ সময়, স্থান — এক সময় লিখে দিয়ে যেও।

কবিরাজ সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আমি লিখেই এনেছি কর্তা।

রেড়ির তেলের পিদিমের সামনে বসে, কবিরাজের নাতনীর জন্ম ছক তৈরি করতে করতে সাংঘাতিক ভাবে চমকে ওঠেন বিনোদ ঠাকুর। একবার নয়, বারবার গণনা করেন। তারিখ লিখতে কী কবিরাজ ভুল করেছে? এ তারিখ অনুযায়ী মেয়ে যে মৃত!

রাতে নিজেই আমঘাটা যেতে চেয়েছিলেন বিনোদ ঠাকুর। অনাথ বাধা দিয়ে বলেছিল, আপনার গিয়ে কাজ নেই, কর্তা। আমি একবার ঘুরে আসি।

চোখের জল মুছতে মুছতে অনাথ ফিরে এসেছিল। এই ঘটনার পর থেকে শিশুদের জন্মপত্রিকা তৈরি করতেন না বিনোদ ঠাকুর।

যোটক বিচার না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে জয়িতার বেদনার ভাগ নিলেন বিনোদ ঠাকুর। জয়িতার চিঠির জবাবে লিখলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো। যেদিন খুশি চলে এস। কিন্তু জয়িতা আসেনি।

বিনোদ ঠাকুর এখন আসনে বসেন না। প্রণামীর বাক্সটাও সরিয়ে দিয়েছেন। ঘোষণা না করলেও, গাঁয়ের মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, বিনোদ ঠাকুর আর জ্যোতিষ চর্চা করবেন না। তিনি অবসর নেবেন।

তিনি সকাল সন্ধ্যা বৌদ্ধ ঢিবিতে গিয়ে বসেন। নির্জন নিরালায় বসে প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করেন। দীর্ঘ জীবনের নানা ঘটনার রোমন্থনে মন্থিত হন কিনা, সে খবর পাবার কোনও উপায় নেই।

বিনোদ ঠাকুর প্রথম জীবনে একবার মারাত্মক ভুল করেছিলেন। সেই মারাত্মক ভুলটা না জানা পর্যন্ত তার জীবনের গল্প পূর্ণ হবে না। তিনি গল্পের খলনায়ক হয়ে উঠতে পারবেন না।

বিনোদ ঠাকুর বলতেন, আমাকে নিয়ে হাজারবার লিখলেও তা গল্প হবে না। বারবার লিখতে হবে, ফেলে দিতে হবে। কতবার বলেছি, মারাত্মক ভুলটা বলুন। আপনাকে নিয়ে গল্পটা শেষ করি। বলেন ও মিষ্টি করে হাসতেন— আবার কখনও বা খুশি মুখ গম্ভীর করে চলে যেতেন। মারাত্মক ভুলটা অজানাই থেকে যেত।

পায়ে পায়ে একদিন বৌদ্ধ ঢিবিতে পৌঁছে যাই। কে জানে কত শত বছর আগে শ্যামপুর-সুবর্ণবিহারে বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রসার লাভ করেছিল। বিনোদ ঠাকুর বলেন, বাতাসে কান পাতলে এখনও শোনা যায়, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

আকাশের দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টি মেলে নির্বিকার বিনোদ ঠাকুর বৌদ্ধ ঢিবির উপর বসে আছেন। আমার উপস্থিতিতে বিরক্ত হলেন না। শুধু একবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন। ঢিবিটা মখমলের মতো ঘাসে ঢাকা। তাঁর সামনে বসি। আমার উপস্থিতি সত্ত্বেও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন বিনোদ ঠাকুর। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, আজ মাঘ মাসের তিন তারিখ?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। ইংরেজির ১৭ জানুয়ারি।

বিনোদ ঠাকুর আবার চিন্তার গভীরে ডুবে যান। অনেকক্ষণ পর বলেন, আটষট্টি বছর আগে, তেরশো সাতচল্লিশ সালে কুমুদিনী আত্মঘাতী হয়েছিলেন। কুমুদিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করার আগেই বিনোদ ঠাকুর বলেন, কুমুদিনী আমার স্ত্রী।

— স্ত্রী?

হাত তুলে চুপ করে থাকার নির্দেশ দেন বিনোদ ঠাকুর। নিজেও চুপ করে থাকেন। একটু আগেই সূর্য ডুবে গেছে। গাছ গাছালি দিয়ে ঘেরা বৌদ্ধ ঢিবিতে আঁধার নামতে শুরু করেছে। অন্য পাখিরা ঘরে ফিরলেও অশ্বত্থ গাছ থেকে বাদুড়েরা দল বেঁধে আকাশে ডানা মেলে দেয়। শ্যামপুরে যে এত বাদুড় আছে, তা জানাই ছিল না। আজকাল তো সব বন্যপ্রাণী বিপন্ন প্রজাতির তালিকাভুক্ত। কেউ কেউ বলেন, এটাও নাকি মানব সভ্যতার অবদান। বিনোদ ঠাকুর বলেন, মাত্র ছত্রিশ দিন আগে আমার সঙ্গে কুমুদিনীর বিয়ে হয়েছিল। আমার তখন উনিশ বছর বয়স, কুমুদিনীর তেরো।

মুখোমুখি বসে কথা বললেও মনে হয় অনেকদূর থেকে বিনোদ ঠাকুরের কণ্ঠ ভেসে আসছে।

বিনোদ ঠাকুর বলেন, কুমুদিনীর কাছে জিজাসা করেছিলাম, তোমার জন্মতারিখটা মনে আছে?

ত্রয়োদশী কুমুদিনী ঘাড় কাত করে বলেছিল, বাবা বলেছিলেন, ১৩৩৪ সালের ২৭শে ফাল্গুন শনিবার। সময় সন্ধ্যা ৭টা ৪ মিনিট।

বিনোদ ঠাকুর বলেছিলেন, গাঁয়ের নাম তো আমার জানা।

কুমুদিনী তবুও বলেছিল, বিল্বগ্রাম। পণ্ডিত মদন মোহন তর্কালঙ্কার ওই গ্রামে জন্মেছিলেন।

কুমুদিনীর জন্মছক করে চমকে উঠেছিলেন বিনোদ ঠাকুর। পণ্ডিত নীলকমল আচার্যের প্রিয় ছাত্র বিনোদ বিহারী আচার্য গণনায় ভুল করবেন, এটা অভাবনীয়। একবার দু'বার বারবার করেও একই ফল উঠে আসে।

একবার নবদ্বীপের নারায়ণ বাচস্পতিকে দেখাতে চেয়ে, দেখান না। ঘরের কথা বাইরে ছড়িয়ে পড়লে দুর্নামের শেষ থাকবে না।

বিনোদ ঠাকুরের মনে ঝড় ওঠে। কিছুতেই মনকে শান্ত করতে পারেন না। ক্লান্ত বিধবস্ত বিনোদ কুমুদিনীকে কথাটা জানিয়ে দিয়ে হাল্কা হতে চান।

রাতে বলেন, কুমুদিনী শোন, আজ থেকে আমি আলাদা শোব।

— আলাদা! কেন?

বিস্ময়ে গলা ধরে আসে কুমুদিনীর।

নিজের ভিতরে এই ভয়ঙ্কর কথাটা চেপে রাখতে পারেননি বিনোদ ঠাকুর। তার বুকে আগুন জ্বলছিল। তিনি বলেন, কুমুদিনী বিয়ের পূর্বে তোমার যোনি অক্ষত ছিল না। বিবাহের পূর্বেই কারও সঙ্গে তোমার যৌন মিলন ঘটেছিল।

— না, না, না। মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে। বলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন কুমুদিনী।

বিনোদ ঠাকুর কঠোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আমি তোমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব না। ক্ষতযোনি স্ত্রীকেও শয্যাসঙ্গিনী করতে পারবো না। ইচ্ছা করলে তুমি পিত্রালয়ে চলে যেতে পারো। আজীবন মাসোহারা পাবে।

বৌদ্ধ ঢিবিতে অন্ধকার ঘন হয়। দলে দলে জোনাকি ডাল থেকে ডালে উড়ে যায়।

বিনোদ ঠাকুর বলেন, পিত্রালয়ে যাবার দিন কয়েক পরে, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিল কুমুদিনী।

বিনোদ ঠাকুর স্বীকার করেন, কুমুদিনীর জন্মছক গণনায় তিনি মারাত্মক ভুল করেছিলেন। নামধাম গোপন করে, জাতিকার বিবাহ সম্পর্কে নারায়ণ বাচস্পতিকে দিয়ে গণনা করিয়েছিলেন। বিনোদ ঠাকুরের গণনার ভুল ধরিয়ে দিয়ে নারায়ণ বাচস্পতি বলেছিলেন, জাতিকা অনাঘ্রাতা, অক্ষত যোনি, কুমারী
কন্যা।

মহাভারত কি ব্যাসদেবের আত্মজীবনী?

মানিকচন্দ্র দাস

যে কোনও মহাকাব্যের উপস্থাপনা প্রায় একই ধরনের, হয় কাহিনীর মাঝে না হয় কাহিনীর একেবারে শেষের দিকে। মহাভারতের উপস্থাপনা হয়েছে হস্তিনাপুরে জনমেজয়ের সর্পসত্রে। সেই অনুষ্ঠানে সারা ভারত থেকে আহূত বহু বিশিষ্ট অতিথির অন্যতম ছিলেন মহর্ষি ব্যাসদেব, মহাকাব্য মহাভারতের রচয়িতা। যজ্ঞারম্ভের পূর্বে রাজা জনমেজয় ব্যাসদেবের কাছে তাঁর পূর্বপুরুষদের জীবন ও সংগ্রামের কথা জানতে চান। মহর্ষি ব্যাসদেব একমাত্র ব্যক্তি যিনি কুরু-পাণ্ডবের সাতপুরুষের অধিকাংশকে প্রত্যক্ষভাবে জানতেন এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। জনমেজয়ের অনুরোধে ব্যাসদেব প্রিয় শিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারত-আখ্যান বিস্তৃত বর্ণনার আদেশ দেন। তাঁর নির্দেশে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে যজ্ঞের অবকাশে সেই ইতিহাস বলতে থাকেন। তাই মহাভারতে প্রশ্নকর্তা জনমেজয় ও উত্তরদাতা তথা বক্তা বৈশম্পায়ন। মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে দেখা যায়— সৌতি, ভীষ্ম বা বাসুদেব ব্যাসের নানা কাহিনী বা উপদেশের কথা বলেছেন, কিন্তু তা বৈশম্পায়নের বর্ণনার অংশমাত্র।

মহাভারত সম্পর্কে (রামায়ণ সম্পর্কেও একই কথা) আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একাংশের ধারণা, উগ্র ও অত্যধিক গঞ্জিকা সেবনে উর্বর মস্তিষ্কের বিচিত্র ফসল মহাভারত। তাঁদের মতে, বিজ্ঞান ও যুক্তির কোনও ধারণার সঙ্গে মেলে না মহাভারতের অনেক কাহিনী। বরং সে সব কাহিনীর সঙ্গে অতি নিকট সাদৃশ্য আছে কল্পকথা, রূপকথা বা উদ্ভট কল্পনার। কিন্তু আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগের একান্ত স্মৃতিনির্ভর কাহিনীতে পরবর্তীকালে কিছু কুশীলকের হাত থাকতে পারে, যা ঐতিহাসিক ও বিশেষজ্ঞগণ অস্বীকার করেন না। অন্যদিকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাজনীতির স্বার্থে যুগে যুগে বহু বুদ্ধিজীবী ইতিহাস বিকৃত করেন। (অবশ্য মহাভারতে এরকম দৃষ্টান্ত দুর্লভ)। মাত্র কয়েকশ বছর আগের মোগল ইতিহাস বা পরবর্তী ইতিহাসের বিকৃতি তার স্পষ্ট ও জীবন্ত প্রমাণ। এছাড়া রূপক, সঙ্কেত বা ইঙ্গিতের অন্তরালে অনক ঘটনা থাকতে পারে, কিন্তু তার অনুসন্ধান আমাদের ধৈর্যের বাইরে।

ইতিহাসের যথার্থ গবেষকগণ আন্তরিক চেষ্টা করলে মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস উদ্ধার করতে পারেন। মহাভারত খ্যাত প্রাচীন সরস্বতী নদীর আবিষ্কার ও উদ্ধার আজকের গবেষক ও বিজ্ঞানসাধকদের সবচেয়ে স্মরণীয় কৃতিত্ব। সেই সরস্বতী নদীর তীরে মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব নক্ষত্রলিপি মিলিয়ে অন্তত দশটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বলেছেন। সেগুলির মধ্যে দুটি বিশিষ্ট ঘটনার তারিখ— (ক) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভ ২২শে নভেম্বর, ৩০৬৭ খৃঃ পূর্বাব্দ, (খ) ভীষ্মের মহাপ্রয়াণ— জানুয়ারি ১৭, ৩০৬৬ খৃঃ পূর্বাব্দ মাঘ শুক্লা অষ্টমী। এই দুটি তারিখ সহ ব্যাসদেব লিখিত অন্য সমস্ত ঘটনার তারিখ নিরূপণ নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। যুক্তি ও বিজ্ঞানবাদীদের বোধহয় ভালো লাগবে জেনে যে, নক্ষত্রলিপি থেকে নির্ণীত এই সমস্ত তারিখ আধুনিক বিশ্বের দুটি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সংস্থা 'নাসা' ও 'ইসরো' দ্বারা

সসম্মানে স্বীকৃত (যেমন তাঁরা মেনে নিয়েছেন রামেশ্বর ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সমুদ্রতলে রামচন্দ্র নির্মিত সেতু)। অথচ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস মহাভারত আজও অধিকাংশ ভারতীয়দের কাছে একান্ত অনাদৃত। মহাভারত সম্পর্কে বলা হয়— যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে। কাব্যের আকারে রচিত হলেও মহাভারত পাঁচ হাজার বছর পূর্বের ভারতের ইতিহাস। সেখানে ধর্ম থেকে যৌনতত্ত্ব, ভারত সংস্কৃতির অতি সূক্ষ্ম দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে আন্তরিক যত্ন ও স্পষ্ট ভাষায়। ভারত সন্তানদের এই বিস্মৃতি, অজ্ঞতা তথা মূঢ়তায় হয় তো ভারতের কোনও তীর্থ বা হিমালয়ের সাধনক্ষেত্রে বসে মৃত্যুঞ্জয় মহর্ষি নীরবে হাসছেন।

মহাভারত ও ব্যাসদেব অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। আর এ যোগ সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার যোগের মতো নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি। ব্যাসদেব বলে বাস্তবে যদি কেউ থাকেন, তাহলে তাঁর সৃষ্ট মহাভারতও বাস্তব কাহিনীর সমষ্টি। আমরা উপন্যাস, কাব্য বা অন্য কিছু যখন রচনা করি, তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার সঙ্গে লেখকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। যদিও জনৈক সমালোচক লিখেছেন, লেখক তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকেন। কিন্তু ব্যাসদেব কেবল ভারত কাহিনীর রচনাকার নন, তিনি সেই কাহিনীর অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র। শুধু বিশিষ্ট চরিত্র নন, তিনি সেই কাহিনীধারার অন্যতম নিয়ামক, যাঁকে মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে নানা ভূমিকায় প্রায়শ দেখা যায়।

ব্যাসদেব নিজের কথা খুব সামান্যই বলেছেন, কিন্তু কৌরব-পাণ্ডবের যথার্থ প্রয়োজনে তাঁর সময়োচিত উপস্থিতি ও আন্তরিক উপদেশ লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, তিনি যেন পরোক্ষভাবে নিজেকে তুলে ধরেছেন। কোনও কোনও কাহিনীতে তিনি স্পষ্টভাবে যুক্ত হয়েছেন, আবার কোথাও দূরে থাকলেও তাঁর চিন্তা ও মন তাঁদের দিকেই ধাবিত হয়েছে বারবার।

ধীবরশ্রেষ্ঠের পালিতা কন্যা মৎস্যগন্ধা। ধীবর অপুত্রক হওয়ায় মৎস্যগন্ধা যমুনা নদীতে ধীবরের হয়ে খেয়া পারাপার করতেন। তীর্থপর্যটনরত সর্বজ্ঞ পরাশর মুনি অত্যন্ত রূপবতী মৎস্যগন্ধাকে দেখে মোহিত হয়ে বললেন, তোমার জন্মবৃত্তান্ত আমি জানি। তোমার কাছে আমি বংশধর পুত্র চাচ্ছি। তুমি আমার কামনা পূর্ণ কর। সলজ্জ মৎস্যগন্ধার কথায় পরাশর নদীমধ্যে কুয়াশা সৃষ্টি করে সর্বদিক তমসাচ্ছন্ন করলেন এবং সত্যবতীর সঙ্গে মিলিত হলেন। মৎস্যগন্ধা সদ্য গর্ভধারণ করে পুত্র প্রসব করলেন। যমুনার দ্বীপে জাত এই পরাশরপুত্রের নাম দ্বৈপায়ন। তাঁর গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ বলে তাঁর নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। পরে তিনি বেদবিভাগ করে ব্যাস বা বেদব্যাস, ব্যাসদেব নামে বিখ্যাত হন। এই ব্যাসদেবই হলেন মহাভারতের স্রষ্টা। জন্মের পর মাকে তাঁর আহ্বানে আসার আশ্বাস দিয়ে মায়ের আদেশ নিয়ে তিনি পিতা পরাশরের সঙ্গে চলে যান এবং তপস্যায় রত হন।

সেদিন থেকে মৎস্যগন্ধার নাম হয় সত্যবতী। পরবর্তীকালে শান্তনু পুত্র দেবব্রতর ইচ্ছায় হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই সত্যবতীর গর্ভে জন্ম হল দুই পুত্রের— চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদের হাতে জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হল। অতঃপর দেবব্রত (ভীষ্ম) অপ্রাপ্তযৌবন বিচিত্রবীর্যকে রাজপদে বসালেন। বিচিত্রবীর্যের যৌবনলাভে ভীষ্ম কাশীরাজের স্বয়ংবর থেকে দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে তুলে এনে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের সাতবছর পরে অপুত্রক বিচিত্রবীর্য যক্ষ্মারোগে মারা গেলেন।

পুত্রশোকাহতা সত্যবতী তাঁর দুই বধূকে দিয়ে ভীষ্মকে বললেন, রাজা শান্তনুর পিণ্ড, কীর্তি ও বংশরক্ষার ভার এখন তোমার উপর। ধর্মজ্ঞ, এখন আমার আদেশে বংশরক্ষার জন্য দুই ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সন্তান সৃষ্টি কর অথবা তুমি বিবাহ কর। ভীষ্ম বললেন, আমি সব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু আমার সত্যপ্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করতে পারি না। তবে আমি ক্ষাত্রধর্মসম্মত একটি উপায় বলছি— পুরাকালে পরশুরাম কর্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হলে ক্ষত্রনারীগণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহবাসে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। কারণ বেদে আছে, ক্ষেত্রজ পুত্র বিবাহকারীরই পুত্র হয়। তাই ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে সন্তান সৃষ্টির জন্য আপনি কোনও গুণবান ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়ে নিয়োগ করুন।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে লজ্জিতভাবে সত্যবতী নিজের পূর্ব ইতিহাস এবং পুত্র দ্বৈপায়নের সব কথা জানালেন। তারপর বললেন, তুমি আর আমি অনুরোধ করলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের আশা পূরণ করবেন। ভীষ্মের সম্মতিতে সত্যবতী ব্যাসকে স্মরণ করলে ক্ষণকালমধ্যে ব্যাস আবির্ভূত হলেন এবং সসম্মানে মায়ের অভিলাষ জানতে চাইলেন। সত্যবতীর প্রার্থনা শুনে ব্যাস বললেন, কেবল ধর্মপালনের জন্য আমি আপনার অভীষ্ট কার্য করব। আমার নির্দেশ অনুসারে দুই রানি এক বছর ব্রত পালন করে শুদ্ধ হন, তবে তাঁরা আমার কাছে আসতে পারবেন।

অরাজক রাজ্যে বৃষ্টি হয় না, দেবতা প্রসন্ন হন না ইত্যাদি যুক্তি দেখিয়ে রানিরা যাতে সদ্য গর্ভবতী হন, তার ব্যবস্থা করতে সত্যবতী বারবার ব্যাসদেবকে অনুরোধ করলেন। ব্যাসদেব বললেন, যদি এখনই পুত্রের জন্ম দিতে হয়, তবে রানিরা যেন আমার কুৎসিত রূপ, গন্ধ আর বেশ সহ্য করেন।

প্রথমে অম্বিকা। সেই দীপালোকিত বিশাল শয়নগৃহে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় অম্বিকা ব্যাসের জন্য প্রতীক্ষারতা। যথাসময়ে ব্যাস প্রবেশ করলেন। তাঁর কৃষ্ণবর্ণ, দীপ্ত নয়ন ও পিঙ্গল জটা-শ্মশ্রু দেখে অম্বিকা চোখ বুজিয়ে রইলেন। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে জন্ম দিলেন অম্বিকা। অম্বালিকা ব্যাসের মূর্তি দেখে ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেলেন। তিনি জন্ম দিলেন বিক্রমশালী পাণ্ডুকে। অম্বিকা আবার ঋতুবতী হলে সত্যবতী ব্যাসের কাছে যেতে বলেন। কিন্তু মহর্ষির রূপ আর গন্ধ মনে করে, অম্বিকা নিজে না গিয়ে এক সুন্দরী দাসীকে পাঠালেন। দাসীর অভ্যর্থনা ও পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে ব্যাস এক সুপুত্রের জন্ম দিলেন। ইনিই মহামতি বিদুর। তৎকালে প্রচলিত রীতি অনুসারে এরা সকলেই বিচিত্রবীর্যের সন্তান। কিন্তু তাঁদের জন্মদাতা হলেন মহাভারত রচয়িতা স্বয়ং ব্যাসদেব। ধৃতরাষ্ট্রের কৌরব নামে পরিচিত শতপুত্র এবং পাণ্ডুর পাণ্ডবখ্যাত পাঁচ পুত্রের ইতিহাসের, যা মহাভারতে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, সূচনা তাই ব্যাসের মধ্যে। আর কাহিনী অনেকক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে ব্যাসদেবের কাহিনী। কিন্তু তিনি নিজে না বলে প্রিয় শিষ্য বৈশম্পায়নের মুখ দিয়ে বিশ্ববাসীকে শোনালেন অতি সুনিপুণ কৌশলে। সর্পযজ্ঞের সেই মহান ও দীর্ঘ দিনের অনুষ্ঠানে ব্যাসদেব সৃষ্ট এই বাস্তব কাহিনীধারা এক স্বতন্ত্র মর্যাদা ও মাত্রা এনে দিল, যা শুনে সমবেত সকলেই সত্যই জনমেজয়ের মতো মুগ্ধ হয়েছিলেন।

প্রথম পাঁচ পর্বের মধ্যে বিরাট ও উদ্‌যোগ পর্বে ব্যাসকে সরাসরি না পেলেও অন্য তিন পর্বে আছে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাবসানে পুরবাসীগণ ও মাতা সত্যবতীকে শোকার্ত দেখে ব্যাসদেব বললেন, মা, সুখের দিন শেষ। দারুণ কাল আসছে। ... দিন দিন পাপের মাত্রা বাড়বে। পৃথিবী শস্যহীনা, রিক্তা হবে। ভয়ঙ্কর কাল আসছে। .... নানা দোষ সমাকুল হবে। .... ধর্মকর্ম সব লুপ্ত হবে। কৌরবদের দুর্ব্যবহারে পৃথিবী আর সুস্থ থাকবে না। অতএব নিজের বংশের ক্ষয় আর দেখবেন না। তপোবনে গিয়ে যোগাবলম্বন করুন।

সত্যবতী অম্বিকা ও অম্বালিকা— দুই পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে তপোবনেই চলে যান। সেখানে যোগাবলম্বনে দেহপাত করেন। কুরুবংশের

ধবংসের ইঙ্গিত দিলেন বেদব্যাস। মহাযোগী ব্যাসের এই ভবিষ্যদ্বাণী কী সুন্দরভাবে বর্তমান কালের পক্ষেও প্রযোজ্য!

তারপর আয়োজন হল পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা। তখন পাণ্ডবগণ বাস করছিলেন সেই রাজ্যের মধ্যে এক কুম্ভকারের কর্মশালায়। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করলেন এবং নানা ঘটনার পর তাঁরা দ্রৌপদীকে নিয়ে কুম্ভকারের কুটিরদ্বারে পৌঁছুলেন। তখন ভীম ও অর্জুন আনন্দিত মনে কুন্তির উদ্দেশ্যে বললেন, আমরা ভিক্ষা এনেছি। কুটিরের ভিতর থেকে কুন্তি বললেন, তোমরা সকলে মিলে ভোগ কর। তারপর দ্রৌপদীকে দেখে বললেন, আমি ভুল করে অন্যায় কথা বলে ফেলেছি। পুত্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন, যাতে দ্রৌপদীর পাপ না হয়, তার উপায় বল। যুধিষ্ঠির একটু চিন্তা করে বললেন, অর্জুন, তুমি দ্রৌপদীকে জয় করেছ, তুমিই এঁকে যথাবিধি বিবাহ কর। অর্জুন বললেন, মহারাজ, আমাকে অধর্মভাগী করবেন না। আগে আপনার, তারপর ভীমের, তারপর আমার, তারপর নকুল-সহদেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হবে। দ্রৌপদী সকলকে দেখছিলেন, পাণ্ডবরাও পরস্পরের দিকে চেয়ে দ্রৌপদীর প্রতি আসক্ত হলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের মনোভাব বুঝলেন এবং ব্যাসের কথা স্মরণ করে এবং ভ্রাতাদের মধ্যে পাছে ভেদ হয়, সেই ভয়ে বললেন, ইনি আমাদের সকলের ভার্যা হবেন।

ধর্মজ্ঞ ও মাতৃভক্ত যুধিষ্ঠির তো এই বিবাহ সমস্যার সহজতম সমাধান করলেন। তৎকালে অনেক পুরুষের একাধিক স্ত্রী ছিল। কিন্তু নারীর বহুবিবাহ সমাজস্বীকৃত ছিল না। তাই বেদবিরুদ্ধ ও সমাজ তথা নীতিবিরুদ্ধ এই কাজ মহর্ষি ব্যাস কীভাবে স্বীকৃতি দেবেন? আর এখানেই মহাভারত রচয়িতা ব্যাসকে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। রাজা দ্রুপদ চেয়েছিলেন, তাঁর আদরের দ্রৌপদীর বিবাহ হোক মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গে। কিন্তু সেখানে পাঁচ ভাই তাঁকে বিবাহ করবেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার কী করে সম্ভব! পাণ্ডবদের দ্বিধা দূর করতে ও দ্রুপদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যাস কিছু প্রাচীন প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন।

পাণ্ডবগণ যখন একচক্রাগ্রাম ত্যাগ করে পাঞ্চাল দেশের দিকে যাবার চেষ্টা করছেন, তখন তাঁদের সঙ্গে ব্যাস দেখা করলেন। নানা কাহিনী প্রসঙ্গে তিনি বললেন, কোনও এক ঋষির এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। পূর্বজন্মের কর্মদোষে তাঁর পতিলাভ হয়নি। তাঁর কঠোর তপস্যায় তুষ্ট মহাদেব এসে বললেন, অভীষ্ট বর চাও! কন্যা বারবার বললেন, সর্বগুণান্বিত পতি কামনা করি। মহাদেব বললেন, তুমি পাঁচবার পতি চেয়েছ। এজন্য পরজন্মে পাঁচজন ভরত বংশীয় পতি হবে। সেই দেবরূপিণী কন্যাই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা। সেই তোমাদের পত্নী হবে। তোমরা পাঞ্চালনগরে যাও। দ্রুপদ কন্যাকে পেয়ে তোমরা সুখী হবে।

দ্বিধাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন দ্রুপদকে ব্যাস ভিন্নকক্ষে শোনালেন আর এক কাহিনী। শাখাপ্রশাখা বর্জিত সেই কাহিনী সংক্ষেপে এরকম—

পুরাকালে নৈমিষারণ্যে দেবতারা এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞস্থানে যাবার সময় ইন্দ্র গঙ্গার জলে একটি স্বর্ণপদ্ম দেখতে পেলেন। ইন্দ্র সেই পদ্ম নিতে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন, এক অনলপ্রভা রমণী গঙ্গার গভীর জলে নেমে কাঁদছেন— তাঁর অশ্রুবিন্দু স্বর্ণপদ্ম হয়ে জলে পড়ছে। রোদনের কারণ জিজ্ঞাসায় রমণী ইন্দ্রকে বললেন, আমার পিছনে পিছনে আসুন। কিছু দূর গিয়ে ইন্দ্র দেখলেন, হিমালয় শিখরে বসে এক সুদর্শন যুবা এক যুবতীর সঙ্গে পাশা খেলছেন। তাঁরা খেলায় মত্ত হয়ে তাঁকে গ্রাহ্য করছেন না দেখে ক্রুদ্ধ দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, এই বিশ্ব আমারই অধীন, আমিই এর ঈশ্বর। যুবা হাস্য করে ইন্দ্রের দিকে চাইলেন, ইন্দ্র স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হয়ে গেলেন। পাশাখেলা শেষে যুবকরূপী মহাদেব বললেন, ইন্দ্র, আর কখনও দর্প প্রকাশ কর না। অসীম বলশালী তুমি এই পর্বতটি তুলে গহ্বরের ভিতরে গিয়ে দেখ। ইন্দ্র গহ্বরে প্রবেশ করে দেখলেন, তাঁর তুল্য তেজস্বী চারজন পুরুষ সেখানে আছেন। ভীত ইন্দ্রকে মহাদেব বললেন, গর্বের ফলে এরা এখানে আছে, তুমিও এখানে থাক। তোমরা সকলে মনুষ্য হয়ে জন্মাবে এবং শত্রুবধ শেষে আবার ইন্দ্রলোকে ফিরে যাবে। তখন আগের চার ইন্দ্র বললেন, ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীদ্বয়ের কৃপায় মানুষী গর্ভে আমাদের জন্ম হবে। বর্তমান ইন্দ্র বললেন, আমি নিজবীর্যে একজন পুরুষ সৃষ্টি করে তাকেই পঞ্চম ইন্দ্র রূপে পাঠাব। মহাদেব তাতে সম্মত হলেন এবং সেই শ্রীরূপিণী রমণীকে মনুষ্যলোকে তাঁদের ভার্যা হবার জন্য আদেশ দিলেন।

উপাখ্যান শেষে ব্যাস বললেন, মহারাজ, সেই পাঁচ ইন্দ্রই পাণ্ডবরূপে জন্মেছেন এবং তাঁদের ভার্যারূপে নির্দিষ্টা সেই লক্ষ্মীরূপিণী রমণীই দ্রৌপদী হয়েছেন। আমি আপনাকে দিব্য দৃষ্টি দিচ্ছি। পাণ্ডবদের পূর্বমূর্তি দেখুন। দিব্যদৃষ্টিতে পাণ্ডবদের অপূর্ব মূর্তি ও দেবলক্ষ্মণ দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত দ্রুপদ ব্যাসকে প্রণাম করলেন। তখন ব্যাস বললেন, মানুষের পক্ষে এরূপ বিবাহ বিহিত নয়, কিন্তু ওঁরা দেবতার অবতার। মহাদেবের ইচ্ছায় দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী হবেন।

আদি পর্বে বিদুরের কৌশলে বারণাবতে জতুগৃহদাহ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ব্রাহ্মণের বেশে যখন পঞ্চ পাণ্ডব কুন্তিকে নিয়ে ভিক্ষান্নে জীবনযাপন করছেন, তখন ব্যাসদেব তাঁদের সেই সঙ্কটকালে আবির্ভূত হলেন। তিনিই একচক্রাগ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করলেন।

সভাপর্বে ৪৪তম অধ্যায়ে ব্যাসদেব মাত্র একবার এসেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ তখন শেষ। বিদায়কালে ব্যাসদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করলেন, তুমি দুর্লভ সাম্রাজ্য লাভ করে কুরু-বংশের উন্নতি সাধন করেছ, তোমার দ্বারা কুরু-বংশ উজ্জ্বল হবে। তখন যুধিষ্ঠির সবিনয়ে ব্যাসের কাছে দিব্য, আন্তরীক্ষ ও পার্থিব— নারদকথিত এই তিন ধরনের উৎপাতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তখন সর্বজ্ঞ ব্যাস বললেন, রাজা, সে ত্রিবিধ উৎপাত তেরো বছরের শেষে হবে। তাতে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হবে। দুর্যোধনের অপরাধে এবং ভীম-অর্জুনের শক্তিতে তোমাকে উপলক্ষ্য করে সকল ক্ষত্রিয় রাজা ধবংস হবে। তোমার মঙ্গল হোক, তুমি সংযত হয়ে পৃথিবী পালন কর। এই বলে মহর্ষি কৈলাস পর্বতে চলে গেলেন। আসন্ন সর্বনাশের পূর্বে স্নেহভাজন ধার্মিক যুধিষ্ঠিরকে সচেতন করা এবং মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত করার জন্য দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো ব্যাসদেবের এই প্রয়াস সবিশেষ লক্ষণীয়।

বনপর্বের ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে ব্যাসদেব এলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। বললেন, আমি সমস্ত কৌরবের কল্যাণে কিছু বলছি। পাণ্ডবদের বনগমনে আমি কষ্ট পেয়েছি। তেরো বছর পূর্ণ হলে তারা রাজ্য উদ্ধারে সচেষ্ট হবে। তখন তোমার দুষ্টপুত্র দুর্যোধন তাদের হাতে নিহত হবে। তাই যাতে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তার জন্য এখন থেকে চেষ্টা কর। তুমি তোমার পুত্র দুর্যোধনকে একা পাঠিয়ে দাও পাণ্ডবদের সঙ্গে বনে বাস করার জন্য, যদি তাদের সঙ্গে বাস করতে করতে তার মধ্যে কিছু ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। অবশ্য সেরূপ হবার সম্ভাবনা কম। কেন না যার জন্ম থেকে যেরূপ স্বভাব থাকে, সে না মরলে তা যায় না। তাই তুমি, বিদুর, ভীষ্ম সকলে মিলে সকলের মঙ্গলকর উপায়ের ব্যবস্থা কর।

সহায়হীন, মিত্রহীন বনবাসী পাণ্ডবদের নিধনে কর্ণ-উদ্ভাবিত ঘৃণ্য চক্রান্ত তখন বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। মহর্ষি ব্যাস দিব্যচক্ষু দিয়ে সব দেখে, সেসময় তাদের সেই ভয়ঙ্কর কাজ থেকে থামালেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, অন্যায় পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির সব হারিয়ে বনবাসে গেছে। তুমি তা জেনেও পুত্রস্নেহে নীরব ছিলে। এখন তোমার সেই পুত্রগণ অসহায় পাণ্ডবগণকে নিধন করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। আমি

তোমার ও পাণ্ডুর পুত্রদের সমভাবে স্নেহ করি। তোমার পুত্র দুর্যোধনকে শান্ত ও ক্ষান্ত হতে আদেশ কর। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আপনার মতো আমাকে একই উপদেশ দিয়েছেন মহামতি বিদুর, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য। কিন্তু আমি অসহায়, তাই সকলের কল্যাণের জন্য আপনি স্বয়ং দুর্যোধনকে কিছু বলুন। ব্যাসদেব বললেন, মহামুনি মৈত্রেয় পাণ্ডবগণকে খুঁজে এখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। তিনি দুর্যোধনকে সময়োপযোগী উপদেশ দেবেন।

কিছুক্ষণ পরে মৈত্রেয় এলেন, ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, তুমি ও ভীষ্ম জীবিত থাকতে তোমার পুত্রের এরূপ বিরূপ আচরণ একেবারে যুক্তিবিরুদ্ধ। তারপর তিনি দুর্যোধনকে কুরু-পাণ্ডবরে সন্ধি প্রসঙ্গে সকলের হিতকর কিছু উপদেশ দিতে গেলেন। তখন দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন মৈত্রেয়ের কথা শুনে হাতির শুঁড়ের মতো নিজের উরুতে চড় মেরে ও হাসতে হাসতে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে চুপ করে থাকলেন। কিন্তু কিছুমাত্র উত্তর দিলেন না। মহামুনি মৈত্রেয় দুর্যোধনের সেই উপেক্ষা লক্ষ্য করে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিলেন। হে অভিমানী দুর্যোধন, তুমি আমাকে অনাদর দেখিয়ে আমার কথা উপেক্ষা করলে। খুব শীঘ্রই সেই অভিমানের ফল পাবে। অল্প দিনের মধ্যে শক্তিশালী ভীমসেন গদাঘাতে তোমার উরু ভগ্ন করবেন। ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে মৈত্রেয় বললেন, কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হলে তাঁর এ শাপ নিষ্ফল হবে।

আবার ব্যাসদেবের আবির্ভাব বনপর্বের ৩৬তম অধ্যায়ে। তখন অসহিষ্ণু ভীম ও সংযত যুধিষ্ঠিরের মধ্যে তুমুল বিতর্ক চলছে। সবে বনবাসের মাত্র তেরো মাস অতিক্রান্ত। ভীমের যুক্তি, আমরা অন্যায় যুদ্ধে হেরেছি, তাই আমাদের তেরো মাসের বনবাসকে তেরো বছর নিয়ে অবিলম্বে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা রাজ্য অধিকার করতে চাই। এই অন্যায় যুদ্ধ যাত্রার বিরুদ্ধে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির যখন যুক্তিজাল বিস্তার করছেন, তখন এলেন মহাযোগী ব্যাসদেব। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমি আমার শক্তিবলে তোমার মনোভাব বুঝে তোমার কাছে এসেছি। যাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতি থেকে জয়ী হতে পার, তোমাকে সে বিষয়ে কিছু অনুষ্ঠান ও কর্তব্যের কথা বলব। তারপর একান্তে ডেকে নিয়ে তিনি তাঁকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা দিলেন। আরও বললেন, অর্জুন এ বিদ্যা পেয়ে মহাদেব ও ইন্দ্রের অনুগ্রহ পাবে। অর্জুন তপস্যা প্রভাবে বরুণ, কুবের, ধর্মরাজ প্রভৃতি দেবতার সাক্ষাৎ পাবে। তাই অর্জুন অজেয় হবে। তারপর তিনি যুধিষ্ঠিরকে দ্বৈতবন ত্যাগ করে সরস্বতী নদীর তীরে কাম্যক বনে যেতে বললেন। যুধিষ্ঠির সেদিন থেকে সংযতচিত্তে ব্যাসদত্তমন্ত্র একমনে অভ্যাস করতে লাগলেন এবং ভ্রাতা-স্ত্রী ও অন্যদের নিয়ে কাম্যক বনে চলে গেলেন।

৯৩তম অধ্যায়ে ব্যাসদেব যখন এলেন, তখন যুধিষ্ঠির সকলকে নিয়ে তীর্থযাত্রার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মন পরিশুদ্ধ হলে তার তীর্থযাত্রা সফল হয়, তাই শান্তভাব নিয়ে বিশুদ্ধ হয়ে তীর্থদর্শনে যাও। উপদেশ অতি সামান্য, কিন্তু সংযতচিত্ত বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠিরের পক্ষে তা নিঃসন্দেহে অতি মূল্যবান ও সামগ্রিকভাবে সকল পাণ্ডব সহ অন্যদের পক্ষে যথার্থ সহায়ক।

পরবর্তী ছটি পর্বের (ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক ও স্ত্রীপর্ব) মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য ও স্ত্রীপর্বে অতি অল্প সময়ের জন্য ব্যাসদেবকে দেখা যায়। ভীষ্মপর্বের প্রথম দিকে তিনি এলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। ধৃতরাষ্ট্র তখন পুত্রদের দুর্নীতির কথা ভাবছিলেন নির্জনে। আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন, তুমি যদি যুদ্ধ দেখতে চাও, তাহলে আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দেব। তখন ধৃতরাষ্ট্র অস্বীকৃত হওয়ায় ব্যাস বললেন, গবল্‌গণপুত্র সঞ্জয় আমার বরে দিব্যচক্ষু লাভ করে, যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে তোমাকে বলবেন। এরপরও তিনি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র আবার তাঁর অসহায়তা ও অক্ষমতার কথা জানালেন।

দ্রোণপর্বের ৫২তম অধ্যায়ে অভিমন্যুবধে শোকার্ত যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে এলেন ব্যাসদেব। তিনি তাঁকে মৃত্যুর স্বরূপ বোঝালেন এবং দৈববিহিত এই মৃত্যুর জন্য শোক ত্যাগ করতে বললেন। এখানেও এক স্নেহময় অভিভাবকের মহান ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেন ব্যাসদেব। দ্রোণপর্বের শেষদিকে ইচ্ছামতো ভ্রমণপথে তিনি এলেন পাণ্ডবশিবিরে। বিস্মিত ও আনন্দিত অর্জুন জানালেন, আমি দেখলাম, যুদ্ধকালে আমার সম্মুখে এগিয়ে চলেছেন এক শূলধারী দিব্যপুরুষ। শূন্যে ভাসমান অদৃশ্য সেই পুরুষের শূল থেকে হাজার হাজার শূল সৃষ্টি হয়ে ধ্বংস করছে কৌরববাহিনীকে। কুরুসেনা ভাবল, আমার অস্ত্রে তারা নিহত হচ্ছে। ব্যাস বললেন, অর্জুন, তুমি নিষ্ঠাবান ও যথার্থ ভক্তবীর। তোমার পূজায় সন্তুষ্ট মহাদেব স্বয়ং এভাবে সাহায্য করেছেন। তিনি ছাড়া অশ্বত্থামা, কৃপ ও কর্ণের সেনাবাহিনীকে কে পরাজিত করতে পারে? তারপর তিনি অর্জুনকে রুদ্রমাহাত্ম্য শোনালেন।

শল্যপর্বে মাত্র একবার অল্প সময়ের জন্য দেখা গেল ব্যাসদেবকে। তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিকে বলছেন, সঞ্জয়কে এখুনি শেষ কর। ব্যাসদেব শুধু বললেন, হে বীর, তুমি সঞ্জয়কে ছেড়ে দাও। ওকে বধ করা তোমার উচিত নয়। মহাবীর সাত্যকি জোড়হাতে মহর্ষির আদেশ মেনে নিলেন। সঞ্জয় নির্বিঘ্নে চলে গেলেন। সঞ্জয়ের মৃত্যু হলে তাঁকে দেওয়া ব্যাসের বর ব্যর্থ হবে এবং সম্পূর্ণ যুদ্ধ বিবরণ শোনাও হবে না ধৃতরাষ্ট্রের। তাই মহর্ষির এই আকুলতা।

স্ত্রীপর্বের প্রথম দিকে শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র তখন মূর্ছিত, এলেন ব্যাসদেব। মূর্ছাভঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, এ দুঃখ থেকে মুক্তি নেই, তাই আজই আমি দেহত্যাগ করব। তখন ব্যাসদেব তাঁকে সান্ত্বনা প্রসঙ্গে যা বললেন, তার মর্মার্থ— দৈব এই কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ সৃষ্টি করেছে এবং দৈবপ্রভাবে তোমার পুত্রগণ নিহত হয়েছে। অন্যরা উপলক্ষ্য মাত্র। মহাযোগী ব্যাসদেবের এই উপদেশে শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র শান্ত হলেন।

শেষ সাতটি পর্বের (শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব) মধ্যে একেবারে শেষের দুটি পর্ব ছাড়া সকল পর্বে ব্যাসদেবকে দেখা যায়। শান্তি পর্বের ৩২তম অধ্যায়ে এলেন ব্যাসদেব। শোকার্ত যুধিষ্ঠিরকে তখন বিদুর রাজ্য অধিকার করে প্রজাপালন ও ধর্মানুষ্ঠানের জন্য উপদেশ দিচ্ছিলেন। সেই সময় ব্যাসদেব উপস্থিত হয়ে বিদুরের সুপরামর্শ সমর্থন করলেন। শোকার্ত যুধিষ্ঠিরকে তিনি বললেন, তোমার গুরুজন, জাতি ও অন্য ক্ষত্রিয়গণ নিজেদের অপরাধে নিহত হয়েছেন। তোমরা কেউই কাউকে বিনাশ করনি। ধর্মসাক্ষী কালই সব বিনাশ করেছেন। তাই শোক না করে তোমার ও সকলের কল্যাণের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। তাহলে এখন ইহলোকে শান্তি পাবে এবং পরলোকে তোমার মঙ্গল হবে। তারপর যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ব্যাস নানা ধরনের পাপ ও তাদের প্রায়শ্চিত্ত বিধির কথা বললেন। আরও কিছু উপদেশ দিয়ে 'সমগ্র ধর্ম' শোনার জন্য ভীষ্মের কাছে যেতে বললেন। ভীষ্মের কাছে গিয়ে শোকার্ত যুধিষ্ঠির যথার্থ শান্ত হলেন। ভীষ্মের উপদেশ অনুসারে হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হল। ৩২ থেকে ৩৭ অধ্যায় পর্যন্ত ঘটনাবলীর এই বিরাট পটপরিবর্তনে ব্যাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান।

২৩১ থেকে ২৫৬ অধ্যায়ের ঘটনা ও তাত্ত্বিক আলোচনা যদিও ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের কাছে করেছেন, কিন্তু তার কেন্দ্রবিন্দু স্বয়ং ব্যাসদেব।

আপন পুত্র, শুককে তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কাল নিরূপণ... যুগধর্ম... জ্ঞান পথে মুক্তির উপায়... কর্মসাপেক্ষ মোক্ষধর্ম ব্যাখ্যা.... গুরুসেবাদি দ্বারা জ্ঞানের উন্মেষ..... সন্ন্যাসীর লক্ষণ.... মোক্ষধর্ম.... পঞ্চ ভূতের লক্ষণ..... মৃত্যুর উৎপত্তি ইত্যাদি নানা বিষয়ে অত্যন্ত জটিল তত্ত্বপ্রসঙ্গে উপদেশ দেন। একজন যথার্থ জ্ঞানীর প্রশ্নের উত্তরে এসব তাত্ত্বিক আলোচনা বেশ জটিল হলেও মহাজ্ঞানী ব্যাসদেবের মনোজগতের সূক্ষ্মতার স্পর্শ পাওয়া যায় এখানে।

অন্যদিকে সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী হলেও তিনি যে একজন রক্ত মাংসে গড়া স্নেহাতুর মানুষ, তার কিছুটা আভাস মেলে শান্তিপর্বের ৩২৯ থেকে ৩৩৪ অধ্যায়ের ঘটনাবলীতে। এই সব অধ্যায়ে আছে শুকদেবের জন্মকাহিনী ও তাঁর শিক্ষা.... পুত্রকে ব্যাসের মোক্ষধর্মের উপদেশ.... পিতার আদেশে শুকদেবের জনক রাজার কাছে মোক্ষ বিষয়ক উপদেশ গ্রহণে গমন.... নারদের শুককে উপদেশ দান প্রভৃতি। নারদের উপদেশে শুকদেবের সিদ্ধান্ত সংসারে আর থাকবেন না। তিনি নারদের অনুমতি নিয়ে আবার ব্যাসদেবের কাছে গেলেন ও তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন। ব্যাস বললেন পুত্র, তুমি কিছুক্ষণ এখানে থাক, তোমাকে দেখে আমার চক্ষু তৃপ্ত হোক। কিন্তু উদাসীন শুকদেব স্নেহশূন্য ও সংশয়মুক্ত হয়ে পিতাকে ত্যাগ করে কৈলাস পর্বতের উপরে চলে গেলেন। সেখান থেকে যোগাবলম্বনে আকাশে সূর্যের দিকে যাত্রা করলেন এবং বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধে গিয়ে নিজ শক্তিতে পরব্রহ্মে লীন হলেন। ব্যাসদেব স্নেহবশত পুত্রের অনুগমন করলেন। কিন্তু শুকদেব অন্তর্হিত হলে তিনি একান্ত শোকসন্তপ্ত হয়ে পড়লেন। তখন ভগবান শঙ্কর সেখানে এসে ব্যাসকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, মহামুনি, তুমি আমার প্রসাদে সর্বত্র নিজপুত্রের ছায়া দেখতে পাবে।

৩৫০তম অধ্যায়ে বৈশম্পায়ন মুখে শুনি বেদব্যাসের পূর্বজন্মের পরিচয়ও। পরের অধ্যায়ে পরম পুরুষের একত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে ব্যাসদেবের মুখে পাই কিছু পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও তাত্ত্বিক বিবরণ। ৩৬৬টি অধ্যায়ে সমাপ্ত বিপুলায়তন শান্তি পর্বটি তত্ত্ব-উপদেশের এক গভীর, বিশাল ও মহার্ঘ আকর।

১৬৬তম অধ্যায়ে, সমাপ্ত অনুশাসন পর্বটি মূলত কিছু উপদেশ প্রসঙ্গে নানা প্রাচীন কাহিনীর বিবরণ। এখানে তত্ত্ব কাহিনীযোগে পরিবেশিত বলে সহজ ও হৃদয়গ্রাহী। এখানেও সরাসরি ব্যাসদেবকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভালোভাবে দেখা যায়। ১৮ অধ্যায়ে ব্যাসদেব শিব মাহাত্ম্য বর্ণনা করে যুধিষ্ঠিরকে শিবের আরাধনা করতে বলেন। ১১৭ থেকে ১২২ অধ্যায়ে আত্মপ্রাণের উন্নতি প্রসঙ্গে একটি কীট ব্যাসের উপদেশে কীভাবে নানা জন্মের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিল, তার বিবরণ, মৈত্রেয়-ব্যাস সংবাদে দান ধর্মের প্রাধান্য, সৎপাত্রে দানের প্রশংসা ও বিদ্যাদানের বৈশিষ্ট্য নানা উদাহরণে অপূর্ব ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অংশটি ভীষ্মমুখে আলোচিত হলেও ব্যাসকে এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

আশ্বমেধিক পর্বের প্রথম দিকে ভীষ্মের দেহত্যাগে শোকসন্তপ্ত যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব সান্ত্বনা দিয়েছেন— কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করতে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে বলেছেন এবং যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কীভাবে সংগ্রহ করবেন মরুত্তরাজের যজ্ঞবৃত্তান্ত বলে তার উপায় নির্দেশ করেছেন। স্নেহময় অভিভাবক তথা যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে ব্যাসের এই মূল্যবান উপদেশে উদ্বুদ্ধ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত হন এবং যথাযথ ব্যবস্থা করেন। ৬২ অধ্যায়ে বাসুদেব মুখে অভিমন্যু হত্যার পূর্ণ বিবরণ জেনে শোকসন্তপ্ত অর্জুনকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দেন ব্যাসদেব। তারপর অর্জুন সুস্থচিত্ত হলে পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের আদেশ দিয়ে সেখান থেকে চলে যান। পরীক্ষিতের জন্মের কিছু পরে হস্তিনাপুরে এলেন ব্যাসদেব এবং যুধিষ্ঠির তখন তাঁকে যজ্ঞে দীক্ষিত করার জন্য ব্যাসদেবকে অনুরোধ করেন। আবার তৃতীয় দিবসে ব্যাসদেব এসে বললেন, যজ্ঞের উপযুক্ত সময় শুরু হয়েছে। তারপর তিনি যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করলেন।

মাত্র ৩৯ অধ্যায়ে সমাপ্ত আশ্রমবাসিক পর্বে ধৃতরাষ্ট্র যখন তপস্যার জন্য বনবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁকে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করলেন। সেই সময় এলেন ব্যাসদেব। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের বনবাসের ইচ্ছা সমর্থন করে যুধিষ্ঠিরকে সম্মতি দিতে বলে সেখান থেকে চলে গেলেন। সেখানেই শেষ নয়, তিনি পরে বনবাসে ধৃতরাষ্ট্রকে আরণ্যক দীক্ষা দিলেন এবং মহামতি শতরূপের আশ্রমে তপস্যার মধ্যে বাস করার ব্যবস্থা করলেন। এই বনবাসকালে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে গঙ্গাতীরে একদিন দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিলেন তাঁর পুত্রদের দেখার জন্য এবং কুন্তিকে দিয়েছিলেন কর্ণকে দেখার জন্য। এই সময় জনমেজয়কে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিলেন তাঁর পিতা পরীক্ষিতকে দেখার জন্য।

স্বল্পায়তন মৌষল পর্বের একেবারে শেষে ব্যাসদেবকে প্রত্যক্ষ করি। তখন যদু বংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। যদুকুলকামিনীদের রক্ষা করতে অক্ষম তখন মহাবীর গাণ্ডীবধারী অর্জুন। সেই সংকট মুহূর্তে ব্যাসদেবের আশ্রমে অর্জুনের প্রশ্নে ব্যাসদেব বললেন অর্জুন, তোমরা দেবকার্য করার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলে। পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের পাশে ছিলেন। তিনি চলে যাওয়ায় তোমাদের অস্ত্রাদিও যথাস্থানে চলে গেছে। অতএব, তোমরা এ স্থান ত্যাগ করে স্বর্গে চলে যাওয়ার উদ্যোগ কর।

মহাভারতে মহাত্মা ব্যাসদেবের এই শেষ উপদেশ। এরপর অতিক্ষুদ্র শেষ দুটি পর্বে— মহাপ্রস্থানিক পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্বে আর মহর্ষিকে দেখা যায় না। আর তাঁর প্রয়োজনও নেই। কুরু-পাণ্ডবদের যথাযথ নিয়ন্ত্রণে তাঁর শেষ চেষ্টার মধ্যে তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ব শেষ হল। অথচ মহামুনি তাঁর দিব্যদৃষ্টি ও অনুভূতি দিয়ে শেষ পর্বদুটির যে বর্ণনা দিলেন, তা জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনার মতো প্রাণবন্ত ও স্পষ্ট। এই

মৌষলপর্বেই শেষ ব্যাসদেবের জীবন কথা।

ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রজাপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা অদিতি থেকে বংশানুক্রমে বিবস্বান (সূর্য), মনু, ইলা, পুরুরবা, আয়ু, নহুষ ও যযাতির জন্ম হয়। যযাতির পুত্র পুরু। পুরুর বংশে জন্মান দুষ্মন্ত। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত, যাঁর নামে এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। ভরতের বংশে জন্মেছিলেন রাজা হস্তী, যিনি হস্তিনাপুর নগর স্থাপন করেছিলেন। হস্তীর চারপুরুষ পরে কুরু রাজা হন। তাঁর নাম অনুসারে কুরুজাঙাল দেশ খ্যাত হয়। তিনি যেখানে তপস্যা করেছিলেন, সেই স্থানই পবিত্র কুরুক্ষেত্র। কুরুর অধস্তন সপ্তম পুরুষের নাম প্রতীপ, প্রতীপের পুত্র শান্তনু। রাজা প্রতীপ পর্যন্ত মহাভারতের যে সামান্য অংশ, তার সঙ্গে ব্যাসদেবের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। সেটুকু তাঁর কাছে ইতিহাসমাত্র এবং সে অংশটুকু রচনার মধ্যেই তিনি যথার্থ সত্যান্বেষী ঐতিহাসিকের মতো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন।

শান্তনু থেকে যদি ভারত কাহিনীর যথার্থ সূচনা ধরা যায়, তাহলে রচয়িতা ব্যাসদেব স্বয়ং সেই কাহিনীর সমসাময়িক এক চরিত্র। শান্তনুর দ্বিতীয় পত্নী ব্যাসমাতা ধীবরকন্যা সত্যবতী। শান্তনুপুত্র ভীষ্ম ব্যাসের অগ্রজ হলেও তাঁর অন্য দুই পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য ব্যাসের অনুজ ও সহোদর। শান্তনু থেকে জনমেজয় পর্যন্ত সাত পুরুষের উত্থান-পতনের কাহিনী ব্যাসদেবের স্পষ্ট বা বলা যায় প্রত্যক্ষ ধারণার মধ্যে। সত্যবতীর জীবদ্দশা থেকে জনমেজয় পর্যন্ত সকল ভরতবংশীয়দের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ব্যাসদেবের আবির্ভাব ও যথাযথ পথনির্দেশ।

ব্যাসদেব তাঁর নিজের কথা নিজে বলে গেছেন। বাসুদেব বা কোনও মুনিকে স্মরণ করলে সঙ্কট কালে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু ব্যতিক্রম মহাযোগী ব্যাস। মাত্র একবার সত্যবতী তাঁকে ডেকেছিলেন সঙ্কটে পড়ে। অন্য ক্ষেত্রে বা সময়ে তিনি বিনা আহ্বানে অযাচিতভাবে কুরু-পাণ্ডবের সঙ্কটকালে এসেছেন। সকলের প্রতি স্নেহময় এই সর্বজ্ঞ মহাযোগী যথাসময়ে নিজে উপস্থিত হয়ে সঙ্কটমুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর মতো এত দীর্ঘ সময়ও মানুষের সেবায় কেউ বেঁচে ছিলেন না।

অন্যদিকে ভারত কাহিনীতে আছে ব্যাসের পিতা পরাশর, তাঁর নিজের জীবন ও সাধনার কাহিনী, সেই সঙ্গে তাঁর জন্মসিদ্ধ পুত্র শুকদেবের জন্ম থেকে ব্রহ্মে লীন হওয়া পর্যন্ত কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা। তাই যদি বলা যায়, মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব তথা তৎকালের কাহিনী কেবল ইতিহাস নয়, মহাভারত সূক্ষ্মভাবে ব্যাসদেবেরই আত্মজীবনী, তাহলে বড় ধরনের অত্যুক্তি হয় কি?

ঋণ স্বীকার ঃ— *(১) মহর্ষি কৃষ(দ্বৈপায়ন বিরচিত মহাভারতের অনুবাদ — কালীপ্রসন্ন সিংহ (সা(রতা প্রকাশন)। (২) কৃষ(দ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারতের সারানুবাদ - রাজশেখর বসু (এম সি সরকার), ১০ম মুদ্রণ। (৩) ঐতিহ্যের স্বরূপসন্ধানে - একটি আধ্যাত্মিক অন্বেষণ - শীতাংশু চট্টোপাধ্যায় (নচিকেতা প্রকাশন)।*

উপন্যাস

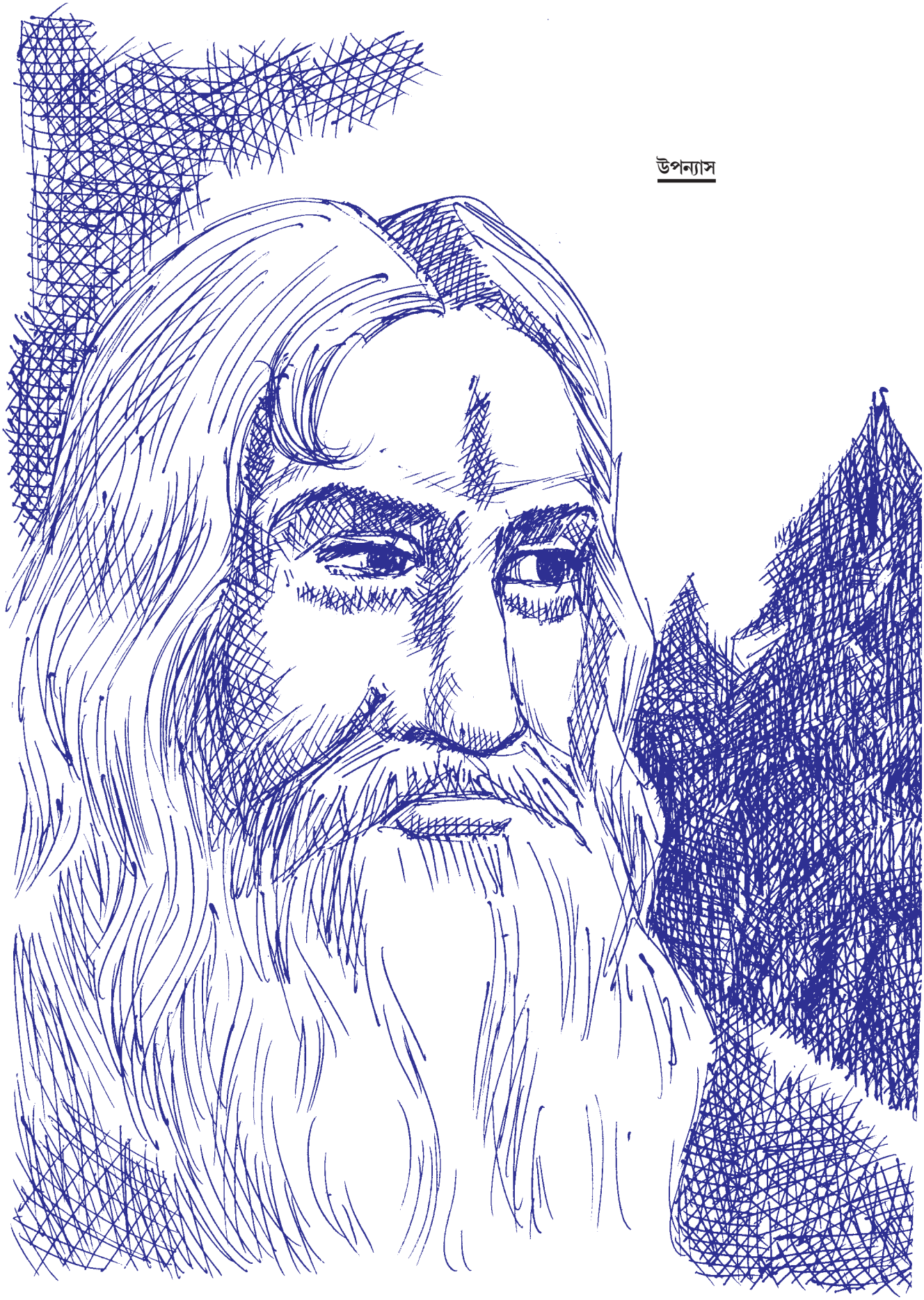

এই সময়

কণা বসু মিশ্র

মুক্তানন্দজীর সঙ্গে হয়ত দেখা হবে না এবারও। কলকাতা থেকে ভোরের উড়ানে দিল্লী পৌঁছেই ট্যাক্সি ভাড়া করে সোজা হৃষীকেশ-এ চলে এসেছে সীমান্তিনী। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, বিকেল থেকে সন্ধে, ও আশ্রমের গেট পেরিয়ে দোতলায় যাবার হুকুম পেল না। যতবারই চেষ্টা করছে, স্বেচ্ছাসেবকরা বাধা দিচ্ছে দু-হাত ঠেকিয়ে। বলছে, উনি এখন ব্যস্ত আছেন।

খাওয়া-দাওয়া হয়নি। ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা হয়েছে সীমান্তিনীর। বেশ কয়েকবার কফি খেয়েছে। গঙ্গার ঘাটের কাছেই সারি সারি ফলের দোকান। ফলের রসও পাওয়া যায়। কিন্তু ওর কোনও ইচ্ছেই নেই।

খরস্রোতা গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। সামান্য কুয়াশার পলেস্তারা। সন্ধের কালো পর্দা নেমে আসছে। সামনেই হিমালয়। বিশাল গম্ভীর রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পাথরের গায়ে গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে গঙ্গার টুকরো টুকরো ঢেউ। সেই পবিত্র গঙ্গা। মহাদেবের জটা থেকে যে নেমে এসেছে। সীমান্তিনী পা ডুবিয়ে বসে রয়েছে একটা বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর। জলের নীচে যেন কারেন্ট বয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডায় কন্‌কন্ করছে পা দুটো। তবু সীমান্তিনী ওসব আর পাত্তা দেয় না। ভালবাসার দুনিয়ার ওপরে ওর এখন ঘেন্না। নিজের শরীর, মন, সব সব...। সীমান্তিনী আর বাঁচতে চায় না।

আশ্রমের দিকে মুখ করে সটান তাকিয়ে আছে সীমান্তিনী। মুক্তানন্দজীর ওপরে ওঁর কেমন যেন অভিমান হচ্ছে। যিনি বলেন, আমি সবসময় তোমার সঙ্গে রয়েছি। তোমার সব দুঃখ আমার ঝুলিতে দিয়ে তুমি হাসিমুখে ফিরে যাও। তিনি তো সীমান্তিনীকে আর টানছেন না। তাঁর ইচ্ছে হলেই তো ও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবে। মুক্তানন্দজীকে ও একবারই দেখেছিল দুতলার বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে।

উনি সবসময় মিটিং-এ ব্যস্ত। সারা দেশ, বিদেশের মানুষের সঙ্গে ওঁর দফায় দফায় মিটিং। যে দেশে যা কিছু গোলমাল উনি সেখানেই ছুটে যান। এই তো সেদিন আফগানিস্তান থেকে ঘুরে এলেন। তার আগে পাকিস্তান। জর্জ বুশের সঙ্গে বারবার দেখা করেছেন আমেরিকায়। হিংসে থামাও। ভালবাস। ভালবাসাই তো সেই বীজ, তোমায় শান্তি দিতে পারে। মানুষকে জয় করে নিতে পারে ভালবাসা।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত উনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই ভালবাসার বীজ ছড়াতে। মানুষ বড় কাঁদছে। মুক্তানন্দজী সেই কান্নার মানুষকে দেখতে চান না। উনি বলেন, আমরা আনন্দের সন্তান, আনন্দ থেকে এসেছি, আনন্দেই ফিরে যাব।

সীমান্তিনী টেপরেকর্ডার বাজিয়ে ওঁর কথাগুলো শোনে। টেলিভিশনের পর্দায় ওঁকে দেখে। কিন্তু কাছে যেতে না পারার জন্য একটা প্রচণ্ড দুঃখও ওর মনের মধ্যে জমা হতে থাকে। কতবার সে এসেছে ওঁর কাছে, তবু আসা যেন আর ফুরোয় না। ওঁকে দূর থেকেই দেখতে হয়। অথচ কত লোকই তো কাছে যাচ্ছে। ওঁকে ঘিরে আছে স্বেচ্ছাসেবকরা। সীমান্তিনী শুনেছে, তাঁর কৃপা না হলে নাকি তাঁর কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

ঘন সবুজ গাছপালায় ঢাকা হিমালয়। পবিত্র গঙ্গার কলকল শব্দ। ভোরবেলা ময়ূরের ডাক, সূর্য ওঠার মুহূর্তে মন্দিরে পুজোর ঘন্টা, বাতাসে বৈদিক মন্ত্র, এসবই মনকে অন্যমনস্ক করে সীমান্তিনীর। গত শীতেও ও এসেছিল। হৃষীকেশের ভোরবেলায় ও যখন গঙ্গার পাড়ের দিকে হাঁটছিল, তখন দেখেছিল, মুক্তানন্দজী জগিং করতে বেরিয়েছেন। তাঁর মুখে শিশুর মতো হাসি। তিনি ছুটছেন। পরণে ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবী। পায়ে রবারের চপ্পল। ধুতিটা লুঙ্গির মতো করে পরা। তাঁর প্রাতঃভ্রমণে অনেকেই সঙ্গী হয়। কিন্তু দৌড়ের রেসে সবাই হেরে যায়। উনি লছমনঝোলা অবদি ছুটতে থাকেন। মাইল দুয়েক ছোটার পর আবার ফিরে আসেন গঙ্গার পাড়ের আরেকটিদিকে ওঁর কুটীরে।

সীমান্তিনী অপলকে দেখে। দাঁড়িয়ে থাকে দু-পাশে ভিড় করা সারিবদ্ধ মানুষের ভীড়ে। মুক্তানন্দজী কোত্থেকে যে এত শক্তি পান, সীমান্তিনী আরও অনেকের মতোই ভাবে। এনার্জি কি ধার দেওয়া যায়? যোগা, ব্যায়াম, ধ্যানের মধ্যে দিয়ে সারা পৃথিবীকে উনি সেই এনার্জিই দিয়ে চলেছেন। তার বদলে উনি চাইছেন এক টুকরো হাসি।

আকাশে থালার মতো চাঁদ উঠেছে। সামনেই দোল পূর্ণিমা। সীমান্তিনী ছিটের মতো তারার আকাশের দিকে তাকিয়ে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে চাঁদ। মন্দিরে আরতির ঘন্টা বাজছে। শাঁখ বাজছে। পঞ্চ প্রদীপের আলোয় আরতি করছেন পুরোহিত। সেই আগুন ছুঁয়ে নিজের মাথায় দেবার জন্য সবাই ব্যস্ত। কিন্তু সেই ব্যস্ততার কোনও ইচ্ছেই নেই সীমান্তিনীর। প্রদীপের আগুন মাথায় ছোঁয়ালেই কি আর না ছোঁয়ালেই কি? সৈকতকে ও তো ফিরে পাবে না!

সৈকতকে ও ভালবেসেছিল। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে দুজনেই একসঙ্গে পড়ত। এম বি এ করেছিল ওখান থেকে। যথেষ্ট মেলামেশাও হয়েছিল দুজনের। একজন আরেক জনকে জানত চিনত। কিন্তু কেউ কি কাউকে চিনতে পারে? সৈকত ওকে চিনেও চেনেনি। যেমন সৈকতকে চেনেনি সীমান্তিনী। নিজেকে ওর কাছে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েও পায়নি ওকে। সীমান্তিনীর বুক যন্ত্রণায় ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে। তবু সৈকতের তীর ছোঁড়ার শেষ নেই। ওকে কাঁদানোটাই যেন ওর অহঙ্কার। নিজেকে খুব উঁচু মাপের মানুষ করে রেখেছে

সৈকত। আর সীমান্তিনী ক্রমেই ওর কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছে। তবু ও সৈকতের জন্যই ছুটছে। কান্নার পুরু সর জমতে জমতে ওর বুকের মধ্যে যেন গ্র্যানাইট পাথর হয়ে গেছে। সেই পাথরটাকে ভাঙতে পারছে না সীমান্তিনী। ওর বুকের ভেতর চাপ চাপ যন্ত্রণা। সৈকতের অপমান কিছুতেই মুছতে পারছে না। তবু কেন ভালবাসার কাঙাল মন সৈকতের জন্য পাগল? ও বার বার ওর কাছে ছুটে যাচ্ছে। সৈকত পাত্তাই দিচ্ছে না। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলেছে— তোমার ওই ন্যাকামী আমার কাছে বড্ড পুরনো। এক মুখ ভাল লাগে না বেশিদিন।

— একদিন তো আমায় ভালবেসেছিলে?

— একদিন বেসেছিলাম বলেই যে চিরদিন বাসব, তার কোনও মানে নেই। মানুষের মন তো বদলায়।

— কিন্তু আমি তো বদলাইনি।

— তুমি তো স্ট্যাগন্যান্ট ওয়াটার। বদ্ধ জালাশয়। একই জায়গায় পাক খাচ্ছ।

— তুমি ভুল করছ, সিনসিয়ারিটি বলে কি কিছু নেই?

— সো হোয়াট? তাতে আমার কি? আমি তো আলাদা ব্যক্তিত্ব।

পৃথিবীর ভূগোল পাল্টে যাচ্ছে। পাল্টে যাচ্ছে মানুষের মন। এক জায়গায় শেকড় গেড়ে বসে নেই কেউ। আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষ বদলে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে প্রতিটি অর্গান। মুক্তানন্দজী বলেন, বন্ধন মুক্ত হতে। এই বদলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে। সীমান্তিনী ওঁর নানা বক্তৃতায়, আলোচনায় কতবারই তো এসব শুনেছে। কিন্তু কেন পারছে না মায়া, মোহ থেকে সরে যেতে! ওর ইচ্ছে করে মুক্তানন্দজীর কাছে মন খুলে সব কথা বলতে। একলা ওঁকে একটু পেতে। কিন্তু ও কতটুকু বলবে? কি বলবে? নিজের আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার কথা? পৃথিবীর কত বড় বড় সমস্যা নিয়ে যিনি ব্যস্ত, কমনওয়েলথ সম্মেলন থেকে শুরু করে কোথায় উনি নেই? তাঁকে বলবে নিজের কথা? উনি যে বলেন, জীবন মানে পজেটিভ থিংকিং। ইতিবাচক। নেগেটিভ, নেতিবাচক নয়। পরের সেবার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দাও। কাজ কর, কাজ কর। কর্মই তো উপাসনা। পরের দুঃখের দিকে তাকাও। তখন দেখবে, নিজের কথা ভুলে যাবে।

কিন্তু সীমান্তিনী তো নিজের কথা ভুলতে চায় না। তাহলে তো নিজেকেই অস্বীকার করা।

মুক্তানন্দজীর কাছে ও তারও উত্তর খুঁজে পেয়েছে। উনি বলেছেন, আজ পর্যন্ত যা কিছুই তোমার জীবনে হয়েছে, তা সবই স্বপ্ন বলে ধরে নিতে পার। রাগ, দুঃখ, অভিমান, অপমান। ভগবানের কাছে এসব কৌতুক। তিনি দেখছেন, সবাই কি রকম খেলছে। যা কিছুই তোমরা করছ, সবই খেলা। এ জীবনের অনিশ্চয়তাটাই হল সত্যি। মানুষকে সজাগ করার জন্য প্রকৃতি মাঝে মাঝে একটু খোঁচা দেয়। এতে জীবন একটু সরল হয়ে ওঠে। এটাকে হাসিমুখে মেনে নিতে হয়।

সন্ধের আরতি শেষ হল। রাতের খাবারের লাইন পড়ে গেছে। এরপর ভজন। গঙ্গার পাড় খালি হয়ে গেছে। আর একজনও বসে নেই। সীমান্তিনী হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় সময় দেখল। ঘড়ির রেডিয়ামের কাঁটাটা জ্বলজ্বল করছিল সন্ধে সাতটার ঘরে। সীমান্তিনী আস্তে আস্তে নেমে এল পাথর থেকে।

তারপর আশ্রমের ডাইনিং হলে গিয়ে দাঁড়াল। সাড়ে ছ'টা থেকেই খাবারের লাইন পড়ে গেছে। হাজার হাজার লোক খাচ্ছে। স্টীলের থালায়। সেবার কাজে পরিবেশনে রয়েছেন অনেকে। আবার অনেকে বাসন ধোওয়ার কাজে। রান্নাঘর পরিষ্কার করা, সব্জি কেটে দেওয়া, সেবার কি শেষ আছে? মুক্তানন্দজীর ইচ্ছেতেই এই সেবার কাজ চলছে। প্রতিটি কাজকেই ভালবেসে করতে হবে। যদি কোনও কাজে প্রেম না থাকে, তবে সে কাজ অর্থহীন। পরম প্রেম হল যোগের লক্ষণ।

মুক্তানন্দজী নিজেই মাঝে মাঝে এসে ঘুরে যান, এই ডাইনিং হলে। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতার দিকেও ওঁর দৃষ্টি। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই তো শৃঙ্খলাবোধ থাকবে। এই শৃঙ্খলাবোধের দায়িত্ব অথবা ডিসিপ্লিন সমাজের প্রতিটি জায়গায় যেমন, তেমন প্রতিটি কাজের মধ্যেও।

খাবার লাইনে দাঁড়িয়ে একটু বৃষ্টিতে ভিজতে হল। হঠাৎ কোত্থেকে একরাশ কালো মেঘ এসে হাজির। সীমান্তিনীর মাথায় কোনও ছাতা নেই। ও বৃষ্টিভেজা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, থালার মতো বড় চাঁদটা মেঘে ঢেকে গেছে। একটু একটু শীতও করছে। কিন্তু বৃষ্টিটাও বেশ মন্দ লাগছে না। মাথাটা হাল্কা হওয়া দরকার। সীমান্তিনী আরামে চোখ বুজল। তারপর চোখ খুলে তাকিয়ে দেখল, বাগানের গাছপালার সবুজ রঙ লাইটের আলোতে। টপ্‌টপ্ করে জল পড়ছে গাছের পাতা থেকে।

ডাইনিং হলে সারি সারি জল চৌকি পাতা তার পেছনে একটা করে আসন। আসনে বসে খাবারের স্টিলের থালাটা জলচৌকির ওপর রেখে রাতের খাওয়া খেল সীমান্তিনী। ইডলি আর সম্বর। একটু টক দই। ওর ক্ষিধে পেয়েছিল খুব। খেয়ে বেশ তৃপ্তি লাগল। খাওয়া শেষ হলে ও বাসন ধোওয়ার লাইনে গিয়ে দাঁড়াল বাইরে। সেবার কাজের জন্য। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেও সবাই সেবার কাজ করছে। কারও মাথায় ওড়নার ঘোমটা, কারও মাথায় শাড়ির ঘোমটা, কেউ বা কাঁধের ওপর একটা ছাতা রেখেছে।

আশ্রমে এলেই আশ্চর্য একটা শান্তি। এর থেকেও বড় আশ্রম ব্যাঙ্গালোরে। সেখানে সাতটা পাহাড় জুড়ে বিশাল আশ্রম। রুক্ষ পাথরের পাশে পাশে অসংখ্য গাছ গাছালি। মাঝে মাঝে ফুলের বেড়। সেখানেও লম্বা কিচেনে লাইন দিয়ে খাওয়ার পালা। নিজের নিজের থালা নিজেকেই ধুতে হয়। সেবার বৈচিত্র্য ওই একই পদ্ধতিতে। পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গা সেখানে আশ্রমকে ঘিরে রয়েছে, পরিষ্কার করার দায়িত্ব তো ভক্তদেরই। এখানে দীক্ষা কর্মযজ্ঞেও। শরীর মন ভাল রেখে সুস্থ চিন্তা। পৃথিবীর সবাইকে আপন করা নেওয়ার পালা। জীব, জন্তু, লতাপাতা, গাছগাছালি সবই তো আপন। ঈশ্বর সবাইকে ঘিরে রেখেছেন। জগৎ ব্রহ্মময়। পাহাড়ের গায়ে লোহার স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে মাঝে মাঝে চটের ব্যাগ ঝোলানো। যার গায়ে লেখা, তোমার একটু খাবারও নষ্ট কর না। পশুপাখীর জন্য দিয়ে দাও। এই জীবজগতের আহারের ব্যবস্থা, তোমার জন্য যিনি করেছেন, তাদের জন্যও তিনি করেছেন। সবাই সেই একই ব্রহ্মের সন্তান। ভালবাসা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। তুমি সবাইকে আপন ভাব। সবার কাছে থেকে প্রেম কুড়িয়ে নাও।

মুক্তানন্দজীর আশ্রম পৃথিবীর প্রতিটি দেশে রয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, আফ্রিকা, এশিয়া মহাদেশের কোথায় নেই? পাঁচটি

মহাদেশই ওঁর আপনজন। নিজের আপনজনেদেরই পৃথিবীর সব মানুষের আপজন করিয়ে নিয়েছেন। কেউ পর নয়। সবাই তোমার। এই তো আমাদের ভারতবর্ষের জীবন দর্শন। মানুষর হৃদয়ের সম্পর্ক কখনও এক দেশের মধ্যে আটকে থাকে না। মুক্তানন্দজী মানুষের গায়ে মানুষের স্ট্যাম্প মেরেছেন। প্রতিটি মানুষই তো পরমব্রহ্মের অংশ। নিজেকে ভালবাস। নিজের মধ্যে পরকে উপলব্ধি কর, তাহলেই আমিত্বের অহঙ্কার তোমার চলে যাবে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাসন ধোওয়া সীমান্তিনীর জীবনে এও তো এক আশ্চর্য ঘটনা। কলকাতার জীবনে ওকে তো কোনওদিন বাসন ধুতে হয়নি। তবে যখন আমেরিকায় ছিল, তখন তো সব কাজই করতে হত। কিন্তু দাম্ভিকতার মেজাজটা ছিল ষোলো আনা। মুক্তানন্দজীর আশ্রমে এসে সেই মেজাজটা যেন বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। যিনি এমন ভালবাসার কারিগর, তাঁর জন্য যেন ও সবই করতে পারে।

ভজনের সময় হল্-এ বসে ওঁকে দূর থেকে দেখল। অপূর্ব হাসি। যিনি হাসি দিয়েই দুনিয়া জয় করেছেন। যিনি বলেন, আমি তোমার সব ভার নেব, শুধু আমায় এক টুকরো হাসি উপহার দাও।

সীমান্তিনী ওঁর হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে সৈকতকে ভুলে যাচ্ছে। অন্তত কিছু সময়। তারপরই মনের ভেতর যন্ত্রণার পোকাগুলো ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ইচ্ছে করছে, সৈকতকে পেতে। ওর সব ভাললাগা, যন্ত্রণা, অবসাদ ওটা ভাগ করে দিতে। অথচ ওতো আর আগের মতো নেই। সেই নেই আর আছের মাঝখানে একটা ঝুলন্ত সেতু। সীমান্তিনী যেন সেই সেতুর মধ্যে ঝুলছে।

মুক্তানন্দজী বলছেন, প্রতিটি আকাঙ্ক্ষাই সৃষ্টি করে জ্বালিয়ে মারতে। এখানে প্রত্যেকেই জ্বলছে। যখন সে নিজের ইচ্ছে, কামনাকে ছাড়তে পারছে না। সেই কামনা, বাসনা, ইচ্ছেকে ত্যাগ করতে হবে। প্রার্থনা করতে হবে ঈশ্বরের কাছে। উনি বলেছেন, যখন আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছে বদলাতে থাকবে, তখন বুঝতে হবে, তুমি সার্থক হয়েছ।

ভজনের পর মুক্তানন্দজী নানা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সামনে ছোট ছোট বেতের বাক্স। যার ইচ্ছে সেই বাক্সে নিজের প্রশ্ন লিখে জমা দিতে পারে। সেক্রেটারি মাইকে প্রশ্নগুলো পড়ে যান। মুক্তানন্দজী উত্তর দিয়ে যান। সীমান্তিনী নিজের প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে যায় আরও অনেকের জিজ্ঞাসার ভেতর দিয়ে।

মুক্তানন্দজীর আলোচনা শেষ হতেই আবার ভজন শুরু হল। উনি নিজেও চোখ বুজে ভজন গাইতে লাগলেন করতালির সঙ্গে। উনি একজন বিরাট মাপের যোগী। ভজনের সময় করতালি দিতে দিতে বলেন, ওতে রক্ত সঞ্চ লন হয় হাতের তালুতে।

মুক্তানন্দজী বললেন, সৎ সঙ্গে যে আনন্দ হয়, তা অনেক উঁচু মার্গের। গান এবং মন্ত্র আত্মার একটি অনুরণন সৃষ্টি করে। ভজন গানে যে ডুবতে পারে, সেই পার হয়ে যায়। সঙ্গীত মস্তিষ্কের পুষ্টিসাধন করে, যা মনের সামঞ্জস্যের জন্য প্রয়োজন। ভজনের সময় চোখ বন্ধ করে গাওয়ার ফলে মনটা এলোমেলো বাতাসের মতো ছুটতে পারে না। জীবনকে আনন্দে, নাচে, গানে ভরিয়ে দাও।

সীমান্তিনী ভজনের সুরে একাত্ম হয়ে যাচ্ছিল। যে ভজনে শিব, কালী, দুর্গা, যীশু, আল্লা সবাই রয়েছেন। সব ধর্মের কি আশ্চর্য মিলন!

সীমান্তিনীর আশ্রমের অতিথিশালায় ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা বেজে গেল। একটা ঘরে চারটে তক্তপোষে চারজন। সুন্দর অভিজ্ঞতা।

কিন্তু ওর যে ঘুম আসছে না। ও দোতলার ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। বৃষ্টিভেজা আকাশের পর আবার চাঁদের আলো। সৈকতের মুখ একবার করে ওর মনের মধ্যে আসছে। আবার ফিরে ফিরে যাচ্ছে। ওর মনে পড়ছে, ক্যালিফোর্নিয়ার দিনগুলো। ঘন্টার পর ঘন্টা ফ্রি ওয়ে দিয়ে গাড়ি চালানোর কথা। সারারাত ড্রাইভ করে ছোটা। প্রশান্ত মহাসাগরের পাড় দিয়ে পাহাড়ের উপত্যকা মাইলকে মাইল রাস্তা পেরিয়ে সানফ্রানসিসকো পৌঁছানো। সেই গোল্ডেন ব্রিজ, সেই আলকাজার আইল্যাণ্ড...। ওরা তো ছিল দারুণ বন্ধু। কোথায় যে কি ঘটে গেল। সৈকত বেলুনের মতো উড়িয়ে দিল সব প্রেম। তাহলে কি ওর সবটাই ছিল মোহ?

কিন্তু সৈকত যে বলেছিল, বিয়ে করবে। দুজনে একসঙ্গে জীবন কাটাবে। কথাগুলো নেহাৎই ফাঁপা!

পরমূহূর্তেই ওর মনে হল, মানুষের সারা জীবনটাই যেন প্রেম। ছোটবেলায় খেলনার মধ্যে প্রেম খোঁজা। খেলার মধ্যে খোঁজা। আবার সেই প্রেমকেই বন্ধুদের মধ্যে খোঁজা। যৌবনে যা বদলে যায় সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে। যে প্রেমে থাকে কাম, চাহিদা। তাই এত দুঃখ। কিন্তু প্রেম ছাড়া কি জীবন চলে? প্রেমে পড়া তো মানুষের স্বভাব। কিন্তু প্রতিটি মানুষই তো দ্বীপের মতো আলাদা। কেউ তো কাউকে বদলাতে পারে না। ওর সঙ্গে তো সৈকতের প্রকৃতির অনেক কিছুই মিলত না। সৈকতের মধ্যে ছিল ভীষণ উচ্ছ্বাস, যা ওর মধ্যে ছিল না। সে যেন সব সময় ছিল বর্ষার ভরা নদী। সীমান্তিনীর মধ্যে ছিল স্থিরতা, গভীরতা।

সীমান্তিনীর ভাবতে ভাবতে মনে হল, পাঁচ বছর আগে তো ও সৈকতকে চিনত না। জীবনের অনেক আসা, যাওয়া অনেক ঘটনার ভেতর এটাও একটা ঘটনা। সৈকত নামের এক যুবক যে ওর জীবনে স্রোতের মতো এসেছিল। তারপর আরেক ঢেউয়ে সরে গেছে। ফেলে গেছে খানিকটা পলি। তাতে কি? সেই পলিও সরে যাবে আস্তে আস্তে আরও কত ঢেউয়ে।

সীমান্তিনী ভাবল, ও প্রেমকে ছড়িয়ে দেবে সবার মধ্যে। ব্যক্তিপ্রেমকে বিশ্বপ্রেম করে দেবে। কিন্তু সে তো সহজ কথা নয়।

মুক্তানন্দজী ক্রমেই ওকে সেই পথেই যেন টেনে নিতে চাইছেন। উনি বলেছেন, প্রেমকে ধরে রাখ। কিন্তু মোহ থেকে মুক্ত হও। বিশালতার ছোঁওয়া পেলে, ওই মোহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। দুঃখটাই তো সুখ হবে। তুমি তো নিজের কামনা, বাসনা আত্মসুখের জন্য জন্মাওনি।

কথাগুলো ওর মাথার ভেতরে অনবরত ঘুরতে লাগল। ভেজা আকাশের দিকে তাকিয়ে ওর হঠাৎ কান্না পেল। সে কান্না সৈকতের জন্য নয়। ওর নিজের জন্য। ওর মনে হল, এতগুলো বছর ও কি সত্যি ভুল করেছিল? ভুল মানুষকে চিনেছিল? সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ওকে করতে হচ্ছে আজ। ভুল ভুল ভুল। সবটাই কি ভুল? প্রেম বলে কি দুনিয়ায় কিছুই নেই? ভালবাসা শব্দটা শুধুই কি প্রহসন? কিন্তু সংসারে প্রেম আছে বলেই তো মানুষ তার হৃদয়ের সীমানাকে বিস্তৃত করতে পারে। প্রেমিক না হলে বেঁচে থাকাটাই তো অর্থহীন। প্রেম নিজের জন্য। প্রেম পরের

জন্য। নিজেকেই নানা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আস্বাদনই তো প্রেম। আর পরের মধ্যে নিজেকে খোঁজা। প্রেম না থাকলে মানুষ নিষ্ঠুর হবে। আজকাল খবরের কাগজের পাতা খুললেই তো সেই দৃশ্যগুলো দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের ভেতর থেকে প্রেম চলে যাচ্ছে, তাই এত খুন-খারাপী। সন্তান মা, বাবাকে খুন করছে। মা, বাবা-সন্তানকে খুন করছে। ভালবাসার পায়রা উড়িয়ে দিয়ে মানুষ প্রেমিকার গলায় ছুরি বসাচ্ছে। প্রেমিকা প্রেমিকের গলায়, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। এটাই নাকি কলি যুগের লক্ষণ। কিন্তু সীমান্তিনী তো কিছুই জানে না। কিসের কলি? কিসের সত্যযুগ? ও শুধু জানে, এই মূহূর্তের বর্তমানকে।

মুক্তানন্দজী সেই কথাই বারবার বুঝিয়ে চলেছেন।

— বর্তমানকে সুন্দর কর। তাহলেই ভবিষ্যত সুন্দর হবে। অতীত নিয়ে মাথা ঘামিও না।

ভালবাসার শেকল আঁকড়ে থেকো না। নদীর স্রোতের মতো ভালবাসাকে ভাসিয়ে দাও এক থেকে অন্যের মধ্যে। এক দেশ থেকে অন্য জায়গায়। ছড়িয়ে দাও নিজেকে সারা বিশ্বে। অন্তরে ডুব দাও। দেখবে সবাই এক। খোঁজো, খোঁজো। খোঁজার শেষ নেই। নিজের মধ্যে পরকে দেখবে, পরের মধ্যে নিজেকে। তাহলেই আর দুঃখ বলে কিছু থাকবে না।

সীমান্তিনীর ইচ্ছে করছে, সৈকত যদি এই কথাগুলো শুনত! ও যে এসব বিশ্বাসই করে না। জৈবিক ক্ষিধে ছাড়া প্রেম ও ভাবতেই পারে না। আজকাল সে লিভ টুগেদার করছে কখনও কোনও মার্কিন মেয়ের সঙ্গে, কখনও ইতালীয়ান, চাইনীজ...। সৈকত বিশ্বাস করে ভাল লাগা, প্রেম এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার পাঁচ যার কাছে ইচ্ছে যেতে পারে। কিন্তু সে প্রেম স্বর্গীয়, পার্থিব কখনোই নয়। ওসব বাজে ধোকার টাটি হতে যাবে কেন? মানুষ মানুষকে চায়, রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে।

সৈকত খুব ভাল ছাত্র। স্কলার হিসেবে বিদেশে ওর সুনাম আছে। কিন্তু নিজেকে ইচ্ছের পুতুল হিসেবে বাজে নেশার কাছে বিলিয়ে দিয়েছে।

ব্যালকনির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে বাতাসের ঝাপ্‌টা খেতে খেতে সীমান্তিনী ভাবছিল, কেউ তো কাউকে পাল্টাতে পারে না। কেউ কি কাউকে চিনতেই পারে! চারদিকে অসংখ্য চেনা মুখের মিছিল ঘিরে থাকে, কিন্তু কার মনে কি ভাবনা চলছে কে জানে! মানুষের মনের ছবি তোলার জন্য তো কোনও ক্যামেরা নেই। ও কি সৈকতকে আগে চিনতে পেরেছিল?

সীমান্তিনীর মনে হল, ও কি হারাল? ও সৈকতকে পেল না ঘর বাঁধবার সঙ্গী হিসেবে। অথবা স্বামী, স্ত্রী হিসেবে বন্ধুর মতো সংসার, তাও হল না। নাইবা হল। হলে তো সীমাবদ্ধ তার যন্ত্রণায় ভুগতে হত। মাঝদরিয়ায় টেনে নিয়ে সৈকত ওকে ডুবিয়ে মারত। তার চেয়ে এই তো ভাল। আমি কে? অথবা কেউ না, এই জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজা। নিজেকে সবার জন্য বিলিয়ে দেওয়া। ও সেবার কাজ করে যাবে। ওর প্রয়োজন নেই। দাঁড়ের দুটি ময়নার মতো এক খাঁচায় থাকা।

রাত একটা বাজে। দূরে হিমালয় দেখা যাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে ওই বিশাল গম্ভীরের দিকে তাকিয়ে নিজেকে ওর খুব ছোট্ট মনে হল। সৈকত মাউন্টেনিয়ারিঙ কোর্স করেছিল একসময় দার্জিলিংয়ে। মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে। ওর খুব ইচ্ছে ছিল এভারেস্ট-এ যাবে। তেনজিং নোরকে এডমণ্ড হিলারীর পর কতজন গেল পৃথিবীর ওই সর্বোচ্চ শৃঙ্গে। কিন্তু সৈকতের আর যাওয়া হল না। ওর ইচ্ছের চাকাটাই ঘুরে গেল অন্যদিকে।

সীমান্তিনী যতই চেষ্টা করছে, সৈকতের ওপর থেকে ওর মনের রাশটাকে টেনে নিতে, ততই ওর কথা মনে পড়ছে। ও ভাবছে, মানুষ তো কিছু সংস্কার নিয়ে জন্মায়। প্রারব্ধের কর্মফলে মানুষের ভোগান্তি মুক্তানন্দজী বলেন। আসলে এই ধাক্কাটা ছিল ওর কপালের নোটিশ। নইলে কি ওর কোনও চক্ষু খুলত? মুক্তানন্দজীর কাছেও হয়ত পৌঁছানো হত না তার।

কাল থেকে যোগ ব্যায়ামের ক্লাস শুরু। নিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে নিজেকে রোগমুক্ত করার এক আশ্চর্য পদ্ধতি। শ্বাসের মধ্যে দিয়ে ফুসফুসের বাতাস পরিষ্কার করা। মাথা পরিষ্কার করা। নানা ভাবনা, চিন্তা, উদ্বিগ্নতার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে মাথায় বিষক্রিয়া তৈরি হয়। এই শ্বাসের আশ্চর্য কৌশলে সেই বিষ বেরিয়ে যায়। গুরুদেব টানা কিছুদিন নির্জন পাহাড়ে যোগ সাধনায় ছিলেন মৌন অবস্থায়। হঠাৎ একদিন ধ্যানের মধ্যে দিয়ে পেলেন শ্বাসের এই বিচিত্র পথ। প্রথমে উনি পাহাড়ের গরীব মানুষের সেবার কাজে লেগে গেলেন। এই নিঃশ্বাসের ব্যায়াম শিখিয়ে দেখলেন, কঠিন রোগ সব ভাল হয়ে যাচ্ছে।

এই রোগমুক্ত মানুষই তো পারে সেবার কাজে এগিয়ে যেতে। মুক্তানন্দজী তারপর শহরে, গ্রামে, নানা জায়গায় নানা মানুষকে এই যোগ শেখাতে লাগলেন। উনি বুঝতে পারলেন, একা এই কর্মযজ্ঞে ছোটা সম্ভব নয়। শিক্ষক, শিক্ষিকা তৈরি হতে লাগল। অসংখ্য শিবির। সারা ভারতবর্ষ থেকে মুক্তানন্দজীর এই যোগ শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ল সারা দুনিয়ায়। সুস্থ শরীর, মনের অধিকারী হবে মানুষ। সে আনন্দে থাকবে। মুখের হাসিটি বজায় রেখে। সারা পৃথিবীতে উনি শুধু ছুটছেন। মানুষকে বুঝিয়ে চলেছেন, তার বেঁচে থাকার সার্থকতা, কেন সে এসেছে পৃথিবীতে।

সীমান্তিনী ক্যালিফোর্নিয়া থেকেই শুনেছিল ওঁর নাম। ইচ্ছে ছিল ওখানেই ওঁর কোর্স করবে। কিন্তু হয়নি। ওর সেই মানসিকতাও তো তেমন ছিল না। ও ক'দিনের জন্য কলকাতা গিয়েছিল। মাত্র কুড়ি দিনের ভেতরে কয়েকটি দিন বেছে নিল হৃষীকেশ-এর জন্য। ওর মা নেই। বাবা বলেছিলেন, পরের বার এসেও তো করতে পার। অথবা আমেরিকাতেই! ক'দিনের জন্য এসেছে মা।

বাবার মন খারাপ হচ্ছে। নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় ভোগেন বাবা মা চলে যাবার পর। আয়রণ সাইড রোডের অতবড় ফ্ল্যাটটা খাঁ খাঁ করে। বাবা পুলিশ অফিসার। ব্যস্ততার মধ্যে থাকেন। কিন্তু ফ্ল্যাটে ঢুকলেই স্ত্রীর জন্য বুক ভরা হাহাকার। ওদিকে সীমান্তিনীর বুড়ো ঠামি এখনও বেঁচে। ঠাকুমার বয়স আশি। ফোকলা মাড়ি নেড়ে চোখভরা জল নিয়ে উনিও বলেছিলেন, কেন যাচ্ছিস দিদি?

কিন্তু কেন যে যাচ্ছে, কিসের টানে যাচ্ছে— ও কাউকেই বোঝাতে পারেনি। ঠাকুমা বলেছিলেন, ফিরে এসে যদি আমায় না দেখতে পাস?

সীমান্তিনী একটু হেসে বলেছিল, মাত্র ক'দিনের জন্য তো যাচ্ছি ঠাম্মা, হৃষীকেশ। এরপর যে আবার আমেরিকা ফিরতে হবে।

ঠাকুমা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর কেটে কেটে বললেন, এদেশে কি কিছুই নেই রে দিদি? যে বিদেশেই ছুটতে হবে!

— সে তুমি বুঝবে না ঠাম্মা। ওদেশ আমায় যা দিয়েছে...

ওর কথা কেড়ে নিয়ে ঠাম্মা বললেন, কমফোর্ট?

ফোকলা মাড়িতে কথাগুলো আটকে গেল। তবু বুঝতে পারল সীমান্তিনী। হেসে বলল, বুঝতে পেরেছ দেখছি। জব স্যাটিসফেকসন বলে একটা কথা আছে জানো? মানে চাকরি করে শান্তি। এদেশে কেবল ধর্মঘট। রাজনীতি। অফিসেও ডিপ্লমেসি। মনের মতো জব অর্থাৎ চাকরি নেই।

ঠাম্মা বললেন, এদেশে যে তৈরি ভাত পাও দিদি। বাড়িতে কোনও কাজ করতে হয় না। ওদেশে যে কাজের লোক পাও না তোমরা। নিজের কাজ নিজে করতে হয়। সীমান্তিনী মুচকি হেসে বলল, তা যা বলেছ। কিন্তু তাতেও একটা স্যাটিসফেকসন আছে। কতটা একসারসাইজ হয় বলত? ওদেশে কাজে তো কোনও ঝামেলাও নেই। জামা, প্যান্ট ফেলে দিলুম লন্ড্রী বক্সে। এটো প্লেট ঢুকিয়ে দিলুম ডিস ওয়াশিং মেশিনে। সপ্তাহে একদিন ভ্যাকুয়াম ক্লীনার দিয়ে মেঝের কার্পেটের ধুলো ঝাড়া।

— ওরে দিদি! এসব এখানেও হয়েছে।

— জানি, জানি। কিন্তু তোমাদের পুরনো প্যাটার্নের মানসিকতায় সেসব তো আবার এ বাড়িতে চলবে না।

তাতো বটেই। আমাদের কেষ্ট, লক্ষ্মীরা হাত দিয়ে যা পরিষ্কার করে, তা কি আর মেসিনের মতো হয়? কিন্তু ওসব মেসিন ঘরে ঢুকলে, এদের চাকরিটা তো থাকবে না। ওরা খাবে কি?

সীমান্তিনী শুধু বলেছিল, তাই তো, তাইতো। পরে ওর মনে হয়েছিল, ঠাম্মা ঠিকই বলেছেন। কেষ্ট, লক্ষ্মীরা যে আত্মীয় স্বজনের চেয়ে বেশি আপন। আজকাল কাজের লোকের সমস্যা। সব বাড়িতেই প্রায় লোক বদল হয়। কিন্তু ওদের বাড়িতে তো ওসব পাট নেই। লক্ষ্মী, কেষ্ট এবাড়িতে বরাবরের জন্য পাকা আসন করে নিয়েছে।

এই মধ্যরাতে হৃষীকেশের গেস্ট হাউসের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ওর কত কথাই যে মনে হচ্ছে। সীমান্তিনীর মনে হচ্ছে, মানুষের মনটা যেন নানারঙের প্যাটার্নে তৈরি কোলাজ। সেই কোলাজ থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা হল ধ্যান।

মুক্তানন্দজী নিজের জন্য একটু সময় দিতে বলেছেন। প্রাণায়াম, ধ্যানের ভেতর আত্মকেন্দ্রিক মন। বাইরের ঘটনাবহুল জীবন প্রবাহ থেকে সরে গিয়ে নিজেকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন। জীবন মানে পজেটিভ, অর্থাৎ ইতিবাচক। জীবন মানে নেগেটিভ অর্থাৎ নেতিবাচক নয়। সবই তো অল্প সময়ের বুদ্‌বুদ্‌। কোনও ঘটনাই ছিপ ফেলার মতো বসে থাকার নয়। শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ চেতনাময় জগত থেকে মনকে আস্তে

আস্তে গুটিয়ে নিয়ে নিজের গভীরে ডুব দেওয়া। সে জন্যই সৎসঙ্গ প্রয়োজন। সীমান্তিনী তো সবই জানে। তবু মনকে ঠিক বশে রাখতে পারে না কেন? নিজের আত্মশক্তিতে এবারে বিশ্বাস রাখতে হবে।

কিন্তু বিশ্বাস রাখব বললেই কি বিশ্বাস রাখা যায়? সীমান্তিনীর যে নিজের ওপরে ধিক্কার এসে গিয়েছে। ওর মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে সুস্থভাবে থাকাটা ওর পক্ষে বোধহয় আর সম্ভব নয়। তবু সেই বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচল মন থেকে ও যেন কি খুঁজতে চেষ্টা করছিল। একটা পথ। যে পথ ওকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সাহায্য করবে।

অনেকদিন পর ও ঘুমের ওষুধ ছাড়াই বিছানায় শুয়ে পড়ল। ওর চোখ ভেঙে ঘুম এল।

মোবাইলের অ্যালার্মে ঘুম ভেঙে গেল সীমান্তিনীর। ভোর চারটে। আড়াই ঘন্টার জন্য ঘুমিয়েছিল মাত্র। ও ধড়ফড় করে উঠে বসল বাথরুমের জল পড়ার শব্দে। ওর সঙ্গী তিনজন একে একে বাথরুমে ঢুকল। গেস্ট হাউসে গরম জল দেবার নিয়ম এই চারটেতেই। ছ'টা থেকে কোর্স শুরু হবে। যেতে হবে সেই গঙ্গার কাছের আশ্রমে।

স্নান-টান সেরে সালোয়ার কামিজ বদলে নিল সীমান্তিনী। ঘরের তিনজন রুমমেট বেরিয়ে গেছে। ওর স্নানের পালা ছিল শেষে। ঘড়িতে পাঁচটা বেজে দশ। অতিথিশালায় গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে সীমান্তিনীর বেশ আরাম লাগল। ভোরের টাটকা বাতাস। ও হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার পাড়ের দিকে চলে গেল। হঠাৎ ও দেখতে পেল, মুক্তানন্দজী জগিং করতে করতে সেই একই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর ডাইনে বাঁয়ে রাস্তার দুপাশে মুখের মিছিল। উনি হাসছেন। ওরাও হাসছে। সীমান্তিনীরও খুব ভাল লাগল। ভোরের টাটকা বাতাস মুক্তানন্দজীর হাসি আর দর্শন যেন বাড়তি পাওনা।

কোর্স শুরু হল। যোগব্যায়ামের পর ধ্যান। পার্টনার বেছে নিয়ে যে যার মনের কথা বলতে হবে। সীমান্তিনী সরিতা আগরওয়ালাকে সঙ্গী পেয়ে গেল। দুজনে মুখোমুখি বসল। প্রথম কে মুখ খুলবে! সীমান্তিনী সরিতাকেই বলতে বলল।

রাজস্থানের মেয়ে সরিতা। জন্ম কলকাতার বড়বাজারে। ছোটবেলা থেকেই সে শুনছে, মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধে সে অপরাধী। ওর জন্মের জন্য ওর মাকে কথা শুনতে হত। কথা শুনতে শুনতে ওর মাও মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর হয়ে উঠতেন। মেয়েকে মারধর করতেন। সে কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুমার কাছে গেলে, সেখানেও কোনও সহানুভূতি পেত না।

সরিতা হিন্দীতে বলতে লাগল। ওর জন্মের আগে ওর ঠাকুমা নাকি সূর্যপ্রণাম করে বারবারই বলতেন, তাঁর বউমার গর্ভে যেন একটি ছেলেই জন্মায়। নইলে ব্যবসা দেখবে কে?

সরিতার জন্মের আগে তিনটি ছেলের জন্ম দিয়েছেন ওর মা। তিনজনকে নিয়ে নাকি ব্যবসা চলবে না। তাই চারজনের দরকার। সরিতার বাবা রজত আগরওয়াল অনেক হিসেব করেই স্ত্রীর গর্ভে সরিতাকে এনেছিলেন। তাঁরও বিশ্বাস ছিল ছেলেই জন্মাবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য। আশা যখন মিটল না, তখন সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আর ওর মা ভয়ে কাঁটা। সেই হাসপাতালের বিছানা থেকেই তিনি অসহায় বোধ করতে লাগলেন। দিন সাতেক পর যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন ওই ছোট্ট শিশুটির জন্য কোনও আয়া নেই। অথচ বড় বাজারে চারতলা বিশাল বাড়ি, গাড়ি, কি নেই! অতবড় ব্যবসা, লোহা লক্কড়ের। বাড়ির কাজের লোকেদের ওপরেও বেশ কড়াকড়ি ছিল। তারা যেন ওই আঁতুড়ে না ঢোকে।

সরিতা ওর মায়ের মুখেই পরে শুনেছে। উনি নিজেই ওকে আগুনের তাপ দিতেন আংটা জ্বেলে। কয়লার আংটা। ও বাড়িতে বাইরের আধুনিকতার ঠাঁটবাট তখনও ঢোকেনি। ওই ফুটফুটে বাচ্চার মুখ দেখার আগ্রহও কারও ছিল না। একেবারে অনাদরে অবহেলায় ছোটবেলায় ও বড় হতে লাগল। যদিও বছর পাঁচেক বয়স থেকেই সরিতা ওর পিতাজীর নজরে পড়ে গেল। পাড়ার নাসারী স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল ওর ভাইয়া। সরিতার বুদ্ধি ছিল ঝক্‌ঝকে। লেখাপড়ায় খুব ভাল। ওর সুন্দর মেজাজের সঙ্গে আদী ভাব বাড়ির সবার মন জয় করতে লাগল।

মাত্র হাইয়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পরই পিতাজী ওর বিয়ে দিয়ে দিলেন রাজস্থানে।

রাজস্থানের মেয়ে রূপ কানোয়ারের সতী হবার ঘটনা যখন ঘটে, সরিতা তখনও জন্মায়নি। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের দিনগুলোতে ওর কেন যেন রূপ কানোয়ারের গল্পটাই মনে পড়ত। তার স্বামী বেঁচে রয়েছে। জোর করে তাকে চিতার আগুনে ফেলা হয়নি। ওর জীবনের সঙ্গে রূপ কানোয়ারের জীবনের মিল না থাকলেও কোথায় যেন যন্ত্রণা থেকে যেত। শাশুড়ি মা লোহার শিক আগুনে পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিতেন ওকে। যদি কোনও কাজে ওর এতটুকু ত্রুটি থাকত। জাঁতায় গম পিষতে পিষতে সরিতার মনে হত, ওর নিজের জীবনটাই যেন জাঁতাকল। স্বামীর খুব নেশা ভাঙের অভ্যেস ছিল। জাফরানের ব্যবসায়ী ছিল ওরা কয়েক পুরুষ ধরে জয়পুরে। পান থেকে চূন খসলেই ওকে চড়-চাপড় খেতে হত স্বামীর কাছে। ওর ছিল রাজেশ। তবু ও রাজেশকেই আঁকড়ে ধরত। রাজেশের কাছেই ও নিরাপত্তার আশ্রয় খুঁজত। কিন্তু রাজেশের কাছে কোনও ভাবেই কোনও সহানুভূতি পায়নি।

সেই সকাল ন'টায় বেরিয়ে যেত রাজেশ, ওর দোকানে। দুপুরে খাবার যেত বাড়ি থেকে। ফিরত রাত বারোটায়। মদে চুর হয়ে। সরিতা প্রশ্ন করলেই বেদম মার।

সরিতার তেমন কোনও ডিগ্রি ছিল না নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। আর সুযোগই বা কোথায়? লেখাপড়া করে ডিগ্রি নেবার!

ভালবাসার আকাশটা ক্রমেই কৃপন হতে লাগল। সাঁড়াশীর মতো টিপে ধরল ওর গলা। অথচ বিয়ের আগে যেদিন ও শুনেছিল, জয়পুরে ওর শ্বশুরবাড়ি, সেদিন ওর কি আনন্দই না হয়েছিল!

অম্বরফোর্ট, জলমহল, ওদিকে জয়শলমীরের সোনার কেল্লা.... কত ছবিই না ওর মনের মধ্যে ঝলমল করে উঠেছিল।

রাজেশ কিন্তু বিয়ের আগে দেখাও করতে গিয়েছিল ওর সঙ্গে কলকাতায়। দুটো চারটে সিনেমাতেও গিয়েছিল। গ্লোব, মেট্রোতে। বলেছিল, ব্যবসার কাজে ওকে নাকি প্রায়ই কলকাতা আসতে হয়। বিয়ের পর সরিতাও আসবে ওর সঙ্গে কলকাতা।

তখন রাজেশকে বন্ধুর মতোই মনে হয়েছিল ওর। স্বামী হিসেবে চমৎকার হবে সে। ওকে কলেজে নাকি ভর্তি করে দেবে। অন্তত গ্র্যাজুয়েশনটা করা দরকার। নইলে রাজেশের বন্ধু-বান্ধবদের স্ত্রীদের সঙ্গে, রাজেশের সমাজের সঙ্গে মিশবে কি করে?

কিন্তু বিয়ের পরে ও দেখল সব ফক্কা। সরিতার বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন যাঁদের ভেবেছিলেন ওরা মোটেই প্রাচীনপন্থী নন। সরিতাকে নিজের বাড়ির মেয়ের মতো করে রাখবেন, তাঁরাই চমকে উঠলেন পরে। ওর অত্যাচারের কাহিনী শুনে।

সরিতা কথাগুলো বলতে বলতে একটু থামল। ওদিকে মঞ্চ থেকে শিক্ষক ব্যাটেলভাই মাইকে বললেন, 'এ' উইল স্টপ্ নাও। 'এ'-কা বাত হো গিয়া। আভি 'বি' উইল স্টার্ট। 'বি' বলিয়ে 'এ' কো আপকো দিল মে কেয়া হ্যায়।

'এ'-র ভূমিকায় এতক্ষণ ছিল সরিতা। ও হেসে মাথা নাড়ল। তারপর সীমান্তিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, ইউ স্টার্ট নাও। বাতাও তুমহারা দিলমে কেয়া হ্যায়।

সীমান্তিনী হাসল। বলল, মেরে দিলমে বাতানেকো লিয়ে কুছ নেহি হ্যায়। প্লিজ, ইউ স্টার্ট এগেইন। প্লিজ ফিনিসড্ ইওর স্টোরি। তোমহারা স্টোরি বহুত ইন্টারেস্টিং হ্যায়। প্লিজ ইউ লেট ইট বি ফিনিশড্।....

— হাম তো বহুত দুখিয়া হ্যায়, ভাই।...

সরিতা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। ওর পেছনের ইতিহাস ফের শুরু হল। সরিতা বলল, ওর স্বামী রাজেশ একদিন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অনেক রাতে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে একটা গাছের গায়ে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেল। রেখে গেল তার জন্য আরও ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। ওর মৃত্যুর সময় সরিতার গর্ভে ছিল রাজেশের সন্তান। কিন্তু শ্বশুর বাড়ির লোকেরা কেউ বিশ্বাস করল না। তারা বলল, মিথ্যে কথা। ওটা রাজেশের সন্তান নয়। শ্বশুরমশাই মারলেন ওর পেটে একটা লাথি। কিন্তু আশ্চর্য, তবু সন্তান বেঁচে রইল।

সরিতার বাপের বাড়িতে খবর গিয়েছিল। তারা জানাল, ওর দাদারা জানাল, ও বাড়িতে ওর জায়গা হবে না।

শ্বশুরবাড়ির লাথি খেয়েও একটু আশ্রয়ের জন্য সরিতা কান্নায় ভেঙে পড়ল। কোথায় যাবে সরিতা? এরই মধ্যে ওর মেয়ে সন্তানের জন্ম হল। সেটা হল আরও সাংঘাতিক অপরাধ। ভাগ্যে জুটল শুধু অত্যাচারই নয়, মা, মেয়ে দুজনকেই বাড়ি থেকে তাড়ানো হল।

কথা বলতে বলতে সরিতার দুচোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছিল। সীমান্তিনী জিজ্ঞেস করল, কোথায় গেলে তারপর?

সরিতা একটু দম নিল। বলল, কলকাতায় বড়বাজারে আমার বাপের বাড়ি। বাচ্চা কোলে করে ট্যাক্সি থেকে যখন নামি, তখন আমার মুখের সামনে দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মা নেই। বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন। দাদাদের হাতের মুঠোয় ওঁকে থাকতে হয়। ব্যবসা দেখাশুনো করে দাদারা। ভালো বাংলা বলে সরিতা। লরেটো কনভেন্টে পড়েছিল।

সরিতা বলল, অনেক অনুরোধে শেষ পর্যন্ত দরজা খুলল ভাইয়া। বুড়ো বাবা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বড়বাজারের বাড়িতে সরিতাকে রাজস্থানের মতো যাঁতা ঘুরিয়ে গম ভাঙানোর কাজ করতে না হলেও, কাজের চাপ এল অন্যভাবে। দাদাদের বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া, তাদের খাওয়ানো, দাওয়ানো সব ওকেই করতে হত। যাকে বলে বিনে পয়সার আয়া। কিন্তু ওর নিজের মেয়ের দুধ জুটত না। কঠিন অসুখ হল তার। ডাক্তার ডাকা হল না। নিউমোনিয়ায় মারা গেল ছ'মাসের মেয়ে। বউদিরা বলল, ভালই হয়েছে। মেয়েকে বিয়ে দেবার দায়িত্ব রইল না।

মেয়ে হারিয়ে সরিতা তো পাগল। বউদিদের নির্যাতনের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। দাদাদের মাথায় সম্পত্তির চিন্তা। ভাগ দিতে হবে বোনকে। বুড়ো বাবা রজত আগরওয়াল চাইছিলেন, বড়বাজারের একটি ঘর মেয়ের নামে লিখে দিতে। আর ব্যবসার মোটা অঙ্ক থেকে ওর খাওয়া পরার একটা খরচ, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা।

সেইখানেই আরও বেশি আপত্তির ঝড় উঠল। বউদিরা তো একেবারেই এককাট্টা। কিছুতেই বাড়িতে থাকতে দেওয়া হবে না ননদকে। দাদারাও চাইছে না বোনকে সম্পত্তির সামান্য ভাগও দিতে। তারা বলেছিল, ও কোথাও একটা কাজ খুঁজে নিক। নিজের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ও নিজেই করে নেবে। ওর বিয়েতে প্রচুর গয়না দেওয়া হয়েছিল। পাঁচ লাখ টাকা নগদ। কোথায় গেল সেসব? ওগুলোই তো ওর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা।

সরিতা কেঁদে দাদাদের বলেছিল, ওই একটি গয়নাও সে পায়নি। সব তার শাশুড়ি মায়ের হেফাজতে। টাকাই বা সে কোথায় পেল? টাকাটা তো শ্বশুরমশাই আর রাজেশ নিয়েছিল।

কিন্তু দাদারা বিশ্বাস করল না। বলল, ওগুলোই তোমার সম্পত্তির শেয়ার। অতএব গো ব্যাক টু ইওর ফাদার ইন লজ'জ হাউস। তোম্ শ্বশুরাল কা ঘর মে চলা যাও।

তা তো সম্ভব নয়। সরিতার শাশুড়ি মা আকাশ থেকে পড়েছিলেন যেন, যখন সরিতা তার বাপের বাড়ির দেওয়া গয়না চেয়ে বসেছিল। তাকে তাড়িয় দেবার সময় উনি বলেছিলেন, তোমার বাপের বাড়ি আবার গয়না দিল কোথায়? দুশ্চরিত্রা মেয়েছেলে আবার মিথ্যে কায়দা ফাঁদতে চাইছে।

— আমার গর্ভে রাজেশের সন্তান! তারও তো কিছু অধিকার রয়েছে এ বাড়িতে!

— ও রাজেশের নয়।

— ব্লাড টেস্ট কর লিজিয়ে উস্‌কো।

— সাট আপ। যার মেয়ে তার কাছেই রক্ষিতা হয়ে থাকো। সেই লোকই তার মেয়ের দায়িত্ব নেবে।

সরিতার হাতের একজোড়া চুড়ি ছিল মাত্র। সেটাকেই সম্বল করে সে জয়পুর স্টেশনে গিয়ে কলকাতার টিকিট কেটেছিল। বাড়ি থেকে লুকিয়েই সে বেরিয়েছিল এক দুপুরে। শাশুড়ি তখন নাক ডেকে দুপুরে ঘুমোচ্ছিলেন। গোলাপী শহর জয়পুরের এক স্যাকরার কাছে ওটা বিক্রি করেছিল সরিতা। সে কথা জানতে পেরে শাশুড়ি চুলের মুঠি ধরে দেওয়ালে হাজারবার মাথা ঠুঁকে দিয়েছিলেন ওর। কপাল ফেটে রক্ত,

ফুলে ঢোল হল মাথা।

তাতেও শান্তি হয়নি। সরিতার গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে ওকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন ফ্যানের ব্লেডের সঙ্গে। যদিও শ্বশুরমশাই এসে ওড়নার ফাঁস থেকে ওকে উদ্ধার করেছিলেন। শাশুড়ি মাকে বলেছিলেন, শেষকালে কি খুনের দায়ে পড়বে? বরং ওকে তাড়িয় দাও, ও ওর মেয়ে নিয়ে যেদিকে খুশি চলে যাক।

সরিতার চোখভরা জল, ও অপলকে তাকাল হলে টাঙানো মুক্তানন্দজীর ছবির দিকে। তারপর আস্তে আস্তে আবার বলতে লাগল নিজের কাহিনী। সীমান্তিনীর মনে হচ্ছিল, সে যেন কোনও সিনেমার ঘটনা শুনছে। সরিতার কাহিনীর প্রতিটি দৃশ্য ওর মনের মধ্যে পরপর ভেসে উঠছিল। ওর মনে হচ্ছিল, এই একুশ শতকের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েও আমাদের দেশের মেয়েরা কত অসহায়! সেই আদ্যিকাল থেকে মেয়েরা যেন অসত্য, সুরা, আর জুয়া খেলার সঙ্গে কতই না মেয়েদের তুলনা করা হয়েছে।

— তারপর? জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল সীমান্তিনী। সরিতার চোখে তখনও জল। বলল, বড়বাজারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একদিন পাগলের মতো ছুটলাম। দেখলাম, আমার শাশুড়ির অত্যাচার থেকে আমার বউদিদের অত্যাচার কিছু কম নয়। আমায় কেউ বাঁচতে দেবে না। বউদিরা আমার জন্য জড়িবুটি নিচ্ছে গুনীনের কাছ থেকে। আমায় খাওয়াবে বলে। আমার বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হওয়ার চেয়ে হাওড়া ব্রীজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ঢের ভাল।

হাওড়ার ব্রীজে উঠেছিলাম ঝাঁপ দেবার জন্য। কিন্তু যেই রেলিং-এর নীচে গলিয়ে ঝাঁপ দেব, হঠাৎ পেছন থেকে আমার কামিজের পেছন চেপে হ্যাঁচকা টান মারল কে? দেখলাম, পুলিশ। নীচে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। গঙ্গা-মাইয়ের কাছে যাওয়া হল না। আমার কাছে কোনও ঠিকানা নেই। নাম, ধাম কিছুই বলতে পারিনি। আমার স্মৃতিশক্তি তখন হারিয়ে গেছে। বোবা চোখের শূন্যতা নিয়ে তাকিয়ে রইলাম পুলিশের দিকে। ওরা আমায় লিলুয়ার অনাথ আশ্রমে দিয়ে দিল। হুঁয়া সে হামকো গুরুদেব কা দর্শন মিলা। হাম বহুৎ কোর্স কিয়া হ্যায়। নাও আই অ্যাম ইন হৃষীকেশ।

সরিতা থেমে গেল।

সীমান্তিনীর মনের মধ্যে তখন ঝড় চলছিল। ও ভাবছিল, এই একুশ শতকের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েও মেয়েদের কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়! ওর নিজের মায়ের কথা মনে পড়তে লাগল। মা কলেজে পড়াতেন। সব সময় স্বনির্ভর হবার কথা বলতেন। পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার ব্যাপারটা পছন্দ করতেন না। উনি বলতেন, মেয়েদের পুরুষেরা স্ত্রী অথবা মা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। মেয়েদের সব সময় পুরুষের অধীনে রাখবার চেষ্টাই করা হয়েছে। আর সেটাই নাকি তাদের সম্মান। বেদ থেকে মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত।

ঋগ্বেদে রয়েছে, বিয়ের ব্যাপারে প্রথমে মেয়েরা নিজেদের সঙ্গী নির্বাচন নিজেরাই করত। কিন্তু এ স্বাধীনতা তাদের বেশিদিন থাকেনি। পুরুষই মেনে নেয়নি। পরে পিতা কন্যাকে সম্প্রদান করতেন। দান শুধু বরকে নয়, তার পরিবারকেও। বিয়ের সময় সেই মেয়েটির হয়ে প্রার্থনা করা হত, সে যেন শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ননদের কাছে সম্রাজ্ঞী হয়। কিছু কিছু শ্বশুরবাড়ি ভদ্র আচরণ করত, কিন্তু বাস্তবে বাড়ির বউকে অন্য চোখেই দেখত। অথর্ব বেদে রয়েছে, সূর্যোদয়ে প্রেত যেমন করে ছুটে পালায়, ঠিক তেমনি করেই বাড়ির পুত্রবধূ শ্বশুরের সামনে থেকে ছুটে পালায়।

মেয়েদের সে যুগে বাইরের জগতে বেরোতে দেওয়া হত না। এমনকি বৈদিক যুগে মেয়েদের কোনও সভা সমিতিতে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হত না। বিয়ে বা কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মেয়েরা মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারত না। মেয়েদের রাখা হত, পুরুষের থেকে নীচু করে। বলা হত, নারী, কুকুর, কালো পাখী— এদের দিকে তাকানো উচিত নয়। তাহলে শুভ, অশুভ, আলো আর অন্ধকার সবই অন্ধকার হবে।

সীমান্তিনীর মনে পড়তে লাগল, ওর মায়ের লেখা ডায়েরির প্রতিটি পাতা। ওর মাকেও তো যুদ্ধ করেই সংসারের চার দেওয়াল থেকে বেরোতে হয়েছিল। ঠাকুমা চাননি, মা অধ্যাপনা করুন। সংসারের জোয়াল ঠেলতেই তো মেয়েরা এসেছে। একথা ঠাকুমা বলতেন।

আজ সরিতা জয়সওয়ালের কথা শুনে ওর মনে হল, পৃথিবী কত এগিয়ে গেছে। নারী আর পুরুষের অধিকার আজ সমান প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু তবুও মেয়েদের অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। এর প্রতিকার করবে মেয়েরাই। বিদ্রোহের দেওয়াল ভেঙে তাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

মুক্তানন্দজী বলেছেন, জীবন একান্ত সরল হয়েও জটিল। জীবনের এই দুটি বিরুদ্ধ চেহারারই মুখোমুখি হতে হবে। শুধু সরল হলে অলস, স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন হবে। আর যদি তুমি সব সময় জটিল হও, তবে তুমি ক্রুদ্ধ এবং নিরাশ বোধ করবে। বুদ্ধিমান লোকেরা এই দুটির মধ্যেই ভারসাম্য বজায় রাখেন।

সীমান্তিনী ভাবল, এই কথাগুলো আমরা বুঝি না বলেই আমাদের এত সমস্যা। সরিতা জয়সওয়াল এখনও খুব সরল। তবু গুরুদেবের কৃপায় নিজের বাঁচার অধিকারের প্রশ্নটা ওর এখন মাথায় এসেছে। শুধু কি কৃপা? শিক্ষাটাই বা যাবে কোথায়? উনি তো মানুষকে মানুষ হিসেবেই তৈরি করে চলেছেন। বলেছেন, জীবনটা এক সুন্দর উপহার। আর তুমি জন্মেছ, সেই উপহারের মোড়ক খোলার জন্য। তোমার পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক, পরিস্থিতি এবং তোমার দেহ— উপহারের সেই সুদৃশ্য মোড়ক।

সুন্দরভাবে কেটে গেল মুক্তানন্দজীর কোর্সের কয়েকদিন। সীমান্তিনীর কত পুরুষ, মেয়েদের সঙ্গে যে আলাপ হল। একেক জনের একেক ধরনের কাহিনী। মুক্তানন্দজী সবাইকে এক করে দিয়েছেন। সবাই যেন এক আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর কত দেশ থেকেই না মানুষ এসেছে। কানাডা, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা। সাদা চামড়া, কালো চামড়ার কোনও পার্থক্য নেই এখানে। ভালবাসায় অস্বাভাবিকতা মরে যায়। একমাত্র হৃদয়ই বলতে পারে কোন্‌টা খাঁটি। হৃদয় খুলে দিয়ে হৃদয়ের ভাষা শুনতে হবে। কেউ পর নয়। সবাই আপন।

সীমান্তিনী ওর উত্তর পেয়ে গেছে। সৈকত চলে গেছে, যাক না। কত সৈকত-এ যে দুনিয়া ভরা। মুক্তানন্দজী বলেছেন, জীবনে যন্ত্রণার খুবই প্রয়োজন। যন্ত্রণা না থাকলে প্রেমের মর্ম বোঝা যাবে না। হয়ত সৈকত একদিন ফিরে আসবে। কিন্তু সেদিন সীমান্তিনীর মন বদলে যাবে।

সীমান্তিনী বুঝতে পেরেছে, নিজের আকাঙ্ক্ষাকে বারবার দমিয়ে রেখে সামনে এগোতে হবে। আঁকড়ে থাকলে চলবে না। সব ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে হবে। যারা সারা জীবন বারবার আকাঙ্ক্ষাই করে, কিন্তু কোনও আশাই পূরণ হয় না, তারাই হতভাগ্য। এদের থেকে সামান্য ভাগ্যবান তারা, বহু প্রতীক্ষার পর যাদের আশা পূর্ণ হয়। আর সবচাইতে বেশি ভাগ্যবান তারা, যাদের মনে কোনও আকাঙ্ক্ষাই থাকে না। কেননা, তাদের মন এতটাই পরিপূর্ণ যে আকাঙ্ক্ষা জাগবার তাদের কোনও অবকাশই নেই।

সীমান্তিনীর মনে হল, ও সবই পেয়েছে। ওর আর কিছু চাইবার নেই। মুক্তানন্দজী বলেছেন, একবার নিজেকে কৃপাধন্য জ্ঞান করতে পারলে, মানুষ অভিযোগহীন হবে। সব অভিযোগ মুছে যাবে, নিরাপত্তাহীনতার বোধ থাকবে না। প্রেমের অভাববোধ কোথায় পালিয়ে যাবে।

মুক্তানন্দজীর সময় গোণা। সারা পৃথিবীর নানা জায়গায় ছুটছেন। ভালবাসার বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কোথাও উনি দু-তিন রাতের বেশি থাকেন না। যেখানেই যখন থাকেন, রাষ্ট্রীয় নেতারা ওঁর কাছে ছুটে আসেন। ধনী, দরিদ্র, সাধারণ মানুষ সবাই। মানুষের হাটে বাজারে ভালবাসার উনি যেন কারিগর। একটি বীজকে ঠিকভাবে মাটিতে পুঁতলে একটি বৃক্ষে পরিণত হয় এবং ক্রমশ নিজেই ফল ধারণ করতে শুরু করে। উনি বলেন, গুরু সবসময় বিরাট শিষ্য সংখ্যা চান না, বহুলোক তাঁর কাছে আসুক, তাও চান না। গুরু সাধনার পথে এগিয়ে যাবার লক্ষ্য ঠিক করে দেন।

ওঁর দক্ষিণ ভারতের আশ্রমে একদিন উনি মিটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন যখন, হঠাৎ এক যুবক এসে হাজির। কিন্তু দরজায় দাঁড়ানো স্বেচ্ছাসেবীরা কিছুতেই ওকে ঢুকতে দেবে না। যুবকটি তবু নাছোড়বান্দা। মিটিংয়ের শেষে মুক্তানন্দজী জানতে পেরে ওকে তাঁর কাছে আসার অনুমতি দিলেন।

যুবকটির বেশ উদ্ধত মেজাজ। সে বারবারই অনুযোগ করতে লাগল স্বেচ্ছাসেবীদের বিরুদ্ধে। মুক্তানন্দজী শান্তভাবে শুনে গেলেন। তারপর তার কথা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের জন্য আমার কাছে এসেছ?

যুবক বলল, আমার চাকরির প্রমোশনটা আটকে রয়েছে। কবে প্রমোশন হবে, জানতে চাই।

মুক্তানন্দজী বললেন, তোমার পরমায়ু তো মাত্র দশদিন। এই হাতে গোণা দশটি দিনের জন্য প্রমোশনের কথা জানতে চাইছ!

যুবকটি ভয় পেয়ে বলল, কি বলছেন আপনি!

সে প্রায় কেঁদে ফেলল। মুক্তানন্দজী বললেন, তুমি তো ওপরে যাবে, কিন্তু কি নিয়ে যাবে? তুমি তোমার পিতাজী, মাতাজীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর না। বন্ধু বান্ধব কারো সঙ্গে তোমার ভাল সম্পর্ক নেই। তুমি উচ্ছৃঙ্খল। তুমি মানসিক ভাবে অসুস্থ। নেশাখোর। ইউ শুড্ রেকটিফাই ইওরসেল্ফ। তুমি নিজেকে সংশোধন কর। এই দশ দিনের মধ্যে তুমি নতুন মানুষ হয়ে যাও। পিতাজী, মাতাজীর কাছে ক্ষমা চাও। ভাল ব্যবহার কর। বন্ধু-বান্ধব, তোমার অফিসের লোকজন সবার সঙ্গে। নেশা ছেড়ে দাও। লোভ ছেড়ে দাও। এই দশ দিন নিজেকে একটু একটু করে উন্নত করাই হবে তোমার সাধনা।

মৃত্যুভয়ে ভীত যুবকটি মা, বাবার কাছে ক্ষমা চাইল। তার পিতাজী, মাতাজীও আশ্রমে ছুটে এলেন। ছেলের পরমায়ু গুরুদেব যদি বাড়িয়ে দেন।

কিন্তু মুক্তানন্দজীর এ বিষয়ে কোনও উৎসাহ নেই। তিনি নির্বিকার ভাবে অন্য ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

যুবকটি কিন্তু দশদিনে ভীষণভাবে বদলে গেল। সে সত্যিই নতুন মানুষ হল। আশ্চর্য! দশদিন পেরিয়ে গেল, তবু সে মরল না। ছুটে এল মুক্তানন্দজীর কাছে। বলল, গুরুদেব! টেন ডেইজ আর ওভার। স্টীল আই অ্যাম অ্যালাইভ। হোয়াই! দশ দিন পেরিয়ে গেল। আমি বেঁচে রয়েছি। কেন?

মুক্তানন্দজী এবার হাসলেন। উনি ওঁর কপালের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার দীর্ঘ আয়ু। ইউ হ্যাভ আ লঙ লাইফ। কিন্তু তোমার চরিত্রের পরিবর্তনের জন্য আমি তোমায় দশদিন আয়ুর ভয় দেখিয়েছিলাম।

যুবকটির তারপর চাকরিতে সত্যিই উন্নতি হল। পরে সে চাকরিও ছেড়ে দিল। নির্লোভ মানসিকতা নিয়ে মানুষের সেবার কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিল।

মুক্তানন্দজী একথাই বুঝিয়ে দিলেন, নেতিবাচক সব কর্মের বীজকে ধ্বংস করে দিতে পারে সৎসঙ্গ। প্রারব্ধের কর্মফলে জীবের দুর্গতি। তাকে পরিবর্তন করার উপায় নেই। সঞ্চিত কর্মকে একমাত্র আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে বদলে দেওয়া যায়।

কর্ণাটকের সেই যুবক সুরেশ্বরের সঙ্গে সীমান্তিনীর পরিচয় হল হৃষীকেশেই। সুরেশ্বর বলেছিল, গুরুদেব প্রথমে যোগ ব্যায়ামের মধ্যে দিয়ে শরীর মনকে নিয়ন্ত্রণ করে ধ্যানের অভ্যাসের কথা বলেছিলেন। তারপর কর্মযোগের অপূর্ব শিক্ষা।

কয়েকদিনের নীরবতার কোর্সের পর নিজেকে খুব হালকা লাগছিল সীমান্তিনীর। আত্মার সঙ্গে আত্মার যোগ হয় নীরবতায়। যখন আমরা অনুভূতির স্তরকে অতিক্রম করে যাই, তখন আমরা স্থির হয়ে যাই। গুরুদেব বলেন, স্থির হও এবং ঈশ্বরকে জানো।

তিনি ধ্যানের গভীরে নিয়ে যান। ধ্যানের অর্থ হল নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা। আর ভালবাসার অর্থ, সবচেয়ে কাছের মানুষটির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা। এরা একে অন্যের পরিপূরক।

শুধু নিজের জন্যই কিছু সময় খালি রাখতে হবে। বছরের একটি সপ্তাহ এবং সেই সময়টা প্রকৃতির মধ্যে বাস করতে হবে। মুক্তানন্দজীর কথাগুলো ভুলতে পারে না সীমান্তিনী।

বেলা তিনটে বাজে। শীতের আকাশে এখনও বেশ রোদ। সীমান্তিনী রামঝোলা পেরিয়ে লক্ষ্মণঝোলার দিকে হাঁটতে লাগল। শীতের সামান্য হাওয়া এখনও এই হিমালয়ের নীচের শহরে।

কাল কোর্স শেষ হয়েছে। আজই রাতে ও দিল্লী চলে যাবে। বিকেল পাঁচটায় মুক্তানন্দজীর সঙ্গে দেখা করবে। এই প্রথম ও অনুমতি পেল ওঁর কাছে যাবার। যদিও কোর্সের সময় রোজই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। দুপুরে ধ্যানের সময় মঞ্চে এসে বসেছিল। উনি আসবার আগেই শিক্ষক যোগ ব্যায়ামের পর ধ্যানে রেখেছেন সবাইকে। যারা কোর্স করছে, তাদের ধ্যানের মধ্যেই গুরুদেব এসেছেন। যখন ধ্যান থেকে চোখ খুলতে বলা হল, তখন চোখ খুলেই সবাই দেখল মঞ্চে হাসিমুখে বসে রয়েছেন গুরুদেব।

— আচ্ছা, হ্যায়?

সবাই চেঁচিয়ে বলল, আপ্ ক্যায়সা হ্যায় গুরুদেব?

— হাম তো বিলকুল আচ্ছা।

সীমান্তিনী হাঁটতে হাঁটতে বারবার গুরুদেবের কথাই ভাবছিল। যাঁর মুখের হাসি কখনও মেলাতে দেখেনি কেউ। হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়ে একজন বিদেশিনী মেমসাহেব জড়িয়ে ধরল। বলল, হ্যালো! হাউ আর ইউ? তুমি কেমন আছ? আই মেট ইউ ইন ব্যাঙ্গালোর। ডু ইউ নো মী? আই অ্যাম অ্যানি...। তোমায় দেখেছিলাম, ব্যাঙ্গালোরে। আমায় চিনতে পারো? আমার নাম অ্যানি।

সীমান্তিনীর মনে পড়ল, তাই তো। কয়েকবার ওর সঙ্গে ই-মেল-এও যোগাযোগ হয়েছে। ওখানে ও একবার কোর্স করেছিল। মুক্তানন্দজী সারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে এভাবেই তো আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি করেছেন।

অ্যানি বলল, চল, আমরা গঙ্গায় নৌকোয় চড়ি।

সীমান্তিনী বলল, আজ গঙ্গার অবস্থা ভাল নয়। তার মেজাজ খুব রুক্ষ।

অ্যানি হেসে বলল, তাতে কি! সো হোয়াট! কাম অন। —বলেই অ্যানি ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে জোর করে বোটে তুলল। নৌকোটা হেলেদুলে অশান্ত ভাবে ছুটতে লাগল। অ্যানি বলল, তুমি মার্কিন দেশে ছিলে? আর ইউ এল এ? তুমি কি লস অ্যাঞ্জেলস্-এ ছিলে? প্রশান্ত মহাসাগরে কখনও বোটিং করেছ?

অ্যানির সঙ্গে দু-ঘন্টা কেটে গেল। নানা গল্পে। একটা রেস্তোঁরায় বসে ওরা দুজন কফি খেল। অ্যানি বলল, আমেরিকায় সে গুরুদেবের এই কোর্সের ক্লাস খুলেছে। সে শিক্ষিকা সান্টাবারবারায়। গুরুদেব প্রতি বছরই ওদের ওখানে একবার করে যান।

অ্যানির জীবনে মুক্তানন্দজীর একটা বড় প্রভাব পড়েছে। জীবনে স্নেহ, মায়া, প্রেম হারিয়ে হারিয়ে সে খুব অসহায় বোধ করত। ছোটবেলায় বাবা, মায়ের ডিভোর্স। বাবা, মায়ের অনেকগুলো বিয়ে, ওর জীবনকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত দারুণভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। মায়ের বারবার স্বামী বদল ওকে দিশেহারা করে দিয়েছিল। ওকে মায়ের হেফাজতেই থাকতে হয়েছিল কিনা! অনেক কষ্ট করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে অ্যানি। ও এখন ইঞ্জিনিয়ার। সান্টাবারবারায় একটা কম্পিউটার কোম্পনিতে সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। বিয়ে করেছিল ওর এক কলিগকে। কিন্তু বিয়েটা ধোপে টেকেনি। যখন ও ভাসমান মেঘের মতো ভাসছিল, কোথাও কোনও শেকড় খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন ও নানা অনুষ্ঠান করে ভালবাসার ওপর বক্তৃতা দিয়ে বেড়াত। কোনও একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মুক্তানন্দজীকে নিয়ে গিয়েছিল ওঁর ভক্তরা বক্তৃতা দিতে। মুক্তানন্দজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মধুর রসিকতায় বলেছিলেন, তুমি কি নিজেকে ভালবাস? আগে নিজেকে চিনতে চেষ্টা কর। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ, তুমি ভালবাসতে জানো কিনা? ভালবাসা কখনও বক্তৃতায় হয় না। হয় নীরবতায় এবং ত্যাগে। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি, আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে। ত্যাগ হচ্ছে আমি কিছুই চাই না। আমি মুক্ত। প্রেমিক, প্রেমিকারা কামনা, বাসনা এবং নিজেদের অধিকারবোধ সম্বন্ধে এত বেশি সচেতন থাকে, যেজন্য তাদের বেশিরভাগেরই পরিণামে দুঃখ। অতিরিক্ত দাবি করতে করতে প্রেম পায়রার মতো উড়ে যায়।

পৃথিবীতে তিন ধরনের প্রেম রয়েছে। একরকম প্রেম পরস্পরের আকর্ষণ থেকে জন্মায়। দ্বিতীয় রকম প্রেম স্বাচ্ছন্দ্যময়। আর তৃতীয়রকম প্রেম স্বর্গীয় প্রেম।

ওদের সেই নৌকোতেই আরেকজন বঙ্গসন্তান ছিল। মাঝির পাশে বসে। এতক্ষণ তার সঙ্গে ওদের পরিচয়ই হয়নি। সে হঠাৎ বলে উঠল, বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনরকম প্রীতির কথা বলা হয়েছে। সাঙ্গিক প্রীতি, গুণগত প্রীতি, আর নৈসর্গিক প্রীতি।

ওরা একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। অ্যানি বাংলা বোঝে না। সীমান্তিনী কৌতূহলী ভাবে প্রশ্ন করল, আপনি বাঙালি?

— ইয়েস ম্যাডাম। শুধু বাঙালি নয়, আপনার সঙ্গে কোর্স করেছি, এই ক'দিন ধরে। আমি এখন সারা বিশ্বের। আমায় চিনতে পারলেন না?

সীমান্তিনীও হেসে বলল, একসঙ্গে পাঁচ হাজার জন কোর্স করলুম। কি করে চিনতে পারব বলুন? অত কি খেয়াল রাখা যায়?

কথার পরই বলল, আরে, আমরা তো কেউ কারো সঙ্গে পরিচিতই হইনি। আমি শ্রীজাত সেন। থাকি গল্ফ গার্ডেন। গোয়েঙ্কাতে কর্মাস পড়াই। আর আপনি?

সীমান্তিনী একটুকরো হাসল। বলল, এবারে আমার নাম ধাম গোত্র বলতে হবে?

শ্রীজাত হো হো করে হেসে উঠল। পরিচয় হতেই বেশ জম্পেশ স্টাইলে শ্রীজাত বলল, যা বলছিলুম, সেই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রীতির কথা। আপনি শুনতে আগ্রহী?

— হ্যাঁ, নিশ্চয়, বলুন না?

শ্রীজাত বলতে লাগল, সাঙ্গিক প্রীতি হল, একজনের সঙ্গে আরেকজনের মেলামেশার অভ্যাসের ফলে যে প্রীতি। এই প্রীতিতে খুব গভীরতা নেই। তারপরের প্রীতি, গুণগত প্রীতি। একজনের গুণে আরেকজন আকৃষ্ট হবার ফলে যে প্রীতি। সেই প্রীতি সাঙ্গিকের চেয়ে একটু গভীর। গুণগত প্রীতির ভাললাগার চাইতে নৈসর্গিক প্রীতির ভাললাগা, অনেকবেশি গভীর। এই প্রেমই শ্রেষ্ঠ প্রেম। একজনের প্রকৃতির সঙ্গে আরেকজনের প্রকৃতি যখন মিলে যায়। কিন্তু সচরাচর এটা হয় না। প্রতিটি মানুষের মন তো দ্বীপের মতো আলাদা। একজনের সঙ্গে আরেকজনের মিল হবে কি করে? তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু মিল হতেই পারে।

সীমান্তিনী অপলকে তাকিয়ে শুনছিল। বলল, আপনি কমার্সের অধ্যাপক। বাংলার ওপরেও দেখছি আপনার দারুণ দখল!

শ্রীজাত বলল, বাঙালির ছেলে বাংলা ভাষা, সাহিত্যটা ভাল করে জানব না? আমার তো আপনাকে দেখেই আশ্চর্য লাগছে। আমেরিকায় থাকেন অথচ পাক্কা মেমসাহেব হতে পারেননি। এখনও দেশের জন্য এত টান!

— আমি তো এই দেশেরই। টান থাকবে না? ওদেশে ভারতীয়রা যাঁরা রয়েছেন, সবারই দেশের টান রয়েছে।

— বাজে কথা বলবেন না। কেরিয়ার তৈরির নেশায় আর স্বাচ্ছন্দ্য, ডলারের নেশায় সবাই পড়ে থাকে, তার আবার দেশের টান!

— সত্যি কথা। তবু কিন্তু দেশের জন্য কষ্টটা থেকে যায়।

বিদেশিনী মেমসাহেব বাংলা বোঝে না। সে হাঁ করে তাকিয়েছিল। আর মুচকি মুচকি হাসছিল।

আকাশে ফের মেঘ জমে উঠল। আবার বৃষ্টি হবে। হিমালয়ের শহরগুলোতে কখন যে বৃষ্টি হবে, তার কোনও হিসেব নেই। মাঝির হাত থেকে বৈঠা কেড়ে নিয়েছিল মেমসাহেব। সে এবার খুব তাড়াতাড়ি বৈঠা চালাতে লাগল। মাঝি তাকে সাহায্য করতে চাইল। সে তার নীল চোখের মণি ঘুরিয়ে কৃত্রিম কটাক্ষে বলল, নো। থ্যাঙ্কস্।

রামঝোলা থেকে একটা টাঙ্গা নিয়ে ওরা তিনজনই ফিরল আশ্রমে। পাঁচটার সামান্য আগেই। সীমান্তিনী গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল। স্বেচ্ছাসেবক তার নামের চিরকুটটা ভেতরে নিয়ে গেল। তারপরই ডাক এল। অনেক দর্শনার্থীই লাইনে দাঁড়িয়েছিল। তাদের ভেতরে প্রথমেই সীমান্তিনীর ডাক পড়ল।

ওর বুকের ভেতরে ঢেউ ভাঙতে লাগল উত্তেজনায়। গত দু-বছর ধরে ও চেষ্টা করে যাচ্ছে ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। এখন ও ভাবছে, ওই হাসিমুখের ব্যক্তিত্বের ধারের সামনে গিয়ে ও কি বলবে? ওর প্রেমের ব্যর্থতার কথা! সৈকতের কথা? ওর নিজের কেরিয়ারের কথা? না হতাশার কথা?

দোতলার সিঁড়ি টপকে উঠল সীমান্তিনী। ও যা ভেবেছিল তা নয়। মুক্তানন্দজী একা নন ওখানে। আরও অনেকেই বসে রয়েছেন কার্পেটের ওপর। একটা সোফার ওপরে হলুদ শাল পাতা। গুরুদেব বসে রয়েছেন তার ওপরে।

দরজার সামনে ওকে দেখতে পেয়েই উনি সুন্দর হাসিটি হাসলেন। যে হাসির জন্য পাগল সবাই। সীমান্তিনী যেন ওঁর কতদিনের চেনা, তেমনিভাবেই বললেন, তোম্ কেইসা হ্যায়? তুমি কেমন আছ?

সীমান্তিনী অভিভূত। ও অপলকে তাকাল কিছুক্ষণ, বলল, আচ্ছা নেহী।

সীমান্তিনী এগিয়ে গিয়ে ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যেতেই, একজন মহিলা বাধা দিয়ে বললেন, ডোন্ট টাচ হিজ ফিট্। ভূমিমে প্রণাম করিয়ে।

সীমান্তিনী ওঁর পায়ের নীচে মাটিতেই প্রণাম করল। বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীরা অনেকেই প্রণাম নেন না। সীমান্তিনী জানে। অন্যের ভেতরে যে অশুদ্ধ চিন্তা, ভাবনা থাকে, রোগ, শোক, দুঃখ তাই গুরুর ভেতরে সঞ্চারিত হয়, পা ছুঁলে।

সীমান্তিনী মাটিতে প্রণাম করলেও হঠাৎ গুরুদেবকে জড়িয়ে ধরে ও কেঁদে ফেলল। বলল, আপকো সাথমে হামারা বহুৎ বাৎ হ্যায়। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

গুরুদেব বললেন, — আই নো। ম্যায় জানতা হুঁ।

সীমান্তিনী ওঁর পদ্মপলাশের মতো চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল, অসীম করুণা। সীমান্তিনীকে কিছু বলতে হল না। গুরুদেব ওর কপালের দিকে তাকিয়ে একটু চোখ বুজলেন। তারপরই চোখ খুলে বললেন, ইউ ফরগেট ইওর ফ্রেণ্ড। তোমার বন্ধুকে ভুলে যাও। পৃথিবী অনেক বড়। তোম্ সেবাকে লিয়ে আয়া হ্যায়।

গুরুদেব মন সম্বন্ধে অনেক কথাই বললেন। ধ্যানের মধ্যে দিয়ে মনের শক্তিকে বাড়াতে হয়। সব শক্তির উৎস হল মন। উনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলছিলেন, দেহের মধ্যে মেরুদণ্ডের কয়েকটি জায়গায় অথবা স্নায়ুকেন্দ্রগুলোতে মনকে স্থির রাখতে হবে। তুমি মনকে কেন্দ্রীভূত কর। ধ্যানই তোমায় অনেক উঁচু অবস্থায় নিয়ে যাবে। মন যদি বাইরের জগতের নানাদিকে ঘুরে বেড়ায়, তখন মন তার ভেতরেই এক হয়ে থাকে। নিজেকেই সে হারিয়ে ফেলে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকেরা বলেছেন, মানুষের মন যেন এক টুকরো স্ফটিকের মতো। কাচে যা থাকে সে তারই রঙ ধারণ করে। এটাই তো সমস্যা। এরই নাম বন্ধন। তুমি সেই বন্ধনে জড়িয়ে রয়েছ। তাই এত কষ্ট পাচ্ছ।

মুক্তানন্দজী হাসতে লাগলেন। বললেন, মায়া, বন্ধনই তো আমাদের দুঃখের মূল। সেই বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার সাধনা কর, দেখবে ওই দুঃখ কষ্ট সব তুচ্ছ হয়ে গেছে। কেমন?

ধ্যানের অভ্যেস করতে করতে স্ফটিক নিজের স্বরূপ চিনতে পারে। ধ্যানই আমাদের সত্যের কাছে নিয়ে যায়। আমাদের ভয়, দুশ্চিন্তা, বিপদ, ভুল, দুর্বলতা, পাপ সেই মহা ভ্রান্তি। আমি এবং আমার শরীর এই ভাব থেকেই আসে। কিন্তু শরীর তো আমাদের বাইরের ব্যাপার। শরীর তো আত্মা নয়। আমরা পরমাত্মার অংশ। এই বোধ জাগিয়ে তোলে ধ্যান।

গুরুদেব আস্তে আস্তে বলে চলেছেন। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে। উনি একটু থেমে বললেন, তোমার প্রেমিক বন্ধুর চিন্তা করতে

করতে তুমি তো ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে পাক খাচ্ছো। ওই গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে বড় জগতের কথা ভাব। তোমার ভেতরে তো মহৎ প্রেম রয়েছে। সেই প্রেমকে সেবার কাজে লাগাও। কোনও হতাশা, চিন্তাই তোমার মনে দাগ কাটতে পারবে না। মেঘ যতই বড় হোক, সূর্যকে কোনওদিন ঢাকতে পারে না। তুমি টিচার হয়ে যাও।

ভারতবর্ষের গ্রামে প্রচুর সেবার কাজ। তুমি গ্রামে যাও। তুমি টিচার্স ট্রেনিং কোর্সটা আগে শেষ করে নাও।

সীমান্তিনী তখন ওঁর দিকে অপলকে তাকিয়েছিল। মুক্তানন্দজী বললেন, সেবাপারায়ণ হওয়াটাই তো এই পৃথিবীর প্রতি আমাদের সবথেকে বড় প্রতিজ্ঞা। তোমার জীবনে কোথাও ভয়ে বা ভুল থাকলে জানবে, তোমার প্রতিজ্ঞার অভাবই তার কারণ। সংকল্প কর, সংকল্প কর। ভাববে, তুমি এই পৃথিবীতে রয়েছ শুধু পরের সেবার জন্য। কোথাও কিছু আশা করবে না। তোমার সেবার কাজের মধ্যে দিয়ে তুমি কাউকেই অনুগ্রহ করছ না। সেবার কাজ তুমি যত করবে, ততই তোমার মঙ্গল। তাই তোমার ভাগ্যে যদি দুর্লভ সেবার কাজ জুটে যায়, তাহলে তুমি কৃতজ্ঞ বোধ করবে।

মুক্তানন্দজী থেমে থেমে আবার বললেন, প্রকৃত সেবা তো তখনই হয়, যখন সেবার কাজ শেষ হবার পরেও তোমার মনে অতৃপ্তির রেশ থেকে যায়।

সীমান্তিনী আর কিছুই বলতে পারল না। শুধু বলল, আপনার সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হবে?

গুরুদেব হাসলেন। বললেন, আমি তো সবসময় তোমার সঙ্গেই রয়েছি। দু-বছর আগে যখন তুমি আমায় প্রথম দেখেছিলে সেই তখন থেকে। আমি তোমায় ডেকেছি, তাই তো তুমি এসেছ। আমার ইচ্ছে আর তোমার ইচ্ছে তো এক হয়ে গেছে। নইলে তুমি এলে কি করে?

এত কথা শোনার পরেও সীমান্তিনীর দু-চোখ ভরে জল এল। ওর মনে পড়ে গেল ফের সৈকতকে। যার কাছে ও ভালবাসার প্রতিদান পায়নি। শ্রদ্ধা পায়নি।

আশ্চর্য! ওর মনের কথাটা কি করে যে বুঝতে পারলেন মুক্তানন্দজী। উনি হঠাৎ বললেন, যে তোমায় শ্রদ্ধা জানায় না, তাকে ধন্যবাদ জানাও। সে তোমায় মুক্ত স্বাধীন করে রেখেছে। সে তোমায় ভালবাসার গোলাপ জল ছিটিয়েছে মাত্র। তোমায় ভালবাসেনি। সে ওই গোলাপ জলে মিশে যেতে পারেনি। ও তোমায় মুক্ত করে দিল। তুমি এখন আকাশের উড়ন্ত পাখী। অন্তরে বাইরে তুমি কর্মজগতের সেবার কাজের একজন সেবিকা। ঠিক আছে? তুমি কারও নও। তুমি তোমার। সেই অন্তরে গভীরে লুকিয়ে থাকা বড় আমি। যে আমি সবার ভেতরে রয়েছে। ভালবাস। সবাইকে ভালবাসা। কেউ পর নয়। সবাই আপন।

সীমান্তিনীর চোখ দিয়ে তখন জল পড়ছিল। গুরুদেব হাসি মুখে বললেন, জীবনটা খুব দামি। কান্নার নয়। প্লিজ ইউ গো। অ্যাণ্ড টেক্ ইওর টিচার্স ট্রেনিং কোর্স ফর সেবা। আবার দেখা হবে।

সীমান্তিনী আরেকবার ওঁর পায়ের নীচের ভূমিতে প্রণাম করল। উনি ওঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় আরেকবার ফিরে তাকাল সেই করুণাঘন দৃষ্টির দিকে। উনিও যে ওরই দিকে তাকিয়েছিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেটের কাছে আসতেই ওর দেখা হল শ্রীজাতের সঙ্গে। সে বলল, কি পেলেন?

— মানে? — ভুরু বেঁকিয়ে সীমান্তিনী প্রশ্ন করল।

শ্রীজাত বলল, মানে মোক্ষলাভের কথা বলছি।

ওর গলার স্বরে ঠাট্টার হাসি। ও এখনও অনুমতি পায়নি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার।

সীমান্তিনী বলল, দেখা হলেই কি মোক্ষলাভ হয়? আমায় তো এখন বহুদূর যেতে হবে।

— আমিও আপনার সঙ্গে যেতে পারি। নেবেন আমায়?

সীমান্তিনী বলল, সে পথে তো একাই যেতে হয়।

শ্রীজাত বলল, দোকায় গেলে আপত্তি কিসের?

সীমান্তিনী বলল, নাহ! আর দোকা নয়।

শ্রীজাত ওর সঙ্গে হাটতে হাটতে বলল, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে রে, তবে একলা চল রে....। কি ব্যাপার? তাই তো?

সীমান্তিনী হাসল। বলল, ঠিক তাই।

— যদি কেউ আসে, তবে কেন নয়?

— হ্যাঁ, সেবার কাজে অনেকেই তো আসতে পারে। অনেকে মিলেই তো সেবা।

— ভেরি গুড। আমি আছি। কেমন?

সীমান্তিনী একটু হেসে, হাত নেড়ে চলে গেল।

মুক্তানন্দজীর ছোটবেলা থেকেই পছন্দের খেলাটা ছিল ধ্যানের খেলা। উনি ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যান করতে পারতেন। কোনও নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়তেন। অথচ ওঁর মা ওঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, ছেলে কোথায় গেল। কোনও ভিড়ভাট্টা ওঁর পছন্দ ছিল না। তেমনই ওঁর প্রিয় খেলা ছিল পুজো করা। বন্ধুদের ডেকে নিয়ে উনি পুজো পুজো খেলতে খুব ভালবাসতেন। ঘন্টা বাজাতেন। পঞ্চ প্রদীপ নিয়ে আরতি করতেন। বিড়বিড় করে কি মন্ত্র পড়তেন, কেউ জানে না। সাধুদের দেখলেই ছুটে যেতেন। তাঁদের কাছে কোনও ঠাকুরের মূর্তি আছে কিনা জানতে চাইতেন। একবার এক সাধু তাঁদের বাড়িতে রাতের অতিথি হয়েছিলেন। সন্ধেবেলা তাঁর পুজো শেষ হতেই ছোট্ট বালকটি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন— তুমি যে শিবের পুজো করলে, এই ঠাকুর তুমি কোথায় পেলে?

সাধু বললেন, আমি স্বপ্নে পেয়েছি।

— স্বপ্নে কি করে পেলে?

— গাছের গুঁড়ির কাছে মাটির তলায়।

— শিব কি কথা বলেছিল, তোমার সঙ্গে স্বপ্নে?

— হ্যাঁ, বলেছিল।

— কি বলেছিল?

— আমায় তুমি নিয়ে যাও। আমি এইখানে আছি।

— একথা বলেনি, একটা ছোট ছেলের সঙ্গে তোমার দেখা হবে, তাকে দিয়ে দিও আমায়?

সাধু একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তারপর মাথা নেড়ে বলেছিলেন, না, বলেননি।

— আজ বলবেন।

— কি বলবেন?

— তুমি আমায় ওই ছোট ছেলেটার কাছে রেখে যাও।

সাধু বললেন, না কখনই নয়। এই শিবলিঙ্গ তোমায় দেব না।

পরদিন ভোররাতে সাধু চলে গেলেন। কিন্তু ওই শিশুটি স্বপ্ন দেখল, ওই শিব তার পুজো পুজো খেলার সিংহাসনে এসে বসেছেন। ঘুমের মধ্যেই সে আনন্দে হেসে উঠল। সাধুও ঠিক একই সময় স্বপ্ন দেখছিল। তাঁর ঝোলায় রাখা শিবলিঙ্গ বলছেন, ওই বালকের কাছে আমায় তুমি দিয়ে দাও।

তবু সাধুর শিবলিঙ্গটির ওপরে আশ্চর্য টান। তাই ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই তিনি পালালেন ওই বালকের বাড়ি থেকে। পাছে বালক তাঁর শিবলিঙ্গটি কেড়ে নেয়।

কিন্তু ছুটতে ছুটতে বেশ খানিকটা দূরে আসতেই সাধু ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন গাছের ছায়ায়। আবার সেই স্বপ্ন। শিব বলছেন, আমায় বালকের কাছে দিয়ে এসো বলছি। তোমার সেবা তো হল কিছুদিন। আমি এবার ওর পুজো চাই। ওর কাছেই থাকব।

সাধু এবার ভয় পেলেন। ভোলানাথের কেমন যেন উগ্র মূর্তি। হাতের ডমরু বাজছে। ভোলানাথ রুদ্র মূর্তিতে নাচছেন।

— জয় ভোলনাথ! জয় শিবশম্ভু!

সাধু ঘুমের মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠলেন ভীত গলায়। তারপর ঘুম ভাঙতেই ফের পেছনে হাঁটতে লাগলেন। সেই বালকের হাতে শিবলিঙ্গ টি দিয়ে বললেন, বাবা, এবার থেকে তোমার সেবাই নেবেন।

বালক খুশি হল। সেই শিবের পুজো তাঁর আজও চলেছে। রুদ্র পুজোয় মুক্তানন্দজী একেবারে তন্ময় হয়ে যান। পৃথিবীর যে প্রান্তেই উনি যখনই থাকুন না কেন, রুদ্র পুজো কখনও বন্ধ হয় না। পুজো করতে করতে উনি শিবের মাথায় ফুল দেন। তারপর নিজের মাথায় ফুল দেন।

শিব আর মুক্তানন্দজী যেন এক হয়ে যান। তাঁর আয়ত চোখদুটি বন্ধ থাকে। সামনে যজ্ঞের আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের তাপে ওঁর শরীর থেকে যেন জ্যোতি বেরতে থাকে। পুরোহিতের গলায় সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ হতে থাকে।

শিব তো রুদ্র। আবার শিব মঙ্গলময়। মুক্তানন্দজীর ভেতর ছোটবেলা থেকেই এই দুটি জিনিস রয়েছে। কোনও অন্যায় উনি সহ্য করতে পারেন না। সমাজের অপাংক্তেয়, অস্পৃশ্যদের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য বাড়িতে অনেক শাসন ছিল। তাদের সঙ্গে একসঙ্গে খেয়ে দেখেছেন জাত যায় কিনা।

ঠাকুমা চেঁচামেচি করে বলেছেন, তোর কি ঘেন্নাপিত্তি কিছুই নেই? ওদের ঘরে গিয়ে ওদের থালায় খাস?

— তাতে কি? ওরা কি মানুষ নয়?

— কিন্তু ওদের সঙ্গে খাওয়া তোকে যে মানায় না দাদা। ওরা নীচু জাত। তুই বামুনের ছেলে।

— জাত, পাত কি গায়ে লেখা থাকে? আমার মধ্যে যে ভগবান, ওদের ভেতরেও তো তিনি। সেই একই শিব।

তবু ঠাকুমা, দিদিমারা তেড়ে এসেছেন, দিনের পর দিন ওঁর এই অনাচারে। বালক কিন্তু স্থির, নির্বিকার। ওঁর ইচ্ছে থেকে উনি এতটুকু সরে যাননি। চারদিকে গেল গেল চীৎকার শুনেও।

বড় ঘরের ছেলে ছিলেন মুক্তানন্দজী। ওঁর বাবা ছিলেন সমাজের উঁচু তলার চাকরিজীবী। বিদেশে লেখাপড়া করেছেন। কিন্তু কঠোর ব্রাহ্মণ সমাজের নিয়ম তাঁকে মেনে চলতে হয়েছে। যদিও উনিই ছেলের সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিলেন। যিনি ওঁকে প্রেরণা দিয়েছেন, ওঁর যোগ সাধনায়। সেই প্রেরণাই একদিন চারাগাছ থেকে বিশাল বটগাছে দাঁড়িয়েছে।

মুক্তানন্দজী অসহায় গরীবের পাশে দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তারা গরীব নয়। অর্থবিত্তই জীবনের শেষ কথা নয়। ভেতরের শক্তিকে জাগাতে হবে। উনি ভারতবর্ষের গণ্ডগ্রামের নাম দিয়েছেন 'সবুজতারা'। ছিল রুক্ষ পাথুরে মাটি, কিন্তু সেখানেই ফলিয়ে দিলেন ফসল। গাঁয়ের মোড়লকে ডেকে বললেন, গাঁওকা আদমী সব ভিখ মাঙ্গনে কো লিয়ে শহরমে যাতা কিঁউ?

গায়ের লোকরা ভিক্ষে করতে যায় শহরে। কেন?

হিয়ামে ফসল ফলাও।

মুক্তানন্দজী নিজেই কোদাল হাতে নেমে পড়লেন। শহর থেকে বীজ আনা হল। সার তৈরি হল। সবুজ ধানে, ঘাসে, ফসলে মাটি ভরে গেল। উনি তাদের বোঝালেন, এই বীজ কিনতে প্রথমে তাদের পয়সা খরচ হবে। তারপর সেই বীজ থেকেই হাজার হাজার বীজ সৃষ্টি হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা আসবে ঘরে। গাঁয়ের আর অভাব থাকবে না।

সেইসব গ্রামে এখন ট্রাক্টর দিয়ে চাষ হচ্ছে। লাঙ্গলের যুগ তো শেষ হয়েছে।

গাঁয়ের লোকেরা নিজেদের আর দুঃখী বলে মনে করে না।

মুক্তানন্দজী ঘুরে ঘুরে ভারতবর্ষের কত গ্রামে যাচ্ছেন। মেয়েদের বলছেন, গরুর গোবর থেকে যে ঘুটে তৈরি হয়, সেই শুকনো গোবরের ঘুটেগুলো পলিথিনের প্যাকেটে পুরে দাও তোমরা। সে সব থেকে আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি হবে আশ্রমে।

আবার বলছেন, ভেড়ির কচুরিপানার ধাপ শুকিয়ে দাও তোমরা। প্যাকেট করে দেবে। ওষুধ তৈরি হবে। নিমপাতা শুকিয়ে দাও। ওষুধ হবে। কত কঠিন রোগ ভাল হয়ে যাবে। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। তোমরা কেউ অসহায় নও। হাজার হাজার গ্রাম, লক্ষ লক্ষ গ্রাম এগিয়ে আসবে। এগিয়ে আসবে সারা পৃথিবী। এই ভারতের আয়ুর্বেদিক ওষুধ কিনতে।

আমার মনে তোমাদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে। শুধু তোমাদের জন্যই আমি তোমাদের শ্রদ্ধা করি। কোনও গুণের জন্য বলছি না।

মুক্তানন্দজী শিক্ষা, সংস্কৃতির নানা দরজা খুলে দিয়েছেন নানা জায়গায় স্কুল কলেজ করে। সংস্কৃত কলেজ, স্কুল, বৈদিক ভবন ইত্যাদি নামে। প্রায়ই উনি সেসব স্কুল কলেজ পরিদর্শনে যান। উনি ভাবেন, সংস্কৃত সাহিত্য ভারতীয় ভাষার আদি জননী। একে গ্রহণ না করলে ভারতবর্ষের মানুষের জ্ঞান লাভ হবে না।

জেলের সেলে কয়েদীদের কাছে ছুটে যাচ্ছেন মুক্তানন্দজী। তাদের বুঝিয়ে চলেছেন, মানুষ কেউ পাপী নয়। তারা ভুল করে অন্যায় করে। তাই তাদের জন্য জেলখানার গরাদ। যখন জেল থেকে খালাস পাবে, তখন তাদের জন্য মুক্তির রাস্তা আছে। সমাজ তাদের সুনজরে নাইবা দেখুক, স্ত্রী, পুত্র পরিবার তাদের আর জায়গা নাইবা দিল, তারা সেবার কাজে এগিয়ে আসবে। সেবা সেবা সেবা। কোটি কোটি মানুষের সেবা চাই। তাই কারাগারের বন্দীদের জন্য যোগ ব্যায়ামের ক্লাস হচ্ছে। ধ্যান শেখানো হচ্ছে তাদের।

মুক্তানন্দজী বুঝিয়ে দিচ্ছেন, যে ধ্যানের মধ্যে দিয়ে তারা বৈতরণী পার হবে। আর হতাশা নয়, আর দুঃখ নয়, আর জ্বালা নয়। জেলের ঘানি টেনেছ। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ। প্রিয়জনেরা দূরে সরে গেছে। প্রায়শ্চিত্ত করেছ, অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছ। এবার উপলব্ধি কর, নিজেকে অন্যভাবে।

'মরা, মরা' করতে করতেই তো দস্যু রত্নাকর ডাকাতি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

সেলের কয়েদীরা অবাক হয়ে শুনতে থাকে। মুক্তানন্দজীর কথা। তাদের উনি তো ঘৃণা করছেন না। আদর করে বুকে টেনে নিচ্ছেন। জেলার সাহেব স্তম্ভিত। কারামন্ত্রীও আশ্চর্য চোখে দেখছেন।

মুক্তানন্দজী তাদের প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরে বলছেন, তুমি আমি একই মানুষ। সবার মধ্যেই সেই একই ঈশ্বর। খুন খারাপী করে তোমরা সেই বড় আত্মাকে ছোট করেছ। বল, যে ভুল করেছ, সে ভুল আর করবে না। তুমি যে অমৃতের সন্তান। পৃথিবী থেকে যখন চলে যাবে, কি নিয়ে যাবে বলত?

কানাডার আশ্রমে মুক্তানন্দজী প্রায়ই গিয়ে থাকেন। পাহাড়ের অনেক ওপরে গভীর জঙ্গল। দুর্গম রাস্তা। সেখানে ভয়ঙ্কর সব জন্তু জানোয়ারে ভরা ছিল। কিন্তু ওঁর আশ্রম হবার পর তারা যে কোথায় সব চলে গেল। সন্ধেবেলা আশ্রমে যখন কীর্তন হয়, তখন অনেক সময় দু-একটি জন্তু জানোয়ার অনেকেরই চোখে পড়ে। আর আশ্চর্য, তারা কারও কোনও ক্ষতি না করে নিঃশব্দেই চলে যায়।

মুক্তানন্দজী আশ্রম করার জন্য এই জঙ্গলটি পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। গাছের ফাঁকে, পাতার আড়ালে ভোরের সূর্য। কখনও পাতার ওপর টপ্ টপ্ করে বৃষ্টির জল। পাতার মর্মর ধ্বনি। প্রকৃতির ছন্দ, লয়, তান সব রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের উনি সূর্যকে প্রণাম করতে শেখান। যার আলোয় আমরা বেঁচে রয়েছি। প্রণাম করতে শেখান পৃথিবীকে। যার মাটিতে আমরা জন্ম নিয়েছি। এই প্রকৃতি, জীবজগৎ, মানুষ, সৌরমণ্ডল সবাই আমাদের আপনজন। যে বিশুদ্ধ বাতাসের অক্সিজেন নিয়ে আমরা বেঁচে আছি, সেই বাতাসের কাছে আমরা ঋণী।

এইরকমই এক সকালে এক ভদ্রমহিলা এসে হাজির। মুক্তানন্দজীকে একবার দেখতে চাই।

স্বেচ্ছাসেবীরা যথারীতি বাধা দিল। বলল, ওঁর অনুমতি ছাড়া কাউকে ভেতরে যেতে দেওয়া হয় না।

তবু মহিলা জিদ ধরলেন, আমি বহু দূর থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছি। নিউইয়র্ক থেকে।

— তাতে কি?

— কেন? উনি নাকি সবার সঙ্গে একইরকম ব্যবহার করেন। তবে আবার কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে, কাউকে হবে না— একি কথা?

মুক্তানন্দজী ভেতর থেকে সবই শুনতে পাচ্ছিলেন। মহিলা খুব জোরে চেঁচিয়েই বলছিলেন। এমনই ভাব যাঁর প্রতি কোনও ভক্তি শ্রদ্ধার ধারই ধারেন না উনি। লোকে যে কেন ওঁর জন্য এতটা পাগল, সেটাই উনি একবার যাচাই করতে চান।

মুক্তানন্দজী হঠাৎ নিজেই দরজার কাছে এসে হাজির। বললেন, ওঁকে ভেতরে আসতে দাও।

ভদ্রমহিলা অবাক চোখে ওঁকে দেখেই হঠাৎ কেমন বদলে গেলেন। মুক্তানন্দজীর ঘরে গিয়ে উনি বসলেন। কিন্তু উনি কি জিজ্ঞেস করছেন, কি বলছেন, সেসব কিছুই ওঁর মাথায় ঢুকল না। ওঁর মনে হল জীবনে এই বোধহয় ওর প্রথম প্রেম। ভদ্রমহিলা বিবাহিতা। দুটি সন্তানের জননী। বয়স চল্লিশের কোঠায়। জীবনে উনি প্রেমও করেছেন বিয়ের আগে। চোখের দৃষ্টিতে এমন বিদ্যুৎ তো উনি এর আগে দেখতে পাননি। উনি আর তাকাতে পারলেন না। যখন ফিরে এলেন, তখন এক বুক যন্ত্রণা। কি যেন পেয়েছিলেন, কি যেন হারিয়ে গেল। উনি

স্টিয়ারিং ধরে অন্যমনস্ক। ওঁর অভ্যস্ত পায়ে এক্সিলেটার টিপছেন, গীয়ার পাল্টাচ্ছেন। ক্লাচে পা রাখছেন। বৃষ্টিভেজা সবুজ জঙ্গল গাছপালা সব যেন ঝাপসা। কেন এত কান্না পাচ্ছে ওঁর? ওঁর তো এতদিন কোনও অভাব ছিল না! ধন, মান, যশ, প্রতিপত্তি সব যার হাতের মুঠোয়। স্বামীর বিশাল চাকরি, ওঁর নিজের ব্যবসা, স্বদেশ বিদেশ মিলে কোটি কোটি ডলারের মালিক। তাঁর বুক ভেঙে যাচ্ছে কেন ব্যথায়? উনি যেন নাম ধাম গোত্র সব ভুলে গেছেন। বাড়ির ঠিকানাটাও যেন মাথায় আসছে না। শুধু ওই একজন ছাড়া। কেবলই ওঁর মনে হচ্ছে, আবার কবে দেখা হবে?

মান্ট্রিয়াল-এ পৌঁছে একটা হোটেলে থেকে পরদিন সকালে টরেন্টোতে পৌঁছানোর কথা ছিল ওঁর। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আরেকবার ফিরে গেলে হত না ওঁর কাছে? সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে। পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছে, না না, স্কারবারোতে নিজের বাড়িতেই ফিরে যাবে। কিন্তু কোন্‌টা ওঁর নিজের বাড়ি! কি নাম যেন ওঁর? যাজ্ঞসেনী। যাজ্ঞসেনী চ্যাটার্জী। স্বামীর নাম? দীপ্তমান। কিন্তু ওকে তো ও বলেই এসেছিল, কাল ফিরবে। সাতশো কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে এসে আবার ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

যাজ্ঞসেনীর মনে পড়ছে, মুক্তানন্দজীর বক্তৃতার কথা। একটা ম্যাগাজিন-এ সে পড়েছিল, কামনা মনকে অধিকার করে, বুদ্ধি কে ভোঁতা করে দেয়। শরীরকে ক্লান্ত করে। কামনাকে প্রশ্রয় দিলে জড়তা আসে। কামনা হচ্ছে আদিম শক্তি। এই শক্তিকে ঠিকভাবে চালালে উৎসাহ, জ্যোতি, বুদ্ধি র ক্ষুরধারতা অথবা প্রেমও হতে পারে।

এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে মোবাইলে আশ্রমে ফোন করলেন যাজ্ঞসেনী। মুক্তানন্দজীর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। শুনলেন, উনি এখন ব্যস্ত। ফোন ধরতে পারবেন না।

মুক্তানন্দজীর নিজে কোনও ফোন রাখেন না। ওঁর সেক্রেটারির ফোনে ইচ্ছে হলে কথা বলা যায়, যদি উনি রাজি থাকেন।

সাজানো শহর। দুদিকে ফরাসী কায়দার বাংলো। ফুলের বাগান। মান্ট্রিয়াল শহর ছেড়ে ফ্রি ওয়ে দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে মনটা কেবলই অস্থির হতে লাগল। দীপ্তমানের সঙ্গেও একবার কথা বলে নিল। মনটাকে একটু অন্যমনস্ক করার জন্য। জানিয়ে দিল, সে মান্ট্রিয়াল থেকে রওনা হয়েছে।

সন্ধে হয়ে গেল। রাস্তায় পড়ল কিং স্টোন। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, সন্ধে ছ'টা বাজে। রাতের খাবার খেয়ে নেবার কথাও মনে রইল না। ক্ষিধে, তৃষ্ণা সব যেন চলে গেছে। বুকের মধ্যে শুধু কান্নার দলা।

স্কারবারোর বাড়িতে উনি ফিরলেন যখন, তখন রাত আটটা বেজে গেছে। দীপ্তমান সোফায় বসে রিমোট কন্ট্রোল ঘুরিয়ে টেলিভিশনের নানা চ্যানেল দেখছিলেন। যাজ্ঞসেনীকে ঢুকতে দেখেই বললেন, আজই ফেরার কি দরকার ছিল? মান্ট্রিয়ালে রেস্ট নিলেই তো পারতে।

কিন্তু ওর আলুথালু চেহারা বেশ অবাক করল দীপ্তমানকে। — কি ব্যাপার? তোমায় কেমন দেখাচ্ছে? শরীর ভাল তো?

স্বামীর চোখে ধরা পড়ে গেলেন যাজ্ঞসেনী। উনি এড়িয়ে গেলেন। — না, না। শরীর আবার কি হবে? তবে পরের সপ্তাহে আমায় আবার ওখানে যেতে হবে।

— নেক্সট উইকে আবার?

— হ্যাঁ, আবার।

— কেন?

— সব কেনর কি উত্তর হয়?

ওদেশে সন্ধে ছ'টা বাজতেই রাতের খাবার। ছেলে, মেয়ে খেয়েছে। তারা পড়াশুনো করছে। দীপ্তমান অপেক্ষা করছিলেন স্ত্রীর জন্য। কিন্তু খাবার টেবিলে বসে যাজ্ঞসেনীর খাবারের কোনও ইচ্ছেই নেই।

রাতে বিছানায় শুয়েও ঘুম নেই। চোখ বুজলেই উনি সেই জ্যোতির্ময় আলোটাই দেখতে পাচ্ছেন। আর সেই পদ্মপলাশ নয়ন। জীবনে এমন আশ্চর্য চোখ উনি আর কখনও দেখেননি।

পরের সপ্তাহে আবার ছুটে গেলেন আশ্রমে। মুক্তানন্দজীর সঙ্গে দেখা হল না। উনি তখন আমেরিকায়। জর্জ বুশের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ওঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

— কবে ফিরবেন?

— উনি তো এখন ফিরবেন না। উনি ওখান থেকে যাবেন ইণ্ডিয়া। তারপর যাবেন ইরান, আফগানিস্তান-এ।

— হোয়েন হি উইল কাম এগেইন?

উনি কবে এখানে আবার আসবেন?

— উনি যখন তখন ওর প্রোগ্রাম চেঞ্জ করেন।

— ওঁর সেক্রেটারির মোবাইল নম্বরটা পেতে পারি?

— না, সেটা কাউকে দেওয়া হয় না।

— কিন্তু আমার যে ওঁর সঙ্গে কথা বলতেই হবে।

— উনি তো কারও সঙ্গে কথা বলেন না ফোনে।

— দেন? হাউ ক্যান আই টক্ টু হিম?

হতাশার নিঃশ্বাস আবার। যাজ্ঞসেনীর মন যন্ত্রণায় ভরে গেল। উনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু মাসখানেক পরেই উনি দক্ষিণ ভারতের একটা টিকিট কেটে ফেললেন। ওঁকে সেখানে গিয়েও হতাশ হতে হল, ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে মুক্তানন্দজী নেই। উনি গেছেন ফ্রান্স। আশ্রমের পরিবেশে গিয়ে মুগ্ধ হলেন যাজ্ঞসেনী। ওঁর মনে হল, এখানেই তো উনি সেবার কাজে থেকে যেতে পারেন। কিন্তু সংসার? ছেলে,

মেয়েরা এখনও তো তেমন বড় হয়নি। ওঁর স্বামীই তো রাজি হবেন না। তবু ওঁর মনের ভেতর ঝড় চলতে লাগল। পেণ্ডুলামের মতো দুলতে লাগল মন। নিজের সংসারে ফিরে যাবেন কি যাবেন না। ছেলে, মেয়ে, স্বামী, ঘরসংসার সবই মিথ্যে মনে হল।

মনে পড়তে লাগল, মুক্তানন্দজীর কথা। উনি বলেছেন, তাঁকে অনুসরণ যেন না করা হয়। কেননা, কেউই তাঁকে অনুসরণ করতে পারবে না। তিনি সবার পেছনেই রয়েছেন।

যাজ্ঞসেনী তবু মনকে আয়ত্তে আনতে পারলেন। রোজই উনি কম্পিউটারে বসে ই-মেল করতে লাগলেন গুরুদেবকে। ততদিনে ফিরেও গেছেন নিজের বাড়িতে কানাডায়।

ই-মেলের উত্তর পেলেন, একদিন। উনি দেখা করতে পারবেন। দিন সাতেক পরই মুক্তানন্দজী আসছেন জার্মানিতে। সেখান থেকে যাবেন ফ্রান্সে। কয়েকদিনের জন্য উনি ইচ্ছে করলে ওঁর নানা প্রোগ্রামে থেকেও যেতে পারেন।

যাজ্ঞসেনীর আনন্দে চোখ জলে ভরে গেল। গুরুদেব তাহলে দর্শন দেবেন! প্রতিদিন মধ্যরাতে উনি কম্পিউটার ঘরে যান। আর প্রতিটি ই-মেলে হাত বুলিয়ে স্পর্শ করলেই উনি বুঝতে পারেন কে কি লিখেছেন। সবাই কৃপা পেয়ে যান। সমস্যা যতই গুরুতর হোক।

দেখা হল জার্মানিতে। যাজ্ঞসেনীর ব্যাকুল চোখের দিকে তাকিয়ে মুক্তানন্দজী বললেন, তোমায় অনেক পথ এগোতে হবে। তোমায় সেবা করতে হবে। তুমি তো মুক্ত আত্মা। তোমার তো বন্ধনের ভয় নেই। তোমায় সংসারেই থাকতে হবে। স্বামী, সন্তানদের প্রতি তোমার কর্তব্য সবার আগে। তুমি ফিরে যাও কানাডায়। সময় হলেই তোমায় ডাকব।

যাজ্ঞসেনী অনুরোধ করলেন, তিনি আশ্রমবাসিনী হতে চান। গুরুদেবের সেবা করতে পারবেন।

কিন্তু গুরুদেব ওঁকে চাইলেন না। বললেন, আমি তো সবার মধ্যেই রয়েছি। তোমার মধ্যেও রয়েছি। সবাই সেই একই আনন্দের সন্তান। আমায় সবার মধ্যেই পাবে।

উনি থামলেন। কিন্তু ওঁর অপলক দৃষ্টিতে যাজ্ঞসেনীর ব্যাকুলতা কমল না। তিনি ফ্রান্স পর্যন্ত ওর সঙ্গে গেলেন। আরও অনেক ভক্তের মতো। তারপর গুরুদেব ফের ওঁকে ফিরে যেতে বললেন।

ফিরে গেলেন নিজের বাড়ি যাজ্ঞসেনী। প্রতিদিন ই-মেল করে যান। উত্তর আসে না। ছ'মাস পর উনি আবার ইন্টারনেট থেকে খুঁজে নিলেন, গুরুদেব কোথায়? ক'দিন থাকবেন। বিশেষ ওই ওয়েবসাইট থেকেই জানতে পারলেন, উনি ভারতবর্ষের গুজরাটে রয়েছেন। সেখানে গোলমাল চলছে। যাজ্ঞসেনী একটুও সময় নষ্ট না করে গুজরাটের আমেদাবাদে চলে গেলেন। দেখা হল গুরুদেবের সঙ্গে। উনি বললেন,— এত ঘন ঘন এলে তো চলবে না। তুমি বছরে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পার। শিক্ষিকা হয়ে যাও। মানুষকে আলোর পথ দেখাও।

ওঁকে আর একটুও অপেক্ষা করতে দিলেন না গুরুদেব। উনি ওঁর মিটিং-এর হলে ঢুকে গেলেন।

যাজ্ঞসেনী হল-এর বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিটিং শেষ হল ঘন্টা খানেক পরে। হাজার হাজার লোক ওঁকে ঘিরে রেখেছে। যাজ্ঞসেনী সেই ভীড়ের মধ্যে কোনওরকমে ঢুকে গেলেন। গুরুদেবের বকুনি খেলেন এবার— তুমি আবার কেন? প্লিজ ইউ ব্যাক টু ইওর হোম। তুমি তোমার বাড়ি ফিরে যাও।

কিন্তু এক বছরের যে অনেক দেরি।

ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা ছাড়া তো উপায় নেই।

ই-মেলের উত্তর এল। কানাডার বাড়িতে বসেই তখন যাজ্ঞসেনী শিক্ষয়িত্রীর ট্রেনিংয়ের কথা ভাবছিলেন। ওঁর প্রশ্নটা ছিল ট্রেনিংয়ের পর কি ধরনের সেবা ওর জন্য রয়েছে?

মুক্তানন্দজী জানালেন, সেবার শেষ নেই। স্বদেশ, বিদেশ সব জায়গাতেই সেবার নানা রূপ রয়েছে। তুমি শিক্ষয়িত্রীর ট্রেনিং শেষ কর। তারপর ওখানে ক্লাশ নিতে থাক। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী তৈরি কর। তাদের আবার লাগিয়ে দাও সেবার বিভিন্ন কাজে। মানুষকে বোঝাও, সে শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধি, পরিবারের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এ পৃথিবীতে আসেনি। তাকে ঘরে ঘরে আত্মীয়তা তৈরি করতে হবে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে। ভালবাসা সারা পৃথিবীতে ঘুরছে। সবার মানসিকতায় সেই বোধই জাগাতে হবে।

শিক্ষয়িত্রী হলেন যাজ্ঞসেনী। ততদিনে তাঁর স্বামী, ছেলেমেয়ের মনও বদলে গেছে। গুরুদেবকে তাঁরা চিনতে পেরেছে। যাজ্ঞসেনীর ছাত্র, ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। গুরুদেব কানাডায় এলেন। এবার যাজ্ঞসেনী দেখতে পেলেন, তাঁর চোখে আশ্চর্য স্নেহ, মমতা। যাজ্ঞসেনীর মনে হল, উনি কি ওঁর বাবা? না মা? না গুরু? না শিক্ষক? উনি যেন সবার মিলিত নির্যাস।

গুরুদেব বললেন, তোমার তো লক্ষ লক্ষ ডলার। তোমার ব্যবসা থেকে যে ডলার আসে, তা থেকে নিজেরটা রেখে, বাকি কিছু কিছু সেবার কাজে দিয়ে দাও। আমাদের ভারতবর্ষ গরীব দেশ। ধন তোমার একার নয় জানবে। তোমার বলে যা ভাবছ, তা তোমার নয়। তা সবার। বিলিয়ে দাও, নিজেকে বিলিয়ে দাও। যতই দান করবে, ততই বেড়ে যাবে।

যাজ্ঞসেনী বলল, আপনি ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই সত্যি নয়। আপনি যা বলবেন, তাই হবে।

যাজ্ঞসেনী ভারতবর্ষে ছুটতে লাগলেন বারবার। গ্রামের মেঠো পথে, কাদা, জল ডোবা রাস্তায়, যেখানে গাড়ি যায় না, সেই অনুন্নত গ্রামগুলিই উনি বেছে নিলেন। চাষীর ঘরে, তাদের সঙ্গে বসে একসঙ্গে ভাগ করে খাওয়া। যে ব্যাপার উনি কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবেননি,

সারাদিন পরিশ্রম করেন। ওদের কোর্স করান। কি করে জীবন থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

সন্ধের পর উনি ধ্যানে বসেন। গুরুদেবের কথা মনে পড়ে, যখন তুমি ধ্যানে বস, তখন তুমিই ঈশ্বর। তাঁকে হৃদয়ের গভীরে অনুভব করতে হবে। গভীর ধ্যানে মন শান্ত, স্তব্ধ, শূন্য হলে তুমি অনুভব করবে— তুমি কে?

ধ্যানে পরিতৃপ্ত মন। যাজ্ঞসেনী এখন আর গুরুদেবের পেছনে ছোটেন না। দায়িত্বের পর দায়িত্ব। কাজের পর কাজের ভেতর মিশে যেতে থাকেন যাজ্ঞসেনী। ওঁর ধৈর্য, অধ্যবসায়ে গুরুদেব খুশি। একা আর কতদূর করা যায়? মুক্তানন্দজী সংগঠনের কথা বলেন। দল তৈরি করতে বলেন। দল থেকে দল তৈরি হবে। তারপর আরেক দল। এভাবেই কাজের গতি বেড়ে যাবে। মানুষ অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। সেই মানুষকে আলোর পথ দেখাতে হবে। শুধু গ্রামে নয়। শহরেও। শুধু ভারতবর্ষ, কানাডায় নয়, সারা পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে হবে। শূন্য থেকে শুরু.....। এর তো কোনও শেষ নেই।

অনেক রাতে যাজ্ঞসেনীর ল্যাপটপ্-এ আলো জ্বলে উঠল। কীবোর্ডে আঙুল চলতে থাকে। উনি ই-মেল করেন। গুরুদেবের আর কোনও কাজ বাকী, যা এখনও করা হয়নি?

উত্তর আসে, নিজের ভেতরে নিজেকে খোঁজো। চরৈবেতি, চরৈবেতি। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, কাজের কোনও শেষ নেই...।

অগ্নিপুরাণে ভারতীয় মনীষা

রবীন্দ্রনাথ বসাক

"আগ্নেয়ে হি পুরাণেহস্মিন্ সর্ববিদ্যাঃ প্রদর্শিতাঃ।"

(অগ্নি - ৩৮৩-৫১ক)

কুসুমিত কাননে বিচিত্র বর্ণময় কুসুম চয়ন করে যেমন পুষ্পমঞ্জুষা পূর্ণ করা হয়, তেমনই সুপ্রাচীন কাল থেকে সভ্যতার লীলাভূমি এই ভারতবর্ষের বিচিত্র বিদ্যানিচয়ের সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে অগ্নিপুরাণ।

সাধারণ মানুষের বুদ্ধি গোচর বিষয় থেকে ব্রহ্মবিদ্যা অভিলাষী ব্যক্তির অভিলাষিত বিষয় পর্যন্ত কিছুই বাদ যায়নি। ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়িকা ভারতী বিদ্যা যেন পূর্ণমহিমায় অগ্নিপুরাণে প্রকাশিতা হয়েছেন। ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য-কলা-ভূগোল-ইতিহাস-বিজ্ঞান-রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের এক পূর্ণাঙ্গ রূপ লীলায়িত ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত হয়েছে এই অগ্নিপুরাণে।

অগ্নিপুরাণে বর্ণিত বিষয়গুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

(১) লৌকিক বিষয়াবলী,যথা—

প্রাসাদ-লক্ষণ, প্রাসাদ ও দেবতাস্থাপন বিধি, প্রতিমার শ্রেণীবিভাগ, প্রতিমা-লক্ষণ, শালগ্রাম-লক্ষণ, ভুবনকোষ, জ্যোতিষশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বিবিধ ব্রত, রাজধর্ম ও রাজনীতি, স্ত্রীলক্ষণ, পুরুষলক্ষণ, রত্নপরীক্ষা, ধনুর্বেদ, বৃক্ষায়ুর্বেদ, আয়ুর্বেদ ও ঔষধ, গজচিকিৎসা, অশ্বচিকিৎসা এবং গো-চিকিৎসা।

(২) সারস্বত সাধনা, যথা—

কাব্যলক্ষণ, দৃশ্যকাব্য (নাটক) নিরূপণ, রসনিরূপণ, নৃত্যকলা, অভিনয়কলা, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, শব্দকোষ, শরীরের অবয়ব বর্ণনা।

(৩) অলৌকিক বিষয়াবলী, যথা—

যোগশাস্ত্র বিবরণ, অদ্বৈতব্রহ্মনিরূপণ, গীতাসার।

অগ্নিপুরাণে ভৌগোলিক বিবরণ ঃ—

১১৮তম অধ্যায়ে 'ভারতবর্ষ' সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্-ভারতং নাম নবসাহস্রবিস্তৃতম্।। ১১৮-১।।
কর্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্।
মহেন্দ্রো মলং সহ্যঃ শুক্তিমান্ হেমপর্বতঃ।। ১১৮-২।।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্বতাঃ।। ১১৮-৩ ক।।

—সমুদ্রের উত্তর এবং হিমালয়ের দক্ষিণ দিকের ভূ-ভাগ 'ভারতবর্ষ' নামে বিখ্যাত। এর পরিমাণ নয় সহস্র যোজন। স্বর্গ ও মুক্তিকামী ব্যক্তিগণের এটিই একমাত্র 'কর্মভূমি'। ভারতবর্ষে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, হেমশৈল, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র নামে সাতটি প্রধান পর্বত আছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত বিস্তার সহস্র যোজন। এটি কিরাত, যবন এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের বাসভূমি। এখানে অনেকগুলি নদী আছে। তার মধ্যে বিন্ধ্যপর্বত থেকে — নর্মদা, সহ্যপর্বত থেকে — তাপ্তী, পয়োষ্ণিকা, গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণ্বা প্রভৃতি, মলয়পর্বত থেকে — কৃতমালাদি, মহেন্দ্রপর্বত থেকে — ত্রিসীমাদি, শুক্তিমান পর্বত থেকে — কুমারাদি এবং হিমালয়

পর্বত থেকে — গঙ্গা, চন্দ্রভাগা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নদী উৎপন্ন হয়েছে।

বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের আয়তন এবং কিরাত-যবনদের সঙ্গে চতুর্বর্ণের মানুষদের একত্র সহাবস্থান লক্ষণীয়। কিরাত-নিষাদ শ্রেণীর মানুষরা প্রকৃতপক্ষে বনবাসী, গিরিবাসী। বৃটিশ ঐতিহাসিকদের কথিত "আদিবাসী" কখনই নয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের তল্পিবাহক তথা ইংরেজ সরকারের এঁটো-কাঁটা-লোভী ইন্ডোলজিস্টদের প্রচারিত Aryan Invasion Theory নিঃসন্দেহে একটি ভ্রান্ত মতবাদ। ভারতীয় জনগণের সামাজিক বিন্যাস, সুস্থিতি ও সৌহার্দ্য ধবংস করে, ভারতে বৃটিশ স্বার্থ চির-অক্ষুণ্ণ রাখার তাড়নাতেই ঐ কূট-তত্ত্বের সৃষ্টি ও প্রয়োগ।

অগ্নিপুরাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা

বিজ্ঞানের বিপুল সম্ভার সংরক্ষিত রয়েছে এই অগ্নিপুরাণে। ভারতরাষ্ট্রের কল্যাণে, দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আত্যন্তিক গবেষণা করা উচিত। এই প্রসঙ্গে ডঃ অশোক চট্টোপাধ্যায় বলেন — "আজ থেকে সহস্রাধিক বছর আগে, যেভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের — পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা শল্যবিদ্যার উন্নতি দেখা গেছে, আজকের বিজ্ঞানের কাছেও অনেক ক্ষেত্রে তা দুর্জ্ঞেয়। সমগ্র পুরাণে বিশেষ করে অগ্নিপুরাণে এ ধরনের বৈজ্ঞানিক সত্য-নির্ভর বহু উদাহরণ দেখা গেছে, আজকের বিজ্ঞান সেগুলি নিয়ে গবেষণা করছে।" (অগ্নিপুরাণ-ভূমিকা, পৃঃ-১)

অগ্নিপুরাণের প্রাসাদ লক্ষণ (অধ্যায়-৪২), প্রাসাদ স্থাপন (অ ঃ ৪৩) কূপ-বাপী-তড়াগ প্রতিষ্ঠা (অঃ ৬৪) সভাগৃহ স্থাপন (অ ঃ ৬৫), সমুদায় প্রতিষ্ঠা (অ ঃ ৬৬), ধবজারোহণ বিধি (অ ঃ ১০২), খড়্গাদি লক্ষণ (অ ঃ ২৪৫), রত্নলক্ষণ (অ ঃ ২৪৬), শরীরের অবয়ব বর্ণনা (অ ঃ ৩৭০) প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনায় — পদার্থবিদ্যা (Physics) , যন্ত্র-প্রযুক্তিবিদ্যা (Engineering Technology), শরীর-সংস্থান বিদ্যা (Physiology), স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিজ্ঞান (Gynaecology), গণিত (Mathematics) এবং রসায়ণশাস্ত্রের (Chemistry) সার্থক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

অগ্নিপুরাণে চিকিৎসাবিজ্ঞান (Medical Science) আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে এবং গজ-অশ্ব-গো-চিকিৎসা বিষয়ক অধ্যায়গুলিতে রসায়নশাস্ত্র ও ভেষজবিদ্যার আলোচনা আছে।

অগ্নিপুরাণের আয়ুর্বেদ আলোচনায় স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

উপস্তম্ভত্রয়ং প্রোক্তং দেহেঽস্মিন্ —
আহারো মৈথুনং নিদ্রা তেষু যত্নঃ সদা ভবেৎ।
অসেবনাৎ সেবনাচ্চ অত্যন্তং নাশমাপ্নুয়াৎ।।
ক্ষয়স্য বৃংহণং কার্যং স্থূলদেহস্য কর্ষণম্।
রক্ষণং মধ্যকায়স্য দেহভেদাস্ত্রয়ো মতাঃ।। ২৮১-১৭-১৯।।

— অর্থাৎ আমাদের এই দেহে তিন প্রকার উপস্তম্ভ (জৈবিক ক্রিয়া প্রবৃত্তি) আছে। যথা — আহার, নিদ্রা ও মৈথুন। এগুলির প্রতি সর্বদা যত্ন নিতে হয়। অত্যন্ত অ-সেবনে ও অত্যন্ত সেবনে দেহ বিনষ্ট হয়। ক্ষীণদেহের পুষ্টি ও স্থূলতা-সাধন এবং স্থূলদেহের কর্ষণ (ক্ষীণতা) এবং মধ্যম প্রকার শরীরের রক্ষণ কর্তব্য। স্থূল, ক্ষীণ ও মধ্যম — মানবদেহ এই তিন প্রকার।

রোগ সমূহের উৎপত্তির কারণ ঃ

অতিভোজনতো তথা চাভোজনেন চ।
রোগা হি সর্বে জায়ন্তে বেগোদীরণধারণৈঃ।। ২৮০-৩১।।

— অতিরিক্ত ভোজনে ও সময়ে ভোজন না করলে এবং মলমূত্রের বেগ উত্তোলনে ও ধারণে সকল রোগ উৎপন্ন হয়।

ব্যাধির শ্রেণীবিভাগ ঃ —

শারীর মানসাগন্তু-সহজা ব্যাধয়ো মতাঃ।
শারীরা জ্বরকুষ্ঠাদ্যাঃ ক্রোধাদ্যা মানসা মতাঃ ।। ২৮০-১।।
আগন্তবো বিঘাতোত্থাঃ সহজা ক্ষুজ্জরাদয়ঃ।১৮০-২ক।

— ব্যাধি চার প্রকার। যথা — শারীরিক, মানসিক, আগন্তুক এবং সহজ। জ্বর-কুষ্ঠাদি শারীরিক ব্যাধি, ক্রোধাদি মানসিক ব্যাধি, বিঘাতাদি দ্বারা (দুর্ঘটনার দ্বারা) উদ্ভূত হ'ল আগন্তুক ব্যাধি এবং ক্ষুধা ও বার্ধক্যাদি হ'ল সহজ ব্যাধি।

হে সুধী পাঠক! অগ্নিপুরাণের এই চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি কি আজও সমান প্রাসঙ্গিক নয়?

অগ্নিপুরাণে শিশুরোগ এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও আছে। বিষ চিকিৎসার বিষয়েও আলোচনা আছে অগ্নিপুরাণে।

অগ্নিপুরাণোক্ত শিশুরোগ ও তার প্রতিকার বিধানে আমরা একটু দৃষ্টিপাত করি —

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকগণ শিশুর স্বাস্থ্যকে অবহেলা করেননি। তাই অগ্নিপুরাণে শিশুরোগও সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ২৮৩ তম অধ্যায়ে আমরা শিশুদের রোগপ্রতিষেধক ঔষধের প্রয়োগ বিধান লক্ষ্য করি। সংশ্লিষ্ট ঔষধের কার্যকারিতার ফলে — শিশুদের বাগ্‌যন্ত্রের জড়তা নষ্ট ক'রে বাক্-শক্তি স্ফুরিত হয়, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রূপ প্রকাশিত হয় এবং আয়ু, মেধা ও সৌন্দর্য বর্ধিত হয়।

বাগ্‌রূপসম্পদ্‌যুক্তায়ুর্মেধা শ্রীবর্ধতে শিশোঃ।। ২৮৩-৪ক।।

অগ্নিপুরাণে শারীর-সংস্থান-বিদ্যা (Physiology) মানবদেহে হৃৎযন্ত্র (Heart), প্লীহা (Spleen) এবং যকৃৎ (Liver) -এর অবস্থান সুন্দর ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে অগ্নি- পুরাণে ঃ

হৃদয়ং পদ্মসন্নিভম্

অধোমুখং তচ্ছুষিরং যত্র জীবো ব্যবস্থিতঃ।। ৩৭০-১৬।।

চৈতন্যানুগতা ভাবাঃ সর্বে তত্র ব্যবস্থিতাঃ।।

তস্য বামে তথা প্লীহা দক্ষিণে চ তথা যকৃৎ।। ৩৭০-১৭।।

— অর্থাৎ, হৃদযন্ত্র দেখতে পদ্মের মতো (হৃৎপদ্ম), তার বিবর (প্রবেশদ্বার নালিকা) অধোমুখ (নিম্নমুখী)। জীবাত্মা ও চৈতন্যানুগত ভাবগুলি তাতেই ব্যবস্থিত আছে। হৃদযন্ত্রের বামে প্লীহা এবং ডান দিকে যকৃৎ অবস্থিত।

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অস্থি, পেশী, স্নায়ু এবং শিরার সংখ্যা ও সংস্থান নির্দেশনা — প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকগণের অঙ্গ সংস্থানবিদ্যা (Anatomy), শরীরব্যবচ্ছেদবিদ্যা (Desection) এবং শল্যবিদ্যা (Surgery)সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের প্রমাণ দেয়।

অগ্নিপুরাণে পরিবেশ চেতনা

অনুকূল পরিবেশ চিকিৎসা-ব্যবস্থার একটি অঙ্গ। পরিবেশের উপরই আমাদের সুস্থতা, আরোগ্য এবং সর্বোপরি জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। অগ্নিপুরাণ এ বিষয়েও আমাদেরকে দিক্-নির্দেশ করে।

গৃহপরিবেশ সংক্রান্ত একটি বিধান নিম্নরূপ ঃ—

বাস-ভবনের উত্তর দিকে প্লক্ষ্ম (পাকুড় গাছ), পূর্ব দিকে বট, দক্ষিণে আম্র এবং পশ্চিমে অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করলে গৃহপরিবেশ স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। গৃহের দক্ষিণ দিকে উৎপন্ন কন্টকবৃক্ষও মঙ্গলজনক। গৃহসন্নিকটে উদ্যানও প্রস্তুত করা উচিত। যদি উদ্যান রচনা করা সম্ভব না হয়, তাহলে টবে (তিলকান্ত) ফুলগাছ এবং অন্যান্য দৃষ্টিনন্দন গাছ লাগিয়ে বাসভবন সজ্জিত করা উচিত।

প্লক্ষশ্চোত্তরতঃ শুভঃ।

প্রাগ্‌বটো যাম্যতস্ত্বাম্র আপ্যেজ্ঝশ্বত্থঃ ক্রমেণ তু।।২৮২-১।।

দক্ষিণাং দিশমুৎপন্নাঃ সমীপে কন্টকদ্রুমাঃ।

উদ্যানং গৃহবাসে স্যাৎ তিলান্ বাপ্যথ পুষ্পিতান্।।২৮২-২।।

বর্তমান পরিবেশ দূষণের যুগে — যেখানে সেখানে নগরনির্মাণ করতে হলে, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও লোকালয়ের মধ্যে ভারসাম্য সুস্থিত রাখতে হবে। — অগ্নিপুরাণ থেকে আমরা এ-শিক্ষাও পাই।

অগ্নিপুরাণে কৃষি বিজ্ঞান **(Agronomy)**

অগ্নিপুরাণে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য নালযন্ত্র (জল উঠানোর পাম্প), কৃত্রিম নদী বা খাল (Canal)-এর উল্লেখ থাকাও প্রাচীন ভারতে উন্নত কৃষি-ব্যবস্থার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। বলা হয়েছে ঃ—

প্রবেশয়েন্নদীবাহান্ পুষ্করিণ্যান্তু কারয়েৎ।। ২৮২-৪ খ।।

অর্থাৎ — নদীর প্রবাহ সকল উদ্যানে অথবা কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করাবে, নদী না থাকলে পুষ্করিণীর (পুকুরের) জল-প্রবাহ যাতে উদ্যানে বা কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করে তার উপায় করতে হবে।

অগ্নিপুরাণে আকরিক প্রযুক্তি (Mining Engineering) ২৩৯ তম অধ্যায়ে বাসযোগ্য স্থান-নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ-

শস্যাকরবতী পুণ্যা খনিদ্রব্যসমন্বিতা। ২৩৯-২৪ক। — যেখানে শস্যক্ষেত্র আছে, আকর (খনি) আছে, খনিদ্রব্য আছে, প্রচুর জল আছে, জলপথ ও স্থলপথ উভয় পথই আছে — এমন পরম রমণীয় পুণ্য জনপদই সভ্য মানুষের বাসযোগ্য হয়।

প্রাচীন ভারতীয়গণ বিভিন্ন প্রকার আকর থেকে খনিজদ্রব্য উত্তোলন করে, জীবনের বিবিধ প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন। বিচিত্র দ্রব্য-সম্ভার প্রস্তুত করার জন্য "কারুবেশ্ম" বা কর্মশালাও ছুন্সজ্জন্সব্দড়্ঙ্গন্মন্ন প্রাচীন ভারতে অবশ্যই ছিল।

৪৩ তম অধ্যায়ে তার সন্ধান পাওয়া যায়।

অগ্নিপুরাণে সামরিক বিজ্ঞান **(Military Science)** ন্যায়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন আছে এবং চিরকাল থাকবে। যুদ্ধ সম্পর্কে এটাই ভারতীয় সংস্কৃতি-সম্মত সিদ্ধান্ত।

অগ্নিপুরাণের ২৩৬তম অধ্যায়ে রণনীতি, রণকৌশল ও প্রয়াস এবং যুদ্ধ শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

"শত্রুং প্রাপ্য রণে মুক্তং পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ"।। ২৩৬-৬৪খ।।

— ২৩৬ তম অধ্যায়ের অন্তর্গত ৬৪ সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয় পাদান্তর্গত এই শ্লোকাংশটির বক্তব্য বিষয়কে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার-বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এখানে বিভ্রান্তির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্লোকাংশটিতে বলা হয়েছে ঃ—

"যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দীকৃত শত্রুকে মুক্ত করে দিয়ে তাঁকে পুত্রবৎ পরিপালন করা উচিত।"

— এই সামরিক দর্শনটি কেবল মাত্র সমসংস্কৃতিসম্পন্ন যুদ্ধরত ভারতীয় হিন্দু রাজাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অ-ভারতীয়, পরমত অসহিষ্ণু মতবাদের অনুগামী, ধর্মান্ধ-সংস্কারাপন্ন শত্রুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এই তত্ত্বনির্ণয়ে প্রমাদগ্রস্ত হয়েছিলেন বলেই — হিন্দুসম্রাট দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ চৌহান, মুসলমান আক্রমণকারী মুহাম্মদ শিহাব্-উদ্দিন-ঘোরীকে (মহম্মদ ঘোরী) দু-দুবার শত্রুরূপে যুদ্ধে পরাস্ত করেও মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত না করে প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলেন। তারই বিষময় ফলশ্রুতিতে তৃতীয়বার শত্রুরূপে যুদ্ধার্থী মুহাম্মদ শিহাব্-উদ্দিন ঘোরীর ছলনায় পরাজিত এবং বন্দী হয়ে শত্রু হস্তে নৃশংসভাবে নিহত হন। এই অবিমৃষ্যকারিতার সুদূরপ্রসারী প্রভাবে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারিয়ে বিদেশী মুসলমানদের দ্বারা ক্রমশঃ ধর্মান্তরিত হতে থাকে। "সেই ট্র্যাডিশন (Tradition) সমানে চলেছে"। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রের এমন যাবতীয় উদার বাণী সম্পর্কে আমাদের সতর্কতা অবলম্বনই শ্রেয়।

২৪২ তম অধ্যায়ে সৈন্যদলের ব্যূহরচনা ও সামরিক কৌশল বর্ণিত হয়েছে। ২৪৯ থেকে ২৫২ তম অধ্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধাস্ত্র, অস্ত্রপ্রয়োগরীতি, অস্ত্রপ্রয়োগের কুশলতা অর্জনের উপায় প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

অগ্নিপুরাণে অর্থনীতি **(Economics)**

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ — এই নিয়ে চতুর্বর্গ। এর মধ্যে মোক্ষলাভের জন্য আবার ধর্ম, অর্থ ও কাম — এই ত্রিবর্গের সম্যক্ সাধনা করতে হয়।

কৌটিল্য বলেন — ত্রিবর্গের মধ্যে অর্থই প্রধান। কারণ — ধর্ম ও কাম অর্থের উপরেই নির্ভর করে।

"অর্থ এব প্রধান ইতি কৌটিল্যঃ — অর্থমূলৌ হি ধর্মকামাবিতি।"

অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু অগ্নিপুরাণের নানা অধ্যায়ে প্রকীর্ণ আছে। "অর্থ" — বলতে লৌকিক বিত্ত এবং কর্মময় বিচিত্র জনজীবন বুঝায়।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এবং সমাজ-প্রশাসক রাজাকেও এই বিশাল কর্মকাণ্ডে সম্মিলিত করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ, পশুসম্পদ এমনকী মানবিক গুণাবলীও অর্থব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জনজীবনে শুচিতা, দেশপ্রেম, অর্থব্যবস্থার উন্নতির প্রধান সহায়ক বলা হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে বর্তমান ভারতবাসীকে ভাবতে হবে এবং বাস্তবে তাকে সফল করতে হবে।

পরিপূর্ণ সামগ্রিক জীবনের সাধনা ছিল প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শ। ধর্ম-অর্থ-কাম-এই ত্রিবর্গের সমভাবে অনুশীলন ছিল প্রাচীন ভারতের জীবনচর্যা।

ঋষি বলেছেন ঃ-

"ধর্মার্থকামা সমমেব সেব্যাঃ।

যো হি একসক্তো স জনো জঘন্যঃ।।"

— ধর্ম, অর্থ ও কাম, জীবনে সমানভাবে ভোগ করা উচিত। যে ব্যক্তি এর মধ্যে যে কোনও একটিকে অধিক গুরুত্ব দেয়, সেই ব্যক্তি ঘৃণার যোগ্য।

অগ্নিপুরাণে রাষ্ট্রনীতি **(Political Science)**

অগ্নিপুরাণের বিভিন্ন অধ্যায়ে রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় প্রকীর্ণ রয়েছে। স্বেচ্ছাচারী রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত (Impeachment) করার প্রেরণাও আছে। ভারতীয় রাজতন্ত্র যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী ছিল না, অগ্নিপুরাণের ১৮ শ অধ্যায়ে তার প্রমাণ পাই ঃ — মহারাজ অঙ্গের পত্নী সুনীথা, তাঁদের পুত্র বেণ। রাজা বেণ প্রজাপালনে মনোযোগ না দিয়ে অসৎকার্যে রত ছিলেন। সেইজন্য মহর্ষিগণ কুশাঘাতে তাঁর প্রাণ বিনাশ করেন।

অঙ্গাৎ সুনীথাপত্যং বৈ বেণমেকং ব্যজায়ত।

অরক্ষকঃ পাপরতঃ স হতো মুনিভিঃ কুশৈঃ।। ১৮-১১।।

ঋষিবৃন্দ বা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নতুন রাজাকেও রাজপদে অভিষিক্ত করতেন। যেমন — মহর্ষিগণ রাজা বেণকে নিহত করে তাঁরই পুত্র পৃথুকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

আধুনিক ভারতের সুনাগরিকগণ রাষ্ট্রনেতার নিয়োগ ও পদচ্যুতি বিষয়ে অগ্নিপুরাণ থেকে প্রেরণা পেতে পারেন।

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান **(History & Sociology)**

অগ্নিপুরাণ শুধু রাজবংশ নয়, প্রাচীন ভারতীয় জনসাধারণের সামগ্রিক জীবনচর্যার প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে।

সমাজবিজ্ঞানের একটি তথ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন রাজা নাভাগের দুই পুত্র, বৈশ্য হয়েও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। নাভাগস্য চ পুত্রৌ দ্বৌ বৈশৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ। ২৭৩-১৭ক।

এছাড়াও অগ্নিপুরাণে সাহিত্যতত্ত্ব, ব্যাকরণ, নৃত্যকলা, অভিনয় -কলা এবং দার্শনিক বিষয়াবলী আলোচিত হয়েছে।

অগ্নিপুরাণ — ভারতীয় জনজীবনে ঐহিক অভ্যুদয়, সুস্থ আনন্দময় সুখ সমৃদ্ধ জীবনের সঙ্গে পারলৌকিক মুক্তি-সাধনা এবং ব্রহ্মানুভূতির সামঞ্জস্য বিধান করে সুষম অখন্ড জীবনবোধের প্রতিষ্ঠা করার প্রেরণা দেয়।

হিন্দুত্ব

প্রীতিমাধব রায়

বিশ্বজনীনতা ও সর্বজীবের শান্তি হিন্দুত্বের মূলীভূত সত্ত্বা। হিন্দুধর্মগ্রন্থের আরম্ভে ও অন্তে থাকে শান্তিপাঠ। সত্য ও মার্গকে জানার আহ্বান জানায় যখন শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ, তখন সেই আহ্বান ধর্মমতের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকে না। দেশ-কালের গন্ডি অতিক্রম করে সে আহ্বান করে সমগ্র বিশ্বের অমৃতের পুত্রদের। হিন্দুধর্ম সুখ ও নিরাময় কামনা করে বলে— 'সর্বে সুখিনা সন্তু'। অথচ, এই হিন্দুত্বকেই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেয় তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ পেশাদার রাজনীতিবিদেরা, পণ্ডিতমন্যেরা, পেশাদার বহু সংবাদমাধ্যম।

ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে অনেকে বোঝেন ধর্মহীনতা, কেউ বা বোঝেন সব ধর্মকে সমান বলা। অবশ্য ভারতের ওই ধর্মনিরপেক্ষতা বাদীরা শব্দটির অর্থ, হিন্দুধর্মের নিন্দা ও অন্যধর্মের জয়গান বলে মনে করেন। যেজন্য ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে ভারত সেবাশ্রম সংঘ সকলেই হল সাম্প্রদায়িক আর ভারত বিভাগকারী মুসলিম লীগ হল ধর্মনিরপেক্ষ। অসংখ্য জনজাতির মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করা নিঃশব্দে ঘটে চলেছে। সংবাদমাধ্যম সে বিষয়ে উদাসীন, অথচ কোথাও ধর্মান্তরিত ভারতীয় স্বধর্মে পরাবর্তিত হলে সরগোল পড়ে যায়।

একথা তথ্যগতভাবে সত্য যে, ভারতে মুসলমান ও খৃস্টানদের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে অনেক দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, এই অসম বৃদ্ধি ভারতের অস্তিত্বের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা অবশ্যই দূর করা উচিত এবং যত তাড়াতাড়ি এই সব পাপ থেকে ভারত মুক্ত হবে ততই মঙ্গল। কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি দেরি হয়, কিন্তু ভারত যদি একবার অহিন্দু প্রধান দেশ হয়ে যায় তা হলে সমগ্র ভারতের জনগণের তথা বিশ্ব সভ্যতার পক্ষে তা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। পৃথিবীতে যত মুসলিম দেশ আছে, তার প্রত্যেকটিই কম-বেশি পরধর্মবিরোধী, হিংস্র ও সভ্যতার পরিপন্থী। কোনদিন যে তারা সভ্য দেশ, সহনশীল ও সংস্কৃতিমনা হয়ে উঠবে তার লক্ষণ এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ, ভারতের বহু হিন্দু এ সম্বন্ধে উদাসীন। আর পেশদার রাজনীতিকরা তো সামান্য মুসলিম ভোটের লোভে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করে মুসলিম তোষণ করে যাচ্ছেন।

রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন একাত্মবোধ। বহু সংখ্যক মানুষ যখন কোনও একটি কারণে নিজেদের এক বলে মনে করে তখনই সেখানে রাষ্ট্রীয় সংহতি বজায় থাকে। ভারতবর্ষে বহু ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর, বহু ভাষা-ভাষী, আহার্য, পোষাক-পরিচ্ছদে ভিন্ন মানুষ বাস করেন একটি মাত্র রাষ্ট্রকে নিজের দেশ ভেবে। তাঁরা পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হতে চান না, কারণ তাঁরা হিন্দু। অরুণাচলের হিন্দুর সঙ্গে কেরলের হিন্দুর, কাশ্মীরের হিন্দুর সঙ্গে তামিলনাড়ুর হিন্দুর আকৃতি, প্রকৃতি, জীবন-যাত্রায় অনেক পার্থক্য আছে। অথচ, তাঁরা নিজেদের ভারতীয় মনে করেন, আর পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর সঙ্গে বাংলাদেশের মুসলমানদের নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগত একত্ব থাকা সত্ত্বেও তারা ভিন্ন রাষ্ট্রবাসী হয়েছে, কেবল ধর্মীয় ভিত্তিতে। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, পরধর্ম সবচেয়ে বিপজ্জনক বিচ্ছেদকারী শক্তি। যখনই ভারতের কোনও অঞ্চলের মানুষ নিজেদের হিন্দুধর্মসত্ত্বাকে অস্বীকার করেছে তখনই সেই অংশে বিচ্ছেদকারী প্রবণতা এসেছে। অখণ্ড ভারতের যে যে অংশ মুসলমান প্রধান হয়েছে তারা পাকিস্তান, বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে। আবার শিখদের একাংশ যখন মনে করেছে তারা হিন্দুদের থেকে পৃথক, তখনই তারা তাদের মহান শিখগুরুদের শিক্ষা ভুলে পৃথক হতে চেয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রকে যখন অশ্রদ্ধা করতে চেয়েছে দ্রাবিড় জনতার একাংশ তখনই সেখানে বিচ্ছেদকামী প্রবণতা এসেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের যে অংশগুলির জনজাতিরা খৃষ্টধর্মে যোগ দিয়েছে তখনই সেখানে এসেছে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা। ভারতের প্রতিটি মানুষের বোঝা দরকার যে, ভারতের প্রতিটি অংশকে হিন্দুপ্রধান রাখার অর্থ ভারতকে একরাষ্ট্রে রাখা এবং বিপরীত হলে ভারত বলে কোনও সভ্য দেশ থাকবে না। দরিদ্র দেশ ধনী হতে পারে, অশিক্ষিত দেশ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু হিন্দু ভারত যদি কখনও বিধর্মী প্রধান হয় তাহলে তা আবার হিন্দু ভারত-পরিবর্তিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। এর থেকে বড় বিপদ আর নেই।

ভারতীয় হিন্দুর অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ধরন বিভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে অনিয়ন্ত্রিত জন্মহার বৃদ্ধির জন্য ও অনুপ্রবেশের জন্য। ভারতের অনেক মুসলমান নেতা ও মোল্লারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সাধারণ

মুসলমানদের উপদেশ দিয়ে থাকে, যাতে ভারতে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পায়। আর একটি পন্থা হল অনুপ্রবেশ। বাংলাদেশ এক দরিদ্র জনসংখ্যাবহুল দেশ, যেখান থেকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ চলছে অসমে, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এমনকী অন্য রাজ্যেও। জয়পুরে যে বিরাট বিস্ফোরণ কাণ্ড সম্প্রতি ঘটে গেল তার কর্মী হল হুজি নামক একটি সন্ত্রাসবাদী মুসলমান সংস্থা, যার মূল ঘাঁটি বাংলাদেশ। আর তারা যে সুদূর জয়পুরে এই ঘটনাটি ঘটাতে পারল তার কারণ, জয়পুরের আশপাশেই পঞ্চাশ হাজারের মত বাংলাদেশী বাস করছে বিনা বাঁধায়। এমনই অবস্থা দিল্লী, মুম্বাই ও অন্য অনেক শহরেই। তাদের সহায়ক হল স্টুডেন্টস্ ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নামে একটি সংস্থা, যাকে সংক্ষেপে বলা হয় সিমি।

অনুপ্রবেশ কোনও দেশেই আইনসম্মত নয়, কিন্তু ভারতের মতো ঘনবসতির দেশে অনুপ্রবেশ কেবল বেআইনী নয়, সন্ত্রাস সম্ভাবনার দিক থেকেও বিপজ্জনক। আবার ভারতে এখনই যে অন্ততঃ দুই কোটি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী আছে তারা দরিদ্র ভারতবাসীর খাদ্যে - বস্ত্রে - বাসস্থানে-আবাসে এবং কাজকর্মে ভাগ বসাচ্ছে, যার কুফল ভোগ করছে সমগ্র ভারতবাসী। এজন্য সমগ্র অনুপ্রবেশকারী জনসংখ্যাকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা অত্যাবশক এবং আইনসম্মত। বিতাড়িত না করাটাই বিপজ্জনক ও বেআইনী। যাঁরা এই বিতাড়নের বিরোধিতা করছেন, তাঁরা দেশ বিরোধী ও বেআইনী কাজ করছেন। আর অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিষেধক হল দুই -তিনটি সন্তান জন্মের পরবর্ত্তীগুলির ক্ষেত্রে সচেতনতা জাগরণ ও আইন অনুযায়ী অতিরিক্ত সন্তানগুলির ক্ষেত্রে কিছু কিছু সুবিধাদান বন্ধ করা যা চীন দেশ করতে পেরেছে।

অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্য কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে সীমান্তে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশ চলছে। কারণ, বেড়া সব জায়গায় ঠিকমত দেওয়া হয়নি। সীমান্তের মুসলমান জনবসতি ও অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু দালালেরা অনুপ্রবেশে সহায়তা করছে। অনেক ক্ষেত্রে সীমান্তরক্ষীরাও অর্থের বিনিময়ে এদের সহযোগিতা করছে। আরও একটা কথা, কেবল বেড়া দিয়েই অনুপ্রবেশ বন্ধ করা সম্ভব নয়। একবার অনুপ্রবেশ করতে পারলে অন্যায়ভাবে ভোটার তালিকায় নাম তুলে এবং রেশন কার্ড হস্তগত করে ভারতীয় বনে যাওয়াটাও চলছে। এক্ষেত্রে উপায় হল, কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখ থেকে ভোটার তালিকা ধরে অনুসন্ধান করা যে সেই তারিখের আগে ব্যক্তিটি কোথায় ছিল। সে কি তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল, বা ভারতেরই অন্য কোথাও ছিল? এইভাবে অনুসন্ধান করলে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, যেখানে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল দেশের স্বার্থের চেয়ে ভোটের স্বার্থ বেশি করে দেখে সেখানে এই কড়াকড়ি করা কঠিন। যদি কোনও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল এককভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করতে পারে তবেই অনুপ্রবেশ সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব।

দেশের খৃষ্টান সংখ্যা বৃদ্ধি কিন্তু মূলত জন্মহার বৃদ্ধির জন্য ঘটছে না, এটা ঘটছে ধর্মান্তরকরণের দ্বারা। এই ধর্মান্তরকরণের পিছনে আছে মিশনারীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও নানা কলাকৌশল।

কিন্তু, এর জন্য হিন্দুদেরও দায়িত্ব আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরণ সবচেয়ে বেশি ঘটেছে জনজাতিদের মধ্যে এবং বর্ণহিন্দুদের মধ্যে তথাকথিত নিম্নর্ণের মধ্যে, যেখানে হিন্দুধর্মের সম্পর্কে জ্ঞান, ধর্মীয় রীতি নীতি ও সামাজিক ব্যবহার সঠিকভাবে প্রচলিত হয়নি।

শ্রীরামপুরের মিশনারী কলেজের অধ্যক্ষ একজন উচ্চশিক্ষিত খৃষ্টান মিজো। তিনি আমার সঙ্গে আলোচনার সময়ে বলেছেন যে, খৃস্টান মিশনারীদের সেবার কারণেই লুসাই বা মিজো জনজাতি আধুনিক শিক্ষা, আচার-ব্যবহার ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। খৃষ্টান মিশনারীরা ওই হিংস্র সমাজে প্রাণ ভয়, রোগ দুঃখ কষ্ট সহ্য করে সেবা করতে আসেন এবং সেবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্তরকরণ করেন। ফলে, এইভাবেই মিজো, নাগা, গারো প্রভৃতিরা খৃস্টান হয়ে যান। অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে বললেন, সেই সময়ে যদি হিন্দুধর্ম প্রচারকারীরা তাঁদের কাছে যেতেন তা হলে তাঁরা সম্ভবত হিন্দু হতেন। একথা অনেকাংশে সত্য। শঙ্করদেব অহমদের মধ্যে হিন্দুধর্ম প্রচার করেন, শিবনারায়ণ পরমহংস মেচ জনজাতির মধ্যে শৈবধর্ম প্রচার করেন, বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয় মণিপুরে, ফলে ঐ সমস্ত স্থানে খৃষ্টধর্ম তেমনভাবে বাড়তে পারেনি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর অনতিদীর্ঘ জীবনে যখন ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে যান তখন ওখানকার জনজাতিদের ধর্মকে বজায় রেখেই বৈষ্ণবধর্ম ও নাম-গান প্রচার করেন। সেখানে জনজাতিদের মধ্যে তাদের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী মোরগ বলি ও হরিনাম একই সঙ্গে চলেছে। কাজেই হিন্দুদের পক্ষ থেকে সেই আন্তরিক অভিযান যদি চলত বা এখনও চলে তা হলে ধর্মান্তরকরণ রোধ ও স্বধর্মে পরিবর্তন এখনও সম্ভব।

বর্তমানে একটা রীতি হয়েছে, সর্বধর্মকে সমান বলে প্রচার করা যা অসত্য। সত্য হল সব ধর্ম সমান নয়। একথা মোটেই সহনশীলতা বিরোধী নয়। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, সমস্ত ধর্মচিন্তার মধ্যে হিন্দু ধর্ম, সমাজনীতি রাষ্ট্রচিন্তা ও অর্থনীতি সর্বশ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে আমার লেখা একটা ছোট বই 'হিন্দুরাষ্ট্র ভাবনা'-তে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে, এখানে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব নয়। এইটুকু বলা যায় যে বৈজ্ঞানিকতায়, মতপ্রচারের স্বাধীনতায়, বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ ও ধর্মবোধের মাধ্যমে হিন্দুত্ব শ্রেষ্ঠমানব তৈরি করার পথ যেমন করে দেখিয়েছে অন্য কোনও ধর্মের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তবু যে হিন্দুধর্ম বিস্তারের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে, তার কারণ, তত্ত্ব ও সত্য তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন তা কর্মের দ্বারা রূপায়িত হয়। শ্রেষ্ঠ চিন্তাও অলস হলে, চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তা ফলপ্রসূ হয় না।

কোনধর্মের প্রসারকে সফল করতে হলে তত্ত্ব, প্রয়োগ ও বিপ্লবী নিষ্ঠার সমন্বয় ঘটাতে হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই সমন্বয়টি ঘটাতে পেরেছিলেন। তাঁর ভক্তিধর্মের তত্ত্বকথা রচনা করেছিলেন রূপ, সনাতন, শ্রীজীব প্রমুখেরা, যাঁরা ভক্তি ও অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের সম্বন্ধে মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করেন বৃন্দাবনে, সংসারী জনসাধারণের মধ্যে নামকীর্তন ও ভক্তিধর্মকে প্রচার করেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আর বৈপ্লবিক নিষ্ঠার দিকটি ধরে থাকেন শ্রীচৈতন্য নিজে ও তাঁর অন্তরঙ্গ, শ্রীরাম, গদাধর পণ্ডিত প্রমুখ নীলাচলে বসে। তাই ভক্তিধর্ম এখন বিশ্বে তথা পাশ্চাত্যের খৃস্টান সমাজেও বিস্তৃতি লাভ করেছে। আগে বলা হয়েছে সব ধর্ম সমান নয়। একথা বলার মধ্যে বিরোধী বা শত্রুতামূলক কোনও মনোভাব নেই। সব ভাষা সমান সম্পদশালী নয় একথা বলার মধ্যে কি কোনও বিদ্বেষ আছে। একথা নিছক সত্য। সাঁওতালী ভাষা এক সরল হৃদয় ভারতীয় জনজাতির ভাষা যার উন্নতি আমি কামনা করি। আর ইংরাজী হল এক বিধর্মী বিদেশীদের ভাষা যারা একদিন ভারতে

সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করেছিল। কিন্তু একথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইংরাজী ভাষা সাঁওতালী ভাষার চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। এমন কী, আমার অতিপ্রিয় বাংলাভাষার চেয়ে বিষয় সম্পদে সমৃদ্ধ।

সব ধর্ম সমান, একথা প্রচার করতে গিয়ে অনেকে বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ নাকি বলেছেন, সব ধর্ম সমান। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যত বই আমি পড়েছি, তাতে এমন কথা কোথাও নেই। তাঁর কতকগুলি উক্তিকে এইভাবে অপব্যাখ্যা করা হয়। যা সঠিক নয়। কথা বলতে বলতে যাঁর গলায় কর্কট রোগ হয়ে গেল, তিনি একবারও কেন সহজভাবে বললেন না যে, সব ধর্ম সমান। বরং তিনি এর বিপরীত ইঙ্গিত দিয়েছেন কথায় ও জীবন চর্যায়। তিনি বলেছেন, রাজার কাছে দেউড়ি দিয়েও যাওয়া যায়, খিড়কি দরজা দিয়ে যাওয়া যায়। তাঁর অর্থ, পথেরও ভাল-মন্দ আছে, তিনি তোতাপুরীজীর কাছে ব্রহ্মসাধনা করেছেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে তন্ত্রসাধনা করেছেন, গোবিন্দরায়ের কাছে ইসলামী সাধনা করেছেন, গির্জার দ্বারে দাঁড়িয়ে খৃষ্টীয় প্রার্থনা শুনেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থেকেছেন মা ভবতারিণীর সন্তান, তাঁর শেষকৃত্যও হিন্দু ধারাতেই হয়েছে। এতে বরং বোঝায় যে কোন ধর্মীয় ধারাকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন।

ধর্মের তো বহু হয় না, ধর্ম তো একটাই হয়, তফাৎ হয় ধর্ম মার্গের। ধর্ম বলতে বোঝায় যা মানুষকে মনুষ্যত্বে ধরে রাখে। ভিন্ন ভিন্ন হয় ধর্মপথ। এই পথগুলি নিশ্চয়ই সমান নয়। ইসলাম বা খৃষ্টধর্মের সঙ্গে হিন্দুত্বের তুলনামূলক আলোচনা করলে হয়ত সাম্প্রদায়িকতার কথা তোলা হবে। তাই বলি হিন্দুধর্মের মধ্যেই যে বহু মত পথ আছে সবগুলিকে কি সমান বলা যায়। বিজ্ঞানসম্মত ব্রহ্মবিদ্যা বা শ্রদ্ধাভক্তির পবিত্র পথ মানুষের পক্ষে যত উপযোগী, মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা, মৈথুন সহযোগে বামাচার পন্থানুসরণ নিশ্চয়ই তত উপযোগী ও শুদ্ধ পথ নয়। একথা প্রকাশ করার মধ্যে দোষ কোথায়।

একটা চলতি কথা আছে, সব মানুষ সমান, যা অসত্য। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সর্বজীবে ব্রহ্মবিরাজমান সে অন্য কথা, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান নয়। জার্মান আইনস্টাইন আর জার্মাণ আইখম্যান সমান নন, ইংরাজ ডেভিড হেয়ার আর ইংরাজ কার্জন সমান নন, মুসলমান নজরুল ইসলাম আর সুরাবর্দী সমান নন, হিন্দু স্বামী বিবেকানন্দ ও হিন্দু উমিচাঁদ সমান নন। একইভাবে সব ধর্মপথ সমান নয়। এবং ধর্মপথের মধ্যে হিন্দুত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ।

ধর্মকে মূলতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, একটি সনাতন ধর্ম, অন্যটি প্রবর্তকবাদী ধর্ম। সনাতন ধর্ম কোনও একটি মানুষের দ্বারা কোনও একটি গ্রন্থের ভিত্তিতে স্থাপিত নয়। হিন্দুত্ব হল সনাতন ধর্ম যা মানুষের স্বাভাবিক ও তার গতিপথে, জীবন চর্যায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংস্কারের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে, সেখানে মূলগ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য, ব্যাখ্যা করার এমনকী বিরোধিতা করার অধিকারও প্রতিটি মানুষের আছে। বেদ রচয়িতারা ভণ্ড, নিশাচর এমন কথা বলার পরও চার্বাককে কোতল করার ফতোয়া দেন না ঋষিরা বা রাজারা, চার্বাক দর্শনও হিন্দুদর্শনে এক স্বীকৃত দর্শন।

অপরপক্ষে প্রবর্তকের ধর্মে কোন কালে, কোন পরিস্থিতিতে প্রবর্তক যা বলেছেন, তার বিরোধিতা করা হবে প্রাণদণ্ডযোগ্য ধর্মবিরুদ্ধ তা। গান্ধিজীর মতো মানুষ, যিনি ইসলামী খৃষ্টীয় মতবাদকেও যথেষ্ট সম্মান দিয়েছেন, তিনিও পরিচয় দেওয়ার সময়ে বা লেখার সময়ে নিজেকে সনাতনী হিন্দু বলতেন, কারণ, তাঁর লেখাতেই আছে যে, আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে অন্য কোনও ধর্ম মতের তুলনা হয় না।

দুঃখের বিষয়, হিন্দুসমাজের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে হিন্দুত্ব সম্পর্কে এই গৌরববোধ, এই অস্মিতা ঠিকমতো ভাবে গড়ে ওঠেনি। এই শিক্ষিত সমাজের বিরাট অংশ এখন যুক্তিহীন সর্বধর্মে সমানত্বের ভ্রান্ত আদর্শে নেশাগ্রস্ত হয়ে আছেন। জাতিকে সত্য ও ন্যায্য স্বাভিমানের পথে অগ্রসর করার জন্য শিক্ষিত সমাজের ঘুম ভাঙা দরকার। কোনও মতবাদকে শ্রেষ্ঠ মতবাদকেও প্রসারিত করার জন্য দরকার গভীর সত্যবিশ্বাস ও নিষ্ঠা এবং অগ্রগামী মনোভাব। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে আঘাত করা হচ্ছে সংখ্যাবৃদ্ধি ও ধর্মান্তরকরণের পথে। তার প্রতিবিধান করতে হবে আইনের মাধ্যমে সরকারকে, সচেতনার মাধ্যমে সমাজকে। কিন্তু, প্রসারের জন্য তো আত্মরক্ষাই যথেষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে মতবাদকে, ধর্মকে, সংস্কৃতিকে প্রসারিত করতে হবে অগ্রগামী ভূমিকায় এবং এতে কোনও অন্যায় নেই। মানব সমাজকে যেমন অধিকতর সুস্থ, সমৃদ্ধ ও সুখী করার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রচেষ্টা করতে হয় শ্রেষ্ঠপথে, মানুষকে মন, চরিত্র, বিচার ও সভ্যতায় অগ্রগামী করতে গেলে মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান হিন্দুত্বকে গভীরভাবে জানা, মনন করা ও বিশ্বাস করার প্রয়োজন আছে। যদি এই সত্য বিশ্বাস আমাদের মনে দৃঢ় হয় যে, আমরা হিন্দুরা শ্রেষ্ঠ মার্গ অবলম্বী, তবেই আমরা এই মার্গকে সমগ্র বিশ্বের মানবের মধ্যে প্রসারিত করার যোগ্য হব, আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা হবে হিন্দুত্বকে অগ্রগামী করতে। ঈশ্বর আমাদের সহায় হন।

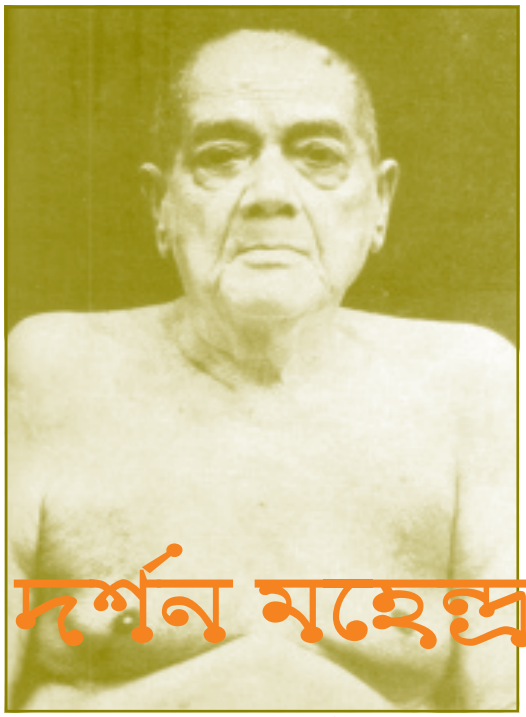

পুণ্য দর্শন মহেন্দ্রনাথ জীবন চেনায় যারে

অরিন্দম মুখার্জী

গত শতকের দুই-এর দশক। সে সময় কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে কলেজ স্ট্রীট যাওয়ার পথে হেদুয়ার পরে ডান হাতের তৃতীয় গলির মুখে খোলার চালের ঘরে শোভন চাচার হোটেল সবার চোখে পড়ত। আর চাচার হোটেলের গা দিয়ে যে সরু গলিটা পশ্চিমমুখে এগিয়ে গেছে তার পোষাকী নাম গৌর মোহন মুখার্জী স্ট্রীট। ঐ গলিটায় ঢুকে দিকের তিন নম্বর বাড়ি। বাড়িটা আকারে বেশ বড় হলেও তার গায়ে বেশ জীর্ণতার ছাপ। এই বাড়িতে প্রবেশ করে যে চলন পথ ভিতর বাড়িতে নিয়ে যায়, তা ঈষৎ বক্রাকৃতি। পথের দু-ধারে অল্প উঁচু রোয়াক। আর দুই ধারের ইঁট বের করা দেওয়ালের উপরে ছাদের বরগা উই ধরে খসে যাওয়ায় মাঝে মাঝে বাঁশ দিয়ে ঝুলন্ত ছাদকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর সামনে উঠোন। এই উঠোনের পশ্চিমদিকের রোয়াকে একজন মুন্ডিত মস্তক মানুষ এতক্ষণ একটা ছোবড়ার গদির ভাঙা সোফায় উবু হয়ে বসে ছিলেন। সন্ধ্যা হয় হয়। বৃদ্ধ মানুষটি এবার উঠে দাঁড়ালেন। বিশাল তাঁর শরীর, বিস্ফোরিত নেত্রদ্বয়, চওড়া বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু। ধীর পদক্ষেপে মানুষটি পশ্চিমের রোয়াক ছেড়ে পূর্ব দিকের প্রথম ঘরে প্রবেশ করলেন।

ঐ ঘরটির অবস্থা বাইরেরই মতো। সে ঘরে শেষ কবে রাজমিস্ত্রি ঢুকেছে তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। দেওয়াল থেকে মাঝে মাঝেই বালি ঝরে পড়ে। গলির ধারে ঘরের একটি জানলা। জানলার ধারে কলাইয়ের ডিস ঢাকা একটা বিরাট মেটে কলসী, গোটা দুই গ্লাস। ঐ জানলার পাশেই একটি ভাঙা আলমারি। ঘরে একটা তক্তপোষ পাতা, তার উপর উঁচু-নীচু ঢেউ খেলানো বিছানা। বিছানার মাথার দিকে অস্বাভাবিক উঁচু একটি তাকিয়া। ঘরের একধারে একটি সাধারণ টেবিল। টেবিলে অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে একটি কালচে পানের ডিবা, একটি লম্বা বহু পুরাতন এনামেল পাত্রে গোটা দুই কলম ও পাশে কালির দোয়াত।

বাইরে গলির গ্যাসের আলো জ্বলে উঠেছে। এমন সময় ভিতর বাড়ি থেকে এক ব্যক্তি একটি লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঘরে রেখে গেলেন। ঐ লণ্ঠনে যাতে বেশি আলো না হয় তার জন্য চিমনীর কাঁচের সামনের দিক কাগজ দিয়ে ঢাকা। দু', চারজন করে ঐ ঘরে কিছু মানুষ ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছেন। অথচ কারুর মুখে কোনও কথা নেই। ঘরটিতে থম্‌থমে নিস্তব্ধতা। কেবল আপনভাবে বিভোর হয়ে ঐ বৃদ্ধ মানুষটি ডান হাতের তর্জনী এবং মধ্যমা নেড়ে নেড়ে ফিস্‌ফিস করে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। কেবল মাঝে মাঝে মানুষটির যেন ধ্যান ভঙ্গ হচ্ছে আর চমকে উঠে ঘরের নিস্তব্ধতা খান খান করে বলে উঠছেন — 'হে হর শংকর! হে হর শংকর!' মানুষটি অনেক পরে চোখ মেলে তাকালেন। গলার স্বর যেন অন্য কোনও জগৎ থেকে ভেসে আসা ধ্বনি। বললেন — জপ হল একটা Wonderful Discovery। তোমরা সব জপ করবে। অনেক জপ করবে। আমার বাপু জপ করতে করতেই মন স্থির হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম জপ করতে করতে গায়ের চামড়ার উপর জ্বলুনী ভাব এল। তারপর মড়া পোড়ার একটা দুর্গন্ধ নাকে এল। বুঝলাম আমার দেহের উদ্ধ্বপ্পপ্প -গুলো প্রতি মুহূর্তে পুড়ে ছাই হচ্ছে। আরও পরে যখন মনটা স্থির হয়ে গেল তখন সর্ব শরীর হিম ঠান্ডা, নাড়ীর গতিও আর নেই। তখন সেকি স্নিগ্ধ জ্যোতি! অনাদি লিঙ্গম্! জ্যোতির্ময় লিঙ্গম্! — কথা আবার বন্ধ। ঘরে সেই আগের মতোই নিস্তব্ধতা। ঘরে যারা বসেছিলেন তাঁরা এবার আস্তে আস্তে উঠতে শুরু করলেন। হাত-পা

শিথিল, দেহ টলমল করছে। কিন্তু মনটা শান্ত, সেখানে যেন অনেক পাওয়ার তৃপ্তি। অথচ কেউই বুঝতে পারলেন না তিনি ঠিক কি পেলেন।

তিন নম্বর গৌর মুখার্জী স্ট্রীটের ঐ বৃদ্ধ মানুষটি আর কেউ নন, তিনি পূণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা। মহেন্দ্রনাথের বিষয়ে আজও মানুষ খুব কমই জানে। হাতে গোনা ভক্ত, সেবক, কিছু স্নেহের পাত্র তাঁর কাছে যাতায়াত করত। মানুষের সান্নিধ্যে বেশ অনীহা ছিল। এমনও ঘটেছে মহেন্দ্রনাথ দশ-বারোদিন একটি কথাও বলেননি। সকলে এসেছে, গেছে, কিন্তু তিনি তাঁর জগতেই রয়ে গেছেন।

বাইরে কি, খোঁজ অন্তরে

সেদিন বিকেলে এক প্রিয় ভক্তকে ডিক্টেশন দিচ্ছেন। স্বামী সারদানন্দের অনুধ্যান রচিত হচ্ছে। দুই-আড়াই ঘন্টা নোট লেখাবার পর তাঁর চমক ভাঙল। বললেন — আজ হরিমটর। স্কুল পড়ুয়া ভক্ত অবাক হয়ে বলল — আপনার দাঁতে ব্যাথা, দাঁত নড়ছে, মটর ভাজা চিবিয়ে কি করে খেলেন? উত্তরে তিনি হেসে বললেন — যাদু, আজ কিছু জোটেনি। একটু পরে ব্রহ্মচারী প্রাণেক্ষ এসে জানতে পেরে কাছের দোকান থেকে মুড়ি, আর সকালের ভাজা চপ-বেগুনি এনে দিলেন। সে সব নিশ্চিন্তে খেয়ে, এক মনে ফার্সি টানতে শুরু করলেন। যেন কিছুই হয়নি। এ রকম প্রায়ই হোত। অনেক সময়ই অনাহার, অর্ধাহারে তাঁকে থাকতে হয়েছে। সে নিয়ে কখনই তাঁর কোনও অভিযোগ ছিল না। মহেন্দ্রনাথের এই অভাবে, বিচলিত এক শিষ্য একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল — আপনি এত কষ্ট করছেন কেন? ইচ্ছা করলেই তো সুখে থাকতে পারতেন! মহেন্দ্রনাথের তাৎক্ষণিক জবাব — তুই আমার বাইরে দেখছিস। বাইরে কি আছে রে! ভিতরেই সব। ভিতরে যতখানি উঠবি, বাইরে ততখানি দেখবি। সবাই তো অন্নের জন্য ঘুরে বেড়ায়, অন্ন কাকে খোঁজে? আর কি জানিস Ideas govern humanity। আর vigorous idea, vagabond থেকেই বের হয়। পৃথিবীর ইতিহাস বলছে এটাই সত্য। স্বামিজীকে দেখিসনি? ওরে এমনি এমনি Neutral Zone -এ উঠতে পারবি নাকি? এসব করতে গেলে নিজের দিকে তাকালে হবে না। নিজেকে আহুতি না দিলে অন্যের ভাল হবে কি করে? কখনও হামবড়াই করবি না, তাহলে সব শক্তি চলে যাবে। বোকা-হাবার মতো থাকবি। সাত চড়ে রা কাড়বি না।

একবার এক দর্শনের বড় প্রফেসর আমার বই পড়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি তখন হেদোর মোড়ে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে বেগুনিওলাদের সঙ্গে গল্প করছি। সেই মাষ্টার বাবুটি তখন নাক সিঁটকে বললে — এই লোকটা Philosopher? আমি তখন তাকে বললেম — হ্যাঁ, এই লোকটা ত্নড়ঙ্গপ্তপ্সব্দপ্সব্দড়দ্বজ, তোমরা তো বাপু মাষ্টার। অন্যের কথা ধার করে বলছ। নিজের কিছু বলার আছে কি? কোনও Idea?

অদ্বৈতের মূর্ত প্রতীক

মহেন্দ্রনাথ গৃহী সন্ন্যাসী ছিলেন। ১৮৮২ সাল থেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর লীলা পার্ষদ। বিদেশে যাওয়ার আগে, বিদেশ থেকে ফিরে এসেও কঠোর তপস্যা করেছেন মায়াবতী, বৃন্দাবন, কনখলে। কনখলের দক্ষঘাটে একটি পাথরের উপর দিবারাত্র তপস্যায় ডুবে থাকতেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। দিনের পর দিন এইভাবেই কাটত। সন্ধ্যার আগে কন্‌খল আশ্রম থেকে কেউ এসে অল্প দুধ-ভাত মেখে মুখে তুলে দিয়ে যেত। পরে রাত্রে তারাই তাঁকে উঠিয়ে আশ্রমে নিয়ে যেত। এই জপ, ধ্যান তাঁর জীবনে অদ্বৈত তত্ত্বের চরম উপলব্ধি এনে দিয়েছিল। তবু কোনও প্রচলিত প্রথা তিনি ভাঙতেন না এবং কাউকে তা উলঙ্ঘন করতে দেখলে বিরক্ত হয়ে জোর ধমক দিতেন। তিনি নিজে ছিলেন অদ্বৈতের মূর্ত প্রতীক। মুখে বলতেন — এটা স্বামীজীর বাড়ি — রিপাবলিক — সকলেই সমান। মাঝে মাঝেই তাঁর কাছে একজন মুচি আসত। তাকে যত্ন করে চেয়ারে বসাতেন, প্লেটে খেতে দিতেন, আলিঙ্গন করতেন। হেদোর মোড়ে ঘোড়ার গাড়ি রাখার স্ট্যান্ড ছিল। সেখানকার গাড়োয়ানরা ঈদের সময় এসে ঘরে বসত, মহেন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করত। অনেক সময় করপোরেশনের জমাদার এসে ফিনাইল দিয়ে ঘর ধুয়ে দিত। একদিন তাদের একজনকে ডেকে বললেন — ওরে কলসিটা ধুয়ে জল এনে দে না। যখন তাদের ছোঁয়া এড়াতেই সে সময়ের কলকাতাবাসী ব্যস্ত থাকত তখন মহেন্দ্রনাথ সে সবের তোয়াক্কা করেননি। বলতেন ও সব সংস্কার আমার অনেকদিন কেটে গেছে।

পায়ে হেঁটে লন্ডন থেকে কলকাতা

কঠিন জেদ, ভীষণ অভিমান দত্ত পরিবারের বংশগত। তবে এতে পরিবারের সবাইকে কেউ যদি ছাড়িয়ে গিয়ে থাকেন তবে তিনি মহেন্দ্রনাথই। ১৮৯৬ সালে ব্যারিস্টারী পড়তে বিলাতে পৌঁছলেন মহেন্দ্রনাথ, স্বামীজী তখন লন্ডনেই। স্বামীজী ভাইকে বললেন পড়তে যদি চাও তবে ব্যারিস্টারী নয়, আমেরিকা যাও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হয়ে এস। দাদার নির্দেশ মেনে ব্যারিস্টারী পড়ার সংকল্প ত্যাগ করলেন। কিন্তু জেদের বসে আমেরিকাও গেলেন না। প্রায় দুই বছর বৃটিশ মিউজিয়ামে বই পড়ে কাটিয়েছিলেন। মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে সান — ইয়ৎ — সেনও পড়াশোনা করতেন। দুজনের খুব বন্ধুত্বও ছিল। দাদার উপর অভিমান তখনও কাটেনি। তার সঙ্গে দুনিয়াটাকে দেখারও খুব ইচ্ছা। তাই কারুর কাছ থেকে অর্থ না নিয়ে বের হয়ে পড়লেন পায়ে হেঁটে কলকাতার উদ্দেশ্যে। নিঃস্ব, কপর্দক শূন্য। ১৮৯৮ থেকে পাঁচ বছর ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়ার কত শত স্থান ঘুরে বাগদাদ-বসরা-করাচি হয়ে ১৯০২ সালে কাশ্মীরে পৌঁছে খবর পেলেন যার ওপর এত অভিমান সেই দাদাই মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে অনেক দূরে চলে গেছেন। মহেন্দ্রনাথের এই ভ্রমণ কথা ভীষণ বৈচিত্র্যময়। সারা জীবনে মহেন্দ্রনাথ বহু বই

লিখেছেন। লিখেছেন এ দেশে তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা। অজানা কারণে তাঁর এই বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা সেরকম কিছু লেখেননি। অল্প কিছু রয়ে গেছে তাঁর ভক্তবৃন্দের লেখাপত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। রাজ দরবারের সম্মান থেকে আরবের মরুভূমিতে ডাকাতের হাতে বন্দী, কোনও অভিজ্ঞতাই বাকি ছিল না তাঁর। একবার এক ভক্ত মহেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিল — আপনি এত কষ্ট সহ্য করে পায়ে হেঁটে কেন সারা পৃথিবীটা ঘুরলেন? মহেন্দ্রনাথ অতীব গম্ভীরভাবে তাকে বলেন — To find out the cause of this Grand Mani-festation.

স্রষ্টা অমর, যে সৃষ্টিতে

মহেন্দ্রনাথ সারা জীবনে বই লিখেছেন শতাধিক। কী অদ্ভুত তার বিষয় বৈচিত্র্য। একদিকে রচনা করেছেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অন্যান্য ভক্ত শিষ্যদের অনুধ্যান, অন্যদিকে বিজ্ঞান ভিত্তিক নানা গ্রন্থে খন্ডন করেছেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নানা মারাত্মক ভ্রমাত্মক মতবাদ। একদিকে রচনা করেছেন চিত্র-শিল্পকলার ইতিহাস, আবার অন্যদিকেরচনা করেছেন ভাষাতত্ত্বের বই। বাংলাভাষায় পাশুপত অস্ত্রলাভের মতো কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে ইংরাজিতে রচিত হয়েছে কুরুক্ষেত্র মহাকাব্য। লিখেছেন পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস থেকে সঙ্গীত, নৃত্যকলার দর্শন পর্যন্ত।

কবে এত সব লিখলেন? কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত, মহেন্দ্রনাথ জবাবে বলতেন — আমার কি মুরোদ! রাস্তার ঘেয়ো কুকুর। রাত্তিরে একটা ভূত এসে লাথি মারে। আমি সেই ভূতের লাথি খেয়ে রাতে ছট্‌ফট্ করি, সকালে কেউ এলে বলি ধরতো গা, কাগজ-কলম। যা বলছি লিখে ফেল। হুঁ, হুঁ বাবা, ভূতের লাথি খেলে তবে বুঝতে।

মহেন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের লিপিকার প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন — দুই-আড়াই ঘন্টা টানা ইংরাজিতে বলে যেতেন, তখন যেন অন্য মানুষ। বিস্ফোরিত নেত্রে অনর্গল কথা বলে যেতেন সেই বিরাট পুরুষ। যেই লেখা শেষ হত তখনই নিঃঝুম, নিস্তেজ হয়ে পড়তেন। কখনো কখনো গায়ে জ্বর এসে যেত। বলতেন গায়ে দুটো কম্বল ঢাকা দাও। তখন ঠিক যেন একটি শিশু। রোজ না হলেও প্রায়ই এরকম হত।

দেশ-সমাজ-ধর্ম

মহেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই বলতেন ওরে দ্যাখ, জাতটার বুক ভেঙে গেছে রে। আমি এদেশের কত গ্রামে ঘুরেছি। দেখেছি দেশে আজও কী ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য। এখানে মানুষের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই। সমস্ত দেশটা শ্মশান হয়ে গেছে। বুদ্ধের ত্যাগ-বৈরাগ্যের এখন কোনও দাম নেই। তখন লোকের পেটে ভাত ছিল। এই রকম দুরবস্থা ছিল না। নিজের জন্যে অনেকেই কাঁদে, পরের দুঃখে, পরের জন্য চোখের জল ফেলে দেখ না। স্বামী বিবেকানন্দ দেশের এত প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন দেশকে ভালবেসেছিলেন বলে, তাঁর ধ্যান-ভজনের জন্য নয়। Heart এবং Intellect দুটোই চাই কিছু করতে গেলে।

ব্যক্তি স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণ, সমাজতন্ত্র (Socialism) প্রভৃতি নিয়ে অনেক লিখেছেন মহেন্দ্রনাথ। আলোচনা প্রসঙ্গে কখনও বলে উঠতেন-কার্ল মার্কস-এর মত আমি মানি না, তাঁর বড় Revengeful attitude — আমার হচ্ছে amity love। ভেঙে-চুরে একটা খাড়া করলে হবে না। রাশিয়াতে অনেক ন্যাশনাল এনার্জি নষ্ট হয়েছে। Individual টা crushed হয়ে গেছে। আমি নেশনটাকে তুলতে চাই। রাশিয়াতে এখন গভর্ণমেন্ট আছে, ন্যাশনাল নেই (People নেই)। বরং আমেরিকা, ইংল্যান্ডে গভর্ণমেন্ট আছে, ন্যাশনাল আছে। আমি এই দুটোই চাই।

জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করল — আমাদের কি হবে?

মহেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন — কেন! আমরা জগতের কেন্দ্র হব। ভারতই জগতের কেন্দ্র হবে। আমাদের ব্রেন ওদের থেকে অনেক সাফ। সায়েন্স, ইন্ডাস্ট্রি, ওরা যা পঞ্চাশ বছরে করেছে, আমরা সেটা মাস ছয়েকে সেরে নেব। ইংরেজ, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মান অজ্ঞাতে ভারতের উত্থানের জন্য কাজ করছে। এসব পরে আমাদেরই কাজে লাগবে। Ideas govern humanity। ওরা কি জগতকে আইডিয়া দিয়েছে নাকি? সে তো আমরা দিয়েছি। ভবিষ্যতে রাশিয়া, চীন, জাপান, আমেরিকা সব ভারতের দিকেই চেয়ে থাকবে। এখান থেকেই সমাজ রক্ষার জন্য, জগৎ রক্ষার ভার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

হিন্দুদের জন্য ষট্-বাণী বলেছিলেন। তিনি বলতেন জনজাতিদের ভিতরে খৃস্টান মিশনারীদের প্রচারের ফলে এ দেশের খৃস্টান সংখ্যা বেড়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে হিন্দুরাই বা পিছপা হবে কেন? শান্তি ভঙ্গ না করে, অপর ধর্মবলম্বীরা যা করে আমরাও তা করবো না কেন? এ ক্ষেত্রে অল্প কিছু কাজ হচ্ছে তার খবর রাখতেন। বলতেন — অল্পে সন্তুষ্ট না থেকে হিন্দুরা আরও ব্যাপক ভাবে Proselytize করুক, তবেই খৃস্টানদের দাবিয়ে রাখা যাবে। বলতেন যত মত তত পথ, ধর্মের চাইতে জাতি বড় (Nation is above religion) বলার অর্থ এই নয় যে অন্যরা কাজ গুছাক আর হিন্দুরা পিছু হটে দেওয়ালের কোণে বসে থাকুক।

হিন্দুদের ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি হিন্দু গীতার ষট্-বাণীর কথা বলেছেন।

"গীতা হিন্দু-জাতীয়তার প্রসারণ —

১। ভগবদ্ গীতাকে ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিলাম। ২। হিন্দু আইনের অন্তর্ভুক্ত হইলাম। ৩। পুরুষ ও স্ত্রীলোক, বালক ও বালিকার হিন্দু নামকরণ করিব। ৪। মৃতদেহকে অগ্নি সংস্কার করিব। ৫। সাধারণ হিন্দুপদ্ধতি অবলম্বন করিলাম। ৬। আপন শ্রেণী হইতে পুরোহিত শিক্ষকও নির্বাচিত করিব। (যে কোন ও ব্যক্তি উপরোক্ত নিয়মগুলি মানিয়া লইবেন তিনি হিন্দু বলিয়া অভিহিত হইবেন এবং হিন্দুর সমান অধিকার লাভ করিবেন)"।

পূণ্য দর্শন মহেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল ১৮৬৯ সালের ১ আগস্ট, কৃষ্ণা নবমী তিথিতে। এই গুপ্ত যোগী, দ্রষ্টাপুরুষ অমৃতলোকে যাত্রা করেন ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর, বিজয়া দশমীর দিনে।

সারা জীবন এক জনকেও মন্ত্রশিষ্য করেননি। কেউ জোরাজুরি করলে বলতেন আমাকে নয়, আমার আইডিয়াকে ধর, তাহলেই আমাকে পাওয়া হবে।

আজও মহেন্দ্র অনুরাগীরা যে স্তোত্র উচ্চারণ করে মহেন্দ্রনাথকে তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, সেই শব্দগুচ্ছের মাধ্যমেই এই লেখা শেষ করলাম।

"অজ্ঞানধবান্ত নির্ণাশং সদা লোক হিতে রতম্।
বিদেহঞ স্থিতপ্রজ্ঞং মহেন্দ্রং প্রণমাম্যহম্।।"

মনের আয়নায়

সুমিত্রা ঘোষ

গাড়ির দুলুনীর সঙ্গে দুলতে দুলতে একটা ঝিমুনী আর গা গুলোনী ভাব হচ্ছিল। মনের ভাবনা চিন্তা সবই একটা ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে আটকে পড়ে মাথার ভেতরে চক্রাকারে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এতকাল ধরে এরকম ঘটনা ঘটেছে কত লক্ষবার শুনেছি। কাগজে পড়েছি, টিভিতে দেখেছি। কিন্তু এসব নিয়ে মাথাব্যথা হয়নি কখনও। কোথায় কার ছেলে বাসচাপা পড়ল, কার অল্পবয়সী স্বামীর বাইক অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু হল— ওসব নিয়ে কোনও আহা-উহু আমাদের মনের কোণায় উঁকিও মারেনি। আমাদের তো সব ঠিক আছে, আর ঠিক থাকলেই হলো। আজ এখন এই মুহূর্তে রিজার্ভেশন ছাড়া স্লিপার ক্লাস কম্পার্টমেন্টের বাথরুমের সামনে স্যুটকেসের ওপর বসে দুলতে দুলতে এসব কথা মনে পড়ছে আমার। আরও অনেক কথা মনে পড়ছে। জীবনের মাঝখানের ছাবিবশ-সাতাশটা বছর আত্মসর্বস্বতা, স্বার্থপরতা আমার চোখকে একেবারে অন্ধ করে রেখেছিল। অথচ আমি এরকম ছিলাম না। আমার চেতনার মধ্যে একসময় অন্য মানুষের দুঃখে শোকে দুঃখী হওয়ার অনুভব ছিল, আমার নিজের পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি ভালবাসা, কর্তব্যবোধ এবং দায়বদ্ধতা ছিল। পশুপাখিরা ওদের স্বভাব বদলাতে পারে না। মাংসাসী পশু পাখি নিরামিষ ভোজী হয়ে যায় না, আবার নিরামিষ ভোজীরা কখনও মাংসের স্বাদ চেখেও দেখে না। কিন্তু আমি তো জীবজগতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান জীব— মানুষ। তাই আপন স্বার্থ, হিংসা, বিদ্বেষ আমাকে ধীরে ধীরে বদলে দিয়েছে।

বাথরুম থেকে আসা বিশ্রী গন্ধটার সঙ্গে ভেতরের আতঙ্ক আর খালিপেটের মোচড় মিলেমিশে মুখে গাজলা উঠে এলো। উঠে গিয়ে নোংরা বেসিনটাতে খানিকটা পিত্তিবমি করে মুখ ধুয়ে এলাম। আমার স্ত্রী রূপালী শূন্য দৃষ্টিতে বাথরুমের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। আমি যে ওর পাশ থেকে উঠে বমি করে এলাম সেসব কিছুই ও দেখল না। অথবা ওর বোধশূন্য চোখ-মন সব দেখেও কিছু দেখল না, বুঝল না। এক ভয়ানক আঘাতে ওর সদাজাগ্রত শ্যেন দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছে। ওর বক্রপথে সদা চলমান জটিল কুটিল মনটা হঠাৎ স্থবির হয়ে পড়েছে। এই মহিলা আমার জীবনে প্রবেশ করার পর থেকেই আমার সুস্থ সুন্দর চেতনার ওপর ময়লা জমতে শুরু করেছিল। আমার স্বচ্ছ দুটো চোখে পরশ্রীকাতরতার ছানি পড়েছিল। আমি একটু একটু করে পাল্টে ছি। ও আমাকে ওর ছাঁচে ঢেলে চরম স্বার্থপর, অসভ্য, অমার্জিত

করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। একটু আগে পিত্তি বমির গাজলা উঠে আসার মতো এখন রূপালীর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মনের পর্দায় সমস্ত নোংরা স্মৃতিগুলো ভেসে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল, আমাদের দুজনের কৃতকর্মের ফল আজ ঈশ্বরের বজ্র হয়ে মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে। শোকে মুহ্যমান স্ত্রীর দিকে আর তাকাতে ইচ্ছে করছিল না। সরে এসে জানালা ঘেঁষে বসে বাইরে তাকিয়ে মনের ভেতরে খোঁজাখুঁজি করতে থাকি।

আমার ঠাকুর্দা আগেকার দিনের এম বি ডাক্তার ছিলেন। যথেষ্ট নামযশ ছিল। বাবাও এযুগের এম বি বি এস, জেনারেল ফিজিসিয়ান। মতিলাল নেহরু রোডের ওপর তিনতলা যে বাড়িতে আমরা থাকি সেটা ঠাকুর্দার তৈরি। আমরা চার ভাই — যথাক্রমে নবেন্দু, সৌমেন্দু, আমি দিব্যেন্দু আর ছোটভাই দিপ্তেন্দু। কোনও বোন নেই আমাদের। আমাদের বাবারও জেনারেল ফিজিশিয়ান হিসেবে ওই অঞ্চলে যথেষ্ট নামডাক ছিল। বাবা খুব রাশভারী মানুষ ছিলেন। চার ছেলেকে কড়া শাসনে মানুষ করেছিলেন। বাবার কথার অবাধ্যতা করার সাহস আমাদের কারও ছিল না। যে সময়ে আমাদের কলেজের বন্ধুরা রাত নটা-দশটা পর্যন্ত ফেলুদার চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে আড্ডা মারত, আমি বা ছোটভাই দীপু সেসব করতে পারতাম না। রাত সাড়ে সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরতেই হতো আমাদের। আমি আর দীপু যখন স্কুলে পড়ি, তখনই বড়দা নবুর বিয়ে হয়। বাবা নিজে পছন্দ করে বিয়ে দিলেন বড়দার। বড়বৌদি একেবারে সাধারণ মাপের হাসিখুশি, সুখী মানুষ। বিয়ের সময় বড়বৌদি বি এ পার্ট টুতে পড়ত। বাবা ওকে পড়াশুনা করতে বলেছিলেন। কিন্তু বড়বৌদির পড়াশুনার দিকে বেশি আগ্রহ ছিল না। মা-র মাধ্যমে ও বাবাকে জানিয়েছিল ও আর পড়তে চায় না। মা-র চাকার স্টেপনী হয়ে জুটে গিয়ে প্রবলবেগে সংসার নামক বস্তুটিকে সুষ্ঠু স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল বড়বৌদি। সকলের সব প্রয়োজনের খেয়াল রাখা, সবাইকে খুশি রাখার কাজে তার জুড়ি পাওয়া ভার। শাশুড়ির আদরের বড় বৌমা। আমাদের বড় ভালবাসার বড়বৌদি। যার কাছে প্রাণখুলে পেটের কথা বললে নিজের পেটে কুলুপ এঁটে রেখে দেয়। মেজদা সমুও ডাক্তার। চণ্ডীগড়ে পি জি আই-এ কিছুকাল শিক্ষকতা করেছে। সেই সময়ই মেজবৌদি অনিতা টোমরের সঙ্গে ভালবাসা হয়। মেজবৌদি তখন চণ্ডীগড় পি জি আই-এ গাইনোকোলজিতে স্পেশিয়েলাইজেশন করছিল। দু'বছর প্রেম করে মেজদা তখন চণ্ডীগড় ছেড়ে কলকাতার এক বিখ্যাত নার্সিংহোমে চলে এসেছে। মোনা পাঞ্জাবি মেয়েকে বিয়ে করার কথা নিজের মুখে বাবাকে বলার সাহস নেই। অগত্যা বড়বৌদি সহায়। বড়বৌদি মা-র মাধ্যমে বাবার কানে কথাটা দিতেই বাবা প্রথমে ক্ষেপে উঠেছিলেন। পরে কি মনে করে বললেন— 'ঠিক আছে। আমি নিজে গিয়ে পরিবার, মেয়ে সব দেখে এসে বলব।' মেজবৌদির বাবা শিল্পপতি। পঞ্চ কুলায় সেক্টর সেভেনের মতো পশ অঞ্চলে ওদের বাড়ি। আমাদের পরিবার পুরনো ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী। উচ্চমধ্যবিত্ত বলা যায়। অত বড়লোকের মেয়ে এবাড়িতে এসে মানাতে পারবে কিনা সেটাই বাবার আপত্তির বেশি কারণ ছিল। পাঞ্জাবি বলে খুব একটা নয়। মেজবৌদির বাবার সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা বলার পর বাবার মনটা বেশ নরমই হল। বাড়িতে যেন ভয়ের বাতাবরণটাও কেটে গেল। মাত্র দুদিন থাকবেন কোনও হোটেলে বলে গিয়ে পুরো এক সপ্তাহ পঞ্চ কুলায় টোমর পরিবারের সঙ্গে ওদের অতিথি হয়ে থেকে গদগদ হয়ে ফিরে এসে বাবা বললেন, 'সমুর বিয়ের দিনক্ষণ সবই পাকা করে চলে এসেছি। বুঝলে বড়বৌমা, একটা শিল্পপতির পরিবার যে এত বিনম্র এতটা নিরহংকারী হতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। কি বাড়ি! আমাদের তো কিছুই নেই প্রায় ওদের তুলনায়। আপত্তি বরং ওদের তরফে হওয়ার কথা ছিল। অপরূপ সুন্দরী মেয়ে, বাপের এতগুলো ফ্যাক্টরি, মেয়ে নিজে ডাক্তার, তবুও দ্যাখো ওরা ওদের মেয়ের নিজের পছন্দকে মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, বাবা, কাকা সবাই একসঙ্গে থাকে। হোটেল থেকে আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে গেলেন টোমর সাহেব আর ওর ভাই। কি আপ্যায়ন! অনিতা নিজে ওর গাড়িতে করে আমাকে সারা চণ্ডীগড় ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। রোজ সকালে আমাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত। সবচেয়ে ভাল লেগেছে দুটো জিনিস। এতগুলো কাজের লোক থাকা সত্ত্বেও অনিতার মা আর কাকীমা রান্না করেন দুবেলা। ওরা রান্নার লোক রাখে না, কারণ তাতে অনিতার ঠাকুরমার আপত্তি। আর দু'নম্বর হল, ওরা নিশ্চয়ই সালোয়ার কামিজই পরেন পাঞ্জাবি যখন। কিন্তু আমি যে এক সপ্তাহ রইলাম কাউকে সালোয়ার কামিজ পরতে দেখলাম না অনিতা ছাড়া। ওর ঠাকুরমা, মা, কাকীমা শাড়িই পরলেন বাঙ্গালি কুটুম্বর সামনে। নাঃ! সমুটার পছন্দ করার চোখ আছে।'

মা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মেজদা মায়ের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান, সবাই জানি আমরা। মেজদা কোনও কষ্ট পেলে মা তার দশগুণ বেশি কষ্ট পান। মা সবার কষ্টেই কষ্ট পান, সববাইকে ভালবাসেন, কিন্তু মেজদার প্রতি মায়ের টান যে অনেক বেশি সেটা মা প্রকাশ না করলেও আমরা বুঝতাম। মেজদাটা ছিলও যে বড্ড ভালমানুষ। ছোটবেলায় আমরা বদমাইশি করে বাবার হাতে মার খাবো বলে মেজদা আমাদের সব দোষ নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে মা-র খেতো। আমি অংকে কাঁচা ছিলাম বলে ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র মেজদা নিজের পড়ার ক্ষতি করে আমাকে সহজভাবে অংক বোঝাতো ঘন্টাভর। মাধ্যমিকে অংক পরীক্ষার দিন ভোররাতে উঠে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে ফুল এনে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বাবা খুশি মনে মেজদার বিয়েটা মেনে নিতে আমার প্রাণটাতেও যেন শান্তিজলের ছিটে পড়েছিল।

বরযাত্রী হয়ে চণ্ডীগড়ে গিয়ে মেজবৌদিদের বাড়ি দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল আমাদের। এত গেষ্ট ছিল যে কোনও ম্যারেজ হলেই কুলোবে না বলে মোহালী স্টেডিয়াম নিয়েছিলেন মেজবৌদির বাবা। সেই বিখ্যাত মোহালী স্টেডিয়ামে বিয়ে হয়েছিল মেজদার। বরযাত্রী আপ্যায়ন এমন করে আমরা বাঙ্গালীরাও করি না বোধহয়। বিয়ের অনেক পরে একবার আমি আর দীপু সিমলা বেড়াতে গিয়ে মেজদার শ্বশুরবাড়িতেই ছিলাম। সত্যিই ওরা নিরহংকারী, কুটুম্ববৎসল। খুব যত্ন করেছিলেন মেয়ের দুই দ্যাওরকে। আর মেজবৌদি? সে তার বাবা-মা'র সৎ শিক্ষার গুণে কি আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের ওই পুরনো ধাঁচের বাড়িতে, পুরনো আমলের ধ্যানধারণার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছিল যেন জলের সঙ্গে জল মিলে গেল। দীপু আর আমার সঙ্গে মেজবৌদির সখ্যতা, বড়বৌদির সঙ্গে তার দিদি-ছোট বোনের মতো মনের মিল, গুরুজনদের প্রণাম করে তার প্রতিদিনের শুরুয়াত— ওহ! অনেক কপাল থাকলে ওরকম দুই বৌদি জোটে মানুষের। মেজবৌদির কলকাতায় মেজদার নার্সিংহোমেই চাকরি হয়েছিল। সকালে নার্সিংহোমে যাওয়ার আগে বড়বৌদির সাংসারিক কাজের অর্ধেকের বেশিটাই করে রেখে যায় অতিদ্রুত হাতে, যাতে এতগুলো লোকের ফরমাশের চাপে বড়বৌদি কষ্টে না পড়ে। তখন 'ডাক্তার বাড়ি'তে শুধু সুখ শুধু শান্তি। পাড়ার লোকে আমাদের বাড়িটাকে ডাক্তারবাড়ি বলে। আনন্দের বান ডাকা পরিবারে আমার মা মহারাণীর মত প্রভুত্ব করেন। মা জাহাজের নেভিগেশন

করেন, বড়বৌদি হাল ধরে থাকে আর মেজবৌদি সকাল বিকেল স্মার্ট হাতে অতি দ্রুত দাঁড় টানে। নার্সিং হোমেও ওর কাজের যশ ছড়ায়। মেধাবী মেয়ে, অল্পদিনের মধ্যেই ভাঙ্গা বাংলায় কথা বলা শিখে নিল, আর বছর দেড়েকের মাথায় তো পরিষ্কার বাংলায় কথা বলতো, এমনকি একটু আধটু পড়তেও পারত। আমাদের পাশের বাড়ির লোকেরা কোনওদিন দুই বৌয়ের কথাকাটি বা ঝগড়ার আওয়াজ শোনেনি আর শাশুড়ি বৌদের মধ্যে তেতো কথাও শোনেনি। সংসারটা একটা আইডিয়াল সংসারের মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছিল সগর্বে।

সে সবই আমার বিয়ের আগের কথা। আমি এম এস সি পাশ করে চাকরি পেলাম এক নামকরা পেইন্টস কোম্পানিতে। বছর দুয়েক পরেই মা আমার বিয়ে বিয়ে করে ঘ্যান ঘ্যান শুরু করল। বাবার হরিহর আত্মাবন্ধু মদনমোহনবাবু ওঁর এক পরিচিত ভদ্রলোকের মেয়ের জন্য ঝুলোঝুলি করতে লাগলেন। বন্ধুর কথায় বাবা যে কি দেখে আমাদের কারও মতামত না নিয়েই এখানে কথা দিয়ে বসলেন সেটা আর জানা যায়নি। শিক্ষা-দীক্ষা, রূপরুচি, পরিবার কোনও দিক থেকেই এ মেয়ের অন্তত আমাদের বাড়ির বৌ হবার যোগ্যতা ছিল না। উত্তর কলকাতার এক কানাগলির ভেতরে শ্রীছাদহীন দেড়শো বছরের ঝরঝরে পুরনো, এখানে সেখানে বট, অশ্বত্থ, শ্যাওলা ধরা উঠোনের মাঝখানে একটা পাতকুয়ো আর একটিমাত্র বাথরুম পায়খানা, যাতে রাত তিনটে থেকে লাইন পড়ে, পায়রাখোপ কুঠুরিগুলোতে গিজগিজ করে অজস্র শরিক আর তাদের ছেলেমেয়েরা— এমনই একটা কুঠুরিতে বড় হয়েছে এই পাত্রী। ওর বাবা চাকরি ভালই করেন, কিন্তু পৈতৃক ভিটের ওই অন্ধকার দশফুট বাই দশফুটের কামরাটা ছেড়ে একটা ফ্ল্যাটে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারেন না। সকাল সাড়ে তিনটে থেকে রাত গভীর পর্যন্ত বাথরুম পায়খানা নিয়ে, এর ঘরের ঝাড়ু দেওয়া নোংরা ওর ঘরের সামনে ফেলা নিয়ে, আরও খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া চলতেই থাকে ওই বাড়িতে। এসব আমি বিয়ের পরে দেখেছি। এই মেয়েকে বিয়ে করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার ছিল না। শর্ট হাইট, চ্যাপ্টা গড়ন, সাধারণ চেহারা। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার ছিল, মেয়ে স্কুল ফাইনাল পাশ ডিভিশন। বড়বৌদির কাছে নিজের আপত্তির কথা জানালাম। মা বাবাকে বললেন, 'দেবুর এ মেয়ে, ওদের বাড়ি, পরিবেশ পছন্দ হয়নি। তুমি কথা না দিলেই পারতে। সত্যিই তো, তোমার কেমিস্ট্রীতে এম এস সি পাশ ছেলের জন্য মাধ্যমিক পাশ মেয়ে ছাড়া আর মেয়ে নেই?'

বাবা রেগে গিয়ে বললেন, 'মাধ্যমিক পাশ বলে মেয়ে খারাপ হবে এমন কথা আছে নাকি? তাহলে তো আমারও তোমাকে বিয়ে না করে বাবার কাছে আপত্তি জানানো উচিত ছিল। তুমি তো ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিলে মাত্র। আমার বাবা-মা এবং আমি তো তোমাকে নিয়ে সুখী হয়েছি। তাহলে? কলকাতার কত পুরনো ঘর ওরা জানো? দেবুকে বলে দিও, আমি যখন কথা দিয়ে দিয়েছি, তখন ওর এখানেই বিয়ে হবে। মেয়ের বাবা অত্যন্ত ভালমানুষ। এ বিয়ে খারাপ হবে না।'

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে হল, কিন্তু বিয়ের পর সত্যিই আমার আর কোনও ক্ষোভ রইল না। জাদুকরী আমাকে ওর জাদুছড়ি দিয়ে ওর মধ্যকার সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ভুলিয়ে দিয়ে সুখের সাগরে ডুবিয়ে রেখে দিল। বিয়ের পর থেকেই প্রতি পদেপদে নানারকম অমার্জিত ব্যবহার করে বসতো ও। কিন্তু মা বৌদিরা বাইশ বছরের মেয়েকে স্নেহের নজরে রেখে বলতো, 'আহা ও ছেলেমানুষ। আস্তে আস্তে আদব-কায়দা, মার্জিত ব্যবহার সব শিখে নেবে এখানে থাকতে থাকতে।' গুরুজনরা ওর দোষ ক্ষমা করে দিচ্ছে দেখে আমি আদে গদগদ হয়ে যেতাম। আর একান্তেও কখনও বলতাম না— তুমি কিন্তু এটা ঠিক করনি। এবাড়িতে গুরুজনদের অসম্মান করে কেউ কথা বলে না। তুমি আর কখনও এরকম অসভ্যতা করবে না, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করব না।

না, আমি ওকে শাসন করিনি, উল্টে পাকে পাকে অজগরীর আঁচলে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। ওর নানা বেয়াদপি খুব খারাপ লাগলেও কিচ্ছু বলিনি। এরপরে একদিন ও একটা বড় রকমের অঘটন ঘটিয়ে ফেলল। বিয়েতে ওর বাবা আমাকে একটা ভারী রূপোর গ্লাস দিয়েছিলেন। ওটা ওঁর নিজের গ্লাস ছিল। বৌদিরা খেতে দেবার সময় ওই গ্লাসটাতেই আমাকে জল দিত। সেদিন বড়দা ওই গ্লাসটাতে জল ঢেলে নিয়ে খাচ্ছিল ডাইনিং রুমে দাঁড়িয়ে। ঠিক সেই সময় রূপালী এসে পড়ে। বড়দাকে ওই গ্লাসে জল খেতে দেখেই ও চিৎকার করে ওঠে— 'একি! আপনি ওর রূপোর গ্লাসে জল খাচ্ছেন কেন? নামান। নামান ওটা এক্ষুনি। রূপোর গ্লাসে জল খাবার এত শখ হলে বড়দির বাবাকে বলবেন আপনাকে একটা কিনে দিতে।'

বড়দা হকচকিয়ে গিয়ে অর্ধেক খাওয়া জলের গ্লাসটা নামিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা সবাই রূপালীর উঁচুস্বরে চিৎকারে ছুটে এসে ঘটনা দেখে স্তম্ভিত। রূপালীর চোখ থেকে আগুন ঝরছে আর বড়দা অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লজ্জায়, দুঃখে আমার মাথা কাটা গেল। ওকে টেনে নিজেদের রুমে নিয়ে এলাম, কিন্তু এতই মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছিলাম যে কড়া ভাষায় কিছু বলতেই পারলাম না। যা বললাম সেটা নিজের কানেই হাস্যকর শোনালো। সেই শুরু হল। বাড়ির একটি মানুষও আর ওকে ক্ষমা করতে পারল না। সকলের চোখে এখন স্নেহের পরিবর্তে অনুকম্পা, ঘৃণা আর ভর্ৎসনার দৃষ্টি। বাবা দুপুরে খেতে এসে মার কাছে একথা শুনলেন। মুখের গ্রাস ফেলে রেখে থালা ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লেন। বড়বৌদিকে বললেন, 'গ্লাসটা এনে দাও।' — তক্ষুণি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে রূপালীর বাপের বাড়ি গিয়ে ওর মায়ের হাতে গ্লাসটা ফেরৎ দিয়ে এমন কিছু বলে এসেছিলেন, যা আমরা জানি না। কিন্তু বড়দার মুখে পরে শুনেছিলাম, রূপালীর বাবা নাকি নিজে বড়দার অফিসে গিয়ে দুটো হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে এসেছেন মেয়ের দুর্ব্যবহারের জন্য। দু-তিনদিন পর বাবা আরও একটা কাণ্ড করেছিলেন। সাধারণত রাতের খাবার আমরা সবাই একসঙ্গে খেতাম। একমাত্র মেজদা সমু নার্সিং হোমে আটকে পড়লে বাবার সঙ্গে রাত্রে একসঙ্গে খেতে বসতে পারত না মাঝেমধ্যে। রাত্রে এই খাওয়ার সময়টা বাবা খুব প্রফুল্ল থাকতেন। সবার খোঁজখবর নিতেন, বন্ধুর মতো গল্পও করতেন। সেই বিশেষ রাতে খাওয়ার আগে বাবা একটা বড়সড় প্যাকেট মা-র হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন,— 'এটা ধর। আজ রাত থেকেই খাবার টেবিলে এগুলো ব্যবহার হবে।' — সকলেই একটু কৌতূহলী, কি আছে রে বাবা ওই প্যাকেটে?

প্যাকেটে তিনটে বড় রূপোর থালা আর তিনটে গ্লাস ছিল। সব ক'টা রূপোর বাসনে বড়দা নবু, মেজদা সমু আর ছোটভাই দীপুর নাম খোদাই করা, যার যার থালা গ্লাসে। দেখতে সবগুলি একই ডিজাইন, একই মাপের। শুধু আমার জন্য কিছু ছিল না। মা খুব রেগে বাধা দিতে গেলে বাবা বাঘের মতো গর্জন করে বলেছিলেন,— 'তুমি একটা কথাও বলবে না। দেবুর প্রশ্রয়ে ওর বৌ আমার বাড়িতে ফাটল ধরাবার চেষ্টা

চালাচ্ছে। ওর বাঁদরামি আমি একটুও সহ্য করব না। আজ থেকে নবু, সমু আর দীপু রূপোর বাসনে খাবে, আমার সামনে বসে। দেবু স্টীলের থালায় খাবে। আশাকরি এবার ওর বৌয়ের শিক্ষা হবে। দেবুও বৌকে বাগে আনার চেষ্টা করবে। কিন্তু এর পরেও যদি ও আর কোনওদিন এবাড়ির কাউর সঙ্গে কোনওরকম অসভ্যতা করে তাহলে যেমন আদর করে ঘরের বৌ করে নিয়ে এসেছিলাম, তেমনি গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেব দুজনকেই। একথা দেবু যেন মনে রাখে। বেয়াড়া স্ত্রীকে বাগে আনা ওর দায়িত্ব।'

বাবার চরিত্রের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। সহজে রেগে যান না। রাগ করার মতো গর্হিত অপরাধ কেউ করলে তার আর ক্ষমা নেই। ভয়ে আমার হাঁটু দুটো কাঁপছিল। এর পরেও যদি রূপালী নিজেকে না শোধরায় তাহলে বাবা আমাদের ত্যাগ করতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হবেন না— জানি আমি। সেই রাতে খাবার টেবিলে কেউ মুখ তুললো না। আমার ভাইরা কেউ ওই রূপোর বাসনে খেতে পারছিল না, কোনও রকমে গলা দিয়ে নামাচ্ছিল শুধু। মা দূরে দাঁড়িয়ে আঁচলে চোখ মুছছিল বার বার। শুধু বাবা নির্বিকার।

রাত্রে শুতে এসে রূপালী বাবার ওপরেই চোটপাট করতে লাগল আমার কানের কাছে। কঠিন গলায় সেদিন প্রথম ওকে বলেছিলাম— 'যা করেছ তার ফল আমাকে ভুগতে হচ্ছে। আর একটা কথাও যদি বলেছ, বাবার নামে তাহলে এক্ষুণি আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। ট্রেনের নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরা ছাড়া আমার আর কোনও গতি রাখবে না তুমি।' — রূপালী তখনকার মতো চুপ করেছিল। কিন্তু স্বভাবই যার ওরকম তারা তো বদলায় না— উল্টে অন্যকে তাদের রংয়ে রাঙ্গিয়ে নিতে পারে। সেদিনও যদি আমি আরও বেশি কঠোর হতে পারতাম তাহলে আজকের দিনটা আসতো না।

আমার মেজবৌদির হাতে জন্মেছিল আমাদের মেয়ে রিমলি। বাবা তখন বেঁচে নেই। বাবার হঠাৎ মৃত্যুর পর আমার বৌ খুল্লামখুল্লা অসভ্যতা করতে শুরু করেছিল সকলের সঙ্গে। যে বাড়িতে কখনও চেঁচামেচি শোনা যায়নি, এখন রূপালীর গলার ভয়ানক শব্দে কাকরাও ভয়ে পালিয়ে যায়। মেজবৌদিকে ও যে কি দারুণ হিংসে করত সে বলার নয়। আমি বুঝতাম রূপালীর হীনমন্যতা মেজবৌদির ওপর ওর আক্রোশের কারণ। মামার বাড়ি, পিসিমাদের বাড়ির লোকেরা এ বাড়িতে বেড়াতে এসে বড়বৌদির প্রশংসা তো করতই, মেজবৌদির আরও বেশি প্রশংসা করত। কারণ অবাঙ্গালী মেয়ে হয়ে মেজবৌদি একেবারে বাঙ্গালী হয়ে গিয়েছিল ততদিনে। ওরা বলত— 'আহা, মেজবৌমা যেন রূপে মা দুর্গা, গুণে সরস্বতী। এত বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু আজ অবধি ওর মুখে কখনও বাপের বাড়ির বৈভবের গল্পকথা শুনলাম না।'— এসব কথাগুলো রূপালীর হিংসেয় জ্বলতে থাকা গরম তেলে জল ঢেলে দেবার মতো ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়ে দিত। মেজবৌদিকে হেয় করার নানা ফন্দী ফিকির ওর শিক্ষায় অনুর্বর মস্তিষ্কে ঘোরাফেরা করত। মা আর বড়বৌদির কাছে লাগান ভাঙ্গানো করে একটুও আমল না পেয়ে আমার কানে সারাক্ষণ বিষ ঢালতে থাকত। প্রেগন্যান্ট হবার পরই একদিন বলল— 'শোনো আমি কিন্তু তোমাদের ওই বিদ্যেধরী গুণেশ্বরী মেজবৌদিকে দেখাব না। কলাকাতায় মেয়ে ডাক্তারের অভাব নেই। আমি বাপের বাড়ির পাড়ায় একজনের কাছে যাবো। তোমার মেজবৌদিকে চোখে দেখলেই আমার গায়ে চুলকোয়, ও আমাকে ছুঁলে শেষে আমার বাচ্চার চুলকুনি রোগ হোক আর কি! ম্যাগো! কি দেমাক উফ্! নিজে গাড়ি চালিয়ে ডাক্তারী করতে যায় যেন দুনিয়াটাকে পায়ের তলায় চেপে রেখেছে। শয়তান একটা!'

দুর্বল বাধা দেবার চেষ্টা করি আমি— 'ছিঃ ছিঃ। কি যা-তা বলছ? মেজবৌদির মতো নামকরা ডাক্তার বাড়িতে থাকতে তুমি বাইরে দেখাবে? আমি মাকে কি কৈফিয়ৎ দেব? মেজবৌদিকে তুমি দেখতে পারো না, হিংসে কর, — একথা বলব?'

— 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই বলে দিও। যা সত্যি তাই বলো। আমি কারও পরোয়া করি না।'

আমার মেরুদণ্ড তো অবশিষ্ট আর কিছুই ছিল না। ভিজে ন্যাকড়া হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগেই, তাই কথায় কথায় মাকে একদিন মিথ্যে কথা বললাম— 'শ্বাশুড়ি তো ওদের পাড়ার একজন লেডি ডাক্তারকে সেদিন দেখিয়েছেন রূপালীকে। সব ঠিকই আছে বলেছে।' মা কোনও মন্তব্যই করল না, ইন্টারেস্টও দেখাল না। একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে রইল। মেজবৌদিও নিজে থেকে কখনও বলল না, 'রূপালী এসো তোমাকে একটু দেখে নিই'।— আমরা যে পরিবারের মধ্যে থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, সেটা বুঝতে আমার অসুবিধা হতো না।

ভরামাসে রাত দুটোর সময় রূপালী বাথরুমে পা পিছলে পড়ে অঘটন ঘটালো। যে মেজবৌদিকে দেখলে ওর চুলকানি হতো, তাকেই বলতে শুনলাম— মেজদি, তোমার পায়ে পড়ি! আমাকে বাঁচাও।' একরকম যুদ্ধ করেই মেজবৌদি বাচ্চা আর মা দুজনকেই বাঁচিয়ে ফেলেছিল। রূপালী শুধু ওকে বাঁচাবার আর্জি জানিয়েছিল আমার সামনেই। বলেনি— বাচ্চাকে আর আমাকে বাঁচাও। সেই মেয়ে রিমলি। আমাদের নয়নের মণি, একমাত্র সন্তান আজ বহুদূরে এক শহরে অচেনা হাসপাতালে একা একা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে ওর। সেই খবর পেয়েই এমন পাগল হয়ে ছুটে যাচ্ছি আমরা।

আমার আর রূপালীর অত্যধিক আদরে প্রশ্রয়ে রিমলি বেয়াড়া হয়েই বড় হচ্ছিল। চৌদ্দ বছর বয়সেই স্বেচ্ছাচারী স্বভাবের প্রকাশ ঘটল, পাড়ার একটা বখাটে ছেলের প্রেমে পড়ে। বড়দা, মেজদার ছেলেরা সবাই দুর্দান্ত রেজাল্ট করছে, কেউ ব্যাঙ্গালোরে, কেউ নাগপুরে পড়ছে। ওরা সবাই রিমলির বড়। রিমলি কোনওমতে উচ্চমাধ্যমিকে লোয়ার সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করেই ঘোষণা করেছিল ও বাইরে পড়বে জ্যাঠতুতো দাদাদের মতো। আমার প্রবল আপত্তি মা-মেয়ে মিলে উড়িয়ে দিল। সঞ্চিত অর্থের সত্যনাশ করে ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে পুণেতে বি বি এ পড়তে গেল রিমলি। মা বলেছিলেন— 'দেবু, ওকে একা অতদূরে পাঠাস না বাবা। চৌদ্দ বছর বয়সেই ও যে কাণ্ডটা করেছিল, বাইরে গেলে যে কি করবে কে জানে! এ মেয়েকে চোখের সামনে রাখা দরকার।'

রূপালী মাকে তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করেছিল— 'কেন মা? অন্যদের বেলায় তো আপত্তি করেননি?'

মা কঠিন গলায় উত্তর দিয়েছিলেন— 'কারণ অন্যরা ওর মতো অসভ্য নয় বলে।'

ব্যাস! লেগে গেল যুদ্ধ। রূপালী আর রিমলি মিলে মাকে যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করেছিল। আমি আটকাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছিলাম। মেজবৌদি বোধহয় জীবনে প্রথম ধৈর্য্য হারালো মাকে অশ্রাব্য ভাষায় অপমানিত হতে দেখে। ঠাণ্ডা গলায় বলে বসল— 'বাবা চলে গেছেন বলে এ বাড়িটা অভিভাবকহীন হয়ে যায়নি সেজো। মা এখনও বেঁচে আছেন, আমাদের অভিভাবক হয়ে। মনে থাকে যেন কথাটা।

গুরুজনের সঙ্গে কথা বলার সহবৎ তোমার নিজেরই কোনওদিন ছিল না, তাহলে রিমলি আর কি করে শিখবে ঠাকুমার সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয়? বাবা বেঁচে থাকতে তোমাকে একবার সাবধান করে দিয়েছিলেন, ভুলে গেলে সেসব?'

বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল রূপালী। তুই-তোকারি করে অশ্লীল শব্দের লাভাস্রোত বওয়াতে লাগল। ইদানিং মা-মেয়ের মন্ত্রগুপ্তিতে মেজদা-বড়দা, বড়বৌদি-মেজবৌদি এদের আমারও আর পছন্দ হতো না। ওদের ক্রমাগত উন্নতি, ওদের ছেলেদের মানুষের মতো মানুষ হতে থাকা আমাকে পীড়া দিত। মাথার মধ্যে কি যে হয়ে গেল, একেবারে ভুলে গেলাম কত বড় যুদ্ধ করে মেজবৌদি রূপালীর জঠর থেকে রিমলিকে জীবন্ত বের করে এনেছিল! ভুলে গেলাম মাথা ধরলে মেজবৌদি পেইন কিলার খেতে দিত না, ওডিকলোন লাগিয়ে মাথা টিপে দিত। নিজের নিষ্ফলতা ঢাকতে ওদের সফলতাকে আঘাত করে বসলাম— 'তুমি নাক গলাবার কে? তুমি এবাড়িতে আছো বলেই আমাদের জীবনে যত ঝঞ্ঝাট। আমি কি আর জানি না, তোমরা টাকার জোরে ছেলেদের জন্য র‍্যাংক কেনো! তা নাহলে ওরাও রিমলির মতই রেজাল্ট করত।' — মিথ্যে বলছি জেনেই মিথ্যেটা বললাম।

মেজোবৌদির চোখ থেকে একরাশ করুণা আমার দিকে ঝরে পড়ল শুধু। তাতে মাথাটা আরও গরম হয়ে গেল। মায়ের সামনে ওকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চল্লাম একতলার সিঁড়ির দিকে। ধাক্কা মেরে ল্যাণ্ডিংয়ে বের করে দিয়ে বললাম— আজই, এক্ষুণি বেরিয়ে যাও এবাড়ি থেকে তোমার দেমাক নিয়ে। শালা পাঞ্জাবির বাচ্চা। তোরা আবার ঘর করিস নাকি? ঘর ভাঙ্গতে এসেছিলি এবাড়িতে। পয়সার গরম হয়েছে তোর? অলক্ষ্মী মেয়েছেলে। বেরো এবাড়ি থেকে।' —সেদিন বড়বৌদিও বাড়ি ছিল না।

এর পরের ইতিহাস আজ আর মনে করতে ইচ্ছে করছে না। আমাকে একটা বকুনি, একটা অপমানজনক কথাও না বলে, এবাড়িতেও যে ওদের অধিকার আছে, সেকথা উচ্চারণও না করে সেদিনই মেজদা-মেজবৌদি কয়েকটা স্যুটকেশ সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। বড়দা আর দীপু নার্সিংহোম, বন্ধু-বান্ধুবদের বাড়িতে সর্বত্র খুঁজেছিল। কোথাও পায়নি। দীপু চণ্ডীগড়েও গিয়েছিল। টোমর সাহেব বলেছিলেন— 'দুঃখিত দীপু। ওরা কোথায় আছে সেটা কাউকে না জানানোর জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবে তোমার মা-র দুশ্চিন্তা দূর করার জন্যই বলছি, ওরা সুস্থ আছে, ভালো আছে।' — মা আমাদেরও সেইদিনই আলাদা করে দিয়েছিল। মা, বড়দা আর দীপু একসঙ্গে থাকত। কথাবার্তাও বন্ধ করে দিয়েছিল ওরা আমাদের সঙ্গে। আমি একেবারে একা হয়ে পড়েছিলাম। আজও আমাদের সঙ্গে বড়দা বা দীপু এলো না। রিমলির অ্যাকসিডেন্টের কথা শুনেও মা পর্যন্ত একটা কথা বলেনি। এত ঘৃণ্য হয়ে গেছি আমি ওদের কাছে। এতগুলো বছরের মধ্যে ওরা যে মেজদাকে আর খুঁজে পায়নি। আমার জন্য মেজদা মেজবৌদির মতো রাম-সীতাকে বনবাসে যেতে হয়েছে যে!

আমার মেয়ে পুণেতে একগাদা টাকার শ্রাদ্ধ করে পড়াশোনা করতে যায়নি। ও আরও স্বাধীন স্বেচ্ছাচার করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। বি বি এ করা ওর হয়নি। টাকা পাঠাতে পাঠাতে আমার প্রাণ যায়। ও ফুর্তি করে টাকা ওড়ায়। এক বছর পরে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম — 'আমি আর টাকা পাঠাতে পারব না। তুই এখানে ফিরে আয়।' — ও উত্তর দিয়েছিল— 'কুছ পরোয়া নেই। কল সেন্টারে চাকরি নিয়ে নেব, কিন্তু তোমাদের ওই মান্ধাতার আমলের বাড়িতে ফিরব না জেনে নাও। জীবনটা আমার। আমি আমার মতো করে বাঁচতে চাই।'

আমার আবার বমি হল। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে ওই অচেনা অজানা শহরে মেয়েকে দেখব না নিজেকে দেখব! ডাইনিং কারের ছেলেটাকে দুটো ভেজ খাবার দিতে বললাম। রূপালী একেবারে গুম, নিঃশব্দ হয়ে আছে। জোর করে ওকেও খাওয়ালাম। খবরের কাগজ বিছিয়ে গা এলিয়ে দিতে তন্দ্রা মতো এল, কিন্তু ঘুম হল না। নানা চিন্তা মাথায় পাক খেতে লাগল। রিমলি কল সেন্টারে চাকরি নিয়ে এক কামরার ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত। আমার স্থির বিশ্বাস ও একা থাকত না। ওর সঙ্গে কোনও ছেলে থাকত। ওর মোবাইলে ফোন করতাম বেশি রাতের দিকে। মাঝে মাঝেই একটা ছেলে 'হ্যালো' বলে ফেলত। ওকে বলেছিলাম কথাটা। ও মিথ্যে কথা বলে এড়িয়ে গিয়েছিল। পুণেতে আমি একবারই গিয়েছিলাম রিমলিকে ভর্তি করানোর সময়। কিচ্ছু চিনি না, কাউকে জানি না। কি যে করব একা একা বুঝতে পারছি না। যে ফোন করেছিল সে পুলিশের লোক। বলেছিল সিভিয়ার হেড ইনজুরি হয়েছে। ওর জ্ঞান নেই। হাসপাতালের নামটা বলেছিল। আর বলেছিল, বম্বে-পুণে এক্সপ্রেস ওয়েতে মোটরবাইক আর ট্রাকের হেড-অন অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। গিয়ে মেয়েটাকে পাবো তো ঠাকুর! আমার যে অনেক পাপ! ক্ষমা করে দাও ঠাকুর! রিমলি যেমনই হোক ও যে আমাদের একমাত্র সন্তান! মেজবৌদি, তুমি যেখানেই থাকো আমাকে ক্ষমা করো। আমি সেদিন তোমাকে যে মারাত্মক আঘাত দিয়েছিলাম আজ তার ফল ভোগ করছি। তুমি তো ভাল, তুমি ক্ষমা করতে পারবে মেজবৌদি। তোমরা সবাই আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। রিমলির প্রাণ যেন বাঁচে এই আশীর্বাদ কর।

চার ঘন্টা লেটে দুপুরে পৌঁছালো ট্রেন পুণেতে। অস্থির উদ্‌ভ্রান্তের মতো এগিয়ে চলেছি গেটের দিকে। বহু সময় নষ্ট হয়ে গেছে। রিমলি যে কেমন আছে এই আড়াই দিন কিচ্ছু জানি না। সেই ঝগড়ুটে, জালিম রূপালী একেবারে অবসন্ন। একহাতে স্যুটকেস অন্যহাতে ওকে টেনে নিয়ে গেটের কাছে এসে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। উল্টোদিক থেকে সে মোবাইলে কথা বলতে বলতে আসছে। আমাদের দেখতে পায়নি। আপনা হতেই গলা চিরে বেরিয়ে এল— 'মেজদা'।

অন্যমনস্ক সে চমকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। স্যুটকেশ নামিয়ে ছুটে গিয়ে ওর বুকের পরম শান্তির আশ্রয়ে মাথা রেখে ঝরঝর করে, ভেউভেউ করে বাচ্চার মতো কাঁদতে শুরু করলাম। হতভম্ব মেজদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল— 'তোরা এখানে? এমন ঝড়ো কাকের মতো দেখাচ্ছে কেন? এত কাঁদছিলই বা কেন? কি হয়েছে?'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মেজদাকে সংক্ষেপে সব বললাম। রূপালী প্ল্যাটফর্মের ওপরেই মেজদার পা আঁকড়ে ধরে শুয়ে পড়েছে উপুড় হয়ে— 'মেজদা, ভগবানই আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন। আমার রিমলিকে বাঁচান।'

মেজদা আমাদের স্যুটকেশ তুলে রূপালীকে ধরে ধরে এনে ওর গাড়িতে তুলল। ও ওর বড় ছেলেকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরছিল। কাকতলীয় ভাবেই দেখা হয়ে গেল। গাড়ি চালাতে চালাতে ও মেজ বৌদিকে ফোন করে এক্ষুণি ওই হাসপাতালে চলে আসতে বলে দিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করে রিমলির অ্যাকসিডেন্টের কথা যতটুকু জানি সব জেনে নিল। মার কথা, বড়দার কথা, দীপুর কথা জিজ্ঞেস করল।

না। আমরা আমাদের বুকের নিধিকে ফিরে পাইনি। পরশু রাত্রে সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। চূর্ণ বিচূর্ণ আমি আর রূপালী মেজবৌদির কোলে মাথা রেখে ধূলিস্যাৎ হতে লাগলাম ওই হাসপাতালের লাউঞ্জে বসে। অ্যাকসিডেন্টাল কেস। থানা-পুলিশ, মর্গ, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট শবদাহের ব্যবস্থা সব মেজদা করল। রিমলির ব্যাগে ওর ফ্ল্যাটের চাবি ছিল। পুলিশ সব ফেরৎ দিয়েছিল। রিমলির ফ্ল্যাটেই মেজবৌদি রূপালীকে নিয়ে চলে গেল আর অর্ধমৃত আমাকে মেজদা প্রায় কোলে তুলে শ্মশানে এনেছিল। রিমলির সেলাই করা শরীরটাতে আগুন দিতে গিয়ে বুঝেছিলাম নিজের আত্মজকে মুখাগ্নি করার সময় বাপের কি হয়! মেজদাই হাত ধরে আগুনটা দিতেও সাহায্য করেছিল।

সবশেষ করে রিমলির ফ্ল্যাটে ফিরে এসে দেখেছিলাম মেজবৌদি রূপালীকে ইনজেকশন দিচ্ছে। ওর ব্লাডপ্রেসার ফল করেছিল। ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। পরদিন ডেথ সার্টিফিকেট আর পোস্টমর্টেম রিপোর্টের কপি মেজদা আমাকে দিয়েছিল। পুলিশ বলেছে রিমলিরা কয়েকজন মিলে লং ড্রাইভে যাচ্ছিল। রিমলি সুলতান ইলিয়াস নামে এক কুখ্যাত লোকের সঙ্গে থাকত। সেদিন ইলিয়াসই বাইক চালাচ্ছিল। ওরা দুজনেই ড্রাংক ছিল। ট্রাকের সঙ্গে কলিশনে ইলিয়াস স্পটেই মারা গেছে। মারাত্মক আহত অবস্থায় রিমলিকে অন্যরা তুলে এনেছিল হাসপাতালে। রিমলি পাঁচ মাসের অন্তঃস্বত্তাও ছিল। শুধু মেয়েকে নয়, মেয়ের পেটে থাকা শিশুটারও মুখাগ্নি করেছি। তিনদিন রিমলির ফ্ল্যাটেই মেজদা আর মেজবৌদি শুদ্ধু চারজনে বসে চোখের জলে হবিষ্যান্ন গিলেছি। চতুর্থদিন সেখানেই চতুর্থীর কাজ সেরেছি। পঞ্চ মদিনে রিমলির অস্থি নিয়ে নিঃস্ব, রিক্ত আমাদের দুজনকে এসি টু-র দুটো টিকিট জোগাড় করে মেজদা-মেজবৌদি তুলে দিতে এসেছিল। মেজদা বলেছিল— 'দেবু সব হারিয়েও যতক্ষণ শ্বাস চলে ততক্ষণ বেঁচে থাকতে হয় রে। তোকেও বাঁচতে হবে আর রূপালীকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মার বুকে গিয়ে আশ্রয় নিস তোরা। ওখানেই শান্তি রাখা আছে।'

বাড়ি ফিরে এলাম অস্থির কলসটা সঙ্গে নিয়ে। বাড়িতে শোকের ছায়া চোখ এড়ায়নি। ওরা সবাই ক্ষমা করে দিয়েছে আমাদের। কত যুগ পরে মায়ের স্পর্শ পেলাম। মা আমাকে আর রূপালীকে বুকে জড়িয়ে ধরে অসীম দুঃখের সাগরটা পার করাতে চেষ্টা করছিল। বড়দা, বড়বৌদি, দীপু সবাইর চোখে জল। এত অল্পবয়সে অপঘাতে মৃত্যু এবাড়িতে এই প্রথম। দিনকয়েক পরে মানসিক অবস্থা একটু থিতু হতে মা জিজ্ঞেস করল— 'হ্যাঁরে, ফিরে এসে সমুকে ফোন করে পৌঁছানোর খবরটা দিয়েছিলি তো?'

ফ্যাল ফ্যাল করে মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওখানে থাকার সময় শোকে মুহ্যমান অবস্থায় একবারের জন্যও আমার মনে হয়নি, গত সাত বছর ধরে মেজদা আমাদের সঙ্গে নেই। ওর কোনও ঠিকানা কেউ জানে না। সেই ৫-৬টা দিন ওরা দুজনে বুকে করে এমন আগলে রেখে ছিল যে মনে হয়েছে সর্বদা আমরা একসঙ্গেই ছিলাম সেই ছোটবেলার মতো। একবারও জিজ্ঞেসও করিনি— 'মেজদা তোরা কোথায় বাড়ি নিয়েছিস? প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছিস না কি নার্সিং হোম বা হাসপাতালে? তোর ফোন নম্বরটা দে তুলে রাখি।'— না। কিচ্ছু জিজ্ঞেস করিনি আমি। নিজের লোকের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে ওদের কোনও খবরই নেওয়া হয়নি। মাকে সেসবই বললাম। মা বলল, — 'পেয়েও হারিয়ে এলি?'

মা নেই। আজই ভোররাতে চলে গেল। কেওড়াতলা শ্মশানে বসেছিলাম একাই ঘাটের সিঁড়িতে। ভাবছিলাম নিজের গভীরে ডুব দিয়ে। মারা যাবার আগে অসুস্থ অবস্থায় মা কেবলই 'সমু সমু' করত। ঘরে কেউ ঢুকলেই বলত, — 'কে সমু এলি?' মেজদা মায়ের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ছিল। মরবার আগে তাকে একবার দেখার জন্য ছটফট করেছে মা। শেষ দেখা হল না। মেজদা জানতেও পারল না মা যে চলে গেল। পুণে থেকে ফেরার ক'দিন পরে করা মা-র সেই প্রশ্নটা নিয়ে আগেও অনেকবার ভেবেছি, আজ শ্মশানে বসেও ভাবছি। প্রত্যেকবারই এক উত্তর এসেছে মনের ভেতর থেকে। আসলে মেজদাই আমাদের শোকার্ত অবস্থা দেখে কাতর হয়ে নিজের কথা বলতেই ভুলে গিয়েছিল। আর আমি বহুবার জিজ্ঞেস করতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করেছি। রিমলির মত্যুশোকের মধ্যেও আমার মাথায় একটা কথা বারবার উঁকি মেরেছে। মেজদার সঙ্গে বাড়ির সকলের আবার যোগাযোগ হয়ে গেলে অবধারিত ভাবেই রিমলীর অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার কথা, সুলতান ইলিয়াসের কথা, পাঁচ মাসের প্রেগন্যান্সির কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে বাড়িতে। আমার সারা জীবনের হেঁট মুণ্ডুটাকে তাহলে আর তো কখনওই তুলতে পারব না। তার চেয়ে মেজদারা হারিয়েই থাকুক না। ওরা নিজেরাই হারিয়ে থাকতে চেয়েছে। তা না হলে তো মা'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই পারত। আমিও তো রিমলিকে হারিয়েছি। মা আর বাড়ির সকলেও না হয় প্রিয় মেজদাকে হারিয়েই ফেলুক। মানুষ মরে গেলেও তার কলঙ্ক অমর হয়ে থাকে। রিমলির নোংরা জীবনের কলঙ্ককে আমি বেঁচে থাকতে দিতে চাইনি। অন্যায়টা কি করেছি? আমাকেও তো সমাজে মাথা তুলেই বাঁচতে হবে? মেজদাও তো বলেছিল— যতক্ষণ শ্বাস চলে ততক্ষণ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাই জীবনের ধর্ম। আমি তো তাই করে চলেছি।

সিগ্রেটটা আর নিজের অপরাধবোধকে আদিগঙ্গার নোংরা ঘোলা জলে বিসর্জন দিয়ে উঠে এলাম অন্যদের কাছে। মাকে কাঠের আগুন দেওয়া হয়েছে। ইলেকট্রিক চুল্লিতে নয়। মায়ের চিতা তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। দুদিকে দুটো শিখা উঁচু হয়ে উঠেছে হাতের মতো। মা যেন হাত বাড়িয়ে 'সমু সমু' বলে খুঁজছে মনে হল আমার। বিবেকটা আবার লাফিয়ে উঠতে চাইছিল। দাঁত চেপে সেটাকে কঁৎ করে গিলে ফেললাম।

স্বপ্নভঙ্গের এক করুণ কাহিনী

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বায়ুদ

অকুস্থল দিল্লী।

তবে এই দিল্লী আজকের নয়। এখনকার দিল্লীর সঙ্গে তার কোনও মিল পাওয়া যাবে না। তাই স্থানটি চেনানো গেল না।

যে দিল্লীর কথা বলা হচ্ছে, তা হল মুঘল-পাঠানদের আমলের। তখনকার দিল্লী ছিল অনেক প্রকাণ্ড। অনেক
জঙ্গলাকীর্ণ। কোথাও কোথাও ঘনবসতি, আবার কোথাও বা জনহীন রুক্ষ প্রান্তর। কোথাও পোড়ো জমি, আবার কোথাও বা কাঁটা গাছের জঙ্গল। কোনও কোনও জায়গায় মুঘল-পাঠান, কোনও কোনও জায়গায় দেহাতি মানুষজন। সে এক অচেনা নগর।

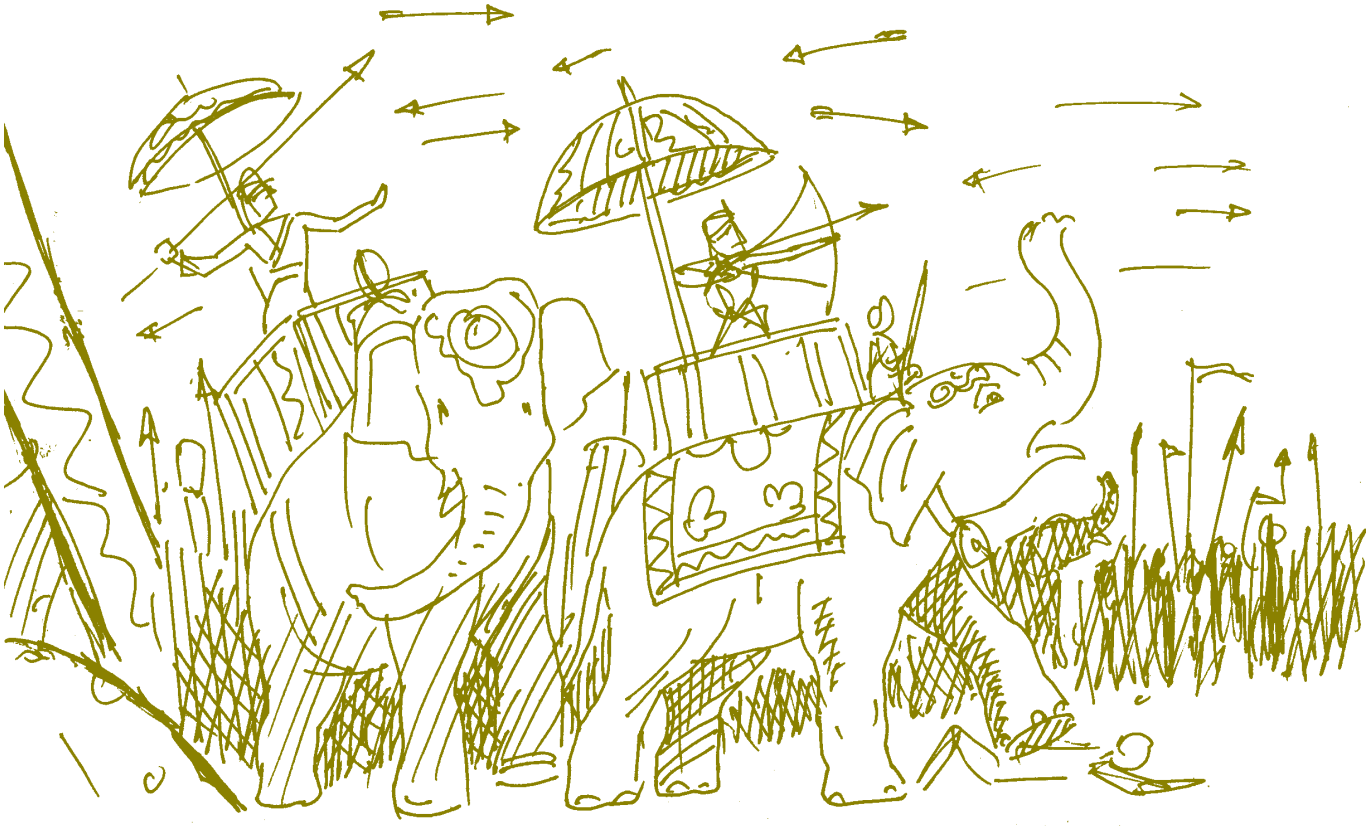

সেদিন দেহাতি পাড়ায় ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামল। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল আলো। কোনও ঘরে প্রদীপ, কোনও ঘরে চেরাগ।

বড়ো রাস্তার মোড়ে যে ছোট্ট দোকানটি ছিল, সেখানে দোকানদার হেমকান্তি চক্‌মকি ঠুকে শোলার মাথায় আগুন ধরাল। তারপর সেই আগুন দিয়ে দোকানঘরে একটি চেরাগ জ্বালল সে।

দোকানে সারাদিনের বিক্রিবাটা শেষ। তবে এখনই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করা যাবে না। সন্ধ্যার পরও দু-একজন খরিদ্দার আসে। তাদের জন্য দোকান খোলা রাখা দরকার। হেমকান্তি তাদের জন্যই দোকানের ঝাঁপ নামাল না। জ্বালিয়ে রাখল চেরাগ, এবং এই অবসরে দিনের বিক্রিবাটার হিসেবটা করতে বসে গেল। এটি তার দৈনিক কাজ। প্রতিদিনের অভ্যাস।

হেমকান্তি হল খুবই হিসেবি লোক। কেবল বিক্রিবাটার হিসাব নয়, সে জীবনের প্রতিটি পা ফেলে হিসেব করে। এই যে হিসেব করে চলা, তা কিন্তু কেউ তাকে হাতে ধরে শিখিয়ে দেয়নি। কারও দেখে যে সে এটি শিখেছে, তাও কিন্তু নয়। এই হিসেব করে চলা হল তার জন্মগত সহজাত। হিসেব না মিললে তার মন খুঁত খুঁত করে। রাতে ঘুম হয় না।

হেমকান্তির এই যে গোলদার দোকান-দারি, তাও হিসেব করে করা। সে ইচ্ছে করলে কাপড়ের দোকান দিতে পারত। দিতে পারত মদের দোকান। পান-জর্দার দোকানও দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু হেমকান্তি তা দেয়নি। অনেক হিসেব কষে সে দিয়েছে এক গোলদারি দোকান। এই দোকান থেকে চাল-ডাল-গেঁহু, ভোজ্যতেল থেকে গো-মহিষের খাদ্য খোল-ভুঁষিও বিক্রি করা যায়। বিক্রয় করা যায় কাপড় কাচার সাজি মাটি, দড়ি-দড়া এবং পাখি পোষার খাঁচা পর্যন্ত। এই দোকান থেকেই হেমকান্তি মেলা তামাক বিক্রয় করে, বিক্রয় করে শিল-নোড়া, ঝাড়ু ইত্যাদি।

গোলদারি দোকানের এই হল মজা। সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস এখান থেকে সরবরাহ করা যায়।

খরিদ্দারের অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে কখনও বসে থাকতে হয় না।

একটু দূরে গজুর পান-জর্দার দোকান। সেখানেও বিক্রিবাটা মন্দ নয়। তবে মাঝে মাঝে গজুকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। তখন মাছি তাড়ায়। অপেক্ষা করতে হয় খরিদ্দারের জন্য। তবে শেষমেশ সে খরিদ্দার পায়।

দোকানের সামনে দিয়ে ঝাঁকা নিয়ে প্রতি সকালে মেলা সবজিওয়ালা যায় ঝাঁকা ভর্তি করে। তারা কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে হাটের পথ ধরে।

একদিন তাদের সর্দার হেমকান্তিকে ধরেছিল, 'দু-একটা ঝাঁকা রাখেন না কেন ঠাকুরমশাই! খরিদ্দাররা এখানে এসে চাল-ডাল-লবনের সঙ্গে সবজিও কিছু কিনে নিয়ে যাবে। এতে আপনার নাফা কিছু খারাপ হবে না।'

'তা হবে না ঠিকই। তবে এটি হল পচ্‌তি মাল। সবজি যদি দিনের দিন না বেচা যায়, তাহলে কিন্তু বিলকুল লোকসান। গোলদারি দোকানে পচ্‌তি মাল রাখা চলে না।'

একবার এক মাছওয়ালাও ধরেছিল, 'কর্তা, আপনার এই গোলদারির সঙ্গে যদি মাছের ব্যবসাটাও রাখেন, তা হলে কেমন হয়?'

হেমকান্তি দাঁত খিঁচিয়ে বলেছিল, 'খারাপ হয় না। তবে দোকানে বড়ো আঁশটে গন্ধ হবে, এই যা। খদ্দেরদের বদলে তখন পিন্‌পিন্ করে বেড়াল আসবে। আর আমার বাঁধা খদ্দেররা ইঁদুরের মতো সব পালিয়ে যাবে।'

হেমকান্তি যা কিছু করে, তা হিসেব করেই করে থাকে। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে সে কাজ করে না।

আবেগবশে সে কখনও কিছু করেনি। গোলদারি দোকানে যা যা বিক্রি করা সম্ভব, সেই সেই জিনিসগুলি সে বিক্রয় করলেও বাড়তি কোনও ঝুঁকি সে নেয়নি। তবে ঝুঁকি নিয়ে আর সব ব্যবসাদারেরা কে কেমন লাভ করছে, তার খবর হেমকান্তি রাখে। এবং এই নিয়ে পান-জর্দার দোকানি গজুর সঙ্গে তার কিছু কিছু আলোচনাও হয়।

গজুর ইচ্ছে, সে একটা শরাবের পানশালা দেয়। তাতে নাকি মেলা লাভ।

'পানশালা? সরাবের কারবার? সে যে মাতালের মোচ্ছব হবে রে। সামলাতে পারবি না গজু।'

'সামলাতে পারলে কিন্তু মেলা লাভ।'

'তা ঠিক, কিন্তু পা পিছলে গেলে লাভের গুড় পিঁপড়েতে খাবে, তখন কী হবে?'

হেমকান্তির কথায় মন বোঝে না গজুর। সে গাজুগুজু করে।

'তাহলে কী শুধু ওই পান-জর্দার ব্যবসাটাই চালিয়ে যাবো?'

হেমকান্তি বুঝতে পারল, খুশি নয় গজু। তখন সে মাথা চুলকে বলল, 'পান-জর্দার সঙ্গে তাহলে তুই আতরের ব্যবসা কর। যারা পান-জর্দা খায়, তারা শৌখিন। তারা গায়ে আতর লাগায়। তারা খুশবু ভালোবাসে। এই ব্যবসাটি করলে তোর এক ঢিলে দু-পাখি মারা হবে।'

কথাটি মনে ধরেছে গজুর। আতরের ব্যবসা করতে সে ইচ্ছুক। কিন্তু এ ব্যবসায় মোটা মূলধন দরকার। এখনও সে মূলধনের টাকা জোগাড় করতে পারেনি। জোগাড় করতে পারলেই গজু আতরের ব্যবসা শুরু করবে।

কিন্তু বছর খানেক আগে হেমকান্তিকে হঠাৎ নিজের ব্যবসা খানিকটা বাড়াতে হল। কিছুটা চাপে পড়ে।

পরিকল্পনা ছিল না। নতুন করে পরিকল্পনা করে এবং বেশ খানিকটা হিসেব নিকেশ করে এই ব্যবসায় নেমে পড়তে হল হেমকান্তিকে।

ব্যবসায় নামবার ঘটনাটি এইরকম। সে যেন গল্পকথা।

তখন গ্রীষ্মকাল। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। দুপুর বেলা। পথ জনবিরল। গরম বাতাস বইছে। লু। তা সেদিন এইরকমই ছিল।

দুটি উটের পিঠে কয়েক বস্তা মাল চাপিয়ে এক মাঝ-বয়সী লোক হেমকান্তির দোকানে এসে হাজির।

লোকটি পরিশ্রান্ত। ক্লান্ত। সঙ্গে কোনও লোকজনও নেই। মানুষটি একা। উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল সে। নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল দোকানের কাছে। বসল দোকানের দাওয়ায়। বলল, 'ভেইয়া, পিনেকা পানী মিলবে?'

'না মেলার কী আছে?'— ডাবু ভর্তি জল এগিয়ে দিল তাকে হেমকান্তি। — 'পান করুন।'

এক নিঃশ্বাসে জল পান করার পর লোকটি যেন কিছুটা স্বস্তি বোধ করল। পাগড়ির মতো করে মাথায় জড়ানো ছিল একটি গামছা। সেই গামছাটি খুলে পাট করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খানিক হাওয়া খেল। এরপর এক সময়ে সে মুখ খুলল। ভাঙা ভাঙা গলা।

'ভেইয়া, আমি অনেক দূরের মুলুক থেকে আসছি। অনেক দূরের এক দেশ। আপনি হয়ত সে দেশ চিনবেন না।'

'তা নামটা বলুন। দেখি, চিনতে পারি কী না!'

'গৌড়দেশ। বাঙ্গাল মুলুক। চেনেন?'

'না, চিনি না। তবে ওই নাম শুনেছি। সেখান থেকে আপনি আসছেন? আপনি কী একজন বেনিয়া, ব্যবসা করেন?'— তাই না?'

'জী।' লোকটি হাসল। — 'হ্যাঁ, আমি ব্যবসা করি। আমি বেনিয়া। এই ব্যবসার জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি। আমার কাছে কিছু সওদা আছে। আপনার কাছে দিয়ে যেতে চাই।'

লোকটির কথা শুনে হেমকান্তি অবাক। বলা নেই, কওয়া নেই, সওদা নিয়ে এসে হাজির! কেমন লোক রে বাবা!'

'কী ধরনের সওদা নিয়ে এসেছেন? আমার গোলদারি দোকান। সেটা দেখছেন তো?'

'ভেইয়া, আমি যে সওদা এনেছি, তা ঠিক গোলদারি দোকানের উপযোগী নয়। চাল-ডাল-তেল নুন নয়।'

'তাহলে? যদি কোনও উট্‌কো মাল হয়, তাহলে তা আমি বেচব কী করে? কোথায় খদ্দের পাবো?'

লোকটি হাসল। রহস্যময় এক হাসি। হেসে বলল, 'মালটা বেশ উট্‌কোই বটে। তবে বেচার জন্য খরিদ্দারের অভাব হবে না। আমি সেই খরিদ্দার পাঠিয়ে দেব। তারা নিয়মিত মাল নিয়ে যাবে।'

কী বলতে চায় লোকটি? হেমকান্তি লোকটির কথার মর্মার্থ কিছুই বুঝতে পারে না। খরিদ্দার পাঠিয়ে দেবে?

লোকটির কাছে বিক্রয় করার মতো পর্যাপ্ত মাল রয়েছে, লোকটির সন্ধানে খরিদ্দারও রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও লোকটি সরাসরি মাল বিক্রয় করছেনা কেন? মাঝখানে হেমকান্তিকে টেনে আনার কী দরকার? লোকটির মাথায় কী কিছু গোলমাল রয়েছে? ধন্ধ লাগে হেমকান্তির। হেমকান্তি সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে লোকটির দিকে।

লোকটি যেন বুঝতে পারে হেমকান্তির মনের কথা। তার বিস্ময়ের কারণ।

'ভেইয়া, আমার বাতচিৎ আপনি বোধহয় ঠিক ঠিক সমঝ করতে পারছেন না, তাই না?'

'জী।'

'তাহলে ব্যাপারটিকে বিস্তারিত ভাবে খুলেই বলতে হয়।— বলি, কেমন!'

এরপর লোকটি বিস্তারিত ভাবেই সব কথা খুলে বলতে আরম্ভ করল। এবং যা বলল, তা হল এইরকম— এ যেন এক ইতিহাস।

লোকটির আদি বসত হল গৌড়দেশ। ইদানীং তাকে 'বঙ্গাল' মুলুক বলা হয়। তবে এখন সেখানে সে থাকে না। লোকটির পুরো নাম গৌতম ভার্গব। জাতিতে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের পেশা না নিয়ে প্রথম যৌবন থেকেই গৌতম বণিক বৃত্তি বা ব্যবসায়ে উৎসাহী। তা নানান ধরনের ব্যবসা সে জিন্দেগীতেকরেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাপড়ের ব্যবসা। 'বঙ্গাল' মুলুকের কাপড়ের ব্যবসায় খুবই নামডাক। এই ব্যবসার সূত্রে গৌতম ভার্গব আর্যাবর্তের বিস্তর জায়গাতে ঘুরেছে। কাশী, মথুরা, কুরুক্ষেত্র এবং দিল্লীর অনেক 'বাক্‌কনের' সঙ্গে তার পরিচয় হয়। পশ্চিমদেশের ব্যবসায়ী বণিকদের যে 'বাক্‌কন' বলা হয়ে থাকে, তা তার আগে জানা ছিল না। এই ঘোরাঘুরির সূত্রেই গৌতম ভার্গব তা জানতে পারে।

বছর দশ-বারো আগে এক বাক্‌কনের কাছ থেকেই সে জানতে পারে, ব্যবসার সেরা ব্যবসা হল 'শোর-গন্ধক-মোমছাল ও লৌহচূর্ণের' ব্যবসা। এইসব উপধাতু দিয়ে তৈরি হয় বারুদ। এই বারুদ নাকি আবার বিশেষভাবে কাজে লাগে কামান-বন্দুকের গোলা তৈরি করতে। মোগল-পাঠান সবাই এখন কামানের গোলা তৈরি করা নিয়ে পাগল। কেননা, তারা যুদ্ধে যায়। তারা হন্যে হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে গোলার মশলা জোগাড় করার জন্য।

যে বাক্‌কন গৌতম ভার্গবকে এই খবর দিয়েছিল, সে ঈষৎ ভুরু নাচিয়ে বলেছিল, 'কী হে গৌতম, পারবে কী তুমি আমাকে ওইসব উপধাতুর যোগান দিতে? ঠিক মতো যোগান দিতে পারলে, তোমাকে আমি রাজা বানিয়ে দেব।'

গৌতম এই বৃত্তান্ত হাঁ করে শুনেছিল। শুনে বলেছিল, 'এই শোরা-গন্ধক-মোমছাল-লৌহচূর্ণ কোথা থেকে পাবো? কোথায় এইসব পাওয়া যায় জানলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

বাক্‌কনটি হেসে বলেছিল, 'তোমাদের গৌড়দেশ হল এইসব উপধাতুগুলির খনি বিশেষ। বারুদের মশলা গৌড়দেশেই বেশি করে পাওয়া যায়। খোঁজ করো।'

গৌতম ভার্গব নিজের মুলুকে ফিরে এসে আরম্ভ করে দিল খোঁজাখুঁজিই। দৌড়াদৌড়ি।

তা বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে হল না। পাওয়া গেল উপধাতুর সন্ধান। বারুদ তৈরি করার সব মাল-মশলার হদিশ মিলে গেল। যে বাক্‌কনটি তাকে ভুরু নাচিয়ে উৎসাহিত করেছিল, তাকে মাঝখানে রেখে মাসখানেক পর থেকে আরম্ভ হয়ে গেল গৌতম ভার্গবের ব্যবসা।

ব্যবসায়ী হিসাবে এই বক্‌কনটি থাকত সামনে। আর পিছনে ছায়ার মতো থাকত গৌতম। তাকে কেউ দেখতে পেত না।

মুঘল-পাঠন, দু'দলকেই মশলা যোগান দিতে থাকলেন বাক্‌কনটি। দু'দলই তাকে চিনত। চিনত বিশেষভাবে।

তা এই চেনাই বোধহয় শেষমেষ তেনার কাল হল। দু'দলের মশলা প্রাপ্তির রেষারেষিতে একদিন খুন হয় গেল বেচারি। যে খুঁটিতে মাল জমা রাখা হত, সেই খুঁটিটি লুঠ হয়ে গেল। হারিয়ে গেল সেই 'বাক্‌কন' মানুষটি। একেবারে লোপাট।

ওই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটি হয়ে যাবার পর গৌতম ভয়ে পালিয়ে এল নিজের মুলুকে। যেন পালিয়ে বাঁচল সে।

কাহিনীটি এই পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে বলে আগন্তুক লোকটি থামল। হেমকান্তি দেখল, লোকটি যেন মৃদু মৃদু হাঁফাচ্ছে। কপালে ঘাম দেখা গেল বিন্দু বিন্দু। লোকটি যেন উত্তেজিত।

বেশ কিছুটা চু প করে থেকে নিজেকে সামলে নিল সে। গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেল। ডাবু থেকে একটু জলও খেল।

'তা দেখ বাছা, টাকা পয়সার লোভ হল সংসারে বড় লোভ। সাধু-সন্তরাও এই লোভ এড়াতে পারেন না তো তুচ্ছ এই ব্যবসায়ী গৌতম ভার্গব! সে নিজের মুলুক থেকে একদিন ফিরে এল এই দিল্লী শহরে। হাত গুটিয়ে ঘরে বসে না থেকে ব্যবসার সূত্রগুলি খুঁজে বের করতে থাকল। এবং অবশেষে সে খুঁজেও পেল। চালু হল ব্যবসা।

তবে গৌতম ভার্গব নিজেই আরম্ভ করে দিল এই ব্যবসা। কিন্তু ভারি কৌশলের সঙ্গে। অতি গোপনে নগরে সে বানিয়ে ফেলল চার-পাঁচটি খুঁটি। খুঁটি যা মাল জমায়েতের জায়গা। এই সব গোপন খুঁটির খবর না-জানতে পারল মুঘলরা, না পাঠানরা। তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট খুঁটি থেকে মাল সরবরাহ হতে থাকল। আজও সেইভাবে চলছে। এবং ব্যবসাও ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে পড়েছে। বেছে বেছে বিশেষ বিশেষ দোকানদারের কাছে অতি গোপনে পৌঁছে যাচ্ছে মাল। সেই দোকান থেকে আরও গোপনে এবং প্রায় নিঃশব্দে ওই মাল তুলে নিয়ে যাচ্ছে পাঠানরা, কিংবা মুঘলরা। আর দোকানদারেরা পেয়ে যাচ্ছে নগদ টাকা। এই টাকার পরিমাণটা খুবই লোভনীয় হে!

এই পর্যন্ত বলে লোকটি থামল।

হেমকান্তি বলল, 'আপনি যেভাবে কাহিনীটি বলতে আরম্ভ করেছিলেন, তা প্রথমের দিকে বুঝতে পারিনি, এই গৌতম ভার্গব লোকটি কে? তা এখন বুঝতে পারছি, ওই গৌতম ভার্গব হলেন আপনি নিজে। আপনিই হলেন বারুদের মশলার ব্যবসাদার, তাই না?'

লোকটি হেসে বলল, 'আপনার অনুমান যথার্থ। আপনি কেবল হেমকান্তি নন, চতুর। বুদ্ধি মান। সামান্য ইশারাতেই শতকথা বুঝতে পারেন। ব্যবসায়ী হতে হলে এই গুণগুলি অবশ্য থাকা দরকার।'

গ্রীষ্মের খাঁ খাঁ দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। বাতাসে আগুনের হল্‌কা। চারদিক নির্জন।

কোথাও কোনও জন-মনিষ্যি নেই। অদূরে দাঁড়িয়ে আছে দুটি উট। উটের পিঠে কয়েক বস্তা মাল।

হেমকান্তি লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি তাহলে কী আমার কাছে এই বস্তাভরা মাল পৌঁছে দিতে এসেছেন?'

'জী।' — হাসল লোকটি, 'ঠিক ধরেছেন।'

হেমকান্তি হেসে বলল, 'তা আমি যদি এই ব্যবসায় না নামি, এই মাল যদি না নিই?'

'নেবেন না, না নেবার স্বাধীনতা তো আপনার আছেই। আমি এই উট দুটিকে নিয়ে এখনই তাহলে ফিরে যাবো।' — লোকটি বিরল মুখে বলল, 'আপনি একজন তরুণ এবং উঠতি ব্যবসাদার। ব্যবসা বাড়ুক, এই স্বপ্ন নিশ্চ য় আপনি দেখেন। যে ব্যবসা খুবই লাভজনক, সেই ব্যবসাকে দূরে ঠেলে দিয়ে নিশ্চ য় আপনি বোকামি করবেন না!'

হেমকান্তি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। চিন্তা করে বলল, 'এই ব্যবসা করতে গিয়ে কোনও বিপদে পড়ব না তো?'

'না। সে রকম কোনও সম্ভাবনা ইদানীং দেখছি না। যেদিন দুপুরে এই মালের বস্তা আপনার কাছে এসে পৌঁছুবে, সেদিন সন্ধ্যাতেই পাঠানরা এই মাল নিয়ে চলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা নগদে দাম মিটিয়ে দিয়ে যাবে। কোনও ধারবাকি না। সপ্তাহে তিনদিন এই ব্যবসা হবে। মাল বিক্রির পর আমি টাকা নিয়ে যাবো। বস্তা পিছু এক তঙ্কা করে নাফা। কোনও গোলমাল পাবেন না, জনাব।

'এই মাল আমার দোকানে কে পৌঁছে দিয়ে যাবে? আপনি আসবেন নাকি!'

'না, আমি আর আসব না। আমার কর্মচারীরা আসবে। আপনি আমার আর কখনও দেখা পাবেন না। এই কর্মচারীরাই সব লেনদেন করবে। এবং যা কিছু কাজকারবার হবে, তা অতিশয় গোপনে।'

হেমকান্তি হেসে বলল, 'গৌতম ভার্গবকে আর আমি দেখতে পারবো না, তাই তো! দেখব কেবল মালমশলার যাওয়া আসা।'

'জী।'

হেমকান্তি হেসে বলল, 'বুঝেছি। এই ব্যবসা হবে এক ছায়ার সঙ্গে। তা তাই হোক। তঙ্কাটা যখন ছায়া নয়, তখন আমি রাজি আছি। আজ থেকেই ব্যবসা তাহলে চালু হয়ে যাক।'

এই নতুন ব্যবসাতে সেদিন থেকে নেমে পড়লেন হেমকান্তি। খুবই নিঃশব্দে এবং গোপনে। গজুও জানতে পারল না।

গৌতম ভার্গব যেদিন দুপুরে মাল খালাস করে গেলেন সেইদিন সন্ধ্যাতেই দু'জন অশ্বারোহী পাঠান এসে হাজির হল। তারা হেমকান্তিকে সেলাম জানিয়ে বলল, 'জনাব, হামারা সওদা কী আস্তি মিলেগা?'

'মিলেগা।'— বস্তাগুলি দেখিয়ে দিল হেমকান্তি। ইশারায় কাজ হয়ে গেল।

নগদ তঙ্কা ফেলে তারা সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল।

সেই শুরু। দেখতে দেখতে আজ গড়িয়ে গেল তিনটি বছর। এই তিন বছরে কিছু কিছু পরিবর্তন হলেও, ব্যবসার ধারাটি অব্যাহত। কোনও পরিবর্তন নেই। এই অব্যাহত ব্যবসার কারণে হেমকান্তির বেশ টাকা জমে গেছে। এই জমা দিনে দিনে বাড়ছে।

হেমকান্তি আগে টাকা রাখত একটি গেঁজের ভেতর। গেঁজ বাঁধা থাকত কোমরে। টাকার আমদানির জন্য গেঁজ বড়ো করতে হল। কিন্তু বড়ো করেও আমদানি টাকার ঠাঁই দেওয়া সম্ভব হল না। এই পরিস্থিতিতে একটি হাঁড়িতে টাকা রাখতে থাকল হেমকান্তি। সেই হাঁড়িও উপচে পড়ল। তখন পিতলের ঘড়া ধরতে হল।

হেমকান্তি এরপর বাড়াতে থাকল ঘড়ার সংখ্যা। এবং দেখতে দেখতে তিন বছরে টাকার পরিমাণ সাত ঘড়া হয়ে গেল।

যে ছোট্ট কুঠিতে হেমকান্তি বাস করত, সেই কুঠির ভেতর একটি মেঝে খুঁড়ে মাটির তলায় রাখতে আরম্ভ করল অর্থ। যেভাবে গুপ্তধন রাখা হয়, সেইভাবে। এই গোপন ধনভাণ্ডারের খবর হেমকান্তি ছাড়া আর কারো জানার সুযোগ থাকল না। হেমকান্তি মনে মনে ভাবতে

থাকল, আরও কিছু টাকার আমদানি হলে সে একটি পাকাবাড়ি করবে এবং তারপর বে-থা করে সংসার করবে।

হেমকান্তি খুবই চালাক ও ধূর্ত লোক। সে নিজের এই অর্থাগমকে বাইরে কোনওভাবেই জানতে দিল না। এমনকী গজুকেও না। গোলদারি দোকান যেমন চলছিল, সেই ভাবেই হেমকান্তি চালাতে থাকল। খরিদ্দাররা যেমন আসছিল, সেই ভাবেই আসে। তারা যেমন কেনাকাটা করত, সেইভাবেই করে। তাদের চোখে হেমকান্তির ব্যবহারের কোনও হেরফের নেই। তা ব্যবহারের কোনও হেরফের না থাকলেও তারা দেখল দোকানি হেমকান্তির চেহারায় বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আগের সেই রোগা শিকড়ে চেহারায় মাংস হয়েছে। হেমকান্তি ধীরে ধীরে সুদর্শন হয়ে উঠছে। রংটাও ফর্সা হচ্ছে।

এদিকে সন্ধ্যার পর সারাদিনের বিক্রিবাটার শেষে হেমকান্তি যেমন চক্‌মকি ঠুকে চেরাগ জ্বালিয়ে টাকা-পয়সার হিসেব করতে বসত, আজও তেমনি করে থাকে। তবে হিসেবের খাতা এখন দুটি। একটি খাতায় গোলদারি দোকানের হিসাব। অন্যটিতে বারুদের হিসেব-নিকেশ। সপ্তাহের সাতদিনই গোলদারি দোকানের হিসাব কষা হয়। কিন্তু বারুদের খাতা লেখা হয় তিনদিন। এবং সেটি রাত আটটার পরে।

এই আটটা নাগাদ এসে হাজির হয় তিন-চারজন অশ্বারোহী পাঠান। এই সময় জায়গাটি প্রায় নির্জনই থাকে। থাকে নিঃশব্দ। অশ্বারোহী পাঠানরাও আসে খুবই নিঃশব্দে। দোকানের কাছে এসে ডাকে, 'হেমুজী!'— ডাকে খুব চাপা গলায়।

তাদের এই ডাক শুনে হেমকান্তি তাড়াতাড়ি তার গোলদারি গদি থেকে নেমে এসে এগিয়ে দেয় বারুদের উপধাতুর বস্তা।

তারা ওই বস্তা তুলে নেয় ঘোড়ার পিঠে। টাকা মেটায়। তারপর প্রায় নিঃশব্দে চলে যায়।

তবে কোনও কোনও দিন তারা একটু দাঁড়িয়ে যায়। জলপান করে। হেমকান্তির হিসাব লেখা এবং দোকান বন্ধ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। হেমকান্তির আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে তারপর চলে যায়। তবে এই ধরনের ঘটনা কদাচিৎ ঘটে।

অশ্বারোহী লোকগুলি যারা আসে, তারা কিন্তু সব দিন এক লোক নয়। তাছাড়া তাদের মুখে একটি কালো কাপড় জড়ানো থাকে। তাই হেমকান্তি তাদের আজও চিনতে পারেনি। তা না চেনাতে হেমকান্তির কোনও আক্ষেপ নেই। সে ব্যবসা বোঝে। এই ব্যবসাটি হলেই হল। হাতে হাতে টাকাটি পেলেই সে নিশ্চিন্ত।

তা সেদিন রাত্তিরে লোকগুলি যেমন আসে, তেমনি এল। চাপা গলায় ডাকল— 'হেমু আছেন? হেমু!'

'আছিরে বাবা, আছি।'

মাল দেওয়া নেওয়া হল। টাকা গুণে নিল হেমকান্তি। হিসেব লেখাও হল। যেমন প্রতিবার হয়, তেমনি।

এরপর দোকান বন্ধ করে নিজের আস্তানায় ফেরা।

একজন অশ্বারোহী বলল, 'জনাব হেমুবাবু, আপনি হামার ঘোড়ায় উঠুন। আজ ঘোড়ায় করে আপনার আস্তানায় পৌঁছে দেই। তাড়াতাড়ি হোবে।'

হেমকান্তি কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল, 'আমার আস্তানা তো পাঁচ কদম দূরে। হেঁটেই চলে যাবো। তার জন্য ঘোড়ায় চড়ার দরকার কী?'

অশ্বারোহীটি প্রায় জোর করেই হেমকান্তিকে ঘোড়ায় তুলে নিল।

ঘোড়া ছুটল। দুরন্ত গতিতে। কোথাও থামল না। বেচারি হেমকান্তি কাতর হয়ে চীৎকার করতে থাকল। কিন্তু সে চীৎকার কারও কানে গিয়ে পৌঁছুল না।

বাজার সরকার

ঘোড়ায় উঠিয়ে নেবার পরে কী কী ঘটনা ঘটে গেল, তা মনে করতে পারে না হেমকান্তি। মনে আছে শুধু ঘোড়ায় ওঠা।

সে কী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল? না কী ভীষণভাবে ভয় পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল! না, সে কিছুই ঠাহর করতে পারে না। সেই সন্ধ্যে বেলায় চেতনা হারিয়েছিল হেমকান্তি। পাক্কা দশ ঘন্টা পরে হারানো চেতনা ফিরে এল তার। চেতনা ফেরার পর হেমকান্তি বুঝতে পারল না, তাকে কোথায় নিয়ে এসে রাখা হয়েছে। তবে চোখ মেলে সে যা দেখল, সে একটি চৌপায়ায় শুয়ে আছে। চৌপায়াটি কাঠের নয়, দড়ির। নড়বড়ে। পাশ ফিরতে ভয় লাগে। ক্যাঁচ কোচ্ শব্দ উঠে।

সে যে পোশাক পরে দোকানের ঠাটে বসেছিল, সেই পোশাকই তার পরনে। কোমরে যে গেঁজটি রাখা ছিল, সেটি ঠিক সেইভাবেই বাঁধা রয়েছে। কোনও গোলমাল হয়নি। যে ঘরটিতে সে শুয়ে রয়েছে, দেখে মনে হল, সে ঘরটি কোনও এক পুরনো ইমারতের অংশবিশেষ। ইমারতটি পাথরের। পাথরের গায়ে গায়ে মেলা জলের দাগ। রাতশেষে একটু একটু করে ফুটে উঠছে আলো। সেই আলোতেই হেমকান্তি এসব দেখতে পাচ্ছে। তার চোখে অপরিচিত পরিবেশটি একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে।

তা খাটিয়ার শয্যা ছেড়ে ধীরে ধীরে মেঝেতে পা রাখল হেমকান্তি। ইতি-উতি তাকিয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। ফাঁকা। কিছুটা দূরে দরজা। সম্ভবত বাইরে যাবার পথ। ওই দরজার কাছেও কেউ নেই। অর্থাৎ তাকে পাহারা দেওয়া হচ্ছে না।

হেমকান্তির একবার মনে হল, পালিয়ে গেলে কেমন হয়? কিন্তু কোথায় পালাবে? তাছাড়া যারা তাকে ধরে নিয়ে এসেছে, তারা কী তাকে পালাতে দেবে? আশেপাশে নিশ্চয় পাহারাদারেরা রয়েছে।

ঘরের ভেতরেই একটা পাক দিয়ে সেই চৌপায়াতেই আবার এসে শুয়ে পড়ল হেমকান্তি। তাকে নিয়ে ভয়ঙ্কর কিছু একটা হবে ভেবে নিয়ে সে বেশ কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে থাকল। তাকে এভাবে ধরে আনল কেন? কী তার অপরাধ?

সকাল হল। ভালো করে আলো ফুটল। দু'জন বিশাল চেহারার পাঠান হঠাৎ এসে তাকে বলল, 'এই যে হেমুসর্দার, ওঠো। হাতমুখ ধুয়ে চট্ করে তৈরি হয়ে নাও। ছোটো হাজারি থেকে হাজিরা দিতে হবে সুলতানের কাছে।'

হেমকান্তি অসহায় ভাবে বলল, 'তা আমাকে সুলতানের কাছে হাজিরা দিতে হবে কেন? আমি কী কোনও দোষ করেছি?'

একজন পাঠান হেঁড়ে গলায় বলল, 'অতশত জানি না। আমাদের কাছে যে হুকুম আছে, তাই শোনালাম। তৈরি হয়ে নাও।'

হেমকান্তি একবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, তোমরা হলে পাঠান। তা তোমাদের সুলতানের নাম কী?'

'আমাদের সুলতানের নাম হজরত ইসলাম শা। ভারি জববর আদমি। হুজুরের কাছে অপরাধ করলে, কারও রেহাই পাওয়ার জো নেই। তোমার মতো এক হিঁদুকে 'কলমা' না পড়িয়ে উনি ছাড়বেন না।'

হেমকান্তি যে একজন হিন্দু, এব্যাপারে সে সবসময় সচেতন নয়। আলওয়ারের কাছে অখ্যাত একটি গ্রামে নাকি তার জন্ম। জন্ম থেকেই বাবা-মা হারা। তার শৈশব স্মৃতি নেই। এক দূর সম্পর্কের মামার হাত ধরে নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে শেষে এসে ঠাঁই পেয়েছে এই দিল্লীর কাছে। মামা দেহ রেখেছেন। এখন সে একা। তবে সে বরাবর শুনে এসেছে যে, সে এক উচ্চবর্ণের হিন্দু। আর তার জাত না কী খুব উঁচু। ব্যস, এই পর্যন্ত। এর বেশি হেমকান্তি কিছু জানে না। কিন্তু তাকে কলমা পড়িয়ে হঠাৎ যদি তার ধর্মটা কেউ গায়ের জোরে ছিনিয়ে নেয়, একথা ভেবে তার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কী তার অপরাধ!

হেমকান্তি কাঁপা কাঁপা গলায় এবং অতি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি যদি কলমা না পড়তে চাই?'

পাঠানটি হেঁড়ে গলায় বলল, 'সুলতানের হুকুম না মানলে তোমাকে কোতল করা হবে।'

দুপুরের পরে হেমকান্তিকে নিয়ে গিয়ে হাজির করা হল সুলতানের দরবারে। সেখানেই নাকি তার বিচার হবে।

হেমকান্তি এর আগে দরবার কখনও দেখেনি। হজরত ইসলাম শায়ের দরবার দেখে তার চক্ষু চড়কগাছ। কী বিরাট একটা ঘর। যেন এক বিঘার মাঠ। ঘরের ভেতর কত না লোক। প্রতিটি লোকের জমকালো পোশাক। প্রত্যেকের গলায় মোতির হার। মাথায় পাগড়ি। পাগড়ির মাঝখানে জ্বল জ্বল করছে হীরে। হীরে কখনও দেখেনি হেমকান্তি। কিন্তু হীরেকে নিয়ে মেলা গল্প শুনেছে। শুনেছে হীরের দ্যুতিতে চারদিক আলো হয়ে যায়। এখন পাগড়ির মাঝখানে জ্বলন্ত আলো দেখে হেমকান্তি বুঝতে পারল যে এগুলি হীরে না হয়ে যায় না। নইলে অমন জ্বল জ্বল করছে কেন।

বিরাট ঘরটির শেষে উঁচু একটি পাটাতনের ওপর যিনি বসে রয়েছেন, হেমকান্তির মনে হল, তিনিই সুলতান। তাঁর পোশাক সবথেকে জমকালো। তাঁর গাখানা সোনার বরণ। তাঁর মাথার পাগড়িতে হীরে। চারিদিকে পাহারাদার। কালো খুসকো সব চেহারা। ওরা খোজা না হয়ে যায় না। সকলের হাতে বরশা। কোমরে তরোয়াল।

অনেক দূর থেকে সেলাম জানাতে জানাতে সেই পাঠানটি হেমকান্তিকে নিয়ে গেল সুলতানের কাছে।

হেমকান্তিও এগিয়ে গেল সেলাম করতে করতে। হেমকান্তির পোশাক মলিন। সেই দোকানি পোশাক। দুর্ভাবনা এবং দুশ্চিন্তায় তার চেহারা শুকিয়ে আমসি। চোখের কোলে কালি পড়েছে। হেমকান্তি নিজেই বুঝতে পারল, তার এখন যে চেহারা, তা হল সিঁদেল চোরের। সুতরাং তার শাস্তি অনিবার্য। শাস্তির ভয়ে কাঁপতে থাকল হেমকান্তি।

দরবার ঘর লোকজনে ঠাসা। সবাই দরবারি লোক। সুলতানের কাছে হেমকান্তিকে নিয়ে যাচ্ছে, সবাই অধীর আগ্রহে চুপচাপ। সকলেরই কৌতূহলী দৃষ্টি তার ওপর।

সুলতানের কাছাকাছি পৌঁছুতেই সুলতান চীৎকার করে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন রহিস লোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কোন্ আদমি? একে আমার কাছে নিয়ে আসা হয়েছে কেন?'

রহিস লোকটি বলল, 'এর নাম হেমু সর্দার। দিল্লীর উঁচু পট্টিতে দোকান দেয়।'

'ভালো কথা। তা দোকানিকে আমার কাছে হাজির করা হয়েছে কেন?'

'এই আদমি বারুদের উপধাতুর যোগান আমাদের দেয়। কিন্তু যে পরিমাণ যোগান দেয়, তা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। অথচ লোকটি মেলা বারুদের উপধাতু নিয়ে বসে আছে। হজরত, এই দোকানি আদমিটাকে পাকড়ে নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে সে সব উপধাতু আমাদের কাছেই দেয়।'

'বুঝেছি।'— সুলতান ঘন ঘন ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'এই আদমি তা হলে গোপনে গোপনে মুঘলদের সঙ্গেও কারবার করে। কী সাংঘাতিক কাণ্ড! এই ধরনের শয়তানিকে কখনই বরদাস্ত করা যায় না।'

কী ভয়ঙ্কর অভিযোগ। অভিযোগের বৃত্তান্ত শুনে হেমকান্তির গলা শুকিয়ে কাঠ। কাঁপতে থাকল সারা অঙ্গ। গৌতম ভার্গব এইরকম অভিযোগের কথা শুনিয়েছিলেন এক বাক্কনের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ এবং সন্দেহে সে বেচারি খুন হয়ে গিয়েছিল। তা হেমকান্তির বিরুদ্ধে সেইরকম কোনও শাস্তি নেমে আসবে নাকি! হেমকান্তির সারা শরীর জুড়ে নামল কাঁপুনি।

'হেমু সর্দার! তোমার বারুদের উপধাতুর কারবার কতদিনের?'

'আজ্ঞে, ও কারবার আমার নয়। ওই কারবার অন্য একজনের।'

'অন্য এক জনের? এ আবার কী ধরনের কথা? আমাদের মালের যোগান দেয় তাহলে কে?'

'আজ্ঞে যোগানটা আমি দিই। কিন্তু এই বান্দাকে মাল সরবরাহ করে আর একজন। তেনার সরবরাহ করা মাল পৌঁছায় আপনাদের কাছে। এই বান্দা হল মাঝের লোক।'

'তাহলে তুমি যে দোকানের দোকানি, সেই দোকানের মালিক কে?'

'আজ্ঞে এই বান্দা।'— কাঁপতে কাঁপতে বলে হেমকান্তি।

'ওই দোকান তাহলে কীসের দোকান? সেখানে কোন্ কোন্ জিনিসের কেনা-বেচা হয়?'

'আজ্ঞে, এই দোকানটি হল গোলদারি দোকান। সেখানে চাল-ডাল-গেঁহু, ছোলা-মটর, হলুদ, রসুন, আদা, পেঁয়াজ, জিরে গোলমরিচ থেকে ঝাড়াই সাফাইয়ের ঝাড়ু, ইঁদুর ধরা কল, এইসব বিক্রি হয়।'

'হুম্।' বিক্রয়ের ফিরিস্তি শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন সুলতান। বললেন, 'তুমি যা বলছ, তা সাচ্চা বলছ তো?'

'জী।' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল হেমকান্তি।

সুলতান তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই সর্দার যা বলছে, তা সত্যি কীনা, এখনই যাচাই করে দেখা দরকার। এই সর্দার যে আস্তানায় থাকে, সেখানে হানা দিয়ে দেখতে হবে বারুদ তৈরির উপধাতুগুলি সেখানে জমা করে রাখা আছে কীনা।'

সুলতানকে সেলাম জানিয়ে লোকটি বলল, 'হজরত যা যা বললেন, তা কালই পরখ করে দেখা হবে। হেমু সর্দারকে আমরা সহজে ছেড়ে দেব না।'

লোকটি হয়ত আরও কিছু বলত, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে সুলতান বললেন, 'আচ্ছা, এ রকম অপরাধের জন্য আমরা কী ধরনের সাজা দিয়ে থাকি?'

হজরতের এই জিজ্ঞাসার জবাবে লোকটি বলল, 'আঁজ্ঞে হিঁদু হলে তাকে কলমা পড়িয়ে মুসলমান করা হয়। আর মুসলমান হলে তাকে কোতল করা হয়। এর মাঝামাঝি কোনও শাস্তি নেই, জনাব।'

অপরাধী কে, তা সঠিকভাবে জানার আগেই ঘোষিত হয়ে গেল শাস্তি।

মাঝে একদিন। এই একদিন দুর্বিসহ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হল বেচারি হেমকান্তিকে।

পরের দিন তাকে হাজির করা হল দরবারে। দরবার সেইরকমই জমজমাট। সকলে উৎসুক চোখে দেখতে থাকল হেমকান্তিকে। অর্থাৎ তাদের হিমু সর্দারকে।

সুলতান সেই আগের দিনের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হেমু সর্দারের দোকানটি কীসের, তা দেখা হয়েছে কী?'

'দেখা হয়েছে জনাব, দোকানটি গোলদারি দোকানই বটে।'

'সেখানে কী কী পাওয়া গেল?'

'আঁজ্ঞে, চাল-ডাল-গেঁহু-ছোলা-মটল এইসব।'

'বারুদ তৈরির উপধাতু? শোরা, মোমছাল, গন্ধক এসব কিছুই মেলেনি?'

'না, জনাব।'— লোকটি বলল, 'দোকানটিকে আমরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছি। ওসব বস্তুর এক কণাও মেলে নি।'

'হেমু সর্দারের আস্তানাটি দেখা হয়েছে?'

'জী।' লোকটি একইভাবে বলল, 'ওই আস্তানাটিও আমরা গুঁড়িয়ে দিয়ে এসেছি। সেখানে পাঁচ বস্তা গেহু আর তিন বস্তা চাল ছাড়া আর কিছুই আমাদের লোকেরা পায়নি।'

'হেমু সর্দার তাহলে সাচ্ কথা বলেছে?'

'জী।'

সুলতান গম্ভীর মুখে সব কথা শুনে আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ওই হেমুটাকে তাহলে কী বিলকুল খালাস করে দেব? ছেড়ে দেব?'

'না জনাব, লোকটি যখন সন্দেহভাজন, তাকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। বাইরে বেরিয়ে গিয়ে সে ছুচুন্দরের মতো গর্তে সেঁদিয়ে যাবে। হয়ত মোগলদের ভেতর চলে যাবে। ওকে আমাদের কাছেই পাকড়ে রাখতে হবে। ছাড়লে চলবে না।'

'তাহলে লোকটাকে নিয়ে কী করব? কোন কাজ তাকে দিয়ে করানো হবে?'

'আঁজ্ঞে, সেটা একটা চিন্তার ব্যাপারই বটে। তা লোকটি যখন গোলদারি দোকান চালাত, তখন তাকে আমাদের কাছে পাকড়ে রেখে গোলদারি কেনাকাটার কাজে লাগানো যেতে পারে।'

সুলতান এই প্রস্তাব শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন।— বললেন, 'প্রস্তাবটি মন্দ নয়। আমাদের সেপাইদের জন্য গাড়ি গাড়ি রসদ কেনাকাটা করতে হয়। পাঁচ শত গণ্ডা বাজার সরকার আছে, তাদের মাথায় ওকে 'শুহ্না' করে চাপিয়ে দাও। দোকান চালানোর অভিজ্ঞতা যখন আছে, তখন এ কাজটা ভালোই পারবে।'

সুলতানের এই হুকুম পরের দিন থেকেই কার্যকর হয়ে গেল।

দোকানি হেমকান্তি পরের দিন থেকে হেমু সর্দার নামে সুলতানের কাজে বহাল হয়ে গেল। দিল্লীর উঁচু পট্টির দোকানি হয়ে গেল পাঠান সুলতান ইসলাম শাহর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। না, তার জাত-ধর্ম কিছুই গেল না। তাকে কোতলও করা হল না। বরং সে সুলতানি প্রাসাদের কাছাকাছি পেল একটি কুঠি। এই কুঠিতেই হল তার নতুন আস্তানা।

দিল্লীর উঁচু পট্টি হয়ে গেল তার কাছে অতীত। তার সহ ব্যবসায়ী গজুকে সে ধীরে ধীরে ভুলতে আরম্ভ করল।

হস্তী দর্শন

গজুকে ভুলে যেতে পারে হেমকান্তি। কিন্তু গজু তাকে ভোলে কেমন করে? হেমকান্তি যে তার নিত্যদিনের সঙ্গী। বন্ধু। পরামর্শদাতা।

তার চোখের সামনে যে ভাবে একটির পর একটি ঘটনা ঘটে গেল, তাতে গজুর পক্ষে হেমকান্তিকে ভুলে যাওয়া খুবই কঠিন হয়ে

উঠল।

সেদিন রাত্তির বেলা গজু যখন পান-জর্দার দোকানে ঝাঁপ ফেলে বাড়ি যায়, তখনও খোলা ছিল হেমকান্তির দোকান। সপ্তাহের তিনদিন বাদে তারা একসঙ্গে দোকানের পাট চুকিয়ে দিয়ে একসঙ্গে বাড়ি ফেরে। সেই ব্যতিক্রমী তিন দিনের ভেতর এটি ছিল একটি দিন। সুতরাং এই দিন এক সঙ্গে ফেরার কথা নয়। তাই ফেরা হয়নি।

কিন্তু পরের দিন? সকাল আটটা নাগাদ দোকান খোলে দুজনেই। কিন্তু আটটার পর বেলা গড়িয়ে দশটা বেজে গেল। কিন্তু হেমকান্তিকে দোকান খুলতে দেখা গেল না। ঝাঁপ ফেলা। দোকান বন্ধ। বেলা বাড়লেও ঝাঁপ ওঠে না।

খরিদ্দার একে একে আসে, ইতিউতি চায়, খানিক অপেক্ষা করে তারপর নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

এরকম ব্যাপার আগে কখনও হয়নি। হেমকান্তির গোলদারি দোকান কখনও বন্ধ যায়নি। জল, ঝড় কিংবা শারীরিক অসুস্থতা, কোনও অজুহাতেই ওই গোলদারি দোকান বন্ধ থাকেনি। হেমকান্তি নিজের ব্যবসার ব্যাপারে খুবই সতর্ক।

গজু অবাক হয়ে দেখল, সারাদিন দোকান বন্ধ হয়েই রইল। টিকি দেখা গেল না বন্ধুর।

সেদিন সন্ধ্যা বেলাতেই নিজের পান-জর্দার দোকান বন্ধ করে হেমকান্তির আস্তানায় হানা দিল গজু। ঘটনাটি জানা দরকার। এবং সেখানে গিয়ে সে যা দেখল, তাতে গজুর বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। সে সবিস্ময়ে দেখল, হেমকান্তির ঘরে তালা লাগানো। সেই ঘরে রাত্তিরে সে শুয়েছিল কী না, তা বোঝা গেল না। তা ঘরে না শুলে, সে কোথায় গেল?

হেমকান্তির কোনও হদিশ না পেয়ে সে রাতে গজুকে হতাশ হয়েই ফিরতে হল।

পরের দিন গজু যা দেখল, তাতে তার চোখ কপালে উঠল। সে দেখল, প্রহরখানেক বেলায় কয়েকজন অশ্বারোহী পাঠান সেপাই এসে হেমকান্তির দোকান ভাংচুর করল। তার গোলদারি দোকানের মালপত্তর টেনে টেনে বার করে রাস্তায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল। রাস্তার ওপর গড়াগড়ি খেতে থাকল গেঁহুর বস্তা। চাল-ডাল-তেল, নুন আরও কত কী।

পাঠান সেপাইরা দোকান ভেঙে কী সব যেন খুঁজতে চেষ্টা করল। তা সে সব কিছুর সন্ধান না পেয়ে মালগুলির ওপর লাথি মেরে চলে গেল। এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড জিন্দেগীতে কখনও দেখেনি গজু। সে ভয়ে কাঁটা। এ কী কাণ্ড ঘটল রে বাবা!

এবং এর পরেও যে আরও গভীর বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করছিল, তা গজু টের পেল সন্ধ্যার সময় নিজের আস্তানায় ফেরার পথে।

সন্ধ্যার পর সে এসে হাজির হল হেমকান্তির ডেরায়। যদি সে সেখানে থাকে। বা ফিরে থাকে। তাকে আজকের ঘটনা জানানো দরকার।

দোকানের ওপর যে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ডটি ঘটে গেছে, তা তাকে জরুর জানাতে হবে।

তাকে হেমকান্তির ডেরার ভেতর ঢুকতে হল না। গজু দেখল, তার ডেরার ওপরেও হাঙ্গামার চিহ্ন।

হেমকান্তির ঘরের চাল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ঘরের কপাট উপড়ে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে রাস্তায়। বেচারির বিছানাপত্র গড়াগড়ি খাচ্ছে উঠোনে। যেসব বস্তা-পুটুলি ঘরে ছিল, সেগুলি ছিন্নভিন্ন। হাঙ্গামাবাজদের হাত থকে রেহাই পায়নি হেমকান্তির রান্নার হাঁড়িকুড়ি। বাসনপত্র। সব কিছুই তছনছ। লণ্ডভণ্ড।

সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে হেমকান্তির বাসগৃহটি যেন একটি হানাবাড়ির মতো দেখাচ্ছে।

গজুর বুঝতে অসুবিধা হল না, হেমকান্তি অজানা এক শত্রুর গভীর আক্রোশের শিকার হয়েছে। যে পাঠান অশ্বারোহীরা তার দোকান ভেঙ্গেছে, এই অপকীর্তি নিশ্চয় তাদেরই কাণ্ড। তারা হেমকান্তির দুশমন। শত্রু।

কিন্তু কেন? কেন এমন হল? হেমকান্তির ওপর তাদের এমন আক্রোশ কেন?

ভয়ে ভয়ে গজু ফিরে এল নিজের আস্তানায়। হেমকান্তির মতো সেও এই দুনিয়ায় একাই থাকে। সেই শৈশব থেকে মা-বাবাকে সেও হারিয়ে বসে আছে। তবে হেমকান্তির মতো সে একেবারে নিঃসঙ্গ নয়। এক বর্ষিয়সী পিসি তার কাছে এসে থাকেন। গজু ঘরে ফিরে পিসিকে সব কথা বলে ফেলল। কথা শেষ করে বলল, 'হেমকান্তি সম্ভবত বেঁচে নেই। সে খুন হয়ে গেছে পাঠান দস্যুদের হাতে।'

'খুন হয়ে গেছে! আহা রে! তা এমন কেন হল? তার অপরাধ?'

'জানি না।'

'জানি না' বলে চুপ করে বসে থাকা যায় না। রহস্য ভেদ করার জন্য বেচারি গজুর মনটা আঁকুবাঁকু করতে থাকল।

গজুর দোকানে নানা ধরনের মানুষ পান-জর্দা কিনতে আসে। খুব সাধারণ মানুষ যেমন তার কাছে আসে। তেমনি আসে কোনও কোনও রহিস লোকও। একজন দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ সুপুরুষ ব্যক্তি মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে আসেন মিঠা পান কিনতে। মানুষটিকে দেখেই মনে হয়, তিনি খানদানি। একজন রাজবংশের লোক। ধীরে ধীরে এবং ক্ষেপে ক্ষেপে উনি কথা বলেন। মাথায় একটি পাগড়ি আছে। পরে থাকেন দীর্ঘ একটি কাবা। এমন পোশাক রাজপুরুষদেরই হয়।

তা সেই লোকটিকে দেখে গজুর মন হল, উনি হয়ত রহস্যভেদ করতে পারবেন। বলতে পারবেন হেমকান্তির নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পিছনে কাদের হাত থাকতে পারে। এবং কেন এমন হল, তারও একটি ব্যাখ্যা তিনিই দিতে পারেন।

লোকটিকে মিঠা পান খাইয়ে গজু ধীরে ধীরে বলল হেমকান্তির বিষয়টা। তার ওপর ঝামেলার কথা।

তা কেবল ঝামেলার কথা বলা নয়, তাঁকে হেমকান্তির দোকানটিও দেখাল গজু। বলল, 'একটা জলজ্যান্ত মানুষ এই ভাবে হাওয়া হয়ে গেল? এ কী কোনও দত্যিদানোর কাণ্ড! না দাঙ্গাবাজদের হিংস্রতা? তারা কেন এমন করল?'

লোকটি দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার অনুমান ঠিক নয়। এটি দত্যিদানোদের কাণ্ড হতে পারে না। দাঙ্গাবাজরা হঠাৎ এক দোকানির ওপর হিংস্রতা দেখাতে যাবে কেন?'

'তাই যদি না হয়, তাহলে এমন বিশ্রী কাণ্ড ঘটল কী করে?'

ফোঁস করে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটি বলল, 'এ রাজরোষ।'

'রাজরোষ?'— অবাক বিস্ময়ে গজু তাকিয়ে রইল লোকটির দিকে। 'কী করে বুঝলেন?'

লোকটি এক চিলতে জর্দা মুখে চালান করে দিয়ে বলল, 'রাজরোষ না থাকলে এই অশ্বারোহী সেপাইরা আসবে কেন? তারা সুলতানি ফরমান ছাড়া কখনও কী এমন হাঙ্গামা করতে পারে?'

'হয়ত তাই। কিন্তু আমাদের এই মুলুকে কে রাজা, কে সুলতান, তা আমরা কী জানি? হেমকান্তিও জানত না। তাহলে?'

'তোমাদের এই হেমকান্তি রাজা বা সুলতানকে চিনত না বটে! কিন্তু তাঁরা হেমকান্তিকে চিনত। নইলে এমন হবে কেন?'

গজুর চোখ বিস্ময়ে কপালে উঠল।

'তা হেমকান্তিকে যখন তাঁরা চিনত, তখন আমাকেও তাহলে চেনে?'

গৌরবর্ণ মানুষটি মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললেন, 'হয়ত চেনে। এবং এই চেনাটা বোঝা যাবে, যখন তাদের আপনাকে দরকার পড়বে।'

গজুর ভেতরটা হাঁকুপাঁকু করে উঠল। 'কারা আমাদের রাজা, কে আমাদের সুলতান, কোথায় তাঁরা থাকেন, এবং কেন তাঁরা মারামারি করেন, এইসব ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন তো। বুঝতে পারলে সেইভাবে খুব সাবধানে চলাফেরা করব।'

আগে মৃদুমৃদু হাসছিলেন মানুষটি। তাঁর নিজস্ব গাম্ভীর্য বজায় রেখে হাসছিলেন। গজুর প্রশ্ন শুনে এবার তিনি বেশ উচ্চৈঃস্বরে হা-হা করে হেসে উঠলেন। হাসি থামার পর অতি সংক্ষেপে এবং গল্পের মতো করে গজুকে যা বললেন, তা এইরকম—

'আমরা যে মুলুকে বাস করছি, এই মুলুকের নাম হল হিন্দুস্তান। এই হিন্দুস্তান ছোটখাটো কোনও মুলুক নয়। এ হল বিরাট এক দেশ। এখানে রয়েছে বিস্তর নদী, মেলা পাহাড়, মেলা জমিন, মেলা শহর, মেলা গ্রাম, আর নানা রকমের মানুষ। আছে নানা ধর্ম। মসজিদ, মন্দির, মঠ, কিছুরই অভাব নেই। এখানে যেমন রাজপুত, জাঠ এবং মেলা হিন্দু রয়েছে, তেমনি এখানে এসে হাজির হয়েছে আফগান, পাঠান, মোগল, তুর্কি, পারসি। এরা সবাই মুসলমান। এখানে এসেছে নিজেদের নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। এরা কেউ সুলতান, কেউ বাদশা, আবার কেউ রাজা।'

লোকটি খুব ধীরে ধীরে এবং গম্ভীর ভাবেই বলে চলেছিলেন। এই বলার মাঝে হঠাৎ গজু বলে বসল, 'তা এখন আমাদের সুলতান কে? কে রাজা?'

'হ্যাঁ, সেই কথাতেই আসছি।' লোকটি মৃদু হেসে বলতে আরম্ভ করলেন, 'এই মুহূর্তে এই দিল্লী শহরের কাছে চলছে দুই রাজার টানা সংঘর্ষ। এক রাজা হলেন সুলতান শের শাহের ছেলেরা, অন্যদিকে রয়েছেন বাবর বাদশার বংশধরেরা। তারা দুজনেই লড়াই নিয়ে পাগল। একজনকে হটিয়ে অন্যজন হিন্দুস্তানের দখল নিতে চায়। আমরা মাঝখানে হয়ে রয়েছি 'উলু খাগড়া।'

'তাই উলু-খাগড়ার মতো আমাদের এমন হেনস্থা?'

'হ্যাঁ, হেমকান্তি সম্ভবত এই উলু-খাগড়ার মতো বিপদে পড়েছে। কিংবা মারা গেছে।'

'বুঝেছি। তা আপনি যে এই সুলতান শেরশা আর বাবর বাদশার কথা বললেন, তেনারা কোথায়? হঠাৎ তেনাদের ছেলেরা কেন?'

'ওঁদের দুজনেরই এন্তেকাল হয়েছে। নইলে ওঁরাই রাজত্ব করতেন। পাকা ফলের মতো আমাদের এই মুলুকটা দুজনের হাতে চলে এসেছিল। পরে এটি ফস্‌কে পড়ে গেছে। এখন এই ফস্‌কে যাওয়া ফলটি তুলে নেবার জন্য দুজনের ভেতর চলছে জোর কামড়া-কামড়ি।'

'তা আমরা যে মুলুকটাতে রয়েছি, এই মুলুক এখন কার দখলে রয়েছে? কে এর সুলতান?'

'এখন এই মুলুকের সুলতান হয়ে রয়েছেন যিনি ইনি হলেন ইসলাম শা। শের শাহের এন্তেকালের পর ইনিই এখন রাজা।'

'রাজা? উরিববাস! তা ইনি লোক কেমন? খুব ভয়ঙ্কর?'

'জানি না। হয়ত তাই। কিংবা বিপরীতও হতে পারে।'

'তা ওঁর সঙ্গে যাঁর লড়াই চলছে, তেনাদের তরফে রাজা কে? বাবর বাদশার ছেলে?'

'হ্যাঁ, ওঁর নাম হুমায়ুন। তবে শুনছি, তিনি ভারি নড়বড়ে।'

এই পর্যন্ত শুনে গজু নিজের মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিল। ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলল, 'এমন গোলমেলে ইতিহাস আর শুনতে চাই না, জনাব। আমার মাথার ভেতর মেলা পোকা যেন কিলবিল করছে। তা শেষে একটা কথা ভারি জানতে ইচ্ছে করছে।'

'কী কথা?'

'আঁজ্ঞে, রকম-সকম যা দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, যার যত জোর আছে, যার বেশি সেপাই আছে, সেই শেষে রাজা হয়ে যেতে পারে। তা তিনি যদি এই দু তরফের বাইরে হন, তাহলেও, নয় কী?'

গজুর এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে লোকটি প্রথমে একটু থতমত খেলেন। তারপর ঈষৎ হেসে মৃদুস্বরে বললেন, 'এই দু'তরফের বাইরে কারও রাজা হওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে হঠাৎ যদি কেউ বিপুল সৈন্যদল নিয়ে দিল্লী দখল করে নেন, তাতে আশ্চর্য হবো না। তা হঠাৎ তোমার এ প্রশ্ন কেন?'

গজু বলল, 'এ প্রশ্ন কেন করলাম তা আমি নিজেই জানি না। তবে আপনার মতো মানুষকে দেখে মনে হল, আপনি যদি বাদশাহ বা সুলতান হতেন, তাহলে খুব ভালো হত। আমাদের মতো সাধারণ লোকের বিস্তর উপকার হত। তা জনাব, আপনি কী হতে পারেন না?'

লোকটি গম্ভীর ভাবে বলল, 'আমি একজন রাজপুত। রাজরক্ত আমার আছে বটে, তবে আমরা এখন রাজ্য জয়ের খেলায় নেই।'

এরপর ওই লোকটি আর দাঁড়াল না। ঘোড়ায় চড়ে যেমন এসেছিল, ঠিক সেইভাবেই ধীরে ধীরে চলে গেল।

তা লোকটি চলে গেল বটে, কিন্তু সে চোখ খুলে দিয়ে গেল গজুর।

গজু এরপর খোলা চোখ নিয়ে দেখতে থাকল চারদিক। তার পান-জর্দার দোকানে যারা আসে, তাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল।

এদের অনেকেই নিয়মিত আসে। যারা নিয়মিত আসে, তাদের পরিচয় অনেকখানি জানা। এদের ভেতর যেমন সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মানুষ রয়েছে, তেমনি রয়েছে সুলতানি সেরেস্তার কিছু কিছু মানুষও। এই সুলতানি সেরেস্তার মানুষেরা বেশ শৌখিন। তাদের পোশাক বেশ চটকদারি। চোখে সুরমা। তারা কথা বলে কখনও তুর্কিতে, কখনও ফারসিতে। আবার আফগানি ভাষাও বেশ গড়গড় করে বলে যায়।

সবজিমণ্ডীরহাটে পান কিনতে যেতে হয় গজুকে। সেখানে মেলা লোকের ভিড়ভাট্টা। এবং দেহাতি লোকজনই বেশি।

তবে মাঝে মাঝে সুলতানি লোকেরা আসে দল বেঁধে। তারা আসে ঘোড়ায় চড়ে। সঙ্গে নিয়ে আসে গর্দভ। সবজি কেনে ঝাঁকা ঝাঁকা। রাশি রাশি। সেগুলি চাপিয়ে দেয় গাধার পিঠে। তারা চলে সুলতানি গড়ের দিকে।

তা কেবল কী সবজি? সবজিমণ্ডী পেরিয়ে যেতে হয় ফলমণ্ডী, চাল-গেঁহু-ডালের আড়ৎ এবং তারও পরে কসাইখানা। ওই সব জায়গাতেও দাপিয়ে বেড়ায় সুলতানি অশ্বরোহীরা। হাজার হাজার টাকার সওদা করে।

তবে সবদিন এরা আসে না। যেদিন আসে, সেদিন হট্টগোল লেগে যায়। সাধারণ ক্রেতারা ভারি গোলমালে পড়ে যায়। গজু ভালো করে পান কিনতে পারে না। কেননা, পানের আড়তের হুটোপাটি। জর্দার দোকানেও এই একই কাণ্ড।

গজু আগে এদের ঠিক ঠাহর করতে পারত না। কেননা, তখন তার চোখ খোলেনি। এখন সে ঠাহর করতে পারে। ওদের পোশাক, ওদের চলাফেরা এবং বিশেষ করে ওদের ভাষা শুনেই চিনতে পারে, এরা পাঠান। এরা সুলতান ইসলাম শাহের লোক।

এইভাবে গড়িয়ে যায় মাসের পর মাস।

সেদিন গজু হঠাৎ এক বিপদে পড়ে গেল। সবজিমণ্ডী আর চাল-গেঁহুর আড়তে কেবল ঘোড়া এবং গাধার পালই আসেনি, এসেছে কয়েকটি পাহাড়ের মতো বিশালাকার হাতীও। বেচারি গজু বেমক্কা একটি হাতীর সামনে পড়ে গেল। প্রায় হাতীর পায়ের তলায়। গজু কাঁপতে থাকল থরথর করে।

কিন্তু বরাত জোর। পায়ের তলায় সে পড়ল না। হাতীটি সুঁড় জড়িয়ে তাকে ওপরে তুলে নিল।

পাথরে পাঁচ কিল

একেই সম্ভবত বলা যায় 'কপাল।' কিংবা বরাত জোর।

যে মানুষটির কোতল হওয়ার কথা, সে কোতল হল না। গায়ে কোনও আঁচড় পর্যন্ত লাগল না। যে মানুষটির কলমা পড়ে জাত খোওয়াবার কথা ছিল, তার জাত খোওয়ানো আটকে গেল। শুধু কী এইটুকু? উল্টে সে সুলতানি দাখিন্যে রাতারাতি হয়ে গেল সৈন্যবাহিনীর রসদ কেনার 'বাজার সরকার'। এখন সে সেপাইদের কাছে, 'হেমু রাজা'। তবে রহিস লোকেরা তাকে বলে 'হেমু সর্দার'। এই যে ভাগ্যোদয় একে কপাল ছাড়া আর কী বলা যায়? হেমকান্তির কপাল খুলল।

হ্যাঁ, এই পরিবর্তনকে হেমকান্তি নিজেও কপাল বলেই মনে করে। এবং কপালটিকে ধরে রাখার জন্য হেমকান্তি এরপর থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছে না। বাজার থেকে হিসাবমতো সওদা কেনা, তার যথাযথ হিসেব রাখা, হেমকান্তি নিখুঁত ভাবেই তা করে থাকে। নিজের দোকান চালাবার সময় এ কাজ সে বরাবর নিখুঁত ভাবেই করে এসেছে। কিন্তু সেদিন তার কাছে এই কাজ ছিল খালে বিলে নৌকো চালাবার মতো। এখন তাকে মহাসমুদ্রে জাহাজ চালাতে হচ্ছে। এ সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ। অতল ও ধূ ধূ জলরাশি। জলের ভেতর আবার হাঙ্গর, কুমির। এবং একটু টাল খেলেই জলের নীচে সেঁদিয়ে যাবে জাহাজ। তখন সলিল সমাধি সুনিশ্চিত।

একজন অজনা, অচেনা এবং একেবারে অদক্ষ ও অপরীক্ষিত একটি লোককে হঠাৎ সুলতান এমন একটি গুরুদায়িত্ব কেন যে চাপিয়ে দিলেন, তার যুক্তিটি আজও খুঁজে পায় না হেমকান্তি। সুলতান কী তাকে ফাঁসাবার মতলবে এ দায়িত্ব দিয়েছেন? হেমকান্তি নাস্তানাবুদ হয়, এটাই কী তিনি দেখতে চেয়েছেন? নতুবা আর কী কারণ হতে পারে?

হেমকান্তি শুনেছে, আগে যারা এ দায়িত্বে ছিলেন, তারা রাতারাতি অনেকেই বরখাস্ত হয়েছেন। তা কেবল বরখাস্ত নয়, তাদের কারোকে কারোকে লাখ লাখ টাকা জরিমানাও দিতে হয়েছে। কারও কারও কাছ থেকে জরিমানা আদায় করেও কয়েদ করা হয়েছে কিংবা তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মুলুক থেকে। লাখ লাখ কাঁচা টাকা হাতে নিয়ে লাখ লাখ মন সওদা। তা এ কেবল টাকার হিসেব নয়, মালেরও নিখুঁত হিসাব চাই। মিলিয়ে দিতে হবে ডাইনে বাঁয়ে। না মিললে চূড়ান্ত হেনস্থা।

কাজটি যে খুবই কঠিন, তা প্রথম দিন থেকেই বুঝে গেছে হেমকান্তি। এবং সে এও বুঝেছে কঠিন কাজকে সম্পন্ন করতে হয় কঠোর পরিশ্রম দিয়ে। তাকে এই দুরূহ কাজে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন সহকারী অবশ্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হেমকান্তি তাদের ওপর নির্ভর করার পাত্র নয়। তাদের দিয়ে খুচরো কিছু কাজ করানো হয় বটে, তবে কেনা-কাটা এবং রসদের খরচটা হেমকান্তি নিজেই রাখে। এর ফলে তার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। বেড়েছে অনেক অভিজ্ঞতা।

কাজ চালিয়ে যাবার মাস আটেক পরে হঠাৎ একদিন সেরেস্তাদার হেমকান্তিকে বললেন, 'হেমু সর্দার, শুনছি, সুলতান আপনাকে শীগ্‌গির তলব করবেন। আপনি তৈরি থাকুন।'

'আমাকে তলব? কেন? কোনও গোলমাল হয়েছে নাকি? কেন, জানেন কী?'

'কেন তা জানি না। তবে হজরত ইসলাম শা আপনাকে কিছু বলবেন।'

'তাহলে আমি কী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবো?'

'না, আপনাকে যেতে হবে না। তিনি তাঁর নফরকে দিয়ে এত্তেলা পাঠাবেন। তখন যাবেন।'

এত্তেলা এল। তবে আরও কিছু দিন পরে। প্রায় এক মাস গড়িয়ে যাবার পর।

হেমকান্তি বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে সেদিন গিয়ে হাজির হল সুলতানের খাস মহলে। বুক দুরদুর।

'হেমু সর্দার, তোমাকে আমি কেন ডেকে পাঠিয়েছি, তা কী তুমি জানো?'

'আঁজ্ঞে না, হজরত।'

'আমাদের সেনাবাহিনীতে পাঁচ হাজার নতুন গোলন্দাজ গত তিন মাস আগে নিয়োগ করা হয়েছে। তা তুমি নিশ্চয় জেনেছ।'

'জী। জানি।'— হেমকান্তি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'তাদের নিয়মিত আমি রসদ যোগানদি, জনাব।'

'তার জন্য নিশ্চয় কিছু বাড়তি খরচ হচ্ছে?'

'আঁজ্ঞে, তা হচ্ছে।'

'হুম্', গম্ভীর হয়ে গেলেন সুলতান। চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। পরে নীরবতা ভেঙ্গে বললেন, 'আট-নয় মাস আগে, তুমি যখন এই কেনাকাটার দায়িত্ব নাওনি, সেই সময় মাসে মাসে কেনাকাটার জন্য কত খরচ হত, তা কী তোমার জানা আছে?'

'আঁজ্ঞে, না। সেরেস্তাদার ওই খরচ কত হত, তা কোনও দিন আমাকে বলেননি।'

'আমাকে কিন্তু বলেছে। আমি জানি।'

'আঁজ্ঞে'—

'শুনবে সে খরচের পরিমাণ?'

হেমকান্তি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুলতান তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি পাঁচ হাজার বাড়তি সেনা খাইয়ে এখন যা খরচ করছ, তার থেকে ঢের ঢের বেশি সে খরচ। অর্থাৎ তোমার দক্ষতায় আমার খরচ ইদানীং অনেক কমে গেছে।'

সুলতানের এই কথায় কী জবাব দেওয়া যায়, তার ভাষা খুঁজে পেল না হেমকান্তি। সে জোড়হাত করে কাঠের মতো নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইল নীরবে।

এদিকে সুলতান বলেই চললেন, 'তোমার কাজের দক্ষতার জন্য খরচের এমন হেরফের হয়েছে। অর্থাৎ খরচ কমেছে। প্রতি মাসে তুমি আমাদের অনেক খরচ বাঁচিয়ে চলেছ। এই কম খরচ প্রমাণ করছে তুমি কেবল দক্ষ নও, তুমি সৎ। তুমি নির্লোভ। তোমার মতো কর্মচারী আমার এই সুলতানিতে খুব কমই আছে। তা তোমার নির্লোভ কাজের জন্য তোমাকে আমি একজন 'ইমানদার' আদমি বলেই বিবেচনা করি। তোমাকে একটি খেতাব আমি দিতে চাই।'

'খেতাব!'

'হ্যাঁ, খেতাব। এ খেতাব 'মীর' বা 'খুনশি' নয়। এই খেতাব হল 'সর্দার'। তোমাকে আমি 'হেমু সর্দার' বলেই ডাকব। সরকারি খাতায় তোমার নাম লেখা হবে 'হেমু সর্দার'।

সুলতানের এই প্রশংসার উত্তরে কী বলতে হয়, তা জানে না হেমকান্তি। তাই সে আগের মতোই নীরব হয়ে রইল।

তা সুলতান ইসলাম শা এখানেই থামলেন না। তিনি হেমকান্তিকে এক হাজার তঙ্কা ইনাম দিলেন। এবং আরও কিছু দায়িত্ব তার কাঁধে চাপিয়ে দিলেন। সুলতান জানালেন, 'আমাদের সেনাবাহিনীর জন্য নিয়মিত বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র কেনা হয়, কেনা হয় অনেক ঘোড়া, উট, হাতী এবং অসংখ্য খচ্চর। এই পশুদের খাবারের জন্য বিস্তর পশুখাদ্যও কেনা হয়, তাদের দায়িত্বটাও তোমাকে এবার থেকে নিতে হবে হেমু সর্দার। তোমার যোগ্যতা আছে, তাই এই গুরুদায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হল।'

হেমকান্তি এই নতুন দায়িত্ব কবুল করে নিয়ে বলল, 'হজরত মহানুভব। আমাকে অশেষ স্নেহ করেন, তাই এ দায়িত্ব দিচ্ছেন। তা এই দায়িত্ব পালনে আমি কোনও ত্রুটি রাখব না। আশা করি, আমার কাজ দিয়ে হজরতকে খুশি করতে পারব।'

সুলতানের ইমান যখন আসে, তখন ইমানের সঙ্গে আসে মেলা সুযোগ সুবিধাও।

হেমকান্তির বসবাসের জন্য আলাদা করে একটি কুঠির ব্যবস্থা হল। সে কুঠি সুসজ্জিত। তা কেবল কুঠি নয়, তার জন্য কয়েকজন হিন্দু নফরও নিয়োগ করা হল। হেমকান্তির খাওয়া-দাওয়ার যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য হিন্দু রীতিতে তৈরি হল রসুইখানা। রাখা হল হিন্দু সূপকার। হেমকান্তি এখন নিজেই একটি ছোটখাটো সুলতান।

মোট কথা, হেমকান্তি যাতে স্বচ্ছন্দে এবং সুখে থাকতে পারে এবং নিজের কাজে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারে, তার সব ব্যবস্থাই করে দিলেন সুলতান। হেমকান্তি প্রথম প্রথম ঘোড়া চড়তে পারত না, কেবল পড়ে যেত। কিন্তু সুলতানের সেপাইরা না-ছোড়। তারা তাদের হুজুরকে শিখিয়ে দিল অশ্বারোহে এবং অশ্ব পরিচালনা করতে। পরে হেমকান্তির জন্য একটি হাতীও বরাদ্দ করে দেন সুলতান। হেমকান্তি তার খুশি মতো কখনও ঘোড়ায়, কখনও আবার হাতীতেও চড়ত। তবে হাতীটাই তার বেশি পছন্দ। হাতীর পিঠে চড়ে সে সবজিমণ্ডীতেও যায়।

এদিকে পাঁচ রকম কাজ করার সূত্রে হেমকান্তির অভিজ্ঞতা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। তার কাছে নতুন নতুন দিগন্ত খুলে যায়। তার অর্জিত নতুন অভিজ্ঞতাগুলি একই সঙ্গে অভিনব এবং বিচিত্র। সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে বিভিন্ন অস্ত্র ক্রয়ের সূত্রে কেবল যে বিচিত্র অস্ত্র সমূহের সম্পর্কে হেমকান্তির সম্যক জ্ঞান হল, তাই নয়, পরিচয় হল তার অস্ত্রধারী বড়ো বড়ো সেনা নায়কদের সঙ্গেও। এই সেনানায়কদের ভেতর সব থেকে উল্লেখযোগ্য হলেন নূর মহম্মদ। এই নূর মহম্মদ হলেন বহু লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক বলশালী পাঠান। কোন যুদ্ধে কোন অস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়, সে বিষয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে নিশ্চিন্ত করে সে হেমকান্তিকে। ঠিক এই ভাবেই পশু সংগ্রহ বা পশু কেনার ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে তাকে নতুন এক অভিজ্ঞতার জগতে নিয়ে যায় সুলতানের রাজপুত সেনাপতি জগৎ সিংহ। বহু যুদ্ধের পোড়খাওয়া সেনাপতি হলেন এই জগৎ সিংহ। যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার পিঠে চড়ে কেমন লড়াই করা যায়, তা যেমন বুঝিয়ে দিলেন তিনি হেমকান্তিকে, তেমনি বুঝিয়ে দিলেন হাতীর পিঠে চড়ে কী ভাবে শত্রুপক্ষকে দাবিয়ে রাখা যায়। বুঝিয়ে দিলেন উঠকেও যুদ্ধের কাজে কীভাবে ব্যবহার করা যায়।

অনভিজ্ঞ হেমকান্তি একেবারে বোকার মতো জিজ্ঞাসা করে বসল, 'যুদ্ধ ক্ষেত্রে পদাতিক বাহিনীর কাজটা তাহলে তেমন গুরুতর নয়, তাই না? তাদের ওপর দিয়ে হাতী, উট, ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে, তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তারা তখন কী করবে?'

হেমকান্তির এই কথা শুনে মুখে চু-চু শব্দ করে জিব কেটে রাজপুত জগৎ সিংহ বলে উঠলেন, 'জনাব, পশু দিয়ে মানুষকে কখনও দাবিয়ে রাখা যায় না। মানুষকে দাবাতে হলে মানুষেরই দরকার। আমাদের শাস্ত্র পাঠ করলে দেখা যায়, সব দেবতারই একটি করে বাহন আছে। তারা পশু। এই পশুতে চেপে দেবতারা যুদ্ধ করেন। পশুরা কখনও যুদ্ধ করে না। তারা দেবতাদের স্রেফ বয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে এই একই কাজ পশুদের।

'হাতী? হাতীরা তাদের পা দিয়ে পিষে শত্রুদের মারে না?'

'মারে, কিন্তু তা কদাচিৎ।' — হাসে জগৎ সিংহ। 'যাদের কপালে অপঘাত মৃত্যু আছে, তারাই হাতীর পায়ের তলায় পিষে মারা যায়।

এইভাবে হেমকান্তির সঙ্গে সেনাপতিরা নানান রকমের গল্প করে। অনেকে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাও বলে যায়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে না গিয়েও হেমকান্তি শিখে ফেলে নানা রণকৌশল। জেনে ফেলে কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে লড়াই করতে হয়। এ যেন জলে না নেমে সাঁতার শেখা।

হেমকান্তি মাঝে মাঝে নিজের অতীত জীবনের কথা ভাবে। ভাবে এবং নিজের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে অবাক হয়। যে ছিল গোলদারি দোকানের এক সামান্য দোকানদার, এখন সে রীতিমতো একজন যুদ্ধ বিশারদ। বড়ো বড়ো সেনাপতিদের নিয়ে তার ওঠাবসা। যে ছিল সেদিন বারুদের মশলার একজন গোপন বিক্রেতা, এখন সে হয়ে গেছে গোলন্দাজ বাহিনীর একজন পরামর্শদাতা। একটি অক্ষর না শিখলেও সে এখন বিদ্যাবিশারদ। নিজের এই পরিবর্তনটা কী ভাবে হয়ে গেছে, তা ভেবে হেমকান্তি বিস্মিত।

তবে হেমকান্তি একেবারে আকাট অপদার্থও নয়। নিজের খামতিটাও সে বুঝতে পারে। বোঝে, জলে নেমে সাঁতার শিখতে হবে।

তাই খামতি মেটাবার জন্য সে মাঝে মাঝে তীরন্দাজ বাহিনীতে গিয়ে তীর ছোঁড়া অভ্যাস করে। চেষ্টা করে বরশা ছুঁড়ে দূরের লক্ষ্য ভেদ করতে। তরোয়াল নিয়ে শেখে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে। এইসব করে হেমকান্তি ভারি আনন্দ পায়।

সেনাপতিরা হেমকান্তির এই সব কাজ দেখে তাকে উৎসাহিত করে। বলে, 'সাবাস্, সর্দারজী। সাবাস্।'

'কেবল সাবাস বললেই হবে? আমাকে এবার তোমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে চলো।'

'আজ্ঞে, আপনার তীর ছোঁড়া, বরশা ছোঁড়া, কিংবা তরোয়াল নিয়ে লড়াই দেখে মনে হচ্ছে, আপনাকে এবার সত্যি সত্যি কোনও যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া চলে।'

দিল্লী শহরের কাছাকাছি অনেক জায়গাই তখন মুঘলদের দখলে। আগে এইসব জায়গার মালিক ছিল আফগান পাঠানরা। শের শা মুঘলদের হটিয়ে দিয়ে নিজের দখলে এনেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ সুলতান শের শাহের এন্তেকাল হওয়ায়, পাঠানরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সেনাপতিকে হারিয়ে সাধারণ সেপাইদের যে হাল হয়, সে রকম হাল হল পাঠানদের। এবং সেই সুযোগে মুঘলরা তাদের কিছু কিছু এলাকা দখল করে ফেলল। বাড়িয়ে ফেলল ঘাঁটি।

মুঘলদের সেইসব ঘাঁটিতে হানা দেয় সুলতানের ফৌজ। হানা দেয় সেনাপতি নূর মহম্মদ। কিংবা জগৎ সিংহ। তারা গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে মুঘলদের ওপর। তারা বাধা দেয়। পিছু হটে। খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হয়। তাই খণ্ড খণ্ড ভাবে সুলতানী রাজ্য উদ্ধার হয়। পুরো যুদ্ধ হয় না, তাই পুরো এলাকাও দখলে আসে না।

একদিন এইরকম এক লড়াইয়ে অংশ নিতে গেল হেমকান্তি। নূর মহম্মদ বলল, 'সর্দারজী, আজ আপনি যুদ্ধ পরিচালনা করুন। আমরা আপনার হুকুমি মোতাবেক লড়াই করব।'

লড়াই হল। হেমকান্তির নির্দেশ মতো সৈন্যরা লড়াই করল।

কী আশ্চর্য। ছোটখাটো লড়াই হলেও এ যুদ্ধে জিতে গেল পাঠান ফৌজ।

হাতে হাতে এই সাফল্য পেয়ে হেমকান্তির আনন্দ আর ধরে না। এদিকে নূর মহম্মদও ভারি খুশি।

'সর্দারজী, এবার থেকে আপনি লড়াই পরিচালনা করবেন, আর আমরা আপনার হুকুম মতো যুদ্ধ করব।'

'তা কী কখনও হয়?'

'এ রকম কখনও না হলেও এবার থেকে তা হবে।'

'না, না। আমি পারব না।'

নূর মহম্মদ তাঁর দাড়িতে আঙুল চালাতে চালাতে বলে, 'পারতেই হবে। আমরাও আপনার পাশে পাশে থাকব।'

রাজপুত যোদ্ধা জগৎ সিংহও হেমকান্তির সমর-প্রতিভা দেখে বিস্মিত।

'সর্দারজী, আপনাকে হাজার সেলাম।'

সব কাজের ভেতরেই একটি নেশা থাকে। তা সে দোকানদারি হোক বা সব্জীমণ্ডীতে গিয়ে সওদা করাই হোক। স্তাবকতায় ভিজলে এ নেশা বাড়ে। হেমকান্তির মনে নেশা ধরল। নেশার টানে মাঝে মাঝেই সে ফৌজ নিয়ে আরম্ভ করল দৌড়াদৌড়ি। তার হুকুমেই পদাতিক সেনারা যুদ্ধ করে চলে। তীরন্দাজরা টান দেয় ধনুকে। অশ্বারোহী সৈনিকরা ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রু সেনার ওপর। মেলা শত্রু জখম হয়, মরে। পিছু হটে। হেমকান্তি আনন্দ পায়, যুদ্ধ জয়ের।

এই ভাবে গড়িয়ে যায় মাসের পর মাস।

মাঝে মাঝে সুলতান ডেকে পাঠান। হেমুসর্দার তার কাজের স্বীকৃতিতে ইনাম পায়। হাজার হাজার তঙ্কার ইনাম।

হেমকান্তি নিজেই এখন বুঝতে পারে, তার জীবনটা যেন এক প্রবাহিত নদী। তবে এ নদী এক খাতে বইছে না। বইছে নানা খাতে।

হেমকান্তি এখন নানা ধারার নদী। কখনও সে হাতী চেপে যায় সব্জীমণ্ডীতে, চাল-ডাল আনতে, আবার কখনও কামারশালায়। এই সঙ্গে খুচরো যুদ্ধে রণাঙ্গনে। এছাড়া ঘোড়া-উট ইত্যাদি বিক্রয় করতে যেসব ব্যবসায়ীরা আসে, তাদের সঙ্গেও বসতে হয়।

এই সব ব্যস্ততার ভেতর থাকতে থাকতে হঠাৎ হেমকান্তির মনটা কেমন যেন উচাটন হয়ে উঠল। তখন আক্ষেপ হয়, তার এই সর্দার হওয়ার অবস্থাটি পরিচিত কারোকে সে দেখাতে পারছেনা। আহা, সে যদি গজুটাকে একবার তার কাছে পেত! তা সে মনে মনে সঙ্কল্প করল, একদিন সে গজুর পান-জর্দার দোকানে হানা দেবে। তাকে তুলে নিয়ে আসবে। নিয়ে এসে তাকে ধরে রাখবে। ছাড়বে না।

সব্জীমণ্ডী। হাট বসেছে যেন। শয়ে শয়ে লোক জুটেছে। জোর কেনা-বেচা চলছে।

হাতীর পিঠে চেপে হেমকান্তিও গেছে সব্জীমণ্ডীতে। সঙ্গে নিয়েছে গোটা তিরিশ উট। ঝাঁকামুটে দেড়শ। সেপাইরাও গেছে। তারা চেপেছে ঘোড়ায়। এদের সকলের সমাবেশে সব্জীমণ্ডী এক বিশাল মেলার রূপ নিয়েছে। চলছে চেঁচামেচি, হট্টগোল। উটের চাপে, গোড়ার দাপাদাবিতে ক্রেতাদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা।

এরই মাঝে হেমকান্তি ধীর গতিতে চলেছে হাতীর পিঠে। তার নজর কখনও দূরে, কখনও নীচে।

হঠাৎ হেমকান্তি দেখল, তার হাতীর পায়ের কাছে এক ঝাঁকা পান মাথায় করে দাঁড়িয়ে গজু। সে ভয় ভয় চোখে কখনও তাকাচ্ছে উটগুলির দিকে, কখনও সেপাইদের ঘোড়ার দিকে। বেচারার চোখে অসহায় ভাব। সামনে উত্তাল ক্রেতারা।

গজুকে এইভাবে দেখে ভারি কৌতুক অনুভব করল হেমকান্তি। মাহুতকে সে ইশারা করল।

মাহুতেরও বুঝতে অসুবিধা হল না হেমুসর্দার কি চাইছেন। হাতীর মাথায় ঠোকা মারল মাহুত।

শিক্ষিত হাতীটি শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে মাল সমেত গজুকে তুলে নিল পিঠের ওপর। গজুকে ওপরে তুলে নিয়ে আসা হল বটে, কিন্তু দেখা হল গজুর জ্ঞান নেই। বেচারির চোখ বোজা। তার সারা শরীর কাঁপছে। হাতে ধরা মাথার ঝাঁকা খসে পড়ল হাতীর পিঠের ওপর। মুখ গুঁজে পড়ল হেমকান্তির কোলের ওপর।

হেমকান্তির সঙ্গে সর্বদাই এ ধরনের ভ্রমণের সময় থাকে এক ঘড়া পানীয় জল। ঘড়া থেকে এক অঞ্জলি জল নিয়ে সে ছিঁটিয়ে দিল গজুর চোখেমুখে। তার মাথার পাগড়ি খুলে মাথাতেও দেওয়া হল জলের ছিঁটে।

এবং কিছু পরেই জ্ঞান ফিরল গজুর। সে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে হেমকান্তিকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কোথায়? আমি কী বেঁচে আছি!'

হেমকান্তি হা-হা করে হেসে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, তুই বেঁচে আছিস গজু। তুই এখন হাতীর পিঠে, হেমুসর্দারের কোলে।'

'হেমুসর্দার! সে আবার কে?'

'তোর বন্ধু।'

পট পরিবর্তন

হেমকান্তির কুঠিখানা দেখে বিস্ময়ে ফেটে পড়ে গজু। এ যে ছোটখাটো একটি রাজপ্রাসাদ।

চারদিক সে ঘুরে ঘুরে দেখে। আর মুখ দিয়ে নানা বিস্ময়সূচক শব্দ বের হয়ে আসে। কেবল কী কুঠিখানা! কত না নফর। কত না খিদ্‌মদগার। মুখের কথা খসাতে হয় না। তারা দৌড়ে আসে। যাকে বলে 'হুজুরে হাজির', সেই রকম।

গজু সবথেকে খুশি হল হেমকান্তির রসুইঘর এবং শোবার কক্ষটি দেখে। হেমকান্তির জাতধর্ম যায়নি। সে তার পছন্দমতো হিন্দু খাবার খাচ্ছে। রান্না করে দিচ্ছে হিন্দু সূপকার। হুজুর যেমন বলছেন, তেমনি রান্না হচ্ছে। হেমকান্তি আমিষ আহার পছন্দ করে না। সুতরাং কোনও আমিষ আহারের ব্যবস্থা তার রসুইখানায় নেই।

শয়ন কক্ষটিও চমৎকার। সুসজ্জিত। কোমল শয্যা। যে পালঙ্কটি হেমকান্তি ব্যবহার করছে, সেটি মহার্ঘ্য কাঠের তৈরি। ঘরের আসবাবগুলিও চমৎকার। গজুর মনে হল, এসব জিনিস হেমকান্তি বাপের জন্মে দেখেনি। সামান্য এক দোকানি থেকে এখন সে এক রাজা।

'অমন হাঁ করে কী দেখছিস রে গজু?'

'দেখছি তোমাকে আর তোমার রাজপ্রাসাদখানা।'

হেমকান্তি হেসে বলল, 'আমার এই কুঠিখানা দেখবার মতো বটে। কিন্তু আমি নই। আমার রং কালো। আমি বেঁটে। হাত-পা-মুখ সবই কদাকার। আমাকে অনেকদিন ধরে দেখেছিস, আর নতুন করে কী দেখবি বল?'

'তোমার ভেতর যে পুরনো মানুষটা ছিল, সে সরে গেছে। এখন তোমার ভেতর যে নতুন মানুষটা তৈরি হয়েছে, তাকে দেখছি।'

গজুর কথায় মজা পেল হেমকান্তি। সে কৌতুক করে বলল, 'হ্যারে, হঠাৎ আমি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর তোরা কী ভাবলি রে গজু? নিশ্চয় মরে গেছি বলে ধরে নিয়েছিলি?'

'ঠিক তাই। এ ছাড়া আর কী ভাববার ছিল?'

গজুর কথায় ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে হেমকান্তি বলল, 'তা তোকে যদি আমি আটকে রাখি, ফিরে যেতে না দিই, তোকেও তো লোকে মরে গেছে বলে ভাববে?'

'তা ভাববে।'

'তাহলে তুই মরে যা। এখন থেকে তুই আমার কাছে থাক। তোকে আমি সুখেই রাখব।'

'আমার পান-জর্দার দোকানটা কী হবে?'

'আমার দোকানের যে দশা হয়েছে, তাই হবে। লোকে লুটপাট করে খাক।'

হেমকান্তির কথায় প্রথমে সায় দিতে পারল না গজু। পরে ভেবেচিন্তে হেমকান্তির কাছে থাকতে রাজি হয়।

এরপর হেমকান্তি গজুর একটি নোকরির চেষ্টায় সুলতানের কাছে যাবার জন্য মনস্থ করল।

কিন্তু তার আগেই সুলতানের কাছ থেকে তলব এল। তলব নিয়ে এল সেনাপতি নূর মহম্মদ। পরের দিন সকালে নূর মহম্মদ কুঠিতে এসে জানাল, 'সুলতান এখানে আর থাকবেন না।'

'এখানে না থেকে তিনি কোথায় যাবেন?'

'যাবেন রাজধানী গোয়ালিয়রে।'

'গোয়ালিয়র! সেটা এখান থেকে কত দূর?'

'খুব কাছে নয়। প্রায় একদিনের পথ।'

'হঠাৎ সেখানে যাবার দরকার কী?'

'ঠিক জানি না। তবে ইদানীং সুলতানের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না।'

'ওখানে গেলে কী শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে?'

'হয়ত থাকবে। তবে শরীর স্বাস্থ্য ছাড়া অন্য দরকারও থাকাতে পারে। ভেতরের খবর আমি বলতে পারব না। যাই হোক, সুলতান চলে যাচ্ছেন। এবং যাওয়ার আগে হেমু সর্দারকে একবার দেখা করতে বলেছেন। সেই কথাটাই বলতে এসেছি।'

সুলতানের তলব, সুতরাং তড়িঘড়ি দৌড়ুতে হল হেমকান্তিকে।

হেমকান্তি সুলতানের কাছে গিয়ে দেখলেন, গোয়ালিয়র যাবার জন্য সব কিছুই প্রস্তুত। হজরতের হাতী সুসজ্জিত। বেগমদের তাঞ্জুমও যাত্রার জন্য প্রস্তুত। দাস-দাসী, বান্দা-বাঁদী সকলেই তৈরি।

সুলতান ইসলাম শা হেমকান্তিকে দেখে বললেন, 'হেমুসর্দার', হঠাৎ গোয়ালিয়র যাবার জন্য মনস্থ করেছি। তা তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। আধা ঘড়ি পরে আমরা রওনা দেব। তুমি এখনই প্রস্তুত হয়ে এসো।'

'জনাম আমি এখনই তৈরি হয়ে আসছি। কিন্তু এখানে আমার কাজের দায়িত্ব কার ওপর দিয়ে যাবো।'

'তার জন্য তোমায় চিন্তা করতে হবে না। অন্য কর্মচারীরা সেসব দায়িত্ব পালন করবে। আমি সেরকম ফরমান জারি করে দিয়েছি। আর গোয়ালিয়র এমন কিছু দূরে নয়, তুমি মাঝে মাঝে এসে এদের কাজের দেখভাল করে যেতে পারবে।'

'আঁজ্ঞে, সেনাবাহিনীর কী হবে?'

হেমকান্তির কথায় মৃদু হেসে সুলতান বললেন, 'তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সবদিক ব্যবস্থা করে আমি গোয়ালিয়র রওনা দিচ্ছি।'

'আঁজ্ঞে, আপনি এই বান্দার কসুর নেবেন না। এই বান্দা জানতে চায়, গোয়ালিয়রে গিয়ে এই বান্দাকে কী কাজ করতে হবে?'

সুলতান গম্ভীর ভাবে বললেন, ' তোমাকে আমি উজিরের পদ দেব বলে মনস্থ করেছি। গোয়ালিয়রে তুমি আমার উজির হিসেবে থাকবে। আমার শরীর তেমন ভালো যাচ্ছে না। তোমাকে তাই আমার ঘন ঘন দরকার হবে।'

সুলতানের এই কথায় অভিভূত হেমকান্তি। সে মাথা নীচু করে সুলতানকে তসমি জানিয়ে বলল, 'হজরত, আমি অভিভূত। এ বান্দা আপনার কাছে চিরঋণী থাকবে। হজরত, আপনি আজ চলে যান। আপনার সঙ্গে আমার যাওয়াটা বোধহয় মানায় না। এ বান্দা কাল সকালে গোয়ালিয়রে গিয়ে হাজির হয়ে যাবে।'

তা পরের দিন হেমকান্তি তার বোচকা বুচকি নিয়ে রওনা দিল। সে চলল হাতীর পিঠে চড়ে। সঙ্গে নিল গজুকে।

গজু সঙ্কুচিত হয়ে বলল, 'তুমি হলে উজির। তোমার সঙ্গে এইভাবে আমার যাওয়া কী উচিত হবে?'

'হবে। হেমু সর্দারের সঙ্গে তার নাজির গজু চলেছে। উজিরের সঙ্গে নাজিরের থাকা খুবই জরুরি।'— এই কথাটি বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হা-হা করে হেসে উঠল হেমকান্তি।

গোয়ালিয়রকে দেখে তেমন ভালো লাগল না তার। চারদিক জঙ্গলে ভরা। মেলা ছোট ছোট উঁচু নীচু পাহাড় আর টিলা। তবে নগরের ভেতর প্রধান যে জায়গাটি, সেটি হল একটি দুর্গ। উঁচু পাহাড়ের ওপর বিশাল পাথুরে গড় হল এটি।

এই কেল্লার ভেতরেই সুলতানী প্রাসাদ। সুলতানের দরবার। সেনা নিবাস। এবং সুলতানী কর্মচারীদের থাকবার আস্তানা এই কেল্লার ভেতর। কেল্লাটি প্রাচীন। অনেক রাজা-রাজড়ার ইতিহাস এবং তাঁদের হাসিকান্নার ইতিহাসও লুকিয়ে রয়েছে এর প্রতিটি পাথরে।

হেমকান্তি এখানে আসবার পর একটু একটু করে বদলে যেতে থাকল। কারণ, এখানে এসে সে অবিরাম সুলতান শেরশাহ এবং তাঁর অবিস্মরণীয় বীরত্বের কথা শুনতে থাকল।

গজুর মুখ থেকেও শোনা যেতে থাকল, 'আমরা এখানে না এলে অত বড় সুলতানের মহিমার কথা জানতেই পারতাম না।'

'তা ঠিক। গোলদারি দোকানের এক দোকানি বা পানজর্দার দোকানি হয়ে জীবনটা কেটে যেত। দুনিয়ার কিছুই জানতে পারতাম না।'

গজু বলে, 'হ্যাঁ, হক কথা। তবে এখন তা জানা গেল। এখন তুমি হলে সুলতানের উজির। তোমাকে সব কথা জানতে হবে। না জানলে তুমি বোকা উজির হয়ে থাকবে। রাজ্য চালাতে পারবে না। উজিরি পরামর্শ তুমি সুলতানকে দিতে পারবে না। মিঠা পান চাইলে, মিঠা পানই দিতে হবে। জর্দার খুশবু আর তেজ বুঝে খদ্দেরকে দিতে হবে।'

হেমকান্তির কাছে মেলা লোকের যাওয়া-আসা। তারা আসে আর নানান কথা শুনিয়ে যায়। কেউ আসে অভিযোগ জানাতে, আবার কেউ শুনিয়ে যায় ইতিহাস। যারা এসব শোনাতে আসে, তাদের ভেতর যেমন রহিস লোক আছে, তেমনি আছে অতি সাধারণ মানুষ। মৌলবি-উলেমারাও আসে। এই সব আগন্তুকদের ভেতর মাঝে মাঝে সুলতানের বংশধরেরাও আসেন। তাঁরা অনেক সময় তাঁদের ক্ষোভের কথা জানিয়ে যান। তাঁদের ক্ষোভ সাধারণ ক্ষোভ নয়। ক্ষোভের ভেতর বিস্তর জ্বালা।

হেমকান্তি এঁদের ইতিহাস শুনে যা বুঝেছে, তা হল এইরকম—

শের শাহের আসল নাম ছিল ফরিদ খাঁ। সে ছিল অতি সাধারণ এক যুবক। কিন্তু তার বুকে বল ছিল। বল ছিল বাহুতেও। চোখে ছিল স্বপ্ন। সে নিজের বাহুবলে বিশাল একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। সেই সাম্রাজ্য তামাম হিন্দুস্তানকে গ্রাস করতে পারত। কিন্তু বেচারি মারা গেলেন। মারা গেলেন হঠাৎ। আরও বেঁচে থাকার কথা ছিল। 'কালিঞ্জর' নামে একটি কেল্লা দখল করতে গিয়ে বারুদের স্তূপের ওপর তাঁর এন্তেকাল হল।

তা সুলতান মারা গেলেন। তাঁর কুরশি কিন্তু মারা যায় না। সেই কুরশিতে এসে বসলেন তাঁর ছেলে জালাল খাঁ।

'জালাল খাঁ।' গজু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'তিনি আবার কে?'

'ওই জালাল খাঁই হলেন এখনকার সুলতান ইসলাম শা। এঁকে অনেকে সালিম শাহও বলে।'

হেমকান্তি যা জেনেছে, তা থেকে বোঝা যায়, এই সুলতানটি বাপের মতো দাপুটে নয় বটে, তবে ইনি বেশ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ। যেমন সাহসী, তেমনি বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান। ইনি অনেক শত্রুকে খতম করেছেন। কিন্তু ওঁকে খতম করে কুরশির দখল নিতে আরও অনেক শত্রু পা বাড়িয়ে আছে। সুযোগ পেলেই তারা নিজেদের নিজেদের কাজ হাসিল করবেন।

ওই সব শত্রু কারা, তারা কেমন, তা জেনে ফেলেছে হেমকান্তি।

হেমকান্তির নিজস্ব একটি ঘ্রানশক্তি আছে। এই ঘ্রানশক্তি দিয়ে সে অনেক মানুষকে ইদানীং চিনতে পারে।

সুলতান ইসলাম শা হেমকান্তির এই বিশেষ গুণটিকে জেনে ফেলেছেন, তাই সুলতানী দরবারে তার এমন কদর।

প্রতিদিন দরবারের শেষে সুলতানের হুকুমে হেমকান্তিকে তাঁর খাস মহলে দেখা করতে হয়।

'কী উজির সর্দার, রাজ্যের কোনও বিশেষ খবর আছে নাকি?

'জী! না।'

'কেল্লার দেওয়ালে দেওয়ালে ফিস্‌ফিস্ কোনও কথা শোনা যায় না?'

'আঁজ্ঞে, না।'

সুলতান হাসেন, 'তোমার নজরটি যেন ঠিক থাকে উজির। আমার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। তোমার চোখ দিয়েই আমি সব কিছু দেখতে চাই। সাবধান, যেন কোনও গোলমাল না বাধে।'

'জী! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

না, গোলমাল কিছুই বাধেনি। বাইরের দিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিল হেমকান্তির। বাইরের দিকে নজর রাখতে গিয়ে ভেতরের দিকে কোনও নজর রাখা সম্ভব হয়নি। সুলতান যে অসুস্থ, তা অনেকখানি অগোচরে রয়ে গেল।

তবে গজু মাঝে মাঝেই মনে করিয়ে দিত, 'সুলতান প্রাসাদে প্রায়ই দেখছি সুলতানী হেকিম আসছেন, একটু খোঁজ নেবে নাকি?'

'খোঁজ নেবার দরকার নেই। তেমন কিছু হলে সুলতান নিজেই খবর পাঠাতেন।'

এদিকে দিনের পর দিন গড়িয়ে যায়। গজু দেখে ঘন ঘন সুলতানী হেকিমের যাওয়া-আসা। অনেক রাত্তিরেও হেকিম আসেন। সুলতানের অসুখ নিয়ে একটা শোরগোল পড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কোথাও তেমন কোনও সাড়াশব্দ নেই। সকলের মুখে কুলুপ আঁটা।

এইভাবে দেখতে দেখতে বর্ষাকাল গড়িয়ে এসে গেল শরৎকাল।

গোয়ালিয়রের আশমান মেঘমুক্ত হল। থেমে গেল বর্ষা। উঁচু নীচু পাহাড়ি ভূমিতে নানা রঙের ফুল ফুটতে থাকল। বাতাসে পাওয়া যেতে থাকল হিমেল পরশ।

তা হঠাৎ শরৎ শেষের এক প্রত্যুষে সুলতানী প্রাসাদ থেকে শোনা গেল চাপা কান্নার শব্দ।

তখনও পূর্বের আকাশ পরিষ্কার হয়নি, বিছানায় উঠে বসল গজু। হেমকান্তিকে ধাক্কা দিয়ে সে ঘুম ভাঙাল। সে চাপা গলায় বলল, 'বোধহয় সর্বনাশ হয়ে গেল রে। যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, ঠিক তাই হল।'

'কী করে বুঝলি!'

গজু বলল, 'সুলতানী প্রাসাদের দিকে একটু কান পেতে থাক। তাহলেই বোঝা যাবে।'

নতুন মর্যাদা

সুলতান আসেন, সুলতান যান। সুলতানের কুরশি কখনও কিন্তু খালি থাকে না। তবে কুরশির দখল নিয়ে বিস্তর কামড়া-কামড়ি হয়।

ইসলাম শাহর কুরশি নিয়ে একটু কামড়া-কামড়ি হল বইকি! তবে তা কিছুদিনের ভেতরেই মিটে গেল।

ইসলাম শাহের এন্তেকালের পর তাঁর কুরশিতে প্রথমে যিনি বসলেন, তিনি হলেন তাঁর নাবালক পুত্র— কিন্তু তাঁকে সহ্য করতে পারলেন না তাঁর মাতুল মুরারিজ খাঁ। তিনি নাবালক ভাগ্নেকে খুন করে সুলতানী কুরশি দখল করে নিলেন। কুরশিতে বসে তিনি নাম নিলেন মহম্মদ আদিল শাহ। তবে লোকের মুখে এই নাম গিয়ে দাঁড়াল, 'আদালি'। তিনি সেই যে তখ্‌তে বসলেন, আর নড়লেন না।

আদালি যে খুব বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন তা নয়। বরং তাঁকে অলস এবং বোকাই বলা সংগত। আফগান ওমরাহেরা এঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন, 'অন্ধ' বলে। আর প্রজারা আড়ালে বলত, 'মূর্খ'। তা বিচার করলে দেখা যায়, তিনি দুটিই ছিলেন। অন্ধ এবং মূর্খ।

তা অন্ধ এবং বোকা লোকেরাও যে কখনও কখনও ভালো কাজ করে বসে তার প্রমাণ মিলল এঁকে দিয়ে একটি ঘটনায়।

ইসলাম শাহের এন্তেকালের পর সুলতানী প্রাসাদের এক টোর, গোয়ালিয়র কেল্লার একটি প্রখণ্ডে হেমকান্তি থাকলেও কুরশি বদলের সময় সে নিজেকে আড়ালেই রেখে দিল। কোনও ভাবেই সে কুরশির কাছাকাছি গেল না। ষড়যন্ত্রে জড়াল না।

তবে নানা সূত্রে তার কাছে নানা খবর এসে পৌঁছুত। হেমকান্তি সে সব খবরে পাত্তা দিত না। কিন্তু খবরগুলিকে মনে রাখত।

একদিন সকালে গজুকে নিয়ে হেমকান্তি কেল্লার বাইরে এসে রাজপথ দিয়ে হাঁটছিল। সেই সময় আধাপরিচিত একটি লোক এসে বলল, 'উজির সাহেব, নতুন সুলতান আপনাকে একটি এত্তেলা পাঠিয়েছেন।

'আমাকে?' হেমকান্তি সবিস্ময়ে বলল, 'নতুন সুলতান কী আমাকে চেনেন?'

লোকটি একগাল হেসে বলল, 'না চিনলে তিনি ডাকবেন কেন? আপনাকে তিনি বিলক্ষণ চেনেন। আপনার কদর কে না বোঝেন!'

তা নিজের প্রশংসা শুনে কে না খুশি হয়। হেমকান্তিও খুশি না হয়ে পারল না।

সুলতান আদালির কাছে যথাসময়ে হাজির হল হেমকান্তি। সুলতান তাকে সযত্নে কাছে বসিয়ে বললেন, 'আমার ভগ্নিপোত ইসলাম শার আমলে তুমি যেভাবে তাঁকে সাহায্য করেছ, আমাকেও ঠিক সেই ভাবেই তোমাকে সাহায্য করতে হবে।'

'আঁজ্ঞে, আপনি যেভাবে আমার সাহায্য চাইবেন, আমি সেই ভাবেই সাহায্য করব।'

সুলতান বললেন, 'দ্যাখো, হেমুসর্দার, আমি এখন চারিদিকে শত্রুদের নিয়ে বসে আছি। ঘরের শত্রু এবং বাইরের শত্রু। এই দুই শত্রুকে মোকাবিলা করতে হবে। তা পারবে তুমি তাদের মোকাবিলা করতে?'

'আঁজ্ঞে পারব।'— হাসতে থাকল হেমকান্তি।

'তুমি কী তাঁদের চেনো?'

'আঁজ্ঞে, চিনি। আপনার কুরশি কেড়ে নেবার জন্য যারা ষড়যন্ত্র করছে, তারা হল ঘরের শত্রু। এই শত্রুদের কাছাকাছি আসতে দেওয়া হবে না। তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। আর বাইরের যারা শত্রু, তারা এখন ছত্রভঙ্গ। তারা হল, 'মুঘল'। সুলতান শের শাহ তাদের থাবা থেকে হিন্দুস্থানের বিরাট একটি অংশ ছিনিয়ে নিয়ে হিন্দুস্তানের সুলতান হয়েছিলেন। কিন্তু তেনার এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে তারা দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেকখানি দখল করে নিয়েছে। বাদশা হুমায়ুন হলেন এঁদের মাথা।'

'অঃ। ঠিক বলেছ'— হেমকান্তির শত্রু চেনার ক্ষমতা দেখে ভারি খুশি হলেন আদালি বাদশা। — 'ঘরের শত্রুদের থেকে এই শত্রু আরও ভয়ঙ্কর। তা হেমুসর্দার, তুমি কী পারবে এই হুমায়ুন বাদশাকে হিন্দুস্তান থেকে তাড়িয়ে দিতে?'

'আঁজ্ঞে, আমি নিজে তেমন যোদ্ধা নই। তবে যুদ্ধের কলাকৌশল অনেকখানি রপ্ত করেছি। এই কলাকৌশলের বিদ্যা থেকে বুঝেছি, হুমায়ুন বাদশাকে এই মুলুক থেকে তাড়িয়ে দেওয়া খুব একটা কঠিন হবে না। যদি হজরত আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।'

'তা কী রকম সাহায্য করতে হবে?'

'আমাকে কাজের স্বাধীনতা দিতে হবে।'

আদালি বাদশা হেমকান্তির কথা শুনে মৃদু হাসতে থাকলেন। হাসতে হাসতে বললেন 'দ্যাখো হেমুসর্দার, লোকে আড়ালে আমাকে অন্ধ এবং মূর্খ বলে থাকে। তাই চট্ করে আমি কোনও সিদ্ধান্ত নিই না। তোমার কথা শোনার পর আমাকে একটু ভাবতে হবে। তোমাকে আমি কতখানি স্বাধীনতা দেব, তা দিন সাতেক পর জানাবো। এখন এই পর্যন্তই থাক।'

হেমকান্তিকে এরপর চলে আসতে হল নিজের কুঠিরে। এবং বেশ চিন্তিত ভাবেই আসতে হল। মনে হল, সুলতানের ভিন্ন মতলব আছে।

হেমকান্তির কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখে গজু জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল, আদালি সুলতান কি জবাব দিয়ে দিলেন? মানে ছুটি?'

'হয়ত তাই। তবে এখনই তা জানা যাচ্ছে না। জানা যাবে সাতদিন পরে।'

সাতদিনের প্রতীক্ষা খুব একটা সময় নয়। কিন্তু হেমকান্তির কাছে এই সময়টি খুবই দীর্ঘ মনে হতে থাকল। সে নজর রাখতে থাকল সুলতানী প্রাসাদের ওপর। ভাবল, আদালি সুলতান তাঁর পরামর্শদাতাদের ডেকে নিয়ে অনেক পরামর্শ করবেন। কিন্তু কোথায় কী! এই সাতদিন ধরে সুলতান ডুবে রইলেন বেহুদা আনন্দে। নাচ-গানের মজলিশে। পরামর্শদাতাদের কারোকে তাঁর মহলে দেখা গেল না। দেখা যেতে থাকল বিস্তর রং মহলের বিবিদের। দেখা গেল, নৃত্যপটিয়সী বাঈজীদের। বোঝা গেল, সুলতান মেতে আছেন নাচ-গানের মজলিশে।

সাতদিন পরে আবার ডাক পড়ল হেমকান্তির। যেমন কথা ছিল, সেই রকম।

আদালি সুলতান বললেন, 'হেমু সর্দার, তুমি ঠিক কী ধরনের কাজের স্বাধীনতা চাও তা তুমি বলেছিলে। আমি ত তা বুঝতে পারছি না। তা বাপু, তোমাকে আমি সব রকম স্বাধীনতাই দিলাম। আজ থেকে তোমাকে আমি আমার মুলুকের প্রধান সেনাপতি আর প্রধান উজিরের পদ দিয়ে দিলাম। আমি এই কুরশিতে বসে বসে দেখব, তুমি কী রকম রাজ্য চালাও। তোমাকে কোনও কাজে বাধা দেব না।'

হেমকান্তি সুলতানকে অজস্র কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলল, 'হজরত মহানুভব। এই বান্দা অতি সামান্য আদমি। আপনার কাজে তার চেষ্টার কোনও কসুর থাকবে না।'

হেমকান্তি হল হিসেব কষে বলার মানুষ। প্রতিটি কদম পা ফেলে সে হিসেব করে। উজিরের দায়িত্ব হল রাজ্য শাসন। আর সেনাপতির কাজ হল সৈন্য বাহিনীকে মজবুত করে তৈরি করে রাখা। তা সেনাবাহিনীকে কেবল মজবুত করে তৈরি করে রাখলেই হবে না, তাকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। দেখতে হবে সুলতানের গায়ে কোনও রকম যেন আঁচড় না লাগে। এবং রাজ্যের কোনও ক্ষতি যেন না হয়।

হেমকান্তি কাজ করতে আরম্ভ করল। এবং কাজ করতে করতে তার ভেতর আশ্চর্য এক আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল।

আদালি সুলতানের যারা প্রতিপক্ষ ছিল, তারা হেমকান্তির কাণ্ড কারখানা দেখে ধীরে ধীরে গুটিয়ে গেল। কোনও রকম গোলমাল পাকাতে এল না। একে একে পিছু হটল।

একদিন তাদের পক্ষ থেকে একজন এসে শুনিয়ে গেল, 'এই যে হেমু সর্দার, তোমাকে এখন কী বলে সম্বোধন করা যায় বলো তো! কখনও মনে হয়, তুমি উজির, কখনও মনে হয় সেনাপতি। আবার কখনও কখনও মনে হয়, তুমিই সুলতান। আদালি সুলতান হাত গুটিয়ে বসে আছেন। আর তুমিই রাজ্যপাট চালাচ্ছ। ব্যবস্থাটা মন্দ নয়।'

'কথাটি ভুল বলেননি জনাব! আমাকে সব কাজই করতে হয়। তবে আমি নিজে কিছুই করি না। সকলকে দিয়ে করাই।'

গজু একদিন এদিক-ওদিক ঘুরে এসে বলল, 'তোমাকে এখন থেকে হেমু সর্দার আর বলছে না।'

'বটে! তা কী বলছে শুনি!'

'বলছে, হেমু রাজা।'

'ভালো। দেখা যাচ্ছে, মুকুট না পরেও তাহলে রাজা হওয়া যায়।'— হাসল হেমকান্তি। 'তা এই রাজা কথাটা কারা বলছে?'

গজু বলে, 'বলছে হিন্দুরা। হিন্দু প্রজারা। হিন্দু জমিদাররা।'

'তারা কী শুধুই রাজা বলছে, নাকি আরও কিছু বলছে?'

'বলছে, অনেকদিন পরে যবনদের হটিয়ে একজন হিন্দু রাজাকে পাওয়া গেছে।'

হিন্দু রাজা! কথাটি মনে ধরল হেমকান্তির। হ্যাঁ, হিন্দুস্তানের বুকে অনেকদিন কোনও হিন্দু রাজাকে পাওয়া যায়নি। সত্যি সত্যি সে যদি রাজা হতে পারে, তাহলে বহু হিন্দু তাকে নিয়ে গর্ব করবে। তাকে ঘিরে হিন্দুদের মধ্যে এক আলোড়ন পড়ে যাবে। মন্দিরে মন্দিরে তার কল্যাণ কামনায় পুজোপাঠ হবে। ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে হেমকান্তির সারা শরীরে রোমাঞ্চ লাগল।

এই ভাবে দেখতে দেখতে মাসের পর মাস গড়িয়ে যায়। গড়িয়ে যায় বছর।

আদালি সুলতান একদিন হেমকান্তিকে ডেকে বললেন, 'হেমু সর্দার, তোমার রাজ্য পরিচালনায় আমি খুবই খুশি। আমি এই গোয়ালিয়র শহরটা ছেড়ে কিছুদিনের জন্য চুনার দুর্গে থাকতে চাই। চুনার দুর্গটি আমার বড়ো প্রিয়।'

হেমকান্তি হেসে বলল, 'হজরতের যেমন ইচ্ছা। গোয়ালিয়রের প্রাসাদ যেমন সুরক্ষিত ছিল, ঠিক তেমনই থাকবে। তবে হজরত যদি অনুমতি করেন, তাহলে আমি একটু দিল্লীর দিকে এগিয়ে গিয়ে মুঘলদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে চাই।'

আদালি সুলতান বললেন, 'এটা তো ভালো প্রস্তাব।'

'কিন্তু এর জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হবে।'

'হোক। হঠকারী মুঘলদের উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার।'

হেমকান্তি দিল্লীর কাছাকাছি এসে ঘাঁটি গেড়ে বসল। তৈরি হল হেমু সর্দারের প্রাসাদ। সেনানিবাস— যেন নতুন এক কেল্লা। নতুন এক রাজার বাড়ি। চারদিকে রটনা হল, এটি হেমু-রাজার বাড়ি। হেমু রাজার বাড়িতে হাতীশালায় হাতী, ঘোড়াশালায় ঘোড়া। পাহাড়ের মতো বিশাল এক হাতীতে চেপে ঘুরে বেড়ায় হেমু। হাতীটির নাম 'হাওয়াই'। রাজার হাতীশালায় আরও মেলা হাতী।

হেমকান্তির এটি যে এক সুখের সময় তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রাজার মতন দরবার সাজিয়ে প্রতিদিন লোকজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হেমু। অভাব অভিযোগ শোনে। আবার ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হয় মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য। শান দেওয়া হয় অস্ত্রে।

তা এই সময় হঠাৎ একটি কাণ্ড ঘটে গেল।

কাণ্ডটি ঘটাল গজু। একজন মাঝবয়সী লোক এবং তার স্ত্রীকে নিয়ে হেমকান্তির কাছে এসে গজু হাজির। তাদের এগিয়ে দিয়ে গজু বলল, 'এরা তোমার মা-বাবা। দেখা করতে এসেছেন তোমার সঙ্গে।'

'আমার মা-বাবা?'— আকাশ থেকে পড়ল হেমকান্তি। — 'অসম্ভব। আমি বাপ-মা মরা এক ছেলে। জিন্দেগীতে তাঁদের আমি দেখিনি। এখন মা-বাবা কোথা থেকে আসবে?'

হেমকান্তির গলায় স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান। 'আমার মা-বাবা নেই।'

হেমকান্তির এই কথা শুনে থমকে গেল মাঝবয়সী মানুষটি। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তা নয়। তিনি ভেঙে পড়লেন কান্নায়। তিনি অবিরাম কাঁদতে থাকেন। আর বলতে থাকেন, 'খোকা, তুই আমাদের চিনতে না পারিস, আমি কিন্তু চিনতে পেরেছি।'

'চিনতে পারছেন? কীভাবে?'

'তোর শরীরের অনেক জায়গায় চেনার চিহ্ন আছে। সেসব চিহ্ন আমার জানা। তা ছাড়া তোর মুখখানা যে আমার বুকে গাঁথা হয়ে রয়েছে রে! ছেলেবেলায় তোর যে মুখ ছিল, সেই মুখের কোনও পরিবর্তন হয়নি।'

এই ভাবে অনেক কান্নাকাটি এবং অনেক যুক্তি তর্কের শেষে হেমকান্তিকে পরাভব মানতে হল।

'তা শেষ কথাটার জবাব আমাকে দাও। মা-বাবা বেঁচে থাকতে আমি অনাথ হয়ে গেলাম কী করে?'

'খুব ছেলেবেলায় তুই চুরি হয়ে গিয়েছিলি বাবা!'

'কী করে? কেমন করে?'

'মেলা দেখতে গিয়ে।'

'কে আমাকে চুরি করল?'

'জানি না।'— মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'জানি না। জানলে তাকে আমি খুন করতাম।'

তা শেষ পর্যন্ত মা-বাবার দাবি গ্রাহ্য হল। হেমকান্তি গ্রহণ করল তার মা-বাবাকে। তাঁরা আশ্রয় পেলেন হেমকান্তির প্রাসাদে। এরপর আরও এক কাণ্ড ঘটল। তাঁরা দেখলেন পুত্র হেমকান্তি অবিবাহিত। যে পুত্রের এত বৈভব, এত সম্পদ এবং রাজার মতো যার প্রতিপত্তি, সে পুত্র

অবিবাহিত থাকে কী করে? তাই হেমকান্তির বিবাহও হয়ে গেল। তা সে নিজে যতই কুৎসিত কদাচার দেখতে হোক, তার বিবাহ হল রাজকন্যার মতো এক রূপসী সুন্দরীর সঙ্গে।

হেমকান্তির কপালে যে এত সুখ আছে, তা দেখে সে নিজেই আশ্চর্য হতে থাকল।

তা সুখ যখন এভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে, তখন তাকে আর একটু বাড়িয়ে দিলে ক্ষতি কী?

হেমকান্তি এখন আর পিছনের দিকে তাকাল না। তাকাল না সে আদালি সুলতানের দিকেও।

হেমকান্তি নিজেকে এই সময় সার্বভৌম এক রাজা হিসেবে ঘোষণা করে দিল।

রাজ্যজুড়ে বেজে উঠল জয়ঢাক। এখন থেকে এই রাজত্বে একজন রাজাকে পাওয়া গেল, 'হিন্দু রাজা'। রাজার নাম 'বিক্রমজিৎ'। বিক্রমজিতের নামে জয়ধ্বনি উঠল। জয় বিক্রমজিৎ।

শেষ কথা কে বলবে

নতুন রাজা বিক্রমজিতের কাছে একটি গোপন খবর এসে পৌঁছুল।

খবর নিয়ে এল যে গুপ্তচর সে ফিস্ ফিস্ করে জানাল, 'খবর আছে জনাব। শের শাহ সুলতানের কাছে মার খেয়ে যে হুমায়ুন বাদশা হিন্দুস্তান ছেড়ে চোঁ চাঁ দৌড় দিয়েছিলেন, তিনি আবার হিন্দুস্তানের দিকে ফিরে আসছেন।'

'কী রকম? কোন্ পথ দিয়ে আসছেন?'

'আঁজ্ঞে, তিনি জালালাবাদ থেকে কাবুল নদীতে ভেলা ভাসিয়ে পোশোয়ারের কাছাকাছি এক জায়গায় নেমে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছে বিশাল এক ফৌজ। পেশোয়ারে এসে তিনি রাতারাতি একটি কেল্লা বানিয়ে ফেলেছেন।'

এরপর খবর এল, তিনি সিন্ধু নদী পার হয়ে গেছেন। এবং এগিয়ে আসছেন। তাঁকে রুখে দেবার কেউ নেই।

নতুন রাজা বিক্রমজিৎ বুঝতে পারে না, এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত। গজু যেমন ছিল, ঠিক সেই রকমই আছে। তবে হেমু সর্দারকে তার রাজা বলতে বড় কুণ্ঠা। একসঙ্গে যারা দোকানদারি করেছে, তাদের পক্ষে রাতারাতি নিজেদের সম্পর্ক বদল করা খুবই কঠিন। বড় অস্বস্তিতে তাদের পড়তে হয়। যাই হোক, গজু এসে বলল, 'হেমু সর্দার, খবর শুনেছ? বাদশা হুমায়ুন খুব সম্ভব কিছুদিনের ভেতর দিল্লীতে ঢুকে পড়বেন। এখন কী করা যাবে?'

'কিছু করা যাবে না। শুধু দেখা।'

'সেকী! হেমু সর্দার লড়াই করবে না?'

'না।'

লড়াই হল না। আদালি সুলতান তখন চুনার দুর্গে। তিনি রয়েছেন নিরাপদ দূরত্বে। নিশ্চিন্তে। খামোখা তিনিই বা লড়াই করতে যাবেন কেন? তিনিও তাঁর উজির ও সেনাপতিকে কোনও হুকুম পাঠালেন না। এখন শুধুই দেখা।

বাদশা হুমায়ুন বারো হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ঢুকে পড়লেন তাঁর ফেলে যাওয়া দিল্লীর সুলতানী প্রাসাদে। এখানে পৌঁছোই তিনি বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে থাকলেন। হুমায়ুন বাদশা জ্যোতিষ বিদ্যায় বিশ্বাস করেন। প্রাসাদের মাথায় তিনি বানিয়ে ফেলেছেন একটি 'শের মণ্ডল'। খুব খাড়াই একখানি ঘর। সেখানে বসে বসে জ্যোতিষীদের নিয়ে তিনি আসমানের তারাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করেন এবং নিজের ভাগ্য গণনা করেন।

সেদিন ছিল শুক্রবার। মাঘ মাসের প্রথম। শীতকাল। আসমান পরিষ্কার। গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি যাতে ঠিক ঠিক দেখা যায়, তার জন্য জ্যোতিষীদের নিয়ে হুমায়ুন বাদশা শের মণ্ডলে বসে পড়েছেন। নামল সন্ধ্যা, নামল আঁধার। সন্ধ্যা তারাটি সবে দেখা দিয়েছে। এমন সময় বাতাসে ভেসে এল মসজিদের আজান ধ্বনি।

আজান ধ্বনি শোনার পর কোনও মুসলমান চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। বাদশা হুমায়ুনও পারলেন না।

খাড়াই শের মণ্ডল থেকে তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নামতে গেলেন। খাড়াই সিঁড়ি। পা জড়িয়ে গেল তাঁর পরিহিত দীর্ঘ জামায়। হড়কে গেল পা। পুঁটুলির মতো তিনি গড়িয়ে পড়ে গেলেন, গড়িয়ে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। খাড়াই সিঁড়ি বরাবর।

যে গুপ্তচর এ খবর নিয়ে এসে হেমু সর্দারকে পৌঁছে দিয়ে গেল, সেই গুপ্তচরকেই হেমু রাজা জিজ্ঞাসা করল, 'কী সাংঘাতিক! বাদশা চোট পেলেন নাকি!'

'চোট বলে চোট। চোট লেগেছে মাথায়। তিনি এখন মাথার আঘাতে অজ্ঞান, অচৈতন্য। কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।'

'এই হাল দেখে শাহী চিকিৎসকরা কী বলছে? বড় বড় হেকিমরা?'

গুপ্তচরটি ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'আঁজ্ঞে, তারা বলছেন, বাদশার এন্তেকাল হয়ে গেছে।'

তিনদিন পরে গুপ্তচরের খবর সত্য বলে জানা গেল। ঘোষিত হল বাদশা হুমায়ুনের মৃত্যু।

'হুমায়ুন বাদশা মারা গেলেন?'

'জী।'

'দিল্লীর অবস্থা তাহলে এখন কেমন?'

'আঁজ্ঞে, ভালো নয়। নগর-শহর সবই অরক্ষিত। সবাই শোকে আচ্ছন্ন, একেবারে অরক্ষিত দিল্লী।

'অরক্ষিত! তা কেমন করে হয়? বাদশার সেনাবাহিনী কী নগরে নেই?'

'আঁজ্ঞে, তা আছে। সবই আছে। তবু—'

'তারা কী ঘুমিয়ে আছে?'

'আঁজ্ঞে না। তারা আছে সেনা ছাউনিতে। আর যাদের দায়িত্ব আছে টহল দেবার তারা কেবল টহল দিচ্ছে।'

হেমকান্তি খিঁচিয়ে ওঠে, 'তাহলে নগর অরক্ষিত বলা হচ্ছে কেন?'

'আঁজ্ঞে, সেনা ছাউনিতে সেনা আছে, হাতীশালায় হাতী আছে। ঘোড়াশালায় ঘোড়া আছে। অস্ত্রশালায় অস্ত্র আছে। গোলন্দাজ বাহিনীর হাতে কামান-বন্দুক সবই আছে। কিন্তু যা নেই, তা হল এদের পরিচালনা করার মতো সেনাপতি। তাই সব থেকেও কিছুই নেই, তাই অরক্ষিত বলা হচ্ছে, জনাব।'

হেমকান্তির যা যা জানবার দরকার ছিল, তা জানা হয়ে গেল। তবে শেষ জানাটি জানবার জন্য সে বলল, 'মুঘলরা কখনও এইভাবে নগর-রাজত্ব ফেলে রেখে দেয় না। তা যত বিপদই আসুক। নিশ্চয় কোনও সেনাপতি নগরের দায়িত্বে আছে।'

গুপ্তচরটি মাথা চুলকে বলল, 'আঁজ্ঞে, তার্দি বেগ বলে এক অপদার্থ সেনাপতি নগর রক্ষার দায়িত্বে আছে বলে শোনা যাচ্ছে।'

হেমকান্তি এইটুকু সংবাদে খুশি হতে পারল না। আরও তল্লাশ করল, এবং জানা গেল, হুমায়ুনের মৃত্যু এবং তাঁর ছেলে বালক আকবরের অভিষেক নিয়ে মুঘলরা এখন ব্যস্ত। দিল্লী থেকে অনেক দূরে 'কালানৌর' বলে একটি জায়গায় বাদশা হুমায়ুনের ছেলে আকবরের অভিষেক হচ্ছে নতুন বাদশা হিসেবে। তাই দিল্লী নগর অরক্ষিত।

হেমকান্তির অভ্যাস হল হিসেব করে চলাফেরা করা। এবারও সে হিসেব করে এগোল।

মুঘলদের আক্রমণ করাটা এই সময় হেমকান্তির উপযুক্ত বলে মনে হল। শত্রু যখন দুর্বল, তখনই তাকে আঘাত করো।

হেমুর বিশাল বাহিনী আক্রমণ করল তার্দি বেগকে। অতর্কিত আক্রমণ। তুঘলকাবাদে জোর লড়াই হল। তুমুল যুদ্ধ। এই লড়াইয়ে বেচারি তার্দি বেগ হেরে গেল। পালিয়ে গেল সে দিল্লী ছেড়ে। দিল্লীর রাজকোষ চলে এল হেমকান্তির হাতে। সকলে রাজা বিক্রমজিতের নামে জয়ধ্বনি করতে থাকল। দিল্লীর রাজকোষ থেকে প্রচুর অর্থ নিয়ে রাজা বিক্রমজিৎ সকলকে বিলি করলেন।

এরপর থেকে দিল্লীতে শুরু হল হিন্দু রাজা বিক্রমজিতের রাজত্ব। হিন্দুদের ভেতর সে কী উত্তেজনা। কী উন্মাদনা।

তার্দি বেগকে পরাজিত করে বিক্রমজিৎ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পেলেন নগদ একশ ষাটটি হাতী, এক হাজার আরবি ঘোড়া, আর নিয়ে গেলেন প্রচুর ধনরত্ন।

গজু এসে হেমকান্তির সামনে নাচতে লাগল। বলল, 'আর কোনও ভয় নেই। মুঘলদের হারিয়ে যখন দিল্লী দখল করা গেছে, তখন হিন্দুস্থান একদিন চলে আসবে হাতের মুঠোয়। আর সেদিন খুব দূরে নেই।'

হেমকান্তি ওরফে রাজা বিক্রমজিৎ গজুকে ধমক দিয়ে বলল, 'গজু, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এখনও অনেক পথ যেতে হবে। অনেক হাঁটতে হবে। লড়াই করতে হবে এখনও অনেক। আর সে লড়াই যে কবে শেষ হবে, তা এখনই বলা যাবে না।'

'আবার লড়াই হবে!'

'হ্যাঁ, মুঘলরা কী ছেড়ে দেবে? তারা তাদের দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আবার আসবে।'

হেমকান্তি তাই হাত গুটিয়ে বসে না থেকে নিজের শক্তি বৃদ্ধিতে মন দিল। যেমন রাজারা দেয়। কিন্তু হেমকান্তি নিজের কাজে মাঝে মাঝেই কেমন যেন দিশেহারা হয়ে যায়। তার মনে হয়, এই ভয়ঙ্কর দায়িত্ব তাকে কে দিল? কে তাকে 'রাজা' হতে বলল? কে বলল তাকে লড়াই করতে? এইভাবে লড়াই করাই কী তার ভাগ্যলিপি। গোলদারি এক দোকানদারের জীবনে এ কী বিপত্তি! বিক্রমজিৎ বলে যখন তাকে সম্বোধন করা হয়, তখন হেমকান্তি কেমন যেন হয়ে যায়। সে হঠাৎ বিক্রমজিৎ হল কী করে? হেমকান্তি তাহলে কোথায় গেল?

যুদ্ধের জন্য জবর প্রস্তুতি চলে। কিন্তু এই প্রস্তুতির মাঝে হেমকান্তির চিত্তবিভ্রমও হয়।

এদিকে যেমন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলে, তেমনি হেমকান্তির বাসগৃহ হঠাৎ রাজবাড়িতে চলে বিশাল যাগযজ্ঞ। শয়ে শয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসে। আসে দলে দলে সন্ন্যাসী। তারা হোম ও যজ্ঞ করে এক হিন্দু রাজত্ব যাতে কায়েম হয়।

হেমকান্তির নতুন বউ স্বামীর রাজত্ব যাতে পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠা হয়, তার জন্য ঠাকুরের নামে উপবাস করতে থাকে। মা-বাবা ছেলের হাতে তাবিজ কবজ পরাতে থাকে। আসন্ন যুদ্ধে যেন তাদের জয় হয়।

তা শেষে সত্যি সত্যিই সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের দিনটি এসে গেল। ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ। এবং এটিও শীতকালের সময়।

সেই পানিপথ। যেখানে একদিন মুঘল বাবরের ভাগ্য পরীক্ষা হয়েছিল। বাবর লড়াই করেছিলেন এক সুলতানের সঙ্গে। এখন বাবরের পৌত্রকে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য লড়াইয়ে নামতে হচ্ছে এক অখ্যাতনামা দোকানীর সঙ্গে। বিষয়টি নিয়ে যতই ভাবে হেমকান্তি, ততই সে আশ্চর্য এক মজা পায়। ভাগ্যের কী পরিহাস! এক অখ্যাত দোকানি বনাম এক মুঘল যুবরাজ।

অঙ্ক কষে এবং হিসেব করেই যুদ্ধে নামলেন রাজা বিক্রমজিৎ ওরফে হেমকান্তি। গোলন্দাজ বাহিনী রাখা হয়েছিল বটে, রাজা বিক্রমজিতের প্রধান ভরসা ছিল হাতী আর বিপুল সৈন্যবাহিনীর ওপর। দেড় হাজার হাতী নামল যুদ্ধক্ষেত্রে। শত্রুপক্ষকে দাবিয়ে রাখতে। বিক্রমজিৎ ওরফে হেমকান্তি তাঁর বিশাল হাতী 'হাওয়াই'-এর পিঠে চেপে মুঘলদের তছনছ করতে থাকল। বাকি দেড় হাজার থাকল তার সঙ্গে সঙ্গত করতে।

জয় প্রায় হাতের মুঠোয়। কিন্তু মুঠোর ভেতর শেষপর্যন্ত জয় ঢুকল না। ছিটকে গেল। ফস্‌কে গেল।

মুঘল তীরন্দাজদের একটি তীর হঠাৎ উড়ে এসে চোখে বিঁধল হেমকান্তির। 'হাওয়াই'য়ের পিঠে লুটিয়ে পড়ল সে।

হাতীটি খুবই সুশিক্ষিত। প্রভুকে পিঠে নিয়ে সে দৌড়ল নির্জন এক জঙ্গলের দিকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। হেমকান্তি ওরফে

বিক্রমজিৎ ওরফে হিন্দু বীর হিমু ধরা পড়ে গেল মুঘলদের হাতে। অচেতন অবস্থায়। অচেতন হিমুকে হত্যা করে আকবর নিশ্চিত জয় করায়ত্ত করে নিল। ইতিহাস বাদশা আকবরের নামে জয়ধ্বনি দিল।

আর বিপরীত দিকে? শোনা গেল, শত্রু পক্ষ হেমুর বাড়িতে হানা দিয়ে পেল প্রচুর ঐশ্বর্য। নব বিবাহিত হিমুর বধূটি রাশি রাশি সোনা নিয়ে হাতীর পিঠে চেপে পালিয়ে বাঁচলেন। এবং তিনি যা বাড়িতে ফেলে গেলেন, তাও কিছু কম নয়। হিমুর বাড়িতে হানা দিয়ে কেবল এই ধনরত্নই লুঠ হল না, তার বাবাকেও খুন করা হল। বেচারি রাজার বাবা!

দুঃখ এই, মানুষটির মর্যাদা বোঝা হল না। ইতিহাসে সে এক উপেক্ষিত চরিত্র।

অনেককাল পরে জাহাপনা আকবরের জীবনী লিখতে গিয়ে আবুল ফজল আক্ষেপ করে এমনই একটি কথা বলেছিলেন। আবুল ফজল লিখেছিলেন, 'হেমুর যে বিরাট উদ্যম, তার যে বিপুল সাহস এবং তার দুঃসাধ্য চেষ্টার যদি বিচার করা হত, তাহলে দেখা যেত তাকে খুন করাটা একেবারেই ঠিক হয়নি। বরং যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখা হত, এবং রাখা হত বাদশা আকবরের অনুগত করে, তাহলে তাকে দিয়ে অনেক বড় বড় এবং মহৎ কাজ করানো যেত।'

আবুল ফজল হেমকান্তির কথা আধখানা করে বললেও, সাধারণ মানুষজন কিন্তু তা বলে না। হেমকান্তি ওরফে হেমু রাজা ওরফে বিক্রমজিৎ আজ আমাদের কাছে এক হারিয়ে যাওয়া মানুষ।

গোর্খাল্যাণ্ড নির্ধারণের মাপকাঠি কেমন হবে?

বলরাম চক্রবর্তী

এই দেশ বা রাষ্ট্র কী? গোর্খাল্যাণ্ড কী? গোরক্ষভূমি কী? কোন নিরিখে কোন বিশেষণে আমরা তাকে চিনবো? সনাক্ত করবো? তার আত্মাকে অনুভব করবো?

(ক) এটি কি দেশের বিশেষ ধরনের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা দিয়ে? (খ) বিশেষ একটি মনুষ্য গোষ্ঠীর এদেশে অবস্থান দিয়ে? অথবা (গ) ওই দেশে বিশেষ একটি ভাষা বা হরফের ব্যবহার দিয়ে? অথবা (ঘ) বিশেষ একটি সরকারের প্রতি আনুগত্যের জন্য? অথবা (ঙ) বিশেষ কোনও একপ্রকার অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য? অথবা (চ) অন্য কোনও নিরিখে? বা একাধিক নিরিখে?

বিভিন্ন জাতীয় দলগুলি যেমন— কংগ্রেস, তৃণমূল, সি পি আই ইত্যাদি পৃথক গোর্খাল্যাণ্ডের দাবির সমর্থনে কোনও বিশেষ যুক্তি এখনও উপস্থাপন করেনি। কিন্তু দার্জিলিং-এর পার্বত্য এলাকায় তাঁদের সমর্থকেরা তাঁদের সমতলের কেন্দ্রীয় নেতাদের জানিয়ে দিয়েছেন, 'পার্বত্য এলাকায় দলের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব রাখতে হলে গোর্খাল্যাণ্ড সমর্থন করতেই হবে।' নাহলে পাহাড়ে কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে শুধু পাহাড়ী ভাইদের আবেগের কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের জন্য অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, রাজনৈতিক নিরাপত্তা (সীমা সুরক্ষা), আমদানি রপ্তানীর জন্য উন্মুক্ত বন্দর ও সাংস্কৃতিক সমমূলতা ও সঙ্গতি প্রভৃতির কথা চিন্তা ও আলোচনা করারও প্রয়োজন রয়েছে।

বেশ কিছু অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য দার্জিলিংয়ের গোর্খা ভাইরা বঙ্গভূমিকে ছেড়ে একটি পৃথক গোরক্ষভূমি গঠন করতে চাইছেন। কিন্তু বঙ্গভূমির সঙ্গে গোরক্ষভূমির কোনও সীমানা বা প্রাচীর তোলা কি সম্ভব? অথবা প্রাচীর তুললেই কি এইসব অভাব অভিযোগের নিরসন হবে? প্রত্যেকটি অভিযোগের কারণ অনুসন্ধান করে দ্রুত সেটির প্রতিবিধান করলে তবেই এইসব অভাব অনটন ও অভিযোগের অবসান হতে পারে। বঙ্গভূমিকে ছেড়ে বা তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে নয়। নানান গঠনমূলক কাজের, যেমন জলের জন্য জলাধার ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করে, শিক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য দার্জিলিং অঞ্চলে একটি গোর্খা ইউনিভার্সিটি বা গোরক্ষনাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে এবং সেখানে গোর্খা ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিশেষ পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা যোগ করে — বঙ্গভূমি থেকে গোরক্ষভূমিকে বিচ্ছিন্ন করে নয়।

আজকের পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত সরকার, অন্যান্য রাজনৈতিক দল সকলেই যখন খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে অভাব অভিযোগের কারণ অনুসন্ধান করে দ্রুত উত্তরবঙ্গের গোর্খা ভাইদের সমস্যাগুলির সমাধান সূত্র খুঁজে পেতে চাচ্ছেন, তখন আমরা যুক্তিপ্রধান আলোচনার মাধ্যমেই আমাদের অভাব অনটন ও অভিযোগের দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা হবে আশা রাখি।

দার্জিলিংয়ের জলাভাব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই মিটবে না বা তাতে উত্তরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে যদি অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ থাকে তা থামানো সম্ভব হবে না। পাহাড়ের গোর্খাদের প্রশাসনে অংশ গ্রহণের জন্য পঞ্চায়েতে ব্যবস্থা চালু করলে এবং যেসব অর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার গোর্খা পার্বত্য পরিষদের কাছে দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তার সম্যক ছত্তব্ধনপ্তন্ত্রব্ধনপ্সঞ্জ এবং তার সার্টিফিকেট বা অডিট-এর সুব্যবস্থা করলে হয়তো গঠনমূলক প্রকল্প বিদ্যুৎ ও জলাভাবের মতো বস্তুতান্ত্রিক অভাব অনটনগুলির নিরসন অনেকাংশে সম্ভব হবে — গোরক্ষভূমিকে বঙ্গভূমি থেকে পৃথক করে নয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তক্ষেপ যদি অনভিপ্রেত হয়, তাহলে দার্জিলিং বা অনুরূপ কোনও শহরে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুদান চাওয়া যেতে পারে। স্থানীয় অধিবাসীরাই আলোচনার মাধ্যমে নির্ণয় করবেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও পাঠ্যক্রম কি হবে — পাহাড়ের পর্যাবরণ, অর্থনীতি এবং গোর্খা সংস্কৃতি ও জীবনধারার দিকে লক্ষ্য রেখে।

এই গোরক্ষ ভক্তরা যেমন হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে আছেন, তেমনি বাংলার সমতল অঞ্চলে ও ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলেই ছড়িয়ে আছেন। গুরু গোরক্ষনাথের নিজের নিবাস ছিল বঙ্গদেশে। সেখান থেকে তিনি ভারতের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম সব দিকেই নিজের ধর্ম ও মতাদর্শ প্রচার করে একটি বলিষ্ঠ দেশভক্ত, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ জাতি গঠন করে গেছেন। যদিও গুরু গোরক্ষনাথের বিষয়ে গ্রন্থপ্রণেতা ডঃ মোহন সিং তাঁর বইয়ের ভূমিকাতে লিখেছেন, গুরু গোরক্ষনাথ আবির্ভূত হন পেশোয়ারের কাছাকাছি অঞ্চলে। কিন্তু গোরক্ষনবাণী গুরু স্বয়ং বলে গেছেন দেশ আমার পূর্বাঞ্চল, আর পশ্চিমে রয়েছে আমার বিচরণক্ষেত্র। গুরু যেন আমার মাঝি। ভ্রমরূপ রোগ করেন নিরাময়।

"পূরব দেশ পঁছাহী ঘাটি
জনম লিখ্যা হামার জোগ
গুরু হামারা নাগর কহী এ
মেটে ভরম বিরোগ।"

একবার গোরক্ষনাথ যখন তাঁর গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গে গঙ্গাতীরে বিচরণ করছিলেন, তখন বনের মধ্যে দিয়ে পথ চলার

সময় হঠাৎ শুনলেন মানুষের গোঙানির শব্দ। কাছে গিয়ে দেখলেন অত্যন্ত রূপবান এক কিশোর পড়ে আছে। যার হাত পা ধারালো অস্ত্রে প্রায় ছিন্ন বিছিন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। গুরু শিষ্য সেখান থেকে তাকে সযত্নে তুলে নিয়ে কুটিরে এসে তার সেবা শুশ্রূষার পর সে একটু সুস্থ হতে তার পরিচয় পেলেন সে সেখানকার রাজা দেবপালের পুত্র। বিমাতার বিদ্বেষে ও আমানুষিক অত্যাচারে তাঁর এই অবস্থা। গোরক্ষের উপর ছিল তাঁর সুরক্ষা ও শুশ্রূষার ভার। সে সুস্থ হলে গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁকে দীক্ষা দিলেন ও তার দেহের চারিটি অঙ্গ ছিন্ন হয়েছিল বলে তার নাম দিলেন চৌরঙ্গীনাথ এবং গোরক্ষের উপর তার শিক্ষা ও সবদিক থেকে সাহায্য করার দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

শিক্ষা সমাপন হলে গুরুদেব তাঁদের নিয়ে চললেন গঙ্গাতীরে গোবিন্দপুরের নিবিড় অরণ্যে। সেখানে গিয়ে গুরুদেব চৌরঙ্গীনাথকে তাঁর আস্তানা বানিয়ে নিতে বললেন। কারণ অদূরে সিদ্ধ পীঠ কালীঘাট। চৌরঙ্গীনাথ সেখানে থেকে কালীতীর্থ কালীঘাটের তীর্থ যাত্রীদের পথকে সুগম রাখেন এবং তার শিষ্য উপশিষ্য তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করার জন্যই চৌরঙ্গী পাড়া গড়ে উঠেছিল। পাশেই ছিল কূর্ম দেবতার মন্দির। যে অঞ্চ লকে বলা হয় ধর্মতলা।

কলকাতার ধর্মতলা ও চৌরঙ্গী, কালীঘাট ছিল যেমন গুরু গোরক্ষনাথের সাধন ও বিচরণ ক্ষেত্র তেমনি পূর্ব, পশ্চি ম ও দক্ষিণ ভারতে অনেকেই গোরক্ষভক্ত এবং নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু গোর্খাল্যাণ্ডের আন্দোলনে গোর্খা শব্দটি খুব সম্ভবত সমতলের ধর্মতলা-চৌরঙ্গী-কালিঘাটের গোরক্ষভক্তদের বাদ দিয়েই প্রয়োগ করা হয়েছে। তাহলে গোর্খা কে বা কারা? আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেল, গুরু গোরক্ষনাথের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল বাংলা ও অসমের শৈল ও সমতল উভয় ভূমিই। সেখানে তাঁর শিষ্যেরা নিজেরা গোরক্ষাশ্রিত মনে করতেন। গুরু গোরক্ষনাথ ভারতের উত্তর ও পশ্চি মের অনেক ভূমিতেই নিজের মতাদর্শ প্রচার করে গেছেন এবং সেসব ক্ষেত্রেও গোরক্ষমতের অনুসারী মানুষেরা আছেন। ভারতের বাইরেও এর ক্ষেত্র বিস্তৃত।

গোর্খা কে বা কারা?

এই গোর্খাল্যাণ্ডের গোর্খা শব্দটি কোন জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে তাও আমাদের স্পষ্টভাবে বোঝার প্রয়োজন। গোরক্ষ সংস্কৃতি যেমন দেখি দেশান্তরেও বিস্তৃত, তেমনি গোর্খা জনগোষ্ঠীও দেখা যায় অনেক জাতি ও উপজাতির মানব গোষ্ঠীতে ছড়িয়ে আছে। বঙ্গের শৈলভূমির আদিবাসীদের বেশ কয়েকটি শাখার মানুষ যেমন, নেওয়ার, গুরুং, লিম্বু, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতিরা যেমন গোর্খা গোষ্ঠীতে আছেন, তেমনি আছেন পশ্চি ম ভারতের রাজপুতানা থেকে আগত রাজপুত ক্ষত্রিয়েরা, উত্তর ভারতের গোরখপুরের এবং পূর্বের বঙ্গদেশের নাথযোগীরা বারাণসী ও সমতলের ব্রাহ্মণেরা যুগেযুগে গোর্খা সমাজের গুরু ও পুরোহিতের ভূমিকায় ছিলেন।

এছাড়া গোর্খা নামে নেপালে একটি শহর আছে, তারও কাছাকাছি লামজুং রাজ্যকে ঘিরে গোর্খাদের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে। এইখানেই খাঙ্খা উপজাতির অত্যাচারী গোর্খা রাজাকে গোর্খা প্রধানদের সহায়তায় সিংহাসন থেকে অপসারণ করে লামজুং-এর ক্ষত্রিয় রাজা কুমার দ্রব্যশাহ গোর্খাদের রাজসিংহাসনে বসেন। তাই গোর্খারা কিরাত-নিষাদ ও রাজপুত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের একটি মিশ্র জাতি এবং একটি উন্নত মিশ্র সংস্কৃতির অধিকারী। নেপালে রচিত গোর্খা বংশাবলী থেকে গোর্খাদের এই পরিচয় পাওয়া যায়। এই বংশাবলী গ্রন্থটি গোর্খা রাজা রাজেন্দ্র বিক্রম শাহর রাজত্বকালে (১৮৩৭-১৮৪২)-র সময় রচিত হয়েছিল। রচয়িতার নামোল্লেখ নেই। পাহাড় থেকে পাহাড়ে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাষা বদলাতে থাকে। যেমন তামাংদের ৩টি, গুরুংদের ২টি, রাইদের ১৪টি এবং কিরান্তিদেরও একাধিক পৃথক পৃথক ভাষা ছিল। যার মাধ্যমে ভিন্ন পাহাড়ের লোকেদের সঙ্গে কথা বলা বা তাদের কথা বোঝার অসুবিধা হতো। তাই পরস্পরকে বোঝার ও কথোপকথনের জন্য অনেক গোর্খাই নেপালী ভাষাকে সাধারণ কথ্যরূপে ব্যবহার করে থাকেন। গোর্খা বংশাবলী গ্রন্থটিও নেপালী ভাষায় রচিত। এটি একমাত্র স্থানীয় ইতিহাস যাতে দ্রব্য শাহ-এর শাসনকাল থেকে গীর্বান যুদ্ধে বিক্রম শাহর মৃত্যুকাল (১৮১৬) পর্যন্ত গোর্খাদের ইতিহাস পাওয়া যায়।

বংশাবলীর প্রারম্ভে আমরা দেখি লামজুং-এর রাজা যুশুবাম শাহর তিন ছেলে ছিলেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে নরহরি শাহ, দ্রব্য শাহ এবং নরপতি শাহ।

শাহ বংশের পরিচয় ও কুলদেবতার ইতিহাস অনুসন্ধান —

দ্রব্য শাহের একজন উত্তরপুরুষ গোর্খার রাজা রাম শাহ তাঁর প্রজাদের ৬টি গোষ্ঠী থেকে সুদর্শন, শান্ত, সাহসী, বাগ্মী ও শাস্ত্রজ্ঞ ৬ জন রাজদূতকে উপঢৌকন ও সৌজন্য পত্র দিয়ে রাজস্থানে চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর ইত্যাদি রাজ্যে পাঠালেন। তিনি চিতোরের ও রাজপুতানার রাজাদের জানালেন যে যখন পদ্মিনীকে নিয়ে চিতোরের রানার সঙ্গে দিল্লীর বাদশাহের যুদ্ধ হয়, সেইসময় রাম শাহর বংশের পূর্বপুরুষেরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হন। কিন্তু তাঁদের রানী ও শিশু সন্তানেরা পাহাড়ে এসে আশ্রয় নেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ওই রাজপুত শিশুরাই সৈন্য সংগ্রহ করে অনেকে স্থানীয় পাহাড়ী রাজাদের পরাস্ত করে রাজা হয়েছেন। রাজা রাম শাহ পরিবারের বংশ পরিচয় এবং ইতিহাস ও তাঁদের কুলদেবতার ইতিবৃত্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে পাঠালেন ওইসব রাজদূতকে।

এই দূতেরা রাজস্থানে শাহ পরিবারের শিকড়ের কিছু সন্ধান যেমন আনলেন, তেমনি সেখানে বিভিন্ন রাজ্যে সৌজন্য স্থাপন করে এলেন।

রাম শাহর পুত্র ডম্বর শাহ এবং তাঁর উত্তরপুরুষ পৃথ্বীপতি শাহ ১৫৯১ শকাব্দে রাজা হয়ে তাঁর দরবারে কালিকা, পশুপতি ও হনুমানের মূর্তি স্থাপন করেছিলেন এবং গুরু গোরক্ষনাথের পাদুকা গোর্খাতে হনুমান-ভুজঙ্গ জঙ্গলে একটি গুহার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গোর্খারা গুরু গোরক্ষনাথের আশ্রিত হওয়ায় মহাদেব ও দেবী কালিকার পূজা আরাধনায় ব্রতী থাকতেন।

নানা তীর্থ পর্যটনের বেশ কয়েক বছর পর গোরক্ষনাথ আবার এসেছিলেন ধর্মতলা-চৌরঙ্গীর এই অরণ্যে। তখন সেখানে আরও একজন যোগী কানুপানাথও ঘুরতে ঘুরতে এসে হঠাৎ হাজির হয়েছিলেন। উভয়ে অভিবাদন বিনিময় করলেন নাথযোগীদের রীতিতে। 'আদেশ' কথাটি উচ্চৈস্বরে একে অন্যকে লক্ষ্য করে উচ্চারণ করেন। কানুপানাথ বললেন, আমি এই বনে এখন থাকি। তাই আপনি আমার

অতিথি। আমি আম দিয়ে অতিথি সৎকার করব। এই বলে কিছুটা ভস্ম শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন, যার ফলে বনের গাছ থেকে বেশ কিছু পাকা আম তাদের সামনে রাশিকৃত হল। উভয় যোগী তার কিছু খেয়ে তৃপ্তি লাভ করলেন। খাবার শেষে গোরক্ষনাথ দেখলেন উদ্বৃত্ত আমগুলি পড়ে রইল, সদ্‌গতি হল না। কিন্তু খাবার জিনিস তো ফেলতে নেই। তাই তিনি বললেন, ওগুলি গাছে পুনঃস্থাপিত করে দিন। কানুপানাথ চমকে ওঠে বললেন, এ কী করে সম্ভব হবে! গোরক্ষনাথ বললেন, গুরুর কাছে শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে শিষ্যের কিছুই অসম্ভব থাকে না। আমি এটি করে দেখাব। তিনি তাঁর ঝুলি থেকে এক চিমটি ভস্ম আমগুলিতে ছুঁড়ে দিলেন। আমগুলি আগের মতোই গাছে গিয়ে ঝুলতে লাগল। তারপর দুই নাথ যোগী তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিনিময় করতে লাগলেন। কানুপানাথ সম্প্রতি কামরূপ পরিব্রাজন করে এসেছেন। তিনি সেখানকার সংবাদ বলতে গিয়ে কামরূপের মোহময়ী নারী মঙ্গলা কেমন করে গুরু নাথযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথকে তাঁর মোহজালে ফাঁসিয়ে বিলাস ব্যসনে মত্ত রেখেছেন তার কথা বললেন। গোরক্ষনাথ শোনামাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মৎস্যেন্দ্রনাথজীই আমার গুরু। আপনার কাছে গুরুদেবর যে সংবাদ পেলাম তাতে আমাকে এখনই তাঁর সাহায্যার্থে কামরূপ যেতে হবে। তবে যাবার আগে আপনাকেও একটা সংবাদ দিয়ে যাই। আপনার গুরু জলন্ধরনাথজীকে আমি চিনি। আমি এখানে আসার আগে কুমিল্লায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি, ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদ জলন্ধরনাথজীকে আক্রোশবশত ভূগর্ভে বন্দী করে রেখেছেন।' কানুপানাথও একথা শুনে চমকে উঠলেন। তিনিও শ্রীহট্টের পথে চললেন। কুমিল্লায় যেখানে তাঁর গুরু ভূগর্ভে বন্দী হয়ে রয়েছেন।

কদলী রাজ্যে মৎস্যেন্দ্রনাথের মোহপাশ মুক্তি

কদলী রাজ্য কামরূপকে প্রমীলারাজ্যও বলা হত। সেখানে রানী মঙ্গলা রাজত্ব করতেন। মন্ত্রী, শান্ত্রী, পাহারাদার সবাই ছিলেন মহিলা, সেদেশে ঘরে ঘরে যোগিনী। পুরুষদের এই রাজ্যে প্রবেশের কোনও অধিকারই ছিল না। পুরুষ বলতে একমাত্র যোগীরাজ মৎস্যেন্দ্রনাথ। তিনিই রানী মঙ্গলা ও বিমলার স্বামী। মৎস্যেন্দ্রনাথ যখন কামরূপের পাহাড়ে ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন রানীর সহচারীরা সুপুরুষ যোগীশ্বরকে ধরে নিয়ে এসে রানীদের হাতে সমর্পণ করেন। রানীরা তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাধন-সঙ্গিনী হন। তখন থেকেই তিনি ওই স্ত্রীরাজ্যে ঐশ্বর্য বিলাস ব্যসন আর কড়া পাহারায় নজরবন্দী হয়ে রয়েছেন। গোরক্ষনাথ বুঝলেন পুরুষের বেশে ওই রাজ্যের অন্দরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি এক নর্তকীর ছদ্মবেশে নর্তকীর দলের সঙ্গে রানীর দরবারে প্রবেশ করলেন ও দেখলেন তাঁর গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ দুই রানীকে পাশে বসিয়ে নৃত্যগীত ও রঙ্গরসে মশগুল। শিষ্য গোরক্ষনাথকে তিনি চিনতেও পারলেন না।

গোরক্ষনাথ তাঁর যোগদৃষ্টিতে দেখলেন রমণী ভোগসুখে তাঁর গুরুর দেহ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। যোগদেহে পূর্বের জ্যোতি আর নেই। কিভাবে ওই নারীদের কুহক থেকে গুরুদেবকে উদ্ধার করা যায় সেকথা ভেবে গোরক্ষনাথ মনে মনে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, কোনওক্রমে যদি রমণীরা তাঁকে চিনতে পারে, তবে তাঁকে কোতল করে ফেলবে। তখন তাই গোরক্ষনাথ নর্তকী বেশেই মৃদঙ্গে বোল তুললেন। সেই বোল যেন যোগের এক একটি পরিভাষাকে ব্যক্ত করতে লাগল। 'কায়া সাধ, কায়া সাধ' বোল তিনি প্রাণপণে বাজাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে মৃদঙ্গের বোল মৎস্যেন্দ্রনাথের হৃদয়ে চেতনা ফিরিয়ে আনতে লাগল। শুনতে শুনতে শিষ্যকে এসে তিনি জড়িয়ে ধরলেন ও কোনও দিকে না তাকিয়ে তিনি শিষ্যের হাত ধরে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। মঙ্গলা, বিমলা কত কাঁদলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই আর ফিরলেন না। অবশেষে দুই রানী কাঁদতে কাঁদতে পাথেয় হিসাবে যোগীর ঝুলিতে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা বেঁধে দিলেন। গোরক্ষনাথ সেই মুহূর্তে কিছুই বললেন না। কিন্তু তিনি মনে মনে বললেন, এর ব্যবস্থা আমি করছি। যাবার সময় সমস্ত রাজ্যের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমার গুরুদেবের যে হাল তোমরা করেছ, তার জন্য আমি কোনওদিনই তোমাদের ক্ষমা করব না। আমি বলছি তোমরা বাদুড় হয়ে ঝোল।' কিংবদন্তী আছে যে, আজও অসমে কাছাড়ের কাছে একটি বিশেষ জায়গা বাদুড়ে ভরা।

এইবার দুই গুরু-শিষ্যের একপথে চলা শুরু হল আর পথ চলতে চলতে গোরক্ষনাথ গুরুদেবের ঝুলি থেকে একটি একটি করে স্বর্ণমুদ্রা ফেলতে লাগলেন। অনেক পরে গুরুদেব টের পেয়ে শিষ্যের হাত চেপে ধরে কাতর ভাবে বললেন, 'বাবা, এই কটা রেখে দে বাবা।' গোরক্ষনাথ দৃঢ় স্বরে বললেন, 'গুরুদেব, এই পঞ্চ ভূতের বিকার দিয়ে আপনি কি করবেন? যোগীর কাছে এর কি কোনও মূল্য আছে? যোগী তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্যে ধনী। সেই ঐশ্বর্যের সন্ধান পায় কে? আপনি এই জগতের অধীশ্বর। আপনি যোগীরাজ, আপনার ইচ্ছামাত্র আপনার প্রস্রাবও সোনায় পরিণত হতে পারে। তাহলে? আমি কিছুতেই এই বিষ আপনাকে স্পর্শ করতে দেব না। এই আমি সব ফেলে দিলাম।' শিষ্যের শাসনের কাছে মৎস্যেন্দ্রনাথ হার মানলেন।

প্রবন্ধে দেখা গেল গুরু গোরক্ষনাথের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল বাংলা ও আসামের শৈল ও সমতল উভয়ভূমিই। যেখানে তাঁর শিষ্যেরা নিজেদের গোরক্ষাশ্রিত মনে করতেন, গুরু গোরক্ষনাথ ভারতের উত্তর ও পশ্চিমের অনেক ভূমিতেই নিজের মতাদর্শ প্রচার করে গেছেন এবং সে সব ক্ষেত্রেও গোরক্ষমতের অনুসারী মানুষেরা আছেন। ভারতের বাইরেও এর ক্ষেত্র বিস্তৃত।

তিমির বলয়

গোপাল চক্রবর্তী

চিৎকার, চেঁচামেচি, গেটে দুমদাম লাথির শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেয়াল ঘড়িতে দেখলাম রাত দু'টো। ভেজানো জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম গেটের সামনে লাঠি, তলোয়ার, হকি-ষ্টিক নিয়ে জনা পঁচিশেক লোক। সকলের মাথায় টুপী, অনেকের দাড়ি। কয়েক জনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ছাত্র শিবিরের মিছিলে দেখেছি। ওদের সঙ্গে রয়েছে স্থানীয় মসজিদের ছোট ইমাম। ওদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রও নিশ্চয় আছে। একজন আবার গেটে লাথি মারল বলল

— এই শালা হারামীর বাচ্চারা, গেট খোল

ততক্ষণে বাড়ির কর্তা রফিক সাহেব, তাঁর স্ত্রী, ছেলে মেয়েরা জেগে উঠেছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওরা আমার সন্ধান পেয়েছে। বাড়ির সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। রফিক সাহেব, স্ত্রী রেহানাকে বললেন— তুমি শিগ্‌গীর অপুকে ষ্টোর রুমের বাঙ্কে তুলে দিয়ে, কিছু চাপাটাঁপা দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দাও।

ছেলে মেয়েদের বললেন — আর তোমরা শোন, ওরা জিজ্ঞাসা করলে বলবে, মামা আমাদের বাড়িতে নেই, অনেকদিন আসেনা। বেশি কথা কেউ বলতে যেওনা। যাও আমি গেট খুলে ওদের সাথে কথা বলছি।

আমি বললাম —

— রসিক ভাই, আমার জন্য এত বড় বিপদের ঝুকি নেবেন, তার চেয়ে বরং আমি ওদের মুখোমুখি হই। আসল ঘটনাটা ওদের খুলে বলি।

— তোমাকে সামনে পেলে ওরা কোতল করবে। সব কথা খুলে বলার সময় আর পাবেনা। এখন যা বললাম তা কর। দেরি করার সময় নেই।

রফিক সাহেব গেটের চাবি নিয়ে চলে গেলেন। আমাকে রেহানা ভাবী ষ্টোররুমের বাঙ্কের উপর তুলে দিয়ে কতগুলি বাক্স টিন দিয়ে আমাকে আড়াল করে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। সম্ভবত সময়টা মে মাস, গরমে আতঙ্কে আমার দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম। ততক্ষণে রফিক সাহেব গেট খুলেছেন। আর খোলা গেট দিয়ে হুড়মুড় করে ওরা ঢুকে পড়েছে। একজন রফিক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল

— ওই কাফেরটা কোথায়?

— এখানে কোনও কাফের নেই। আমরা সাচ্চা মুসলমান।

— ইসলামের শত্রু কাফেরকে বাড়িতে লুকিয়ে রেখে সাচ্চা মুসলমান ফলানো হচ্ছে?

— ইমাম সাহেব, আপনি তো আমাকে চেনেন, রাত দু'টোর সময় বাড়িতে চড়াও হয়ে এসবের অর্থ কী?

সম্ভবতঃ সেই ইমামের গলা শোনা গেল — দেখুন রফিক সাহেব, আমরা খুব বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি। সে হিন্দুটা আপনার বাসায় লুকিয়ে আছে। ওকে বের করে দিন। একজন মুসলমান হিসাবে এটা আপনার কর্তব্য। কারণ ওই হিন্দুটার প্ররোচনায় পাবলিকের মার খেয়ে আমাদের সেক্রেটারী হাসপাতালে ভর্তি।

— আমরা বদলা চাই, রক্তের বদলে রক্ত।

অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠল।

রফিক ভাই ধীর, স্থির সংযত ভাবেই বললেন।

— দেখুন আপনারা মিথ্যা খবর পেয়েছেন। আর আপনারা কাকে খুঁজছেন তা আমি জানিনা। তবে দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমার পরিবারের লোকজন ছাড়া আমার বাসায় আর কেউ নেই। ব্যাপারটা যদিও আমার পক্ষে অসম্মানজনক, তবুও বলছি যদি — আপনাদের সন্দেহ হয় তবে বাসায় তল্লাসি করতে পারেন।

মনে হলো কথাটা বলতে গিয়ে রফিক ভায়ের গলাটা যেন একটু কেঁপে গেল। ওদের মধ্যে কয়েকজন বলে উঠল — হ্যাঁ, আমরা তাই করবো। আমরা আপনার বাসায় খুঁজে দেখবো। কারণ আমরা নিশ্চিত যে কাফেরটা এখানেই আছে।

কাউকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে লোকগুলো ঘরে ঢুকে গেল। অনেকগুলো পায়ের দুপদাপ শব্দের সঙ্গে এটা ওটা ছুঁড়ে ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হৃদ্‌স্পন্দন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, কখন এই স্টোররুমের তালাটা ভাঙ্গে। নাস্তিক বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে ঈশ্বরকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা আহ্নিক ছেড়েছি, পৈতের ঠাঁই হয়েছে দেশলাইয়ের বাক্সে, ড্রয়ারের মধ্যে। আজ এই চরম মুহূর্তে মনে হলো এই বিপদ থেকে একমাত্র ঈশ্বরই বাঁচাতে পারেন। মা বলতেন বিপদে মধুসূদনকে স্মরণ করতে হয়।

— এই বল অপু রায় কোথায়?

— জানি না।

দৃঢ় কণ্ঠে বলল রফিক ভায়ের সাত বছরের মেয়েটি।

— তোদের বাড়িতে নেই?

— না।

একজন বলল —

— ছাদটা একবার দেখে নাও।

কয়েকজন দুপ্‌দাপ্ করে ছাদে উঠে গেল। হাতের লাঠি দিয়ে দরজা জানলায় এলোপাথারি বাড়ি মারছে। সঙ্গে অশ্লীল গালিগালাজ। কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ স্টোররুমের দরজার সামনে এসে থেমে গেল। একজন লোহার রড জাতীয় কিছু দিয়ে তালাটায় আঘাত করল। কমজোরী তালা, সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গোটা কয়েক চাম্‌চিকে উড়ে বেরিয়ে গেল। টর্চ জ্বেলে এদিক-ওদিক দেখল ওরা।

— একজন বলল —

— এ আবার কোন দোজখ্! চল চল।

ইমামের গলা শোনা গেল —

— রফিক সাহেব, মুসলমান হয়ে ইসলাম বিরোধী কাজ করবেন না। আপনার বাসায় কাফেরদের এত আনা-গোনা কেন?

— মুসলমান, এই শালাকে তো কোনও জুম্মাবারে মস্‌জিদে যেতে দেখিনি।

— শালা ইণ্ডিয়ার দালাল।

— ইসলাম বিরোধী কাজ করলে কিন্তু শাস্তি পেতেই হবে। সাবধান।

— এই চল, চল। চল সব।

ওরা চলে গেল। রফিক ভাই গিয়ে গেটে তালা লাগিয়ে এলেন। একটা টুল বসিয়ে আমাকে বললেন

— নেমে এসো।

ঘামে ভিজে সারা গায়ে কালিঝুলি মেখে বাঙ্ক থেকে নামলাম। রেহানা ভাবী একটা তোয়ালে দিয়ে গায়ের নোংরাগুলো ঝেড়ে দিলেন। রফিক ভাই বললেন।

— যাও বাথরুম থেকে ফ্রেস্ হয়ে এসো।

আমি বাথরুম থেকে স্নান করেই এলাম। ততক্ষণে ছেলে-মেয়েগুলো যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। আজকের এই অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য নিজেকে বড় অপরাধী মনে হলো। বলালম —

— রফিক ভাই, আজ আমার জন্য আপনাদের এত অপমান, হেনস্থা।

— আমি সে কথা ভাবছিনা। আমি ভাবছি এ কোন দেশে আমরা বাস করছি। একি তালিবানি আফগানিস্তান, পাকিস্তান না স্বাধীন বাংলাদেশ? মুক্তি যুদ্ধের চেতনা এত তাড়াতাড়ি মুছে গেল বাঙালির মন থেকে?

রেহানা ভাবী বললেন।

— এরপর কী করবে সেটা ঠিক কর। ওরা যদি আবার আসে?

— হ্যাঁ, আসবেই তো। প্রতিবাদ নেই, প্রতিরোধ নেই, ওদের সাহস দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। অপুকে এখানে রাখা যাবেনা।

— ও কোথায় যাবে তাহলে?

— আপাততঃ কক্সবাজার, তোমার মামার বাড়ি

সেই রাতে আর ঘুম হয়নি কারো। শেষ রাতে একটা ব্যাগে টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস গুছিয়ে নিলাম। রফিক ভাই আগে একা বেরিয়ে রাস্তাটা দেখে এলেন। রেহানা ভাবী হাতে দশটা একশো টাকার নোট গুজে দিলেন। বললেন —

— মামারা বড়লোক হলেও ভালো মানুষ। ওখানে থাকতে তোমার কোনও অসুবিধা হবে না।

রফিক ভাই বললেন —

— চল, কক্সবাজারের ফাস্ট বাসটা ধরতে হবে।

ছেলে মেয়েগুলো অনেক আগেই উঠে গেছে। ওদের চোখেও জল। ছোট মেয়ে নূপুর আমার হাত ধরে বলল —

— মামা আবার আসবে তো?

— আসবো রে, নিশ্চয় আসবো।

তখন বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে। রফিক ভায়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। ফার্স্ট বাস ধরেই কক্স বাজার যখন পৌঁছালাম তখন বেলা সাড়ে এগারোটা। চট্টগ্রাম শহর থেকে ৯০ মাইল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরে এক মনোরম জায়গা কক্সবাজার। অনেকটা দীঘা বা পুরীর মতো। ছোট শহর কক্সবাজারের পাশেই রেহানা ভাবীর মামার বাড়ি। ওরা এখানকার বনেদী জমিদার। যেমন অর্থ তেমন ক্ষমতা। ওদের মুখের কথাই এখানে আইন। আধ ঘন্টার মধ্যেই আমরা রেহানা ভাবীর মামার বাড়িতে এসে পৌঁছালাম। চারদিকে গভীর পরিখা দিয়ে ঘেরা অনেকটা প্রাচীন কেল্লার মতো বাড়ি। চারদিকে বনেদীয়ানার ছাপ। রেহানা ভাবীর মামা শেখ শরিফুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে রফিক ভায়ের বাসায় অনেকবার দেখা হয়েছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমার আসার খবর পেয়ে দোতলা থেকে নেমে এলেন মামা। এ বাড়ির মেয়েরা পরপুরুষের সামনে বেরোয়না। পুরুষ পরিচারকদের আমাদের খাবার ব্যবস্থা করতে বললেন। স্নান খাওয়ার পর রফিক ভাই মামা-শ্বশুরের কাছে আসল কথাটা তুললেন।

— মামা, অপুকে দিন কতক আপনাদের বাড়িতে রাখতে হবে। ওখানে ওর খুব বিপদ। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে জামাতে ইসলাম আর ইসলামী ছাত্র শিবিরের লোকেরা এমন একটা অবস্থা করেছে ওর প্রাণ সংশয়।

— হ্যাঁ, খবরের কাগজে পড়েছি। অপুর কথাই লিখেছে, ও নাকি জামাতের কোন্ নেতাকে মেরেছে।

— আসলে লোকটার সঙ্গে অপুর খুব তর্কাতর্কি হয়েছিল। ওই লোকটা অপুদের কলেজের এক প্রবীন অধ্যাপক সম্পর্কে অশোভন উক্তি করেছিল। কিন্তু ওকে মেরেছিল অন্যলোক। তার মধ্যে সব পার্টির ছেলেরাই ছিল। কিন্তু ওরা ইচ্ছাকৃত ভাবে অপুর উপর সব দায় চাপিয়েছে।

— ও তাই, তা ও থাক্না যতদিন খুশি। আর জানোতো আমি একটা কলেজ করেছি, অপু যদি চায় তো ওখানে পড়াতে পারে। ও যদি দায়িত্ব নিতে রাজি থাক তো ওকে প্রিন্সিপ্যাল করে দিতে পারি।

— তাহলে তো খুব ভাল হয়। ও থাকল, ওর সব দায়িত্ব কিন্তু আপনার। আমাকে এখনই যেতে হবে।

সেদিন বিকেলেই আমাকে রেখে রফিকভাই চলে গেলেন। আমিও একটা নিশ্চিন্ত, নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। পরদিন থেকে মামা আমাকে ওদের ঐশ্বর্য দেখিয়ে চললেন। আস্তাবলে কুড়ি বাইশটা ঘোড়া। বিভিন্ন মডেলের আটখানা গাড়ি, গোয়ালে শ'খানেক গরু, অনেকগুলি ধানের গোলা, পুকুর-দীঘি, সমুদ্রের ধারে লবণ তৈরির জমি, হাট-বাজার সব মিলে এক রাজকীয় ব্যাপার। আমাকে কলেজের জন্য তৈরি বাড়িও দেখালেন। অনেকটা জমির উপর একতলা লম্বা, পাকা বাড়ি। আপাতত ইন্টারমিডিয়েট আর পাশে আর্টস-এর এ্যাফিলেশান পাওয়া গেছে। সামনের সেশান থেকে ক্লাস শুরু হবে। তবে এখন থেকে ছাত্র ভর্তি হতে শুরু করেছে। কারণ এই অঞ্চলে এই একটাই মাত্র কলেজ। কক্সবাজার সরকারি কলেজ এখান থেকে বারো মাইল দূরে। যদিও মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল, তবুও পরিবেশটি আমার খুব ভাল লাগল। এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল না হোক, একটা লেকচারের চাকরি পেলেও আমি এখানে থেকে যেতে রাজি।

একটু একটু অনুভব করছি কয়েকদিনের মধ্যে এই বাড়িতে আমার গুরুত্ব যেন ক্রমশ বাড়ছে। দেওড়ি থেকে নানা সাহেবের খাস কামরায় মামা সাহেবের সঙ্গে আমার খাওয়ার বন্দোবস্ত হল। বারমহল থেকে নীচের তলার একটা ভাল ঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা হল। বাড়ির মেয়েরা এক আধটুকু আমার সামনে বেরুচ্ছে। চাকর-বাকররা যেন একটু বেশি সমীহ করছে। সেদিন নানা কক্সবাজার গেছেন ব্যবসার কাজে, ফিরতে রাত হবে। আমি বাড়ির পেছনের পরিখার ধার ধরে একা হাঁটছি। হঠাৎ পেছন থেকে মেয়ে কণ্ঠে চম্‌কে উঠলাম্।

— শুনুন —

— আমাকে বলছেন?

— হ্যাঁ।

আঠারো-উনিশ বছরের এক যুবতী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। অপূর্ব সুন্দরী, এমন সুন্দরী মেয়ে আমি আগে কখনো দেখিনি। গোলাপী রঙের সালোয়ার কামিজের সঙ্গে গায়ের রঙ যেন মিশে গেছে। একই রঙের উপর জরির কাজ করা ওড়নায় মাথাটা ঢাকা। লম্বা বিনুনী হাঁটুর কাছে নেমে এসেছে।

আমি স্বপ্নাবিষ্টের মতো বল্‌লাম —

— কিছু বলবেন?

— আপনি এখান থেকে চলে যান।

— কেন?

— আববাজান আপনাকে মুসলমান করে আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার মতলব করছেন।

— কে আপনার আববাজান?

— শেখ শরিফুল ইসলাম।

আমি রীতিমতো চমকে উঠলাম্।

বললাম —

— আপনি কি জিনাত?

— হ্যাঁ।

— রেহানা ভাবীর মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি।

— রেহানা আপা আপনার কথাও আমাকে অনেক বলেছে। আপনার অনেক গল্প আমি পড়েছি। মুসলিম ইন্সটিটিউটে আপনার একটা নাটকও দেখেছিলাম রেহানা আপার সঙ্গে। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি চাইনা আপনি আমার জন্য ধর্মান্তরিত হন। আপনি সময় থাকতে পালিয়ে যান।

আমাকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মুর্হূতে অদৃশ্য হয়ে গেল জিনাত।

এখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে রফিক ভায়ের অফিসে ফোন করে কথাটা জানালাম। রফিক ভাই বললেন।

— তুই কাল বিলম্ব না করে ওখানে কাউকে কিছু না বলে চলে আয়। ওরা যা বলে তাই করে। মাথায় যখন কথাটা একবার ঢুকেছে তখন তা ওরা বাস্তবায়িত করবেই।

দিন কয়েকের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে আবার পথে নামলাম। রফিক ভায়ের বাসায় গিয়ে তাদের আর বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলতে মন সায় দিলনা। আমার গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। ওখানে ওরা রীতিমতো পাহারা বসিয়েছে। আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা আমাদের বাড়িতে আমার বাবা-মায়ের কাছে মানুষ হয়েছিল, এখন রাঙ্গামাটি কলেজে পড়ায়। সরকারি কোয়ার্টারে থাকে। পাহাড়ী জায়গা, লোকজন কম, ওখানে থাকাটা আমার পক্ষে যথেষ্ট নিরাপদ। চট্টগ্রাম থেকে বাস ধরে সোজা রাঙামাটি চলে গেলাম। তখন প্রায় দু'টো বাজে, কলেজের স্টাফরুমে ঢুকতেই আমাকে দেখে কাকা যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। বলল —

— তুই এখানে কেন এসেছিস?

— কাকা সবইতো জান, এই মুহূর্তে আমার কোথাও থাকার জায়গা নেই। যদি কটা দিন আমাকে থাকতে দাও।

— তুই কি চাস্ তোর জন্য ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমি বিপদে পড়ি? এক্ষুণি চলে যা, কে কোথায় দেখে ফেলবে।

এই কথার কোনও জবাব নেই, আবার নিঃশব্দে এসে রাস্তায় দাঁড়ালাম। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি, অনেক আশা করেছিলাম কাকার কোয়ার্টারে গিয়ে খাব। হঠাৎ চোখে পড়ল দু'টো ছেলে দূর থেকে আমাকে অনুসরণ করছে আর ইশারায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। একটা ছেলেকে চিনলাম, এক সময় আমাদের কলেজে পড়ত। ইসলামী ছাত্র শিবিরের কট্টর সমর্থক। এখন রাঙামাটি কলেজের গেটে খাবারের দোকানের ক্যাশিয়ার। ছেলেটি আমাকে ভালভাবে চেনে আর এই ঘটনার কথাও নিশ্চয় জানে। আমি হাঁটার গতি বাড়ালাম, ওরাও আরও দ্রুত আমাকে অনুসরণ করছে। আমার গন্তব্য আপাতত বাস স্ট্যান্ড। ভাগ্য ভাল স্ট্যাণ্ডে ঢোকার মুখে একটা বাস বেরিয়ে আসছিল, বাসটায় বেশ ভীড়। ভীড় ঠেলে উঠে ভিতরে এগিয়ে গেলাম, বাসের গতিও বেড়ে গেল। টিকিট কাটার সময় শুনলাম বাসটি চট্টগ্রাম যাবে না। আমারও নির্দিষ্ট কোনও গন্তব্য নেই, বাস যেখানে থামবে সেখানেই নেমে পড়ব। হঠাৎ মনে পড়লো কাছাকাছি আমার এক দুঃসম্পর্কের মাসীর বাড়ি আছে। সম্পর্কটা দূরের হলেও এক সময়ে ওদের সঙ্গে আমাদের খুব যাওয়া আসা ছিল। এত কাছে যখন এসে পড়েছি তখন এই বাড়িতে না হয় কদিন কাটিয়ে যাই। আমার ওই ঘটনার কথা নিশ্চয় ওরা শোনেনি। আর যদি শুনেও থাকে হিন্দু প্রধান এই গ্রাম আমার পক্ষে নিরাপদ। নির্দিষ্ট স্টপেজে নেমে পড়লাম। পাশেই কর্ণফুলি নদী, এখান থেকে নৌকায় নদী পার হলেই ওপারে মাসীদের গ্রাম। গ্রামের প্রায় শেষ প্রান্তে মাসীদের বিরাট মাটির বাড়ি। যৌথ পরিবার, অনেক লোক জন। এই বিকেল বেলায় আমাকে দেখে সবাই অবাক। অনেকদিন পর পুকুরে সাঁতার কেটে স্নান করলাম। তিন-চার রকমের মাছ দিয়ে মোটা লাল চালের ভাত খেলাম পরম তৃপ্তির সঙ্গে। এ বাড়ির যে সব ছেলে-মেয়ে এক সময় আমার খেলার সাথী ছিল তারা এখন ঘোরতর সংসারী। ছেলেদের বিয়ে হয়ে বৌ এসেছে বাড়িতে, আর মেয়েরা বিয়ে হয়ে চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি। শুধু মাসীর ছোট দেওরের মেয়ে টুনটুনির এখনো বিয়ে হয়নি। বাঙ্গুনীয়া কলেজে বি এ পড়ে। টুনটুনি আমার চেয়ে বছর ছয়েকের ছোট। ও ছোটবেলা থেকেই গল্পে ওস্তাদ। টুনটুনিই এখন এই বাড়িতে আমার একমাত্র বন্ধু। দু'তিনদিন বেশ হাসি গল্পে কেটে গেল। চারদিনের দিন দুপুর থেকে অসহ্য মাথার যন্ত্রণা শুরু হল, রাতে প্রচণ্ড জ্বর এলো। বাড়ির কর্ত্রী পিসিমা ও তাঁর জা'দুজনের বয়স হয়েছে। বউদের ছেলে-পুলে সামলানো, সংসারের কাজ। বাড়িতে একমাত্র বেকার টুনটুনি। তার উপরই পড়ল আমার সেবা-যত্নের ভার। ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ আনা, থার্মোমিটারে ঘন্টায় ঘন্টায় জ্বর দেখা, নিয়ম করে ঔষধ-পথ্য খাওয়ানো, মাথায় জলপট্টি দেওয়া, মাথা ধোয়ানা সব কাজেই টুনটুনি। সাত-আট দিনের মাথায় জ্বর ছাড়ল। শরীরটা খুব দুর্বল অনেকদিন চুল কাটানো হয়নি। দাড়িও বেশ লম্বা হয়েছে। চুলে জট পড়ে গেছে। সেদিন দুপুরে টুনটুনি একটা মোটা চিরুণী নিয়ে এসে বলল।

— চুলের কি হাল হয়েছে। দেখি জটগুলো ছাড়িয়ে দি।

— আঃ কি করছো, কে কী ভাববে।

— চুপ করো তো, ভাবলোতো বয়ে গেল।

টুনটুনি ছোটবেলা থেকে একটু ডাকাবুকো ধরনের। যা বলে স্পষ্ট বলে। চিরুণী দিয়ে আমার চুলের জট ছাড়াতে লাগল। আমি বললাম —

— ক'দিন তোমাকে খুব কষ্ট দিলাম।

টুনটুনি স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে আমার একখানা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে নিয়ে বলল,

— বলো, সারা জীবন এমন কষ্ট করার সুযোগ দেবে?

— আমিও চাই এমন একটা দিন আসুক।

— আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলবে?

— বলবো।

— তোমার কী হয়েছে?

— কেন?

— তোমার খুব বিপদ তাই না?

— কী করে বুঝলে?

— সেজ বৌদির ভাই এসেছিল। তখন তোমার খুব জ্বর। সেই বলল তোমার সঙ্গে নাকি মুসলমানদের গোলমাল। ওরা তোমাকে পেলে মেরে ফেলবে। ও আরও একটা খবর দিল, তোমার নামে থানায় ডায়েরী হয়েছে। তোমার কাছে নাকি অনেক অস্ত্র, তুমি হিন্দু ছেলেদের ট্রেনিং দিয়ে দেশ-বিরোধী দল তৈরি করছ। তোমার শত্রুপক্ষ এসব কথা প্রচার করছে।

— এসব কথা ও বলল? কোথায় শুনল ও?

— ওরা এসব প্রচার করছে। কাগজেও নাকি কয়েকবার বেরিয়েছে। ও আরও একটা কথা বলল।

— কী?

— তোমার কলেজের চাকরিটাও নাকি চলে গেছে।

ভাবতে অবাক লাগে মাত্র দশ বছরের মধ্যে দেশের মানুষের মন থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুছে গেল। সেই সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস এর মধ্যে মলিন হয়ে গেল। কোথায় গণতন্ত্র, কোথায় সমাজতন্ত্র, কোথায় ধর্মনিরপেক্ষতা। দেশের শাসনভার কতগুলি অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধর্মান্ধের হাতে। রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে অভিযুক্ত, স্বাধীনতার শত্রুরা আজ লাঠি তরোয়াল নিয়ে প্রকাশ্যে তাড়া করছে মুক্তিযুদ্ধের নায়কদের। মানুষ প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

— কী ভাবছো?

টুনটুনি জিজ্ঞাসা করলো।

— এ্যাঁ, না ও কিছু না।

পরদিন সকালেই বাজারে গিয়ে সেলুন থেকে চুল দাড়ি কাটিয়ে বাড়ি ফিরছি। মাসীমার বাড়ি থেকে বাজার হাঁটা পথে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। মনে হলো দু'টো লোক যেন আমাকে অনুসরণ করছে। কিন্তু এখানে আমাকে কে চিনবে? হয়তো আমার মনের ভুল, ওরা চলেছে ওদের কাজে। তবুও আমি সোজা বাড়ি না এসে অন্য পথ ধরলাম। দেখলাম লোক দুটো মাসীমার বাড়ির সামনে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কি কথাবার্তা বলে আবার ফিরে গেল। আমিও অনেকটা পথ ঘুরে অবশেষে বাড়ি ঢুকলাম। বাড়ি এসে দেখি আমার মাসতুতো বোন সোনালী আর তার বর এসেছে। বিয়ের পর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। সোনালীর শ্বশুর বাড়ি ফতেয়াবাদ। বর নাজির হাট স্কুলের মাষ্টার। সারাদিন গল্প-গুজবের মধ্যে কেটে গেল। এবাড়ির নিয়ম সবাই এক সঙ্গে খেতে বসে। বাড়ির বৌয়েরা কয়েকজন পালা করে পরিবেশন করে। সে রাতে সবার সঙ্গে আমিও খেতে বসেছি, দু'এক গ্রাস হয়তো মুখে দিয়েছি, এমন সময় উঠোনে কয়েক জনের কথাবর্তা শোনা গেল। মেসোমশাই জিজ্ঞাসা করলেন —

— কথা বলে কারা?

উত্তর এলো —

— আমরা থানা থেকে এসেছি।

মেসোমশাই এঁটো হাতে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

— কী ব্যাপার?

— আপনাদের বাড়িতে বাইরের লোক কেউ আছে?

— বাইরের লোক, হ্যাঁ আছে।

— অপু রায়?

— অপু রায় টায় কেউ না। আমার মেয়ে-জামাই এসেছে আজ। জামাইয়ের নাম অমিত চৌধুরী।

— দেখুন আমাদের কাছে খবর আছে অপু রায় নামে এক ক্রিমিনাল এই বাড়িতে আছে।

আমার সামনে বসেছিল টুনটুনি, ইশারায় আমাকে উঠে যেতে বলল। আমি গ্লাসে হাত ধুয়ে উঠে এলাম। টুনটুনি আমাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে আলনার পেছনে বসিয়ে কতগুলি কাপড় চোপড় চাপা দিয়ে চলে গেল। থানার পুলিশ বাহিনী ততক্ষণে ঘরে ঢুকেছে। কারা কারা খেতে বসেছিল ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। আমার জায়গাটায় ন বৌদি বসেছিল বলে চালিয়ে দিল। তবুও ওদের সন্দেহ দূর হয় না। অবশেষে এক হাজার টাকা নিয়ে ওরা চলে গেল। সেই রাতে আর কারও হয়তো খাওয়া হয়নি। আমার ঘটনাটি যারা জানতো না তারাও জেনে গেল। বাড়ির সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সোনালীর বর খবরটা আগেই জেনেছিল। রাজনীতি করা সাহসী ছেলে। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। সোনালীর সঙ্গে আলোচনা করে সেই আমাকে বলল

— এখানে থাকাটা আপনার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। যদি কিছু মনে না করেন তবে আমাদের বাড়িতে গিয়ে ক'দিন থাকতে পারেন। আমাদের

বাড়িটা অবশ্য পুরোনো, সেকেলে। তবে লুকিয়ে থাকার পক্ষে ভাল।

সোনালী আমার নিজের মাসতুতো বোনও নয়। মায়ের পিসতুতো বোনের মেয়ে। তার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ওঠা, কেমন সংকোচ হলো। কিন্তু এছাড়া আর উপায় কী? কাল সকালের আগেই এই বাড়ি ছাড়তে হবে, যাবো কোথায়? এই দুর্দিনে সবাই যখন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তখন এই দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা যদি আশ্রয় দিতে আগ্রহী হয় সেতো আমার সৌভাগ্য।

আবার পথ চলা। যাওয়ার সময় টুনটুনির জন্য মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। প্রণাম করতেই মাসীমা বললেন

— এসব ঝামেলা মিটে গেলে আবার আসবি।

টুনটুনি বলল

— সাবধানে থেকো। চিঠি দিও। আর আমাকে দিয়ে তোমার এই বিপদের সময় যদি কোনও কাজ হয় ডেকে নিও।

তার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। ঊষর মরু পথে টুনটুনি আমার কাছে এসেছিল এক স্নিগ্ধ মরূদ্যানের মতো। তার ছায়ায় দুদিনের বিশ্রামের পর আবার অনিশ্চিত অজানার পথে পা বাড়াতে হলো। টুনটুনির ভালো নাম স্নিগ্ধা। শরতের শিশির ভেজা শিউলীর মতো স্নিগ্ধ।

সোনালীর বর যতটা বলেছিল তাদের বাড়িটা আত্মগোপন করার পক্ষে ততোধিক নিরাপদ। শতাব্দী প্রাচীন দোতলা বিশাল দালান। শরিকি বাড়ি, অন্য শরিকরা এই বাড়িতে কেউ থাকে না। কালে ভদ্রে আসেও না। ওরা নীচতলার খান তিনেক ঘর বসবাসের যোগ্য করে রেখেছে। উপর-নীচের ফাঁকা ঘরগুলি বসবাসের অযোগ্য। রঙ চটে, আস্তরণ খসে পড়েছে কোন্ যুগে। ফাটলে ফাটলে গজিয়েছে বট অশ্বত্থের গাছ। জানলা দরজার অস্তিত্ব বড় একটা নেই। ঘরে ঘরে চামচিকের বাস। ঘন্টায় ঘন্টায় তক্ষক ডাকে। সোনালীরা একতলায় একটা ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিল। আমি রাজি হইনি। নিজেই উদ্যোগী হয়ে দোতলার দক্ষিণের ঘরটা পরিষ্কার করে বসবাসের উপযোগী করে তুলেছি। অবশ্য সোনালী আর সোনালীর বর সব কাজই করেছে। ওরা একটা ছোট তক্তপোষ, একটা ছোট টেবিল উপরে তুলে দিয়েছে। সামনে একটা বড় পুকুর টলটলে জল, শান বাঁধানো ঘাট। খুব ভোরে স্নান সেরে সন্ধ্যা আহ্নিক করে সোনালীর কাছ থেকে একটা উপন্যাস নিয়ে উপরে উঠে যাই। এখন আর মাথা থেকে লেখালেখি কিছু বেরুচ্ছে না। দুপুরের খাওবার সোনালী উপরে এনে দেয়। রাতে নিচে নেমে সবাই এক সঙ্গে খাই। আমার উপরের ঘরে থাকা নিয়ে সোনালীর শাশুড়ী প্রথমটাই খুব আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু আমি বোঝালাম আমি ওখানেই ভাল থাকব। সোনালীর শাশুড়ীর বয়স হয়েছে। হয়তো আমার মায়ের মতোই ৬০-৬৫ হবে। তাঁর কাছে আমি কোনও কথা গোপন করিনি। কেন আমাকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, কি ঘটেছিল, সব এক এক করে তাঁর কাছে বলেছি। তিনিও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছেন,

— কিছু ভেবোনা বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এখানে যতদিন খুশী থাকো। তোমার মার সাথে কতদিন দেখা হয়নি, কাউকে খবর দিয়ে মাকে নিয়ে আসা যায় না?

রোজ দুপুরে মাসীমা উপরে আমার কাছে বসে গল্প করতেন। কত কথা, এই বাড়ির ইতিহাস, তাঁদের পূর্বপুরুষদের কথা। এই বংশের একজন আরাকানের রাজসভায় উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর শ্বশুর মশাইয়ের ছিল কাপড়ের ব্যবসা। এক একদিন বিকেলে সোনালীও আসত। এই নিরাপদ আশ্রয়, সহজ সরল মানুষগুলোর অকৃত্রিম আন্তরিকতা, এই কর্তব্যনিষ্ঠা। আর তো কোথাও চোখে পড়েনি। অথচ ওরা আমার কে? যেখানে পরমাত্মীয়েরা আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আমার ঠাঁই মেলেনি। সকলের কাছে আমি যখন অবাঞ্ছিত, তখন এই দূর সম্পর্কের আত্মীয় পরিবারটি পরম আদরে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। না, এখানে আর থাকাটা এদের উপর উৎপীড়নের নামান্তর হবে।

সোনালীর বরকে পাঠিয়ে রফিক ভাইকে আনালাম। রফিক ভাই তো আমাকে দেখে অবাক। এতদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি, কোনও খবরই জানিনা। এদিকে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। জামায়তে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবির আমার নামে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দায়ে আদলতে মামলা করেছে। পিসিমার বাড়িতে টুনটুনি ঠিক খবরই দিয়েছিল। আমার পাশে দাঁড়ানোর আজ আর কেউ নেই। যে রাজনৈতিক দলের হয়ে ছাত্র জীবনে খেটেছি তার নেতারা সবাই মন্ত্রী আর নেতা হওয়ার লোভে এরশাদের জাতীয় পার্টিতে নাম লিখিয়েছে। রফিক ভাই বলেছিলেন, কিন্তু ওই ভীরু কাপুরুষগুলোর কাছে সাহায্য চাইতে মন সাড়া দিলনা। আমাদের গ্রামের ধনী মহাজন ধনা চৌধুরীকে খবর পাঠিয়ে এই গ্রামের সোনালীদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে আনালাম। পাঁচ বিঘা জমি বন্ধক রেখে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে সে রাজী হল। রফিক ভাই পরের দিন মাকেও নিয়ে এলেন। বেশি টাকা দিয়ে একদিনে পাশপোর্ট বের করা হল। আমার ইউনিভার্সিটির বন্ধু রতন বড়ুয়াকে খবর দিয়ে আনা হল। ও তখন চট্টগ্রামে একটা কাগজের রিপোর্টার। রতনই ডলার কেনা, ভিসার ব্যবস্থা সবই করে দিল। চট্টগ্রাম থেকে বাসে ঢাকা, ঢাকা থেকে বেনাপোল বর্ডার। তারপর কলকাতা। মায়ের দেশ ছেড়ে আসার ইচ্ছে ছিল না, অনেকটা জোর করেই আনতে হল। রাত দশটায় বাস। বাস স্ট্যান্ডে অনেকেই এসেছিল — রফিক ভাই, রেহানা ভাবী, তাদের ছেলে-মেয়েরা, রতন বড়ুয়া। এসেছিল সোনালী আর অমিত। একটু ফাঁকা পেয়ে সোনালী কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল,

— টুনটুনি কিন্তু তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবে। যদি পরিস্থিতি পাল্টায় ফিরে এসো।

বাস ছাড়ার হর্ণ বেজে উঠল।

কিডন্যাপ

বাদল ঘোষ

গোবিন্দ সাঁতরা একজন শিক্ষক। এই শহরে আছেন বিগত কয়েক বছর। স্থানীয় একটি নামী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি ইতিহাসের এম এ। তাহলেও স্কুলে বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি এবং অঙ্কের ক্লাসও নেন। নিজের সাবজেক্ট তো আছেই। মাল্টি পারপাস শিক্ষক আর কী। স্কুল তাকে ভাল ভাবে ব্যবহার করে এবং তিনিও ব্যবহৃত হতে ভালবাসেন। টিউশনিও করেন।

গোবিন্দবাবুর স্ত্রী এবং এক কন্যা। কন্যা জুঁই একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। মাধ্যমিকে স্টার পায়নি তিন নম্বরের জন্য। তার জন্য সে রেগে আছে। এমনিতেই সে রাগী মেয়ে। জুঁই ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা। সেইরকম স্বাস্থ্য। জিম করে। ক্যারাটে জানে। জুজুৎসু প্যাঁচে দক্ষ। তার মন ভালো থাকলে সে চমৎকার মেয়ে। মন খারাপ থাকলে ভয়ঙ্কর। দুঃখের বিষয়, বেশিরভাগ দিন তার মন মেঘলা থাকে।

এক শনিবারের দিন। বেলা তখন আড়াইটা। গোবিন্দবাবু স্কুল থেকে ফিরেছেন। চা মুড়ি খাচ্ছেন। তাঁর পরমপ্রিয় খাদ্য। ছোটবেলা থেকে খাচ্ছেন। এ খাওয়াটার প্রতি তাঁর একটা ভালবাসা গড়ে উঠেছে। জুঁই এখনও ফেরেনি স্কুল থেকে। সে দুটোর মধ্যে স্কুল থেকে চলে আসে। আজ আবার কি হল! দেরি হচ্ছে কেন? অবশ্য চিন্তার কোনও কারণ নেই। জুঁই খুব সাহসী মেয়ে। সেই রকম গায়ের জোর। যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে সে মোকাবিলা করতে পারে। তার জন্য গোবিন্দবাবুর একটা গর্ব আছে। ঠিক সেই সময়ে ঝনঝন করে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

।।দুই।।

টেলিফোন ধরলেন গোবিন্দবাবু। ওপাশ থেকে কথা ভেসে এল— এটা কি স্কুল শিক্ষক গোবিন্দবাবুর বাড়ি?

— হ্যাঁ।

— তিনি কি আছেন? একটু ডেকে দেবেন?

— আমিই গোবিন্দবাবু। কি বলছেন বলুন!

— নমস্কার স্যার। আপনি আমাকে চিনবেন না। চেনার কথাও নয়। একটা খবর দিই। আপনার মেয়েকে আমরা অপহরণ করেছি। মানে কিডন্যাপ আর কি!

— সে কী! গোবিন্দবাবুর কোল থেকে মুড়ির বাটি পড়ে গেল।

— স্কুল যাবার পথে, মোটামুটি পৌনে এগারোটায় একাজ করেছি আমরা। তবে স্যার, আপনার মেয়েকে অপহরণ করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে। সাংঘাতিক মেয়ে আপনার। অপহরণকালে চেঁচামেচি, কিছু করল না। আমরা পাঁচজন ছিলাম। টয় রিভলবার দিয়ে কাজটা সারলাম। হঠাৎ আপনার মেয়ে তিনটে ঘুষি মারল। দুটো ঘুষি দুজনের পেটে। তাদের নার্সিং হোমে ভর্তি করতে হয়েছে। খরচ হয়ে গেল অকারণ। হাসপাতালে দিতে পারিনি পুলিশের ভয়ে। ডাক্তাররা বললেন, হেভি ইনজুরি পেটে। সারতে অর্থ এবং সময় দুইই লাগবে। তারপর স্যার, থার্ড ঘুষিটা মারল গাড়ির গায়ে। বডির রং উঠে গেল এবং দুমড়ে গেল। গাড়িটা আমাদের নয়। এক বড়লোক বন্ধুর কাছে চেয়ে আনা। তার বাবার গাড়ি। সেটা গ্যারেজে পাঠাতে হল। গচ্চা লাগবে আর কি! তারপর স্যার, ভাড়া করা ড্রাইভার এনেছিলাম। তিনশো টাকার কথা ছিল, যখন সে জানল অপহরণের কেস, তখন সুযোগ বুঝে হাজার টাকা চাইল। না হলে রাস্তায় গাড়ি রেখে দেবে এবং পুলিশে খবর দেবে। বাধ্য হয়ে তার দাবি মানতে হল। শুরু থেকেই ব্যাপারটা খারাপ চলছে। বড় বিশ্রী।

— তা আপনাদের উদ্দেশ্য কি?

— আপনি সম্বোধন করে লজ্জা দেবেন না স্যার। আমরা আপনার ছেলের বয়সী।

— আমার কোনও পুত্র নেই। ওই একটাই মেয়ে সম্বল। তা তোমরা আমার মেয়েকে অপহরণ করলে কেন? আমার স্ত্রীকে করতে পারতে। আমি কিছু মনে করতাম না।

— সে রকমই প্ল্যান ছিল। তারপর আমাদের গোয়েন্দা খবর দিল, স্ত্রীর সঙ্গে আপনার লাইন খারাপ। হেভি খারাপ। আপনি স্ত্রীকে কাটাতে চান। তাকে উদ্ধারের জন্য আপনি একটা আধলাও দেবেন না। সুতরাং লাভ কি? একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। আমাদের কাকীমা, অর্থাৎ আপনার স্ত্রী অতো শুকনো কেন? হাড় সর্বস্ব কেন? অথচ আপনার মেয়ে কত স্বাস্থ্যবতী। কতো তফাৎ। আপনার মেয়েকে একটা পোড়ো বাড়িতে আটকে রেখেছি। ওকে চেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে আমাদের এক বন্ধু বাঁধতে গেল। আপনার মেয়ে এমন লাথি ছুঁড়ল, বন্ধুর মালাইচাকি সম্ভবত ভেঙে গেছে। অর্থপেডিক ডাঃ ঘোষকে দেখাতে হবে। আজ ওর ডেট নেই। চুন হলুদ লাগিয়ে সে এখন শুয়ে আছে। যন্ত্রণায় মাগো বাবাগো করছে।

— এঃ হে, আমার মেয়ে তো খুব খারাপ ব্যবহার করছে তোমাদের সঙ্গে। এটা ওর ঠিক হচ্ছে না!

— ওতে স্যার, আমরা কিছু মনে করিনি। মেয়েরা চিরকাল একটু অবুঝ হয়েই থাকে।

— তোমরা কি আমার মেয়েকে ছাড়বে না?

— ছাড়ব নিশ্চয়। তবে টাকা লাগবে। আমরা পাঁচ বন্ধু। অনার্স, এম এ করেছি, কিন্তু কেউ চাকরি পাইনি। একটা ব্যবসা করব পাঁচজন মিলে। কিন্তু ক্যাপিটাল নেই। শেষে এই লাইনটা ধরলাম। ভাল লাইন স্যার। খুব পয়সা। কাগজে দেখছি তো। অবশ্য ঝুঁকি আছে। কোন্ ব্যবসাতে ঝুঁকি নেই বলুন তো! আপনার মেয়ে আমাদের প্রথম কেস। স্বীকার করছি, বউনিটা ভাল হয়নি। তবে মাছটা বড়। ভাল টাকা পাব আপনার কাছে।

— তোমার নামটা বল?

— আসল নামটা বলা যাবে না। বঙ্কু বলবেন। ছদ্ম নাম।

— তা ভাই বঙ্কু, কত টাকা চাই?

— বেশি নয়, এক লাখ হলেই চলবে। আমাদের দলের একজনের বোনকে আপনি পড়িয়েছিলেন, মেয়েটা পড়াশোনায় ডেড কেস। আপনি ঠিকভাবে পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন। সে খাতিরে পাঁচ লাখের বদলে এক লাখ। বেশি কি!

— আমার পক্ষে বেশি। খুবই বেশি।

— কেন স্যার? একথা কেন? শুনে দুঃখ পেলাম। আপনার টাকা নেই? দশ লাখ টাকা দামের অত সুন্দর বাড়ি করেছেন। স্কুলে ভাল মাইনে পান। টিউশনি করেন। তবু বলছেন টাকা নেই? বিশ্বাসযোগ্য?

— ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে বাড়ি করেছি। বউ সুন্দরী নয় বলে বাড়িটা সুন্দর করেছি, দুঃখ ভুলবার জন্য। মেয়ের পিছনে খাওয়ার খরচ মাসে ৫ হাজার টাকা। কত খায় জানো?

— সহি বাত স্যার। এর মধ্যে তিনবার সে খাবার খেয়েছে। দামি দামি খাবার। আমরা বেকার। কোথায় টাকা পাব বলুন? ধারে দোকান থেকে আনলাম। দোকানী আর দিতে চায় না। বলে, সারা জীবন তোমরা ধারে চলছ। তোমাদের ভবিষ্যৎ কি? মুখ ঝামটা দিল। তা বলে জুঁইকে না খাইয়ে রাখতে পারি না।

— কোথা থেকে ফোন করছ?

— একটা বুথ থেকে। এখান থেকে ১ কিমি দুরে এক জঙ্গল, সেখানে প্রচুর বিষাক্ত সাপ, ভয়ে কেউ এদিকে আসে না। সেখানে এক বাড়িতে জুঁইকে রেখেছি। আপনার মেয়ে বেশ ভাল স্যার। একটু রগচটা এই যা। আপনি স্যার, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না।

— না, না। পুলিশের উপর আমার আস্থা নেই। তাদের এসবের মধ্যে জড়াচ্ছি না। সব নষ্ট গুড়ের খাজা।

— এবার কথাবার্তা শেষ করি।

— না, না। ফোন ছেড়ো না বঙ্কু। তোমার সঙ্গে কথা বলে বেশ আরাম পাচ্ছি।

— কিন্তু বিল উঠছে যে!

— টাকাটা আমার কাছে মুক্তিপণ হিসাবে ধরে নিও।

— সত্যি কথা বলতে কি, আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমারও বেশ ভাল লাগছে। সত্যি বিলের টাকাটা দেবেন তো! শুনেছি, আপনি খুব কঞ্জুস মানুষ।

— কে এমন কথা বলল তোমাকে? নিশ্চয় আমার স্ত্রী। তা হ্যাঁ হে বঙ্কু, এই অপহরণের ব্যাপারে আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ নেই তো? কি রকম যেন গন্ধ পাচ্ছি।

— মা কালীর দিব্যি বলছি, কোনও যোগাযোগ নেই। তাঁর ধারে কাছে আমরা যাই না। আপনি তাঁকে যেমন ভয় করেন, সেইরকম আমরাও। আপনার বাড়ির পাশ দিয়ে গেছি, কাকীমার গলা পেলাম। আপনাকে ধমকাচ্ছেন। বাপরে কী গলা! যেন ঢাক বাজছে।

— ঢাক নয় বঙ্কু, বল ফুলস্পীডে মাইক বাজছে।

— দেখবেন স্যার, কাকীমার নামে নিন্দে করলাম। সেটা আবার কাকীমার কানে তুলবেন না যেন। বিপদে পড়ে যাব। কাকীমা খুব জাঁহাবাজ মহিলা।

— তা আর বলতে। তোমার সঙ্গে সহমত বন্ধু। তা বঙ্কু, তোমাদের যদি এক লাখ টাকা না দিই, তোমরা কি জুঁইকে মেরে ফেলবে?

— একদম নয় স্যার। জুঁই আমাদের বোন। দাদা বোনকে খুন করতে পারে! সম্ভব? আমরা আলোচনা করে ঠিক করেছি, সেক্ষেত্রে ওকে আমরা আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব। আপনার মেয়ে পড়াশোনায় ভাল। একটা চাকরি ঠিক পেয়ে যাবে।

— তাহলে তো ভালই হয়। জুঁই -এর বহুদিনের সাধ ও আমেরিকায় যাবে। তাই পাঠিয়ে দাও তোমরা।

— কিন্তু স্যার, মেয়েকে ছেড়ে আপনি বাঁচবেন! সাতদিনে কেঁদে কেঁদে মরে যাবেন। কাকীমাকে একদিন বলেন নি?

— ইয়ে, তা বলেছি। তোমরা দেখছি সবই জানো। ঠিক আছে, টাকা দিয়ে দেব। এক লাখ পারব না ভাই, ওটা ৫ হাজার করে দাও।

— মরে যাব স্যার, একদম মরে যাবো। বাজারদর দেখুন। সব আগুন হয়ে আছে। হাত দেওয়া যাচ্ছে না। ৫ হাজারের কি দাম আছে? আচ্ছা ঠিক আছে এটা ১০ হাজার করে দিন। আপনার যখন ব্যাঙ্ক লোন আছে, কনসিডার করতেই হয়। হতে পারি কিডন্যাপার, তা বলে তো অমানুষ নই।

— ঠিক আছে। দশ হাজারই দেব।

— ইউ আর গ্রেট স্যার। আমাদের গোয়েন্দা বলেছে, আপনি খুব ভাল মানুষ। কথাটা ঠিকই বটে। আপনি তাহলে কাল সকাল দশটায় ১০ হাজার টাকা নিয়ে রেল স্টেশনের ওভার ব্রিজে দাঁড়িয়ে থাকবেন। টাকাটা নিয়ে নেব।

— আর মেয়েকে কখন ছাড়বে?

— রেল স্টেশনের বাইর যে চায়ের দোকানটা আছে, সেখানে আমরা জুঁইকে নিয়ে সাড়ে ন'টায় পৌঁছে যাবো। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে পেয়ে যাবেন। কোনও অসুবিধা হবে না স্যার। আমাদের সঙ্গে টয় পিস্তল থাকবে। ফলস্ ফায়ার করতে পারি, ভয় পাবেন না স্যার। তবে পুলিশকে ডাকবেন না।

— কথা দিচ্ছি, ওদের ডাকব না। ডেকে কি বিপদে পড়ব?

।। তিন ।।

পরদিন রবিবার। সকাল ৬টা। ঝনঝন করে টেলিফোন বাজল। গোবিন্দবাবু টেলিফোন তুললেন। বললেন, হ্যালো।

— প্রাতঃপ্রণাম স্যার। সাতসকালে আপনাকে বিরক্ত করছি। কিছু মনে করবেন না।

— কি ব্যাপার বঙ্কু?

— স্যার, আপনার মেয়েকে ছেড়ে দিচ্ছি।

— সেকি! মুক্তিপণ নেবে না? মুক্তিপণ না নিয়ে ছাড়াটা কি ঠিক হবে? তোমাদের প্রেস্টিজ থাকবে? আর্থিক লস হবে না?

— কি করব স্যার! বেকারের কপালই এই। উপায় নেই। কাল রাত দশটায় আমাদের মিটিং হল। দুজন নার্সিং হোম থেকে পালিয়ে এসেছে। ওদের পেটে এখন ব্যথা নেই। দশ হাজারে রাজি হয়েছি বলে আমাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হল। কিন্তু আমি লিডার। প্ল্যান আমার। আমি যা বলেছি, তার নড়চড় হতে পারে না। শেষে ঠিক হল, এক পয়সাও নেব না। আমরা এমনিই জুঁইকে ছেড়ে দেব। ভোর পাঁচটায় আপনার মেয়ে উঠেছে। বলল, ভাল ঘুম হয়েছে। সকালে জগিং করল, ফ্রী হ্যাণ্ড ব্যায়াম, যোগাসন। কি সুন্দর করল বলার নয়। চোখ জুড়িয়ে গেল। তারপর ডিম পাউরুটি কলা খেল। কফি খেল। তখন তাকে বললাম, জুঁই, বাড়ি চলে যাও। তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তারপরই নাটক স্যার।

— কিরকম?

— জুঁই বলল, না, যাব না। আরও কয়েকদিন এখানে থাকব। এখানে আমি ভাল আছি। সুখে আছি। তার কথা শুনে আমরা বিপদে পড়ে গেলাম। এত খাইখরচ কোথায় পাব? তখন আমি জোরে এক ধমক দিলাম। জুঁইয়ের কি কান্না। কিছুতেই চুপ করছে না। কি যে বিপদ বলার নয়। আশেপাশের লোক কান্না শুনতে পেলে তো সর্বনাশ। ধরা পড়ে যাব। তবে হাতে পায়ে ধরে চুপ করালাম। স্যার, শুনছেন তো?

— বলে যাও, থেম না। শুনতে ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, যেন উপন্যাস। সুখ-দুঃখের পদাবলী। আমার মেয়ে কী চিজ বোঝ তোমরা। আর ওর মায়ের কথা কি বলব! হাড়মাস কালি করে দিলে।

— সংসারে সবাই কি ভাল হয় স্যার? একটু মানিয়ে নিন। সব সংসারে একই অবস্থা। তারপর যা বলছিলাম, তবে পাঁচজনে পাহারা দিয়ে বনের বাইরে আনলাম। এখানে বড় বেশি বিষাক্ত সাপ। যদি জুঁইকে কামড়ে দেয়! তাহলে তো আরও ফেঁসে যাব। বনের বাইরে এসে জুঁই আবার গোলমাল শুরু করে দিল। তবে কিডন্যাপ করে কি ফ্যাসাদে পড়েছি বলার নয়। জুঁই বলল— হেঁটে বাড়ি যাব না। রিক্সাতেও নয়। মারুতি করে এনেছ, মারুতি করে ফেরৎ পাঠাও। ন্যায্য কথা। কিন্তু হাতে স্যার একটাও টাকা নেই। এক মারুতিওয়ালাকে ডেকে আনলাম। গাড়িতে ওঠার সময় আমাদের পাঁচজনকে প্রণাম করল জুঁই। তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতে গাড়িতে উঠল। খুব কঠিন গেরো স্যার। আপনার মেয়ে আমাদের মায়ায় বেঁধে গেল। বুক টনটন করছে আমার। আমাদের মুক্তি কেমন করে হবে স্যার?

— তাহলে কেমন মেয়ে আমার বলো?

— খুব সুন্দর স্যার। খুব ভাল। পৃথিবীতে এমন চমৎকার একটা মেয়ে আছে, আমরা জানতেও পারতাম না কিডন্যাপ না করলে। ওটাই আসল লাভ হল আমাদের। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। একটু বাদে জুঁই পৌঁছে যাবে।

— জুঁইয়ের কথা ভাবছি না। তোমাদের কথা ভাবছি। একদিন তোমরা আমাদের বাড়ি এস বেড়াতে। এখানেই খাবে। সারাদিন তোমাদের নিয়ে হৈচৈ করব। খুব আনন্দে কাটবে।

— যাবার উপায় নেই স্যার। খবর পেলাম, আপনি থানায় ডায়েরি না করা সত্ত্বেও পুলিশ ব্যাপারটা জেনে গেছে। গোয়েন্দা বলল, আমাদের নামও জেনে গেছে। পুলিশ ধরলে খুব মারবে। তারপর আবার কেসও দেবে। কি করে কেস চালাব স্যার? আমরা যে বেকার। হাতে পয়সা নেই। বাড়িও হেল্প করবে না।

— পুলিশ মামলা করলেই হল। করুক না। দেশে আইন নেই, আদালত নেই? আমি তোমাদের পাশে আছি। আমি খরচ করে, ভাল উকিল লাগিয়ে, তোমাদের মুক্ত করব। এটা তো আমার কর্তব্য।

— না স্যার। আপনার উপর আমরা মানসিক টরচার করেছি জুঁইকে কিডন্যাপ করে। অন্যায় করেছি। পাপ করেছি।

— আহা, তার জন্য তো আমি কিছু মনে করিনি। কেন তোমরা দুঃখ পাচ্ছ? যা করেছ বেশ করেছ। আমি তো তোমাদের সাপোর্ট করছি।

— আপনি ক্ষমা করলেও আমাদের বিবেক ছাড়বে না। স্যার, আমরা একটা সিদ্ধান্তে এসেছি, সেটা বলি। আমাদের সম্পদ বলতে পাঁচজনের হাতের পাঁচটা ঘড়ি। ওগুলো বিক্রি করে আমরা এই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কোথাও গিয়ে আমরা লেবারগিরি করে খাব। এত বড় পৃথিবীতে কি আমাদের কোথাও জায়গা হবে না! একটা জিনিস খারাপ লাগছে স্যার। বাজারে বহুত দেনা রেখে গেলাম। খাবার দোকানে দেনা, নার্সিং হোমে দেনা, গ্যারেজে দেনা। দেনায় দেনায় জর্জরিত। যদি আমরা কোনওদিন টাকা রোজগার করতে পারি, একদিন ঠিক শোধ করে দেব। ঠিক নেপোলিয়নের মতো। বাবার একটা টাকাও মারব না। প্রতারণা মহা পাপ। বেকার আছি বলে এত পাপ করতে হল। গুড বাই স্যার। বিদায়। ফোন ছাড়ছি।

— বঙ্কু বাবা, শোনও শোনও, ফোন ছেড়ো না। কথা আছে আমার। অনেক কথা। ওপাশ থেকে কট্ করে একটা শব্দ। ফোন কেটে দিয়েছে বঙ্কু। গোবিন্দবাবুর মন যন্ত্রণায় ভরে উঠল। জীবনে এত যন্ত্রণা কোনওদিন কি পেয়েছেন? স্মরণ করতে পারলেন না গোবিন্দবাবু। রিসিভারে ফোন রেখে দিলেন। দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

ওদিকে বাইরে গাড়ির হর্ণ। জুঁই ফিরে এসেছে। জুঁই বলল, বাবা, আমি ফিরে এসেছি।

— ওদের একজনকেও সঙ্গে আনতে পারলি না জুঁই?

ভাইসে খুশী মা

শারদ শুভেচ্ছায়

অবাক করা দারুণ স্বাদ

ICE CREAM

Manufactured by:

SUBZERO ICE CREAMS PVT. LTD.

138J, Picnic Garden Road, Kolkata 700 039, Phone: 033 23430400, 92393 74656

email: subzerowice@gmail.com

Ideaino/SZ-08